মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর

৪০ বছর

নির্বাচিত রচনার সংকলন

সম্পাদনা । ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম

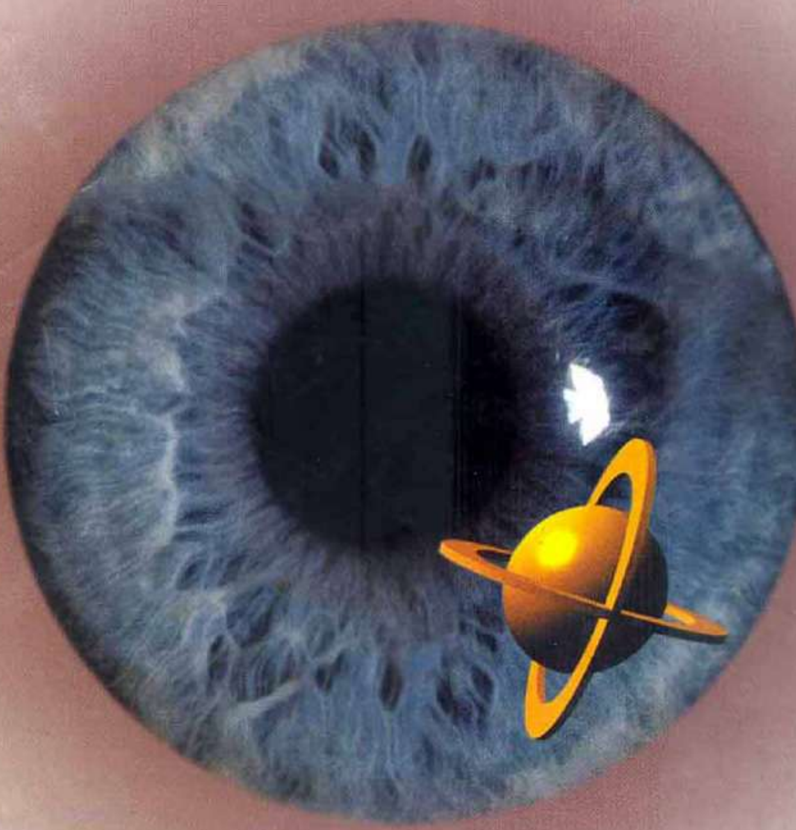

আমরা চেয়েছিলাম উদ্যোগটা ক্ষুদেবিজ্ঞানীদের হলেও, পত্রিকাটি হবে সবার জন্য—যেখানে দেশের বৈজ্ঞানিক চেতনার একটি প্রতিফলন ঘটবে। তাই ক্ষীণ অবয়বে প্রকাশিত হলেও গোড়া থেকেই এই পত্রিকার একটি বড় পরিসর ছিল, আকাঙ্ক্ষাটিও বড় ছিল। সারা দেশের বিজ্ঞানোৎসাহী-সমাজ থেকে এটি শুরুতেই সাড়া পেয়েছিল। ফলে বড় আসরে যেতে এর বেশি দেরি হয় নি। একদিকে বিশ্ববিজ্ঞানে যখন যেটি আলোড়ন তুলেছে *বিজ্ঞান সাময়িকী*র পাতায় তা অগ্রগণ্যতা পেয়েছে। অন্যদিকে সব সময় আমাদের একটি মূল সুর ছিল—দেশ ও বিজ্ঞান।

*বিজ্ঞান সাময়িকী*র নিয়মিত প্রকাশনার চল্লিশ বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কাল-পরিক্রমার এক সাক্ষীও বটে। বিজ্ঞান সাময়িকীর যখন সূচনা-পর্ব, তখন বিজ্ঞানের সীমান্তে মহাশূন্য-যুগের উন্মেষ ঘটছে। ওটা ছিল স্পুটনিক আর গ্যাগারিন-গ্লেনের জয়জয়কারের সময়। স্বাভাবিকভাবেই এর বিস্ময়, এর উত্তেজনা সাময়িকীর পাতায়ও দেখা গিয়েছে।

চল্লিশ বছর ব্যাপী প্রকাশনায় *বিজ্ঞান সাময়িকী*র বিষয়-বৈচিত্র্য প্রচুর। সে রকম এর লেখক-বৈচিত্র্যও প্রচুর।

(অপর ফ্ল্যাপে দেখুন)

ISBN 984 410 203 0

মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর
৪০ বছর

নির্বাচিত রচনার সংকলন

সম্পাদনা

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম

ভূ মি কা

মাসিক *বিজ্ঞান সাময়িকীর* চল্লিশ বছরের অনেক প্রকাশনা থেকে সংকলনের জন্য কিছু রচনা বেছে নেয়া দুরূহ কাজ। এক্ষেত্রে একে চল্লিশ বছরের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর সংকলন হিসাবে পাওয়াটি মূখ্য প্রচেষ্টা ছিল না। বরং বলা যায় নানা দিক থেকে এটি সময়ের সঙ্গে *বিজ্ঞান সাময়িকীর* নানা আমেজের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। *বিজ্ঞান সাময়িকীর* সূচনাপর্ব ঘটেছিল ১৯৬০ সালে, চট্টগ্রাম কলেজের সদ্য স্কুল পেরিয়ে আসা ছাত্রদের মধ্যে। প্রথম সংখ্যার পরিচিতি ঘোষণায় ছিল— 'ক্ষুদেবিজ্ঞানী সমষ্টির উদ্যোগে প্রকাশিত বার্তাবহ'। আমরা চেয়েছিলাম উদ্যোগটা ক্ষুদেবিজ্ঞানীদের হলেও, পত্রিকাটি হবে সবার জন্য—যেখানে দেশের বৈজ্ঞানিক চেতনার একটি প্রতিফলন ঘটবে। তাই ক্ষীণ অবয়বে প্রকাশিত হলেও গোড়া থেকেই এই পত্রিকার একটি বড় পরিসর ছিল, আকাঙ্ক্ষাটিও বড় ছিল। সারা দেশের বিজ্ঞানোৎসাহী-সমাজ থেকে এটি শুরুতেই সাড়া পেয়েছিল। ফলে বড় আসরে যেতে এর বেশি দেরি হয় নি। একদিকে বিশ্ববিজ্ঞানে যখন যেটি আলোড়ন তুলেছে *বিজ্ঞান সাময়িকীর* পাতায় তা অগ্রগণ্যতা পেয়েছে। অন্যদিকে সব সময় আমাদের একটি মূল সুর ছিল– দেশ ও বিজ্ঞান। *বিজ্ঞান সাময়িকীর* পাতায় আমরা গোড়াতেই ছাপাতে পেরেছিলাম আমাদের অনুপ্রেরণাদায়ী বিজ্ঞানী আবদুস সালামের সেই অমর ঢাকা-ভাষণঃ 'এমন উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে হবে যাতে সমগ্র জাতি মনোবল কাজে লাগিয়ে এক পুরুষের মধ্যেই দারিদ্রের অবসান ঘটাতে পারে।... এটা হল কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব'। এই উদ্দীপনা সৃষ্টির কথাটি আমরা কখনো ভুলি নি।

বিজ্ঞান সাময়িকীর নিয়মিত প্রকাশনার চল্লিশ বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কাল-পরিক্রমার এক সাক্ষীও বটে। *বিজ্ঞান সাময়িকীর* যখন সূচনা-পর্ব, তখন বিজ্ঞানের সীমান্তে মহাশূন্য-যুগের উন্মেষ ঘটছে। ওটা ছিল স্পুটনিক আর গ্যাগারিন-গ্লেনের জয়জয়কারের সময়। স্বাভাবিকভাবেই এর বিস্ময়, এর উত্তেজনা সাময়িকীর পাতায়ও দেখা গিয়েছে। পরমাণু-শক্তির প্রয়োগ তখনো বৈজ্ঞানিক কর্মসূচিতে অগ্রগণ্য ছিল। বিশেষ করে পারমাণবিক ফিউশন থেকে প্রায় অশেষ শক্তি-উৎসের ভাণ্ডার তখন উন্মোচিত হয়ে গেল প্রায় বলে মনে হচ্ছিল— যা শেষ পর্যন্ত আজ অবধি সম্ভব হয় নি। এরপরও খবর থেকেছে শক্তি উৎস— কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত বদলে গেছে। তিয়াত্তরের তেল-সংকটে শক্তির সনাতন উৎসগুলো নিয়ে উন্নত দেশগুলো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই মনোযোগ পায় সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি ইত্যাদি নবায়নযোগ্য শক্তিগুলো। কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স বিপ্লবের হাওয়া সাময়িকীর পাতায় আগেভাগেই লেগেছিল। পরে একই সঙ্গে বিজ্ঞানের জগতে ও আমাদের দৈনন্দিন জগতে এর প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। সাময়িকীর লেখালেখির এবং খবরের একটি বড় অংশ সেদিকে চলে যায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রায়োগিক বিজ্ঞানের এই দিকগুলো লেখক-পাঠককে নাড়া দেয় বেশি, কারণ সেগুলো আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে সরাসরি। কিন্তু *বিজ্ঞান সাময়িকী* কোনো পর্যায়েই শুধু সেগুলো নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল না। বিজ্ঞানের মৌলিক সৃষ্টিগুলো, বিশ্বের পরম রূপ উদ্ঘাটনে তাদের ভূমিকা *বিজ্ঞান সাময়িকীকে* সব সময় হাতছানি দিয়েছে। বিষয়গুলো যতই জটিল ও দুর্বোধ্য হোক না কেন জনপ্রিয় বিজ্ঞানের সফল লেখকরা সেগুলোকে সাধারণ মানুষেরও মননকে নাড়া দেবার মতো করে তুলে ধরতে পেরেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ

নিজেরাই ঐ বিজ্ঞানের সৃষ্টিকার, আবার সাধারণ্যের জন্যও লিখেছেন চমৎকারভাবে। *বিজ্ঞান সাময়িকীর* সৌভাগ্য যে, তাঁদের কারো-কারো লেখা এটি ধারণ করতে পেরেছে। আইনস্টাইন জন্ম-শতবার্ষিকী, বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি ইত্যাদি নানা উপলক্ষকেও *বিজ্ঞান সাময়িকী* স্মরণ করেছে বিশেষ সংখ্যা, বিশেষ প্রবন্ধমালা ইত্যাদির মাধ্যমে।

চল্লিশ বছর ব্যাপী প্রকাশনায় *বিজ্ঞান সাময়িকীর* বিষয়-বৈচিত্র্য প্রচুর। সে রকম এর লেখক-বৈচিত্র্যও প্রচুর। এই উভয় বৈচিত্র্যকেই আমরা সংকলনে ধারণ করার চেষ্টা করেছি। অতি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ থেকে হালকা মেজাজের রূপক লেখা, বড়দের থেকে ছোটদের মনোগ্রাহী বিষয়বস্তু সব কিছুরই কিছু প্রতিনিধিত্বমূলক লেখা এখানে আনা হয়েছে। তাছাড়া যে সব সক্রিয় কর্মদ্যোগ *বিজ্ঞান সাময়িকী* বিভিন্ন সময় গ্রহণ করেছে তারও কিছুটা প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। তারপরও অবশ্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিকের লেখা, বেশ কিছু উচ্চ মানের লেখকের প্রতিনিধিত্ব থেকে এই সংকলন বঞ্চিত হয়েছে। অবয়ব বড় হয়ে যাওয়াটাই ছিল তার প্রধান কারণ। এ সব সত্ত্বেও এই সংকলনটি চল্লিশ বছর ধরে ব্যাপ্ত একটি প্রচেষ্টার, একটি আকাঙ্ক্ষার, একটি আন্দোলনের আলেখ্য হিসাবে আদৃত হবে, এই আশা আমাদের থাকবে। বিভিন্ন রচনার শিরোনামের সঙ্গে ও পাদটিকার সাথে যে নকশাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো অতীতের *বিজ্ঞান সাময়িকীর* পাতা থেকে চয়ন করা।

নভেম্বর, ২০০০

মুহাম্মদ ইব্রাহীম
সম্পাদক
মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী

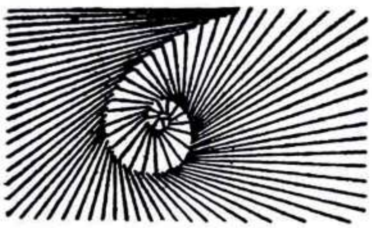

সূচিপত্র

১৭ আগামী দিনের শক্তি/ বোরহানুল ইসলাম সিদ্দিকী
২০ নবতম
২১ সাম্প্রতিক। স্ট্রেলকা ও বেলকার মহাশূন্য ভ্রমণ
২২ সম্পাদকীয়। ঘূর্ণিবাত্যায় বিধ্বস্ত আমরা
২৩ অধ্যাপক সালামের ভাষণ
২৫ অথ সংখ্যা সংবাদ
২৭ বিজ্ঞান সাময়িকী সম্পর্কে পরিচয়
২৮ সাম্প্রতিক। মহাশূন্যে প্রথম মানুষ
৩০ সম্পাদকীয় । এটি আমাদের কাজ
৩১ মহাশূন্যে নতুন মানুষ : গ্লেন
৩২ অশ্রুত রাগিনী / সুরাইয়া বেগম
৩৪ অথ আড্ডা তত্ত্ব / জ. ও. ম. শামসুল হোসাইন
৩৬ শক্তির সন্ধানে মানুষ / মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
৩৯ রেডিয়ামের আবিষ্কার /মারিকুরি (১৮৬৭–১৯৩৪)
৪১ অঙ্কের জাদুকর রামানুজম/ ইফতিখার গণি চৌধুরী
৪৪ তৃতীয় বিজ্ঞান-মেলা প্রসঙ্গে/ মুহাম্মদ সালামত উল্লাহ
৪৬ কম্পিউটার বিভ্রাট/ মাইনুল আনাম
৪৯ আপেক্ষিক তত্ত্বের এক অধ্যায়/ মুসলেহ উদ্দীন
৫১ সম্পাদকীয়। লক্ষ মানুষ কেন ভেসে যাবে?
৫২ বাংলাদেশ ও গণমুখী বিজ্ঞান/ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
৫৬ নেশা যার নাম / হামিদ রেজা
৫৯ তোমাদের জন্যে, ভালবাসা/ হুমায়ূন আহমেদ
৬২ সাম্প্রতিক। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা
৬৩ সম্পাদকীয়। চাই দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যকর পলিটেকনিক
৬৪ বহির্বিশ্বে জীবন/ মোহাম্মদ আতাউল করিম
৬৭ বাংলাদেশে পদার্থবিদ্যা-চর্চা /অজয় রায়
৭০ যে চিঠি আমরা বিলম্বে পেলাম
৭২ আচার্যের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ/ আনোয়ারুর রহমান খান
৭৫ সম্পাদকীয়। বিজ্ঞান ও কাজ ভিত্তিক শিক্ষা
৭৬ সাক্ষাৎকার। এ শিক্ষা হবে তদারকীয় জন্য নয় নিজে করার জন্য / ড. কুদরত-ই-খুদা। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ড. আলী আসগর
৭৮ প্রোটিনের অভাবে অপুষ্টি / মাসুদ সিদ্দিকী
৮১ সংশয় ঊনবিংশতি / স্বাতী

৮৩ তেল সংকট ও আগামী দিনের পৃথিবী / সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন আহম্মদ
৮৬ মতামত। কেমন হয়?
৮৭ বই আলোচনা। দ্বিজেন শর্মা / চার্লস ডারউইন/ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
৮৯ সম্পাদকীয়। মাটির কাছের সংস্কৃতি
৯০ সম্পাদকীয়। বাংলা ও ইংরেজি
৯১ বিজ্ঞান সাময়িকীর বিশেষ সাক্ষাৎকার। প্রফেসর আবদুস সালাম
৯৪ পাখ-পাখালীর নীড়ে /দীপক কুমার দাঁ
৯৬ শক্ত জিনিস শক্ত কেন /মুহাম্মদ ইব্রাহীম
৯৯ সাম্প্রতিক। মঙ্গলের খবর আসছে সেখানে কি প্রাণ আছে
১০১ কুকুরের কান থেকে ব্যাঙের চোখ /ড. জহুরুল হক
১০৫ পারমাণবিক যুগের জন্মকথা /স্বপন কুমার গায়েন
১০৮ ভিনদেশী এক স্কুলে / জিয়াউল হক
১১০ অনুসন্ধানী কারা? তারা কী করে?
১১৩ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পঞ্চাশ বছর /এ. এম. হারুন-অর-রশীদ
১১৬ বিজ্ঞান-ক্লাব : সমন্বয়/ বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশ '৭৬
১১৯ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞান-আন্দোলন /আবদুল্লাহ আল-মুতী
১২২ আকাশ দেখা /মোহাম্মদ আবদুল জব্বার
১২৫ পানি : একটি বিশিষ্ট পদার্থ /আলী আসগর
১২৭ টপোলজি কী/ নাদিরা মজুমদার
১২৮ বোটানিক্যাল গার্ডেন : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় / এম. এ. রহমান
১৩০ জল পড়ে পাতা নড়ে! নদী চলে বাঁকে বাঁকে /মুহাম্মদ ইব্রাহীম
১৩২ ইতিহাসের পাতা থেকে। বিদ্যুৎ যুগের জন্মদিনে
১৩৪ ইথনোবোটানি গবেষণার নতুন দিগন্ত/ আজিম উদ্দিন মল্লিক
১৩৭ সম্পাদকীয়। শিক্ষার মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতি
১৩৮ একটি ঐতিহাসিক সংলাপ
১৪২ ম্যাচ বক্স সাক্ষরতা/ বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের প্রস্তাব
১৪৪ সম্পাদকীয়। আইনস্টাইন জন্ম-শতবার্ষিকী
১৪৫ বিজ্ঞান সাময়িকী থেকে পুনরাবৃত্তি (আইনস্টাইন সম্পর্কিত)
১৫০ সম্পাদকীয়। বিজ্ঞান সাময়িকীর অন্য স্কুল
১৫১ আপন স্কুল। স্কুল খুইলাছে
১৫৪ বর্ণালী। অলৌকিক প্রুফ-রিডার
১৫৫ সম্পাদকীয়। শিশুবর্ষ কার জন্য?
১৫৬ সম্পাদকীয়। আবদুস সালামের সেই ডাক
১৫৭ অবশেষে বিশ্ব বসন্তমুক্ত/ ডোনাল্ড হেন্ডারসন
১৬১ বঙ্গোপসাগরের ট্রলারে/ বিষ্ণু দাশ
১৬৪ সূর্যগ্রহণ দেখাতে অনুসন্ধানীর আয়োজন
১৬৬ গ্রামবাংলায়। গভীর পানির ধান
১৬৭ চমকপ্রদ। মাকড়সার টরেটক্কা
১৬৮ গণশিক্ষা। ম্যাচবক্স সাক্ষরতা—বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়
১৬৯ সম্পাদকীয়। বিলাসিতার অনুকরণ নাকি দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই
১৭০ সাম্প্রতিক। প্রযুক্তি : লাগসই জায়গায়
১৭২ এক অনন্য পাহারাদারী /ফারজানা নাজনীন
১৭৪ যেদিন তুমি মহাকাশে যাবে /সাব্বির আনোয়ার
১৭৬ কনফারেন্সের বুলি
১৭৮ অন্য রকম একটি স্কুল /বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিবেদন
১৮০ আপনার ব্যাটারিকে চিনে নিন

১৮৬ সম্পাদকীয়। কাজী মোতাহার হোসেনের প্রয়াণে
১৮৭ টুকরো ছবি। গ্যালিলিও স্মৃতি : ফ্লোরেন্স/মুহাম্মদ ইব্রাহীম
১৮৯ এমন কেন হয়? । তাপ /স্বাতী
১৯১ বিজ্ঞান লেখকের বক্তব্য /আবদুল্লাহ আল-মুতী
১৯৪ চমকপ্রদ। বিদ্যুৎ বাল্‌বের হিসাব-নিকাষ
১৯৫ উই পোকা! সাবধান! /সাব্বির আনোয়ার
১৯৭ পশু-পাখির আচরণ : যে বিজ্ঞান এখনো শৈশবে /স্বাতী
২০০ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে যেমন দেখেছি /ড. কাজী মোতাহের হোসেন
২০৫ সম্পাদকীয়। অনুসন্ধানীর সম্মেলন
২০৬ হার্ট আমার হার্ট /স্বাতী
২০৯ পানি /এলিজাবেথ জেইনওয়ে
২১১ গ্রামীণ প্রযুক্তি প্রকল্প। পরিমিত উত্তাপে পানি বিশুদ্ধকরণ : বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা
২১৩ সম্পাদকীয়। প্রাচীন সেই আগন্তুক : হ্যালির ধূমকেতু
২১৪ সম্পাদকীয়। নারী ও বিজ্ঞান
২১৫ চাঁদের কাছে দুর্ঘটনা : এ্যাপলো–১৩ কাহিনী : জেবা জয়নাব
২১৮ অসুখের খাদ্য নিয়ে লোকবিশ্বাস/ নিত্যগোপাল বসু
২২০ বাঁ-হাতি /মুহাম্মদ ইব্রাহীম
২২২ বর্ণালী। প্রিন্সিপিয়ার তৃতীয় শতবার্ষিকী
২২৪ ফরাসি প্রতিমন্ত্রীর গ্রামীণ কারিগরি বিদ্যালয় পরিদর্শন
২২৫ রান্নাঘরের বিজ্ঞান /গৃহস্থ
২২৭ সম্পাদকীয়। কমপিউটার আমরা কতখানি ব্যবহার করছি
২২৮ সাধারণ নিয়ে অসাধারণ ভাবনা /রবার্ট ফুলঘুম
২২৯ কী করে নোবেল পুরস্কার পাওয়া যায় /আমীর আমিরানী
২৩১ সম্পাদকীয়। ধরিত্রী সম্মেলনে যা হল
২৩২ সম্পাদকীয়। তথ্য প্রচুক্তির আবাহন
২৩৩ ধরিত্রী সম্মেলন ও তারপর : আমাদের করণীয়/ সেমিনারের মূল বক্তব্য
২৩৬ ইতিহাসের ঢাকা নগরী : প্রযুক্তি ও জনজীবন / মুহাম্মদ ইব্রাহীম
২৩৯ তাম্রযুগের এক নিঃসঙ্গ পথিক : আইসম্যান
২৪২ এভারেস্ট শৃঙ্গে : মহাবিজয়ের ৪০ বছর /স্বাতী
২৪৫ সম্পাদকীয়। টেলিভিশনের বিশ্বায়ন
২৪৬ এ যুগের রোবট-শ্রমিক /স্বাতী
২৪৮ ইন্টারনেট ব্যবসা /আরিফ বাদশা খান
২৫১ সাম্প্রতিক। কম্পিউটারের শতাব্দী সঙ্কট
২৫৩ সম্পাদকীয়। মৃত্যুঞ্জয়ী লারা
২৫০ আলেয়া বেগমের সারাজীবন । সময়ের প্রেক্ষিত নিয়ে একটি রূপকথা /গডফ্রিড বোমান
২৫৭ চমকপ্রদ। ডিম্বাণুর উদার নীতি : নতুন প্রজাতির সৃষ্টি
২৫৮ যা আসছে। ডাক্তারের কাছে জেনেটিক প্রফাইল /মু. ই.
২৬০ একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
২৬২ বিজ্ঞান সাময়িকীর ৪০ বছরের রচনা-তালিকা

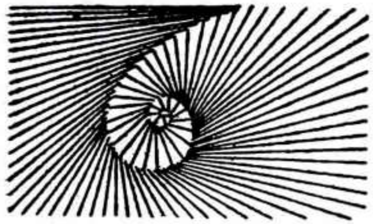

আগামী দিনের শক্তি

[সেপ্টেম্বর '৬০]

বোরহানুল ইসলাম সিদ্দিকী

সরাসরি কিংবা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সূর্যই যে পৃথিবীর সব কিছুর উৎস একথা আমরা জানি। সূর্য তার প্রচণ্ড তেজ কোটি কোটি বছর ধরে অকাতরে বিলিয়ে আসছে। সূর্যের ভেতর এই প্রচণ্ড তেজ কিভাবে উৎপন্ন হয় তা সত্যিই ভাববার কথা। আমরা যেভাবে কয়লা কিংবা অন্য কোন জ্বালানী পুড়িয়ে তাপ উৎপাদন করি সূর্যের তাপ নিশ্চয়ই সেভাবে উৎপন্ন হয় না। কারণ তাহলে সূয্যিমামা যতই দৈত্যাকার হোন না কেন, আর তাঁর জ্বালানীর ভাণ্ডারটি যতই বড় হোক না কেন তাঁকে এতদিনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হত। কিন্তু ছাই হওয়া দূরের কথা এতদিন পর্যন্ত তাপ বিলিয়ে আসার পরেও সূর্যের তাপের এতটুকু কমতি হয়নি, বরং তার তাপ নাকি ক্রমশঃ একটু একটু করে বেড়েই চলছে। তা হলে, সূর্যের এই অফুরন্ত তাপ উৎপন্ন হচ্ছে কিভাবে?

এর উত্তর হচ্ছে সূর্যের এ উত্তাপ সাধারণ দহনের ফলে উৎপন্ন না হয়ে পারমাণবিক পরিবর্তনের ফলেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। তবে পারমাণবিক বোমা এবং পারমাণবিক চুল্লীগুলোতে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা শক্তি উৎপাদিত হয় সূর্যে ঠিক সেভাবে হয় না। আধুনিক পদার্থবিদ্যা অনুসারে ভর (mass) এবং শক্তি (energy) একই জিনিসের দুই বিভিন্ন রূপ, এদের একটাকে অন্যটাতে পরিণত করা সম্ভব। কোন বস্তুর ভর হঠাৎ কমে গেলে বা বেড়ে গেলে খানিকটা শক্তি এর থেকে বেরিয়ে আসে, তা যত সামান্যই হোক। কাজেই কোন ভারী পরমাণুকে ভেঙ্গে অপেক্ষাকৃত হালকা পরমাণুতে বিভক্ত করলে অর্থাৎ ফিশন পদ্ধতিতে যেমন শক্তি উৎপাদন করা যায় (পারমাণবিক বোমা কিংবা আণবিক চুল্লীগুলোতে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে), তেমনি কয়েকটি হালকা পরমাণু যুক্ত হয়ে যদি অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণুর সৃষ্টি হয় তাহলেও অনেকটা শক্তি নিঃসৃত হয়।

এ শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে ফিউশন (Fussion) প্রক্রিয়া বলা হয়। একীভূত হওয়ার আগে হালকা পরমাণুসমূহের ওজনের সমষ্টি যত ছিল এদের দ্বারা গঠিত ভারী পরমাণুটির ওজন এর থেকে কিছুটা কমে যায়। ঐ ক্ষয়প্রাপ্ত ওজনটুকুই আইনষ্টাইনের বিখ্যাত শক্তি-পদার্থ সমীকরণ $E = mc^2$ অনুসারে শক্তিতে পরিণত হয়। এভাবে ফিউশন প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপাদিত শক্তিকে বলা হয় তাপ-কেন্দ্রীয় শক্তি (Thermo-nuclear energy)।

সূর্যের তাপ উৎপাদনের বেলায় এই প্রক্রিয়াটাই কাজ করে থাকে। সূর্যে যে সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব রয়েছে তার অধিকাংশই হালকা হাইড্রোজেন গ্যাস। সূর্যে এই গ্যাসটার খুবই প্রাচুর্য। হিসেব করে দেখা গেছে সূর্যের কেন্দ্র দেশের উত্তাপ হচ্ছে ১৫,০০০,০০০ ডিগ্রী সে.। এ প্রচণ্ড তাপে আর উপরিভাগের প্রবল চাপে হাইড্রোজেন পরমাণু একীভূত হয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী হিলিয়াম পরমাণু গঠিত হয়। ফলে খানিকটা শক্তি নিঃসৃত হয়। এতে করে তাপ খানিকটা বেড়ে যাওয়ার ফলে আরো অধিক সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু একীভূত হয়। এভাবে তাপ ক্রমশ. বেড়েই চলে আর প্রক্রিয়াটাও চলতে থাকে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপ এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে এবং এভাবেই তা একটু একটু করে বেড়ে চলেছে।

মানুষ যখন সূর্যের এ অফুরন্ত শক্তির উৎস একবার আবিষ্কার করেছে, সে সূর্যের অনুকরণে নিজেও এ ধরণের শক্তি উৎপাদন করা যায় কিনা তারই চেষ্টা করতে আরম্ভ করল। আমরা এবার দেখব এ ব্যাপারে সে কদ্দূর কামিয়াব

হতে পেরেছে। অবশ্য ফিশন প্রক্রিয়ার ন্যায় এটা তত সহজ কাজ নয়। কেননা এ প্রক্রিয়া শুরু করতে হলে চাই অতি প্রচণ্ড উত্তাপ যা সৃষ্টি করা দুরূহ ব্যাপার। তবে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয় তা দিয়ে ফিউশন ক্রিয়া আরম্ভ করানো যায়। হাইড্রোজেন বোমাতে (যাতে সর্বপ্রথম ফিউশন প্রক্রিয়া ঘটানো হয়). এ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। হাইড্রোজেন বোমার ভেতরে থাকে একটা পারমাণবিক বোমা। বিস্ফোরণ ঘটার সময় প্রথমে পারমাণবিক বোমা কাজ শুরু করে ফিউশন ক্রিয়া ঘটাবার জন্য দরকারী উত্তাপের সৃষ্টি করে. যার ফলে হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ (একই মৌলিক পদার্থ কিন্তু atomic weight বিভিন্ন) পরমাণু একীভূত হয়ে ফিউশন ক্রিয়া শুরু হয় এবং আরো প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয়।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে তাপ উৎপাদিত হয় বলে হাইড্রোজেন বোমা থেকে পারমাণবিক বোমার মত মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে। যদি তেজস্ক্রিয়হীন পদ্ধতিতে উচ্চ তাপ উৎপাদন করা যায় তবে তেজস্ক্রিয়হীনভাবেও তাপকেন্দ্রীয় শক্তি উৎপাদন সম্ভব। বর্তমানে এভাবে তাপ কেন্দ্রীয় শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। যুক্তরাজ্যের বৈজ্ঞানিকগণ এ ব্যাপারে অগ্রণী। যুক্তরাজ্যের হারওয়েলে অবস্থিত 'জিটা' যন্ত্রে (Zero Energy Thermonuclear Assembly বা সংক্ষেপে ZETA) ৫০ লক্ষ সেন্টিগ্রেডেরও বেশী তাপ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা পারহ্যাপস্ট্রন নামক যন্ত্রের সাহায্যে ৬০ লক্ষ সেঃ তাপ উৎপাদনে সমর্থ হয়েছেন বটে কিন্তু মাত্র এক মাইক্রোসেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডের দশলক্ষ ভাগের একভাগ সময়ের জন্য। এ দুটোর কার্যপ্রণালী অনেকটা একই রকমের। খাঁটি হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিবর্তে এগুলোতে হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ ডয়টারিয়াম ব্যবহার করা হয়। একাজে হাইড্রোজেন অপেক্ষা এটাই অধিক উপযোগী। তবে এতে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী তাপের দরকার হয়। দশ ফিট ব্যাসের বলয়ের আকার বিশিষ্ট তিনটা অংশকে শিকলের মত জুড়ে দিয়ে তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ জিটাযন্ত্র। এদের মধ্যে রয়েছে তোরাস নামক একটা এলুমিনিয়ামের বলয় যার মধ্যে থেকে বাতাস বের করে নিয়ে 'ভারী হাইড্রোজেন' অর্থাৎ ডয়টারিয়াম গ্যাস পুরে দেওয়া হয়। শক্তিশালী কনডেনসারের সাহায্যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি জমা করে ট্রান্সফর্মারের মধ্য দিয়ে এই শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ভেতরকার ডয়টারিয়াম গ্যাসের মধ্য দিয়ে আরো শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে। বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে গ্যাস সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে ধন-বিদ্যুৎযুক্ত ডয়টারণ ও ইলেকট্রণের উদ্ভব হয়। এভাবে আয়নিত গ্যাস. বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের (magnetic field) প্রভাবে অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে 'প্লাজমা' বা গ্যাস-মেঘের সৃষ্টি করে যা তোরাসের মধ্যভাগে (প্রাচীরের গায়ে না লেগে) একটা রিং-এর আকারে অবস্থান করে। এ অবস্থায় প্রায় দুই লক্ষ আম্পায়ারের মত শক্তিশালী বিদ্যুৎ যখন ঘনীভূত গ্যাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন ঐ গ্যাস অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ফিউশন প্রক্রিয়ার জন্য দরকারী তাপের সৃষ্টি করে। এ উত্তাপ এতই প্রচণ্ড যে এর সংস্পর্শে আসলে কোন পদার্থই কঠিন অবস্থায় থাকতে পারবে না। তা হলে? প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই যে ডয়টরিয়ামের আধার. তোরাস. বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। উপায়? এর সমাধান হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা গ্যাসকে তোরাসের মধ্যভাগে অতি সাবধানতার সাথে ঘনীভূত করে রাখা যাতে কোন মতেই উত্তপ্ত গ্যাস প্রাচীর স্পর্শ করতে না পারে। 'জিটা' যন্ত্রে পাঁচ মিলিসেকেন্ড (১ মিলিসেকেন্ড = এক সেকেন্ডের সহস্রভাগের একভাগ) সময়ের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে. ইতিমধ্যেই যন্ত্রটা ৫০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মত উত্তাপ সঞ্চয় করে এবং ফিশন ক্রিয়া আরম্ভ করে।

যদিও বর্তমানে উৎপাদিত তাপকেন্দ্রীয় শক্তি থেকে ব্যয়িত বিদ্যুৎশক্তিই পরিমাণে অধিক হয়ে যায় তবু ভবিষ্যতে তাপমাত্রা আরো বাড়াতে পারলে তাপকেন্দ্রীয় শক্তিকে ব্যবহারোপযোগী করা যাবে। বৃটেনের 'জিটা' যন্ত্র এ ব্যাপারে আশার সৃষ্টি করেছে। এভাবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে কতগুলো উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে যা ফিশন প্রক্রিয়ায় নেই। ফিশন প্রক্রিয়ায় তাপ উৎপাদন করতে হলে ইউরেনিয়ামের দরকার। কিন্তু এটা অতি দুষ্প্রাপ্য খনিজ. সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম রয়েছে তা একত্র করলে খুব বেশী হবে না। এ জ্বালানীর সমস্যাটা কিন্তু ফিউশন প্রক্রিয়াতে নেই। কারণ পানিতে ভারী হাইড্রোজেন অর্থাৎ ডয়টারিয়াম প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। প্রতি পাঁচ গ্যালন পানি থেকে এক গ্রাম ডয়টারিয়াম পাওয়া যেতে পারে। আর এই পানি সরবরাহের জন্য পৃথিবীর মহাসাগরগুলোতো মওজুদ রয়েছেই। কাজেই এ পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারলে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক. রাজনীতিবিদ. অর্থনীতিবিদ প্রভৃতি সকলেরই মাথা ব্যথার একটা বিরাট কারণ জ্বালানী-সমস্যা চিরতরে দূরীভূত হয়ে যাবে। পৃথিবীতে বর্তমানে যে তেল-কয়লা আছে তাতে বড়জোর আরো ১০০ বছর চলতে পারে. যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম আর থোরিয়াম আছে তাতে চলতে পারে ২০০ থেকে ৩০০ বছর। কিন্তু সমুদ্রের পানিতে যে ডয়টারিয়াম রয়েছে তাতে পৃথিবীর চলবে আরো একশ কোটি বছর।

ফিশন প্রক্রিয়ার পারমাণবিক চুল্লীগুলো হতে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ নিয়তই ছড়িয়ে পড়তে তাকে। এ তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য চুল্লীগুলো সব সময় খুব পুরু সীসা এবং কংক্রীটের দেয়াল দিয়ে মুড়িয়ে দিতে হয়। পারমাণবিক শক্তি যে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না এ তেজস্ক্রিয়াই তার প্রধান কারণ। কেননা যেখানেই এ শক্তি ব্যবহার করতে চাওয়া হয় আদৎ চুল্লী থেকে এর দেয়ালের লটবহরের ওজন বেড়ে যায় সাংঘাতিকভাবে। অপরপক্ষে ফিউশন প্রক্রিয়ার সাহায্যে সম্পূর্ণ তেজস্ক্রিয়াবিহীন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করা যায় এটা এ প্রক্রিয়ার একটা মস্তবড় সুবিধা।

তাপকেন্দ্রীয় শক্তি বর্তমানে তত মূল্যবান না হলেও উল্লিখিত বিভিন্ন সুবিধার জন্য অদূর ভবিষ্যতে এটাই পৃথিবীর প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনের একটা প্রধান পন্থা হয়ে দাঁড়াবে। সেদিন বেশী দূরে নেই, যখন মানুষ এক গ্রাম ডয়টারিয়াম (যার দাম পড়বে দুশিলিং অর্থাৎ প্রায় দেড় টাকার মত) ব্যবহারের দ্বারা তাপ কেন্দ্রীয় শক্তি উৎপাদন করে দশটন কয়লার খরচ বাঁচাতে পারবে; আর সূর্যের মত অফুরন্ত শক্তির আধার মানুষ নিজেদের মধ্যেই তৈরি করে নিতে পারবে।

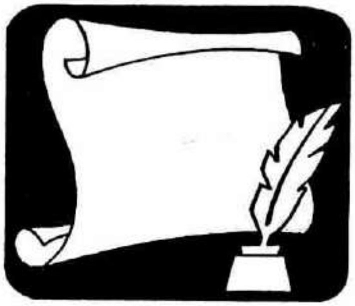

নবতম

[সেপ্টেম্বর '৬০]

আগামী যুগ বিজ্ঞান পরিষদের (!) বিজ্ঞানী গোষ্ঠী গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছেন যে আজকাল চশমাধারী ছেলে বুড়োর সংখ্যা আর সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। নব নব আলোক উৎস আবিষ্কারের সাথে পাল্লা দিয়ে (বলা বাহুল্য এই বিজ্ঞানী গোষ্ঠির সব সদস্যই চশমাধারী) চশমার ফ্রেমের যত রকমারি বাহারই আবিষ্কার হোক না কেন এর গঠন ও উপযোগিতা মোটামুটি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের (ইনি বাইফোকাল চশমার আবিষ্কারকর্তা) আমলে যা ছিল তাই রয়ে গেছে। কিন্তু আগামী যুগ বিজ্ঞান পরিষদের খুঁতখুঁতে-মনা বিজ্ঞানীরা তা মেনে নেবেন কেন? তাঁরা তাঁদের উর্বর মস্তিষ্কের বহু গবেষণার ফলে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বহুগুণ সম্পন্ন চশমার ডিজাইন দিতে সক্ষম হয়েছেন।

চশমাটা এমন লেন্সের দ্বারা তৈরি যার পাওয়ার ইচ্ছানুসারে বাড়ানো কমানো চলে। কোন চোখে, কখন, কদ্দূর পাওয়ারের দরকার হবে তা ঠিক করতে একটা স্বয়ংক্রিয় 'ইলেকট্রনিক অ'ই' যা পরিমাণ মত লেন্সের পাওয়ার নিয়ন্ত্রণ করবে (এতে করে অবশ্য চক্ষু বিশেষজ্ঞগণের যথেষ্ট অসুবিধা হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই)। এ ছাড়া দরকার মত স্ক্রু ঘুরিয়ে একে দূরের জিনিস কাছে এনে দেখার বা কাছের সূক্ষ্ম জিনিষকে বড় করে দেখার উপযোগী করে তোলা যাবে। তাছাড়া এতে ইনফ্রা-রেড এবং আল্ট্রা-ভায়লেটরশ্মিকে দৃশ্য আলোতে পরিণত করার ব্যবস্থা থাকবে। যার ফলে ব্যবহারকারী সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে বা ঘন কুয়াশার মধ্যে সব কিছুই দেখতে পারবে। বৃষ্টি বাদলে চলবার সময় যাতে করে পানি জমে দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত করতে না পারে তার জন্য দুই লেন্সে দুটা অতি সূক্ষ্ম উইপারের (wiper) ব্যবস্থা থাকবে যা এত দ্রুত কাজ করবে যে এর অস্তিত্ব বোঝাই যাবে না। সব বৈদ্যুতিক সার্কিটগুলো ও যন্ত্রপাতি অতি সূক্ষ্ম আকারে চশমার ফ্রেমের মধ্যেই লুকানো থাকবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হবে ব্যবহারকারীর শরীরের উত্তাপ থেকেই। কানের গোড়ায় ফ্রেমের সাথে এমন একটা টিউব আটকানো থাকবে যা শরীরের তাপকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করবে। অবশ্য মাথা-গরম লোকদের জন্য এটা মাথার তালুর সংস্পর্শে রাখারই বন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে করে মেক্সিমাম পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

আগামী 'যুগ বিজ্ঞান পরিষদ' এ নব আবিষ্কারের পেটেন্ট করিয়ে নিয়েছে। কেউ কমার্শিয়াল স্কেলে এটা প্রস্তুত করতে চাইলে সব কিছু জানিয়ে আগামী যুগ বিজ্ঞান পরিষদের কাছে আবেদন করুন।

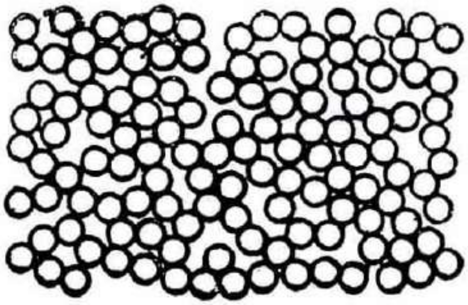

সাম্প্রতিক

ষ্ট্রেলকা ও বেলকার মহাশূন্য ভ্রমণ

[সেপ্টেম্বর '৬০]

গত ২৭শে আগষ্ট সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'টাসের' এক ঘোষণার মধ্য দিয়ে মহাশূন্য ভ্রমণের ইতিহাসে আরেকটা উজ্জ্বল অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। ঘোষণাটি হচ্ছে 'কৃত্রিম উপগ্রহযুক্ত মহাশূন্য যান এবং স্পেস কেপসুল সাফল্যজনকভাবে অবতরণ করেছে। কুকুরগুলোসহ যেসব প্রাণীর উপর পরীক্ষা কার্য চালানো হয়েছে, তারা সুস্থ রয়েছে।'

কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত রাশিয়ান রকেট-ঘাটি থেকে এর আগের দিন সকালে এ উপগ্রহ একটা শক্তিশালী মহাশূন্যযানের সাহায্যে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হয়। সম্পূর্ণ যানটার ওজন হচ্ছে ১০,০০০ পাউণ্ড, এদিক দিয়ে এটাকে বেশ বড় ধরনের মহাশূন্যযান বলা যেতে পারে। এর মধ্যে ছিল একটা স্পেস-কেপসুল যার ভেতর দেয়া হয়েছিল দু'টা কুকুর—ষ্ট্রেলকা (ছোট্ট তীর) এবং বেলকা (ছোট্ট কাঠ-বিড়ালী)। এদের সহযাত্রী ছিল নানা ইঁদুর, মাছি, ফুঙ্গি, বীজ প্রভৃতি আরো অনেকে।

নিক্ষেপের মিনিট পাঁচেকের মধ্যে উপগ্রহটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে ২য় স্পুটনিকের যাত্রী লাইকার শোচনীয় মৃত্যুর পর ষ্ট্রেলকা এবং বেলকাই প্রথম প্রাণী যারা কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছে। কুকুর দু'টাকে কেপসুলের যে-কেবিনে রাখা হয়েছিল তাতে একজন মানুষ আরামসে বেশ কয়েকদিন কাটাতে পারে। এদেরকেও বহু আগে থেকেই মহাশূন্য ভ্রমণে অভ্যস্ত করে তোলা হয়েছিল এবং নানা ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল। এদের কাছে ছিল একটা টেলিভিশন প্রেরকযন্ত্র এবং নানা যন্ত্রপাতি, যার মাধ্যমে এদের নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বাস, মস্তিষ্ক-তরঙ্গ প্রভৃতির অবস্থা নিয়তই পৃথিবীতে পাঠানো হচ্ছিল।

২৭ ঘন্টা ধরে ১৮ বার প্রদক্ষিণ করে মোট ৪৩৪,৯৫৯ মাইল ভ্রমণ করার পর পৃথিবী থেকে বেতার সঙ্কেত পেয়ে উপগ্রহটা কক্ষ ত্যাগ করে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। পৃথিবী থেকে মাইল পাঁচেক দূরে থাকতে কেপসুলটা বিচ্ছিন্ন হয়ে প্যারাসুটের সাহায্যে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নেমে এল। 'টাসের' ঘোষণা অনুযায়ী এটা নির্দিষ্ট অবতরণ স্থান থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে পৃথিবীতে নেমেছে। অবতরণের পর যাত্রী প্রাণীগুলোর উপর নানা পরীক্ষা কার্য চালিয়ে দেখা গিয়েছে যে এগুলো বেশ সুস্থ এবং সক্ষম রয়েছে। এভাবে প্রমাণ হল প্রাণীদেহের পক্ষে মহাশূন্য ভ্রমণের ধকল সওয়া সম্ভব। ষ্ট্রেলকা ও বেলকা এবং তাদের সহযাত্রীরা মহাশূন্য ভ্রমণ করে এসে মানুষের মহাশূন্য ভ্রমণের ব্যাপারে একটা বিরাট আশার সৃষ্টি করেছে। জনৈক রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক নিউনয়েড সেডভ (রাশিয়ান মহাশূন্য ভ্রমণ পরিকল্পনায় যার যথেষ্ট হাত রয়েছে) গভীর আত্ম-বিশ্বাসের সাথে বলেছেন 'আরো দুটা কুকুরযুক্ত মহাশূন্যযান নিক্ষেপের পর আমরা মনুষ্যবাহী যান মহাশূন্যে নিক্ষেপ করব'।

সম্পাদকীয়

ঘূর্ণিবাত্যায় বিধ্বস্ত আমরা

[নভেম্বর '৬০]

গেল মাসে তিন হপ্তার ব্যবধানে পূর্ব বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে যে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে কাছাকাছি ইতিহাসে তার জুড়ি নেই। দশম অক্টোবর আর একত্রিশে অক্টোবর। অশ্রুত ঘূর্ণিবাত্যা আর অকল্প সমুদ্রপ্লাবন ধুয়ে মুছে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের হাজার হাজার প্রাণ। নিষ্প্রাণ করে গেছে গোটা পূর্ব পাকিস্তান। মানুষের এই দুর্গতি দেখে নতুন করে বোধ হল : এই বিশ শতকের শেষার্ধেও আমরা প্রকৃতির হাতে কেমন অক্ষম খেলনা। আমাদের সীমিত বিজ্ঞানের জারিজুরি সাধারণ্যে প্রকাশ পেল। কিন্তু বিচারটা এক তরফা হয়ে যাচ্ছে। সত্য কথা, প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ কাবু করা বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হয়নি। অথবা আদৌ সম্ভব হবে কিনা তাও বিসংবাদ সাপেক্ষ। তবু একথা নির্বিবাদে স্বীকার্য যে, মানুষের সকল আয়েস-আরাম বালাই-দুর্গতিতে (ঘূর্ণিবাত্যা-জলোচ্ছ্বাসও অন্তর্ভুক্ত) আধুনিক বিজ্ঞানের দান অপরিমেয়। আজ বাত্যা-বিধ্বস্তদের দুর্দশামোচন যতখানি অনায়াস-সাধ্য, শত বছর আগে তা ছিল অচিন্ত্য। বিংশ শতাব্দীর ষড় দশক এবং সপ্তম দশকের মাঝামাঝি ফলিত বিজ্ঞান ছাড়া একটি দিন কোন শ্রেণীর নারক অভিজ্ঞতা সেটা চট্টলবাসীমাত্র উপলব্ধি করেছেন পয়লা নবেম্বর, উনিশশ ষাট সাল। পানি নেই, আলো নেই এমনকি বাকী দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। যেন মানব সভ্যতার কোন এক আদিম নগর এই চট্টগ্রাম বন্দর। তাই মানতে হয় অসীম বিজ্ঞানের মহিমা, অসীমতর মানুষের ক্ষমতা। প্রয়োজন সময়ের। সময় লাগে মানুষের, সময় লাগে প্রকৃতির। সময় লাগে অণু খুঁজে নিয়ে আণবিক চিকিৎসা করতে, যেমন সময় লাগে ফুল ফুটিয়ে ফল ফলাতে।

পূজার ছুটি আর আকস্মিক বাত্যা বিপর্যয়ের ব্যাঘাতে দ্বিতীয় সংখ্যা বিজ্ঞান সাময়িকী বের হতে দেরী হয়ে গেল। বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রথম সংখ্যা সভাজনের মনোযোগ পেয়েছে বলে আমরা উৎসাহিত। শুভার্থীদের সক্রিয় সহযোগিতাই আমাদের কাম্য। 'অনুসন্ধিৎসা' শিরোনামায় একটি নতুন বিভাগ যোজিত হবে আগামী সংখ্যা থেকে। যে কোন প্রাসঙ্গিক এবং পর্যাপ্ত-মানের প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে এ-বিভাগ মারফত।

অধ্যাপক সালামের ভাষণ

[ফেব্রুয়ারী ১৯৬১]

ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক একে একটি পরিহাস বলে গণ্য করবেন যে, ১৯৬০ সালে অনুন্নত দেশগুলির জন্য তিনশত কোটি ডলার সাহায্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অথচ ঐ বৎসরই গোলাবারুদ, আণবিক অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট ইত্যাদির জন্য ৬ হাজার কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। আমি বিস্মিত হই এই ভেবে যে, ১৯৫৭-৫৮ সালে অনুন্নত দেশগুলি ২৪০ কোটি ডলার সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু ঐ সময় অনুন্নত দেশগুলিকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে প্রায় দুইশত কোটি ডলার।

উন্নত দেশগুলি থেকে আমদানী করার সময় অনুন্নত দেশগুলিকে অধিক মূল্য দিতে হয়েছে। পক্ষান্তরে উন্নত দেশগুলিতে পাট, তুলা ইত্যাদি রফতানি করতে গিয়ে অনুন্নত দেশগুলি কম মূল্য পেয়েছে। পল হফম্যান একে অনুন্নত দেশসমূহ কর্তৃক শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলিকে সাহায্য দান বলে উল্লেখ করেছেন। যার ফলে উন্নত দেশগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য নিঃশেষে অপচয় হয়।

পদার্থবিদ হিসাবে আমি একে চরম হঠকারিতা বলে মনে করি যে, শুধু মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করতে পাকিস্তানের বাৎসরিক বাজেটের সমপরিমাণ মুদ্রা ব্যয় করা হচ্ছে। এর কোন অর্থ হয় না। এই সব বিষয় একটিমাত্র দিকের ইঙ্গিত করে, তাহল মানুষের ক্ষুধা ও অভাবের সমস্যা দূর করার ব্যাপারে বিশ্বের দেউলিয়া নেতৃত্ব। আমি বলতে চাই যে, আজকের পৃথিবীতে কিনসের মত লোক দরকার— যিনি বলবেন অনুন্নত এলাকার মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন গোটা পৃথিবীর সম্মিলিত দায়িত্ব। আমি আরও বলতে চাই যে, আজকের পৃথিবীতে রুজভেল্টের মত লোক দরকার— যিনি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি 'নিউ ডিল' দান করতে সমর্থ!

কিছুকাল আগে পর্যন্তও পাকিস্তানে প্রকর্মীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশী অনাদৃত ছিল তারা বিজ্ঞান-কর্মী। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এখনও ভাগ্যোন্মেষ হয়নি। বিজ্ঞান-অধিকৃত পৃথিবীতে পাকিস্তানী বিজ্ঞানীদেরও যে কিছু কর্তব্য আছে কর্তৃপক্ষ তা যেন ভাবতেই পারেন নি। খুব বেশী হলে এই মাত্র বলা যেতে পারে যে বিজ্ঞানীদের সরকার প্রায় অনিচ্ছার সঙ্গে কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছেন। আমির শাসিত বোখারার তৎকালীন অসহিষ্ণু দিনগুলোতে জনৈক খ্রিস্টান ঘড়ি মেরামতকারী সম্পর্কে ধর্মগুরুদের মনোভাব মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে। তাকে মসজিদে ঢুকে ঘড়ি মেরামতের অনুমতি দেওয়া হয় এই যুক্তিতে যে, কারিগরী প্রয়োজনে তাকে, যে সব গাধা মসজিদের জন্য পাথর বয়ে এনেছিল তাদের সমশ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করা যেতে পারে। আমাদের কর্তৃপক্ষ উক্ত ধর্মগুরুদের মনোভাবই শুধু গ্রহণ করেন নি, সম্ভব হলে 'ঘড়ি মেরামতকারী' তাঁরা বিদেশ থেকে আমদানী করেছেন।

সরকারী উপেক্ষার একটি কারণ এটাও অবশ্য যে, আমাদের দেশে বিজ্ঞানীদের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। বিজ্ঞান কমিশনের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তানে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত পদার্থবিদ মাত্র ৬০ জন! লণ্ডনের একটা কলেজেই যা পাওয়া যাবে। বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে একজনের পক্ষে সাফল্য লাভ করা এখন আর সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য এবং একটা সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ধারা গড়ে উঠার জন্যে এক জায়গার নির্দিষ্ট সংখ্যক বিজ্ঞানী সমাবেশ একান্ত প্রয়োজন। একবার তেমন পরিবেশ গড়ে উঠলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে।

বিজ্ঞানী হিসেবে আমরা সর্বাগ্রে সাহায্য দিতে পারব কোন ক্ষেত্রে? এ-প্রশ্নের জবাবে দীর্ঘ তালিকা পেশ করা যায়। কৃষিক্ষেত্রে স্বল্প-উৎপাদন সমস্যা, বন্যা-নিরোধ থেকে শুরু করে 'সুই গ্যাসের' সর্বাধিক যথোপযুক্ত ব্যবহার পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় আমরা সাহায্য করতে পারি। একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। নিম্নশ্রেণীর লৌহ-সংশোধনের জন্যে মেক্সিকোতে সম্প্রতি 'গ্যাস রিডাকশান' পদ্ধতি চালু হয়েছে। ইস্পাত-সমৃদ্ধ অনেক দেশই অবশ্য এই পদ্ধতিতে তেমন কৌতূহলী নয়। কারণ তাদের যথেষ্ট কয়লা আছে। মেক্সিকান পদ্ধতিতে প্রতি বছর দশ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরি হয়। আমাদের দেশের অবস্থাও মেক্সিকোর অনুরূপ। গ্যাস এবং নিম্নশ্রেণীর লৌহ-সম্পদ আমাদের আছে। আনন্দের বিষয়, এগুলোকে কাজে লাগাবার জন্যে, আমাদের সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট নিজেরা ছোট আকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় হাত দিয়েছেন। এটা সাফল্যমণ্ডিত হলে আমাদের ইস্পাত নির্মাণের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর আসবে। আপনারা কি স্বীকার করেন না যে এই পরিকল্পনাটা সবচেয়ে বেশী নজর ও অগ্রাধিকার পাবার অপেক্ষা রাখে?

জাতীয় উন্নতির পথে বিঘ্নগুলো অতিক্রম করার প্রচেষ্টায় অন্যান্য দরিদ্র দেশের মত, এমন কতকগুলো কার্যকারণের উপর আমরা নির্ভরশীল যেগুলো আমাদের নিজেদের আয়ত্বের বাইরে। কিন্তু সমাজের পরিবর্তন হবার আগেই আমাদের অভ্যন্তরীণ কতকগুলো পূর্ব প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলতে হবে। তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল এমন উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে হবে যাতে সমগ্র জাতি মনোবল কাজে লাগিয়ে এক পুরুষের মধ্যেই দারিদ্রের অবসান ঘটাতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন, অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহের প্রতি এক টানা নজর রাখা, বিশেষ প্রয়োজনে জাতিকে এইটে বুঝিয়ে দেওয়া যে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগুলোর লক্ষ্য হল সমগ্র সমাজকে উন্নত করা, সমাজের বিশেষ একটা অংশ মাত্রকে নয়। জানি না, ঢাকার যুব-সমাজ তাদের সন্ধ্যেটা কেমন করে কাটায়। কিন্তু খুশী হব যদি, ধরা যাক লাহোর, তার কাব্যময় বর্তমান থেকে কারিগরী সংস্কৃতির দিকে মোড় নেয়, মলের কাফেগুলোতে কাব্যচর্চার চেয়ে অন্তত কিছুটা সময় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য বস্তু সম্পর্কে জোরালো আলোচনায় ব্যয় করে। জাতীয় চেতনার খাতিরেই এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

কি ধরনের বিপ্লব আমরা আনতে চাচ্ছি সে সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকার দরকার। এটা হল কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। কাজেই বিপুল হারে জাতির কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সবশেষে বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমরা, পাকিস্তানীদের দারিদ্র্য যে চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে, তার মুখোমুখি দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করতে চাই। আর তা' রুশ এবং চীনের উন্নয়নের মতই দ্রুত অথচ সেই অনুপাতে মানুষের সমান দুর্ভোগের মূল্যে অর্জিত নয়।

পবিত্র কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমার কথা শেষ করি।

'খোদা একটা জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজের অবস্থার পরিবর্তন নিজেরাই করে।'

ত্রয়োদশ বিজ্ঞান-সম্মেলনে সাধারণ সভাপতির ভাষণের শেষাংশ।

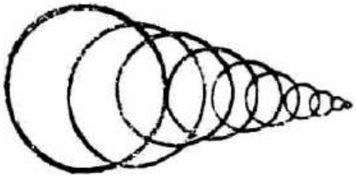

অথ সংখ্যা সংবাদ

[মার্চ-এপ্রিল '৬১]

চোখটা বুঁজে এক মুহূর্ত চিন্তা করে দেখুন দেখি। দেখবেন আপনাকে ঘিরে রয়েছে শুধু সংখ্যা আর সংখ্যা; ছোট বড় মাঝারি হরেক আকারের, হরেক বহরের স্রেফ কতগুলো সংখ্যা। আপনার জীবনটাই কতগুলো সংখ্যার যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটার শুরু সূচিত হচ্ছে জ্ঞাত একটা সংখ্যা দিয়ে আর শেষটা সূচিত হবে অজ্ঞাত আরেকটা সংখ্যা দিয়ে, এর মাঝের ফাঁকটুকু অসংখ্য সংখ্যার ঠাসাঠাসিতে ভরা। আজকের দিনটাই ধরুন, সেই সাত-সকালে ঘুম থেকে উঠেছেন ঘড়িতে যখন কাঁটায় ৪টা ৫০ মিনিট। তারপর থেকে সংখ্যা কি আপনাকে নিস্তার দিয়েছে? মিটার ব্যাণ্ড, কিলোসাইক্‌ল্‌স, অফিসটাইম, রোলনম্বর, পার্সেনটেজ, বোলিং এভারেজ, বেটিং-স্কোর, অলিম্পিক রেকর্ড, লুমুম্বা বাহিনীর অগ্রগতি, শুক্রগামী রকেটের ওজন, সুদের হার, পাটের দর, ডেবিট-ক্রেডিট, টেক্স, ম্যাক্সিমাম-মিনিমাম তাপমাত্রা, টেম্পারেচার চার্ট, টায়ার প্রেশার, স্পীড লিমিট, তুফানের ক্ষয়ক্ষতি, প্রাইজ বণ্ড, আদমশুমারী, মুদ্রা বিনিময় তালিকা–আরো কত যে সংখ্যার কচকচানীতে আপনার মাথাটা ভর্তি হয়ে আছে তা কি আর বুঝছিনা। তবু অনর্থক আরো সংখ্যাতত্ত্বের কথা শুনাচ্ছি বলে আগে ভাগেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি। মানুষের জীবনে সংখ্যার এই রাজত্বটা কিন্তু চিরন্তন না। চিরকালই মানুষ এভাবে সংখ্যার পাকে পাকে জড়ানো ছিল না। এমনও দিন ছিল যখন মানুষ বড় সংখ্যা কাকে বলে চিনতই না। এনিয়ে কোন মাথা ঘামাবার দরকারও তারা অনুভব করেনি। সাবেক আমলের একটা গল্প বলি। হাঙ্গেরী দেশের দুই পণ্ডিত বাজী রেখেছেন,– সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা কে বলে দিতে পারে। প্রথম পণ্ডিত বললেন, 'আচ্ছা আপনিই প্রথমে বলুন আপনার সংখ্যাটা'। দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন অপেক্ষাকৃত চালাক। তিনি সবচেয়ে বড় যেই সংখ্যাটা মনে করতে পারলেন তাই বলে দিলেন। বললেন 'তিন'। প্রথম পণ্ডিত ত পড়ে গেলেন মহাচিন্তায়! এর চেয়ে বড় সংখ্যা আর কিইবা হতে পারে? শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলে ফেললেন, 'তাহলে আপনিই জিতলেন।' আজকালকার দিনে এমন একটা বাজীর কথা চিন্তা করুন ত। স্পষ্টই বুঝতে পারছেন এ বাজী কোনদিন শেষ হবে না, যদি না ফস করে কেউ বলে উঠে– 'ইনফিনিটি'। কিন্তু তাতেই বা আপনি বাজী হারতে যাবেন কেন। ইন্‌ফিনিটি তো ঠিক সংখ্যা নয়, এতো তিলিসমাতের খেল্। রবারের বেণ্ডের মত, যতই টানেন লম্বা হবে।

সেই হাঙ্গেরীর পণ্ডিতদের কথা না হয় বাদই দিলাম। আফ্রিকার হটেন্‌টটদের নাম শুনেছেন তো? এদের যদি জিজ্ঞেস করেন– তোমার ছেলে কয়টা কিংবা কয়টা শত্রু তুমি সাবাড় করেছ, তা যদি তিনের থেকে বেশি হয় এরা স্রেফ বলে দেবে 'অনেক'। সংখ্যার যুগ এই বিংশতাব্দীতেও এরা এক, দুই আর তিন অবধি গুণেই খুশি।

এতো গেল অসভ্য যুগ আর অসভ্য জগতের কথা। এবার যাদের 'সভ্য' বলতে আপনার আপত্তি থাকতে পারে না সেই রোমান আর গ্রীকদের কথায় আসুন। সংখ্যা-তত্ত্ব তখন বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলেও আজকালকার মত খুব বড় বড় সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে এদেরো মাথা যে গুলিয়ে যেতো না তা নয়। পৃথিবীতে যত বালুকণা আছে তারো যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে, তা যত বড়ই হোক না কেন, এই সত্যটা বুঝতে এবং বুঝাতে আর্কিমিডিসের মত শক্ত মাথার দরকার হয়েছিল। আর বড় বড় সংখ্যা নিয়ে এরা বিব্রত বোধ করবেই না বা কেন? এরাতো আর লীলাবতীর খেল্ জানত না, শুভঙ্করের ফাঁকও জানত না, আর দশের মাথায় ছোট্ট একটা ৭ বসিয়ে এক কোটির মত লাগাম ছাড়া একটা সংখ্যাকে পোষ মানিয়ে রাখার বিদ্যাও এদের জানা ছিল না। সেই জুলিয়াস সীজারের দফতরের কেরাণীটার কথাই ভাবুন ত দেখি। ৮৭৩২এর মত একটা ছোট্ট সংখ্যা লিখতেও বেচারাকে লিখতে হত MMMMMMMMDCCXXXII। দশ লক্ষের মত একটা সংখ্যা লিখতে বেচারাকে M এর পর M এত বার বসিয়ে যেতে হত যে পুরা একটা ফুল স্কেপ কাগজেও পোষাতো না।

ভাগ্যিস আমাদের আরবীয় আর ভারতীয় অঙ্কদাদুরা তাঁদের নবধারাপাতের শতকিয়াটা দিয়ে গিয়েছিলেন। (এটাকে বরং বলা উচিৎ দশকিয়া)। এক থেকে ন পর্যন্ত কতগুলো চিহ্ন আর গোলগাল একটা অণ্ড। বলা যাক অশ্বাণ্ড। কারণ তারই মতো এটা অবাস্তব, এর মানেই হচ্ছে 'কিছু না।' কিন্তু কারো ডানে বসতে পারলে এটা অনেক কিছু। এই দশটা পুঁজিই আপনার দরকার, তারপর লিখে যান যত বড় সংখ্যা লিখতে চান। কেবল বালি কেন, পৃথিবীতে কত পরমাণু আছে তারও হিসেব করে ফেলুন, এতে বর্ণমালার অক্ষরের মত পুঁজি ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। দাদুদের এই বিদ্যেটা অবশ্য ইউরোপে পাচার হতে দেরী হয়নি। সংখ্যাতত্ত্বকে শীঘ্রই কায়দায় আনল সে দেশের মানুষ। তাদের মুখে খই ফুটল– মিলিয়ন, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন, কোয়াড্রিলিয়ন, কুইন্টিলিয়ন, সেক্সটিলিয়ন, সেপটিলিয়ন, অকটিলিয়ন, নোবিলিয়ন, ডেসিলিয়ন, উনডেসিমিলিয়ন এরকম আরো কত কি। দশের কায়দায় এনে ফেলাতে সব সংখ্যাই কাবু। আমাদের সেই অঙ্কদাদুরা তাঁদের অঙ্কের বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে বেকাদায় ফেলতে কিন্তু কম ওস্তাদ ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি। বিদ্যোৎসাহী বাদশা সিরহাম তখন হিন্দুস্তানের তখ্তে। তাঁরই মহাজ্ঞানী উজিরে আজম সীমা বিন দাহির আবিষ্কার করলেন বিখ্যাত খেলা দাবা। বাদশা এতে মহাখুশী হয়ে উযীরকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। চতুর উযীর শুধু বললেন, বাদশাহ নামদার, হুজুরের অন্ন খেয়ে মানুষ, তাঁর কাছে আমার বেশি কি চাওয়ার আছে। তবে আমার আরজ, আমার এই দাবার ছকটার প্রথম ঘরটাতে দেয়া হোক একটা শস্যের দানা আর দ্বিতীয়টাতে দেয়া হোক দু'টা দানা, তৃতীয়টাতে চারটা, এভাবে প্রত্যেক ঘরে আগের ঘরের দ্বিগুণ করে দানা দিয়ে ছকের ৬৪টি ঘর পুরিয়ে দিলেই আমি খুশি। বাদশাহ হেসে বললেন– এইই বুঝি তোমার চাওয়া। বেশ তাই হোক। এই কে আছিস, নিয়ে আয় ত এক বস্তা দানা। তাঁরই বা দোষ কি। তিনি ত আর জানতেন না যে গুণোত্তর হারে বৃদ্ধিটা কত সাংঘাতিক জিনিস। একটা, দু'টা, চারটা করে দানা দেয়া শুরু হয়ে গেল। কিন্তু একি? ২০টা ঘর না পুরাতেই বস্তা খালাস। আনা হল আরো বস্তা। কিন্তু সেই রাক্ষুসে ছকের ক্ষুধা কি তাতে মেটে। হিসেব করে দেখা গেল– $১ + ২ + ২^{২} + ২^{৩} + ২^{৪} + \ldots\ldots + ২^{৬২} + ২^{৬৩}$ এই হিসেবে দাহিরের 'সামান্য' দাবী মেটাতে দরকার মোট ১৮,৪৪৬, ৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১, ৬১৫ টি দানার, সারা হিন্দুস্তানের শস্যক্ষেত্র থেকেও যা দেয়ার সাধ্য বাদশার ছিল না। আজ যে জনসংখ্যা গুণোত্তর হারে বাড়ছে বলে বলা হচ্ছে তাতে চিন্তার কারণ আছে বৈকি।

মনে করছেন বুঝি এসব সংখ্যা চিরদিনই দৈনন্দিন জীবনের শুকনো কচকচানী নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তা কিন্তু মোটেই না। প্রাচীন সংখ্যাতত্ত্ববিদদের রসবোধ আর কল্পনাশক্তি দুইই ছিল। তাঁদের উর্বর কল্পনাশক্তি সবগুলো সংখ্যাকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়েছিল। ১, ৩, ৫, ৭.........এসব বেজোড় সংখ্যা হল স্ত্রী জাতীয় আর ২, ৪, ৬, ৮...এসব জোড় সংখ্যা হল পুরুষ জাতীয়। এদের সার্থক বিয়ের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয় অসীম সংখ্যা বংশ ১, ২, ৩, ৪, ৫.......... এর অবাধ গতি। $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$, এর মত সংখ্যাগুলো হল অফোটা ডিম, যা দেখে বলার যো নেই একি ছেলে না মেয়ে। $\sqrt{-১}$ এর মত সংখ্যা হল 'কাল্পনিক' অর্থাৎ মায়াবী; আছেও আবার নেইও। শুধু কি তাই, সংখ্যাকে এরা সৃষ্টিকর্তার আসন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পীথাগোরাসের শিস্যরা প্রার্থনা করত 'আমাদেরকে আশীর্বাদ কর, হে পবিত্র স্বর্গীয় সংখ্যা, দেবতা আর মানুষের সৃষ্টিকারী।'

সংখ্যার নানা গুঢ় অর্থ নিয়ে ধর্মযাজকদের মধ্যে কামড়া কামড়িও কম হয়নি। মার্টিন লুথার যখন প্রটেস্টান্ট ধর্ম প্রচার শুরু করেছেন, বান্‌গাস নামক জনৈক ক্যাথোলিক যাজক ৭০০ পৃষ্ঠার এক বিরাট বই লিখে প্রমাণ করে ছাড়লেন লুথারের নামের সাংখ্যমান ৬৬৬ হচ্ছে 'পশুদের সংখ্যা'। লুথারের এক বন্ধু পাল্টা আক্রমণ করে দেখালেন তখনকার পোপ দশম লিও-এর নাম রোমানে লিখলে হয় LEO DECIMVS। এর শেষ শব্দটার অক্ষরগুলো একটু নেড়েচেড়ে দিলে হয় MDCLVI অর্থাৎ ১৬৫৬। এখন নেড়েচেড়ে দেয়ার জন্য দশ ক্ষতিপূরণ দিলেই এটা হয় ১৬৬৬ অর্থাৎ কি না ১০০৯ + ৬৬৬। কিন্তু ১০০০ লেখা হয় 'M' দিয়ে যা কি না লেটিন Mysterium (রহস্য) শব্দের আদ্যাক্ষর। আর ৬৬৬ তো পশুর সংখ্যা আছেই। কাজেই পোপ দশম লিও হচ্ছেন একজন ১০০০ + ৬৬৬ অর্থাৎ 'রহস্যময় পশু'।

আর এদেরই বা দোষ দিতে যাব কেন? সংখ্যা নিয়ে নানা কুসংস্কার কি আপনার আমার মনেই কম। হলফ করে বলুন তো দেখি পরীক্ষায় রোল নম্বর ১৩ পড়লে কিংবা আপনার বাড়ীর নম্বর ৪২০ হলে আপনি কি অস্বস্তি বোধ করেন না?

এখন আর সংখ্যাকে নিয়ে সেই রসবোধও নেই, কল্পনার দৌড়ও নেই। সংখ্যা এখন শুধু কতগুলো নির্জীব, নিষ্প্রাণ, রূঢ় বাস্তবতার বাহন। সংখ্যা যে মানুষকে পাগল করে দিতে পারে তা আপনি অনায়াসে বুঝতে পারেন আদমশুমারীতে enumerator হলে, কিংবা অঙ্কের পরীক্ষায় চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ বের করতে হলে। সংখ্যার এত কচকচানীর মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে আপনি নিশ্চয়ই সেই হটেনটটদের মত হয়ে থাকতে চাইছেন। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে সেভাবে থাকতে গেলেই আপনার স্থান নির্ঘাৎ পাগলা গারদে। তাও কি সংখ্যার হাত থেকে রেহাই পাবেন বলে মনে করেন? কাকস্য পরিবেদনা! সেখানেও আপনার একটা নম্বর পড়বে, পাহারাদার সেখানেও চেঁচিয়ে রিপোর্ট করবে– সেল নম্বর ৭, পাগলা নম্বর ২০৩ : সব ঠিক হ্যায়!

বিজ্ঞান সাময়িকী সম্পর্কে 'পরিচয়'

[মার্চ-এপ্রিল' ৬১]

দেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তানের নানা জায়গায় বিজ্ঞান চর্চার তৎপরতা দেখা দিয়েছে কিন্তু এর জন্যে যে ব্যাপক পরিকল্পনা বা গবেষণার প্রয়োজন তা হয়তো এখনো সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তবে এর প্রয়োজনীয়তা যে তীব্রভাবে নানা স্থানে অনুভূত হচ্ছে এটা ভালো লক্ষণ। এর জন্যে চাই প্রচুর পরিমাণে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা জন্মানো। বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপামর জনের অহেতুক বিমুখতা অপসারণ করা এখনকার মতো আমাদের কর্তব্য! অসীম নীল আকাশ ভেদ করে কার রকেট কতদূর উড়লো এসব জানার চাইতে আমাদের শেখা অনেক বেশি দরকারী। বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা প্রচুর। এর প্রতিটিতে আমাদের জ্ঞানান্বেষণের শিকড় চালিয়ে না দিলে সমাজ ও দেশ কোনদিনই পরিপুষ্ট হবে না। অপরের বৈজ্ঞানিক উচ্ছিষ্ট দিয়ে আমাদের হয়তো দৈনন্দিন কাজ চলবে, কিন্তু কোন দিনও আমরা বিংশ শতাব্দীর ভালোমন্দে মেশানো সভ্য মানুষ হতে পারবো না।

চট্টগ্রামের কিছু তরুণ –'ক্ষুদে বিজ্ঞানী সমষ্টি' কর্তৃক 'বিজ্ঞান সাময়িকী' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। একটা সচিত্র চটুল সিনেমা পত্রিকা বা নিরামিষ সাহিত্য-পত্র বের না করে বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশ করার মধ্যে এই 'ক্ষুদে বিজ্ঞানী'দের সাহস আছে বলতে হয়। এই প্রচেষ্টা যত ক্ষুদ্র হোক কিন্তু মহৎ। দেশের লোকসংখ্যা এবং প্রয়োজন অনুপাতে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিয়ে বইয়ের সংখ্যা যেমন কম, বিজ্ঞান সাময়িকীর সংখ্যা আরো কম। বোধ হয় আর দু' একটার বেশি নেই। এ দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগগুলোর তৎপর হওয়া একান্ত উচিত ছিল। শিক্ষা বিভাগ ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে প্রশংসা জনক কাজ শুরু করে দিয়েছে।

আমাদের এখানকার বিজ্ঞান-পত্রগুলোর লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নানা বৈজ্ঞানিক তৎপরতার যেমন খবর আদান-প্রদান করতে হবে, তেমনি নিজের দেশের কোথায় কি হচ্ছে বা হবার সম্ভাবনা আছে এ খবর পরিবেশন করা উচিত। এতে নিজেদের মূল্য বুঝে নিয়ে ভবিষ্যতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শিখবো। পরের ধার করা কল-কারখানার অহমিকায় থাকা আর উচিত হবে না। পাকিস্তানে নানা বিষয়ে নানা আন্দোলন হলো, কিন্তু বিজ্ঞানের আন্দোলন একটিও হলো না। আরেকটা বিষয় হলো বিজ্ঞান-পত্রের বেঁচে থাকা। পাঠক, লেখক এবং পরিচালকের সমান পরিমাণে সহযোগিতা না থাকলে কোন পত্রিকাই টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়ে আমরা চট্টগ্রাম থেকে সদ্য প্রকাশিত 'বিজ্ঞান সাময়িকী'র বহুল প্রচার এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি। আর স্বাগতম জানাচ্ছি তাদের ক্ষুদ্র মহত্বকে।

সাম্প্রতিক

মহাশূন্যে প্রথম মানুষ

[মে '৬১]

'পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষবাহী মহাশূন্যযান ভোস্টক (পূর্ব) কে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে ছুঁড়ে দিয়ে কক্ষে পৌছানো হয়েছে ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল। পৃথিবীর উপগ্রহরূপ মহাশূন্যযান ভোস্টকের চালক হচ্ছেন একজন রুশ নাগরিক– ফ্লাইট মেজর ইউরি আলেজিয়েভিচ গ্যাগারিন।'

মস্কো বেতার থেকে প্রচারিত এই ঘোষণা সারা বিশ্বে এক ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পেরেছিল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। এই ঘোষণাটির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের আরেকটি বিজয় নিনাদ। মাটির মানুষ এবার সত্যি সত্যি মাটির মায়া কাটাল। ১৯১১ সালের ১২ই এপ্রিল জনৈক ফরাসী বৈমানিক পীয়েরেপীয়ের ৪ ঘন্টা ৮ মিনিটে লণ্ডন থেকে প্যারিসে গিয়ে বাহাদুরী দেখিয়েছিলেন আর আজ মাত্র পঞ্চাশ বছর পর ঠিক ঐ দিনটিতে একজন রুশ সৈনিক ও কারিগর ইউরি গ্যাগারিন ৮৯ মিনিটে মহাশূন্যে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে এলেন। ধন্য গ্যাগারিন, ধন্য রুশ বিজ্ঞানীরা যারা এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। ভোস্টককে তার কক্ষে নিয়ে যায় একটা বহুধাপ বিশিষ্ট রকেট। গ্যাগারিনকে শুদ্ধ নিয়ে আদত উপগ্রহটার ওজন হচ্ছে প্রায় ৫ টনের মত। নিষ্ক্রমণ বেগ (মাধ্যাকর্ষণকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য দরকারী বেগ) পৌছানোর পর রকেটের শেষ ধাপটুকুও ছুটে গেলে মহাশূন্যে প্রথম মানুষকে নিয়ে ভোস্টক আপন কক্ষপথে, যা বিষুবরেখার সাথে ৬৫.৪ কোণ করে ছিল, ৮৯.১ মিনিটে একবার করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। এ সময় পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব থাকে ১৭৫ কিলোমিটার ও ৩০২ কিলোমিটারের মাঝামাঝি।

খুব তাড়াতাড়ি প্রচণ্ড বেগে পৌছাতে যে ত্বরণ (acceleration)-এর উদ্ভব হয়েছিল তা গ্যাগারিন স্বচ্ছন্দে সহ্য করতে পেরেছিলেন। ভোস্টক ও পৃথিবীর মধ্যে সব সময়ই বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু ছিল। এর মাধ্যমেই মহাশূন্য থেকে সর্বপ্রথম মানুষের গলা ভেসে আসে। গ্যাগারিনের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রথম সংবাদ হচ্ছে 'যাত্রা স্বাভাবিক হয়েছে। বেশ ভাল আছি!' এ সময় তিনি দক্ষিণ আমেরিকার উপর দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এর পর তিনি আফ্রিকার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আরেকটা সংবাদ পাঠান। তা হচ্ছে, 'আমি ওজনহীন অবস্থা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই সহ্য করতে পারছি।'

মহাশূন্যে প্রথম মানুষ গ্যাগারিন স্পেসসুট পরে বসেছিলেন এমনি একটা কুঠরীর মধ্যে যেখানে মহাশূন্যের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মওজুদ ছিল হাজারো রকমের যন্ত্রপাতি। উত্তাপ, ওজনহীনতা, উল্কাবৃষ্টি, মহাজাগতিক বাষ্প এ সবই ছিল প্রধান প্রতিকূলতা।

১০৮ মিনিট ধরে মহাশূন্য ভ্রমণের পর গ্যাগারিন পূর্ব পরিকল্পনা মত নিরাপদে পৃথিবীতে নেমে আসেন। সোভিয়েট রাশিয়ার পূর্ব নির্দিষ্ট এক অজ্ঞাত অঞ্চলে তাঁর এই ঐতিহাসিক অবতরণ ঘটে। অবতরণের পরেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং উৎফুল্লভাবে বলেন: 'পার্টি ও সরকারের কাছে, এবং ব্যক্তিগতভাবে জনাব ক্রুশ্চেভের কাছে জানাচ্ছি যে আমার অবতরণ স্বাভাবিক হয়েছে।'

ফিরে আসার পর গ্যাগারিন তাঁর ভ্রমণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যে প্রথম মনুষ্যবাহী মহাশূন্যযানে গ্যাগারিন শুধু নিষ্ক্রিয় যাত্রীই ছিলেন না। মহাশূন্যে প্রথম মানুষ হিসেবে অনেক কিছুই তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন, যেগুলো ইতিপূর্বে মানুষ শুধু ধারণাই করত।

বিংশ শতাব্দীর কলম্বাস গ্যাগারিনের বয়স সাতাশ বছর। তিনি সোভিয়েট বিমান বাহিনীতে একজন কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত মেজর। তাঁর এই ঐতিহাসিক ভ্রমণের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কৃত্রিম ওজনহীনতার সৃষ্টি করে, প্রচণ্ড ত্বরণের বেগ সইয়ে, সাংঘাতিক রকমের তাপ ও চাপের মধ্য দিয়ে তাঁকে মহাশূন্যে এসব অবস্থায় কাটাতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়। এসব সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণ নূতনেরই মোকাবেলা করেছিলেন। আর সেই মোকাবেলায় জয়ী হয়ে এসেছেন মেজর ইউরি গ্যাগারিন।

সারা বিশ্বের ব্যাপক অভিনন্দন লাভ করেছেন চাঞ্চল্যকর স্পেসড্রামার নায়ক ইউরি গ্যাগারিন। অবতরণস্থান থেকে মস্কো নিয়ে আসার পর সরকার ও আপামর জনসাধারণ তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন তাতেই বোঝা যায় তাঁর কৃতিত্ব কতখানি ছিল। নাৎসী জার্মানীর আত্মসমর্পণের খবর শুনার পর মস্কোকে এত আনন্দোৎফুল্ল আর কোনদিনই দেখা যায় নি। রুশ বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যের দ্বার মানুষের জন্য খুলে দিলেন। সশরীরে মহাশূন্যে বিচরণ করে মানুষ দেখিয়ে দিল তার অগম্য কোন জায়গাই থাকতে পারে না। ক্রমাগত সাধনার ফলে সব কিছুই সম্ভব হয়।

সম্পাদকীয়

এটি আমাদেরই কাজ

[জুন–১৯৬২]

'কি হবে আদার বেপারীর জাহাজের খবর রেখে?' বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন সত্যিকারের মৌলিক অবদানের প্রশ্ন আসে, বিজ্ঞানের অর্ণবযান যখন জ্ঞানের চয়নে সামনে, আরো সামনে এগিয়ে যায়, তখন নিজেদেরকে আদার বেপারী ভাবাই আমাদের স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু আদার বেপারীরাই যে চেষ্টা করলে জাহাজের পাকা নাবিক, চাই কি জাহাজের মালিকও হয়ে বসতে পারে সে বোধ আমাদের মোটেই জন্মায় না তবে কথাটা সত্যি।

আমাদের দেশে অঙ্কের অধ্যাপক সব সময় বইয়ের অঙ্ক বুঝিয়ে আসছেন, এই আমরা জানি এর বেশি কিছু আমরা আশাও করি না। মৌলিক সংযোজন বিদেশের কাজ। ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় মাথাগুলিই সে কাজ করবে, এইত আমাদের ধারণা। কিন্তু সে ধারণা পালটানোর সময় এসে গেছে। যখন দেখি আমাদেরি অধ্যাপক খলীফা বিদেশের জাঁদরেল গণিতবিদদের টেক্কা দিয়ে অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক কিছু দিচ্ছেন। যখন দেখে আমাদেরি ডা. কামাল খুঁজে পাচ্ছেন পূণার্ণভা শাকের মধ্যে রোগমুক্তির চাবিকাঠি, রমনার মাটির মধ্যে এণ্টিবায়োটিক 'রমনাসিন' যাতে বিদেশ স্বয়ং আগ্রহশীল; তখনো কি আমাদের সে ধারণা থেকে যাবে? জগতকে তাক লাগিয়ে দেয়ার মত খুব বড় বড় আবিষ্কার হয়ত আমাদের দেশে বেশি হচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে নিরাশ হওয়ার কিছু নাই। আমাদের ভেবে দেখা উচিত সারা দেশে ক'জন বুদ্ধিজীবীই বা সত্যিকারের বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সমাজ সচেতন বিজ্ঞানী ডা. সালামের কথায় মাত্র পঞ্চাশজন পদার্থবিদ পাকিস্তানে রয়েছেন। বিদেশের এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়েই পদার্থবিদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি।

কাজেই অনগ্রসরতার কারণ আমাদের বিজ্ঞান-বুদ্ধির অভাব নয়, বিজ্ঞানপ্রিয়তারই অভাব। বিজ্ঞানে সাধারণ্যের আগ্রহ কম, তাই বিজ্ঞানকে জীবন-সাধনার অঙ্গ করে নিতে এগিয়ে আসছেনও অতি মুষ্টিমেয় লোক। গলদ এখানেই। আশা করা যায় দেশের কীর্তিমান বিজ্ঞানীদের অবদান আমাদের এ ভুল শুধরিয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

মহাশূন্যে নূতন মানুষ : গ্লেন

[জুন–১৯৬২]

'মানুষটার স্নায়ু কি ইস্পাতের তৈরি?' ন'সপ্তার মধ্যে দশবারই আকস্মিক কারণে যাত্রা স্থগিত হওয়ার পরও যখন লোকটা দমলেন না তখন অনেকেরই মনে প্রশ্নটা জেগেছিল। অনেকে ভাবলেন যে এবার যুক্তরাষ্ট্র নূতন মানুষ নির্বাচন করবে, মহাশূন্যে তার প্রথম দূত হিসাবে। না, গত ফেব্রুয়ারীর ২০ তারিখ বিশ্বের মানুষ সচকিত হয়ে শুনতে পেল লে: কর্ণেল জন গ্লেনই শেষপর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সম্মান রক্ষা করেছেন, মহাশূন্যে কক্ষপথে আবর্তনকারী প্রথম আমেরিকান হতে পেরে। গ্লেন তখনই বলেছিলেন এই যাত্রার যে প্রস্তুতি সে বহুদিনের, দু' এক দিনের বিলম্ব এর কোন ক্ষতিই করতে পারে না।' কথাটি সত্য বলে প্রমাণিত হল।

গ্লেনের মহাশূন্য ভ্রমণের যান ছিল অসংখ্য যন্ত্রপাতিভর্তি একটা মার্কারি কেপসুল ফ্রেণ্ডশীপ– ৭। একে মহাশূন্যে পৌছে দেয় এটলাস ডি বলে একটা মিসাইল। কেপক্যানভেরাল থেকে রকেটের আদত ধাক্কাটা খাওয়ার পরের চার ঘন্টা ছাপান্ন মিনিট গ্লেন কাটিয়েছেন অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার মধ্যে। এর মধ্যে তিনি পৃথিবীর বাধা কাটিয়ে উঠেছেন মহাশূন্যে, তিন তিনবার পৃথিবীকে চক্কর দিতে দিতে দেখেছেন চারটা অপূর্ব সুন্দর সূর্যাস্ত। ওজনহীন অবস্থা তাঁকে কোনরকম বেকায়দাতেই ফেলতে পারেনি। তাঁর সঙ্গের ক্যামেরা প্রভৃতি জিনিস তিনি ইতস্ততঃ শূন্যের মধ্যেই রেখে দিচ্ছিলেন, ঠিক যেন অদৃশ্য কোন তাকের উপর রাখছেন। শুধু একবার ক্যামেরার ফিল্ম ভরতে গিয়ে তিনি দেখেন তাঁর হাতের ধাক্কা লেগে সেই যে ফিল্মটা ভাসতে ভাসতে ইনস্ট্রুমেন্ট বোর্ডের পেছনে চলে গেল সেটার আর নাগালই পাওয়া গেল না।

মহাশূন্য থেকে চতুর্দিকের অদ্ভুত সব শোভা দেখে গ্লেন মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু সেটুকু ছাড়া তাঁর করবার আরো অনেক কিছুই ছিল। প্রায়ই তাঁকে অনেকগুলো যন্ত্রপাতি নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। একবার কিছুটা যান্ত্রিক গোলযোগও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু গ্লেন ধীরস্থির মাথায় নিজের হাতেই সেটুকু সংশোধন করে নিতে পেরেছিলেন। এখানেই গ্লেনের সফরের বৈশিষ্ট্য। মানুষ এখানে শুধু মহাশূন্যে ভ্রমণ করেনি, নিজের হাতে সে এমন নিয়ন্ত্রণও করেছে।

তিন চক্কর ঘোরার পর গ্লেনের কেপসুল ব্রেকের সাহায্যে গতিবেগ কমিয়ে ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডলে নেমে এসেছে। এর পর বিরাট এক প্যারাসুট একে আস্তে নামিয়ে নিয়ে এসেছে আটলান্টিকের বুকে। নামার কিছুক্ষণ পরই যুক্তরাষ্ট্র নৌ-বাহিনীর ডেষ্ট্রয়ার 'নোয়া' তাঁকে তুলে নিয়ে যায় মাতৃভূমির দিকে।

সেখানে এক বিরাট সম্বর্ধনার ঝড় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। বিশ্বের সর্বত্র জন গ্লেন তাঁর ঐতিহাসিক ভ্রমণের জন্য মোবারকবাদ লাভ করেছেন। কিন্তু গ্লেনের নিজের কথায় তাঁর কীর্তি খুব দীর্ঘ এক কার্যক্রমেরই অঙ্গমাত্র, সে কার্যক্রম মহাশূন্যে মানুষের জয়যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন অনেকদিন আগে লিখে গিয়েছেন 'যুদ্ধে যারা গিয়েছে তাদের যুদ্ধের গল্প যেমন আকর্ষণীয় তেমনি চাঁদে যারা যায়নি সে কবিদের চাঁদের গল্প পানসা হতে বাধ্য।' আজকের মানুষ আশা করছে শিগগিরই মহাশূন্যচারীগণ চাঁদের পানশা গল্পকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবেন।

অশ্রুত রাগিনী

জুন-৬২

সুরাইয়া বেগম

বিরুদ্ধ সমাবেশের কথা বলতে গিয়ে আমরা যে বলে থাকি, 'তেলে জলে মেশে না'—এ কথার অর্থগত সার্থকতাকে আর বজায় থাকতে দিচ্ছে না বিজ্ঞানের শক্তি। সুরের মোহিনী মায়ার নাগিনী ছুটে আসে স্বভাব বৈরিতা ভুলে গিয়ে সাপুড়ের পাশে; আর বনের বাঘও নাকি শিকার ফেলে রেখে বসে থাকে সঙ্গীতের অপূর্ব মূর্ছনায়। সুরের ছোঁয়ায় এমনি যাদু যদি বা সম্ভব হয়, তবে তা জীবের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ কথা আমাদের পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে যে, শব্দের মোহিনী শক্তি জড়জগত থেকেও বিরুদ্ধ প্রকৃতি দূর করে তাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দেয়। তেলের সঙ্গে জল মিশে যায় আপন আপন স্বত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে।

কেমন করে তা সম্ভব সেটা ফরাসী বিজ্ঞানী অধ্যাপক লাঁজেভিঁর (Langevin) প্রচেষ্টার কথা দিয়েই শুরু করা যাক। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সেটা। লাঁজেভিঁ নিযুক্ত হয়েছিলেন শত্রুপক্ষের সাবমেরিনের অগ্রিম সন্ধান পাবার উপায় উদ্ভাবন করতে। তিনি কাজ করছিলেন শব্দের প্রতিধ্বনি নিয়ে। শব্দের প্রতিধ্বনি থেকে সমুখবর্তী কোন বস্তু যা শব্দকে প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দেয়, তার অস্তিত্ব জানা যায়। কিন্তু শত্রুর সন্ধান করবার জন্যে যদি শব্দই সৃষ্টি করতে হয়, তবে আর গোপনীয়তা রক্ষা পেল কি করে। আর তা ছাড়া যে শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, পানির তলার সাবমেরিনের মত ছোট জিনিস থেকে তার সম্যক প্রতিধ্বনি পাওয়া সম্ভব নয়। লাঁজেভিঁ তাই এমন শব্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা থেকে প্রতিধ্বনির উদ্ভব হলেও আভিধানিক অর্থে তাকে শব্দ বলা চলবে না।

এই শব্দোৎপত্তির গোড়ার কথাই হচ্ছে শব্দকারী বস্তুর কম্পন। শব্দ যা থেকেই বের হোক না কেন সেখানে কোন না কোন প্রকারের কম্পন বেরুতে দেখা যাবেই। ফুঁয়ের জোরে বাতাসে কম্পন সৃষ্টি করে বাঁশী বাজাতে হয়, আর তারযন্ত্রের তারকে কাঁপালে সুর বেরোয়। সুরের জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে 'সারেগামা'র সৃষ্টি; আর এই নামকরণের মূলকথা হচ্ছে সুরের তীক্ষ্ণতার প্রভেদ! এক সুর আর একটির চেয়ে চড়ায় কিংবা খাদে রয়েছে, এই হল বিভিন্নতা। কিন্তু সুরের এই বৈশিষ্ট্যতারও কারণ রয়েছে। প্রতি সেকেণ্ডে কম্পনের সংখ্যা (Frequency) কত তারই বিচার করে সুরের তীক্ষ্ণতা নির্ণীত হয়। শব্দকারী বস্তু যত দ্রুত তালে কাঁপবে ততই চড়া সুরে বাজবে নিঃসৃত সুর। প্রতি সেকেণ্ডে কম্পনের সংখ্যা (বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'কম্পাঙ্ক') (কুড়ির কম হলে তাকে আর শব্দ বলে উপলব্ধি হয় না। কম্পাঙ্ক যত বাড়ে, সুরের তীক্ষ্ণতাও তত বাড়তে থাকে। কিন্তু এরও সীমা রয়েছে। প্রতি সেকেণ্ডে এই সংখ্যা কুড়ি হাজার ছাড়িয়ে গেলে তা আর আমাদের কানে শব্দের অনুভূতি জন্মায় না। তবে অনেক ইতর প্রাণী এমন সব তীব্রতর শব্দ শুনতে পায়, যা আমাদের অনুভূতির বাইরে, চামচিকে এমনি সব শব্দ সৃষ্টি করতে পারে এবং তা শুনতেও পায়। বলতে পারি চোখে দেখার কাজটুকু এরা কান দিয়ে সারতে পারে। এই জাতীয় কম্পন, যা আমাদের বোধেন্দ্রিয়ের সীমার অতীত, দেহের সীমার কাছে নীরব, তাকে বলা হয় শব্দোত্তর (Supersonic বা Ultrasonic) কম্পন। এরা আমাদের শ্রুতিগোচর না হলেও এদের বিচিত্র গুণপনা আর বিস্ময়কর কার্যকারিতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে বাধা পায় না। শব্দকারী বস্তুর কম্পন বাতাসে সৃষ্টি করে শব্দের তরঙ্গ আর এই ঢেউ কর্ণকুহরে হানা দিয়ে সেখানে জাগায় শব্দের অনুভূতি। শব্দোত্তর কম্পনে সৃষ্ট তরঙ্গ কানের পর্দায় সাড়া না জাগাতে পারলেও তার রয়েছে আরও অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা।

লাঁজেভিঁর সাবমেরিন সন্ধানের কথাই ধরা যাক। এই শব্দোত্তর তরঙ্গকে সূক্ষ্ম রশ্মির আকারে কোন বিশেষ দিকে পাঠালে তা কোন কিছুতে বাধা পেলে বিপরীতমুখী উৎসের কাছে আবার ফিরে আসে। এই ফিরে আসা তরঙ্গগুলো কোন যন্ত্র দিয়ে ধরতে পারলেই তা সন্ধান দেবে অগ্রবর্তী প্রতিবন্ধকের অস্তিত্ব এবং হিসেব করে বলা যাবে তার দূরত্ব। শুধু ডুবোজাহাজ কেন– সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করার জন্যও এর ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকরী। এই ছিল লাঁজেভিঁর আবিষ্কার। তিনি তা সৃষ্টি করবার পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন কেলাসিত কোয়ার্টজ (Quarhz crystals) নিয়ে। কেলাসিত কোয়ার্টজকে তড়িৎপ্রভাবে রাখলে তার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটবে এবং তড়িৎপ্রভাবের দিক পরিবর্তন করতে থাকলে (Alternating) কোয়ার্টজ খণ্ডের দৈর্ঘ্যের পর্য্যানুক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধি হয়, আর তাতেই কোয়ার্টজের ভেতরে কম্পনের উদ্ভব। এছাড়া আরও বহু উপায়ে শব্দোত্তর কম্পন সৃষ্টির পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। সে সব বাদ দিয়ে নিঃশব্দ কম্পনের ব্যবহারিক প্রয়োগ আর তার শক্তিমত্তার অদ্ভুত রূপের কথাই বিবেচনা করা যাক।

কম্পাঙ্কবিভেদে এর কার্যকারিতার পরিবর্তন ঘটে এবং এর শক্তির রকমারী পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে এমন কম্পন সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে পঞ্চাশ কোটি।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে শব্দোত্তর তরঙ্গের দান অপরিসীম এবং অদ্ভুত। এই তরঙ্গের প্রয়োগে যে তাপের উদ্ভব হয় তার বাহ্যিক প্রয়োগে যাতে পঙ্গু ও অচল তথা অক্ষম ব্যক্তিদের কার্যক্ষম করা সম্ভব হচ্ছে। হাত পায়ের পেশীর ব্যথাও এতে সহজেই নিরাময় হয়। আলোর তরঙ্গের মত এই তরঙ্গকেও প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সাহায্যে ফোকাস বা কেন্দ্রীভূত করেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ বিশেষ স্থানে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ছুরি না চালিয়ে অস্ত্রোপচারের কথা বললে ডেনমার্কের কুমারকে বাদ দিয়ে 'হামলেট' অভিনয়ের কথা মনে আসতে পারে। কিন্তু শব্দোত্তর কম্পন তা সম্ভব করেছে। মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারে বিশেষ নিপুণতা ও অতি সতর্কতার ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা থাকে খুব বেশী। তখন এই সূক্ষ্ম শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগে মস্তিষ্কের রোগগ্রস্ত অংশকে তাপের ক্রিয়ায় পুড়িয়ে নিষ্ক্রিয় করে দিলে জটিল অস্ত্রচালনার ঝুঁকি নেবার প্রয়োজন থাকে না। দন্তচিকিৎসকরাও দাঁতের ভেতরে এবং অস্ত্রচিকিৎসকরা হাড়ের ভেতরে ফুটো করবার জন্যে এর সাহায্য নিয়ে থাকেন। অস্ত্রের স্থলবর্তী হয়েছে এখন শব্দোত্তর কম্পন।

শব্দোত্তর কম্পন বহুবিধ রাসায়নিক ক্রিয়াও ঘটিয়ে থাকে। তরল পদার্থ কিংবা গ্যাসের ভেতরে কঠিন পদার্থের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভেসে থেকে গ্যাসকে ধোঁয়াটে আর তরলকে ঘোলাটে করে তোলে, এই তরঙ্গের আঘাতে কণাগুলো ধাক্কা খেয়ে পরস্পর জুড়ে গিয়ে ক্রমশঃ বড় হতে থাকে এবং অবশেষে যথেষ্ট ভারী অবস্থায় পৌঁছলে ভেসে থাকতে আর সক্ষম হয় না। এর সাহায্যে বায়ু থেকে ধোঁয়া আর কুয়াশা এবং তরল পদার্থ থেকে অদ্রবণীয় পদার্থ সরিয়ে ফেলা যায়। গলিত কাচ জমিয়ে লেন্স প্রভৃতি তৈরী করবার সময় গলিত কাচকে বায়ুমুক্ত করার কাজও এটা দিয়ে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হতে পারে। এমনিভাবে পানির সঙ্গে পারদ কিংবা তেলের সঙ্গে জলেরও মিশ খাইয়ে দেওয়ানো যায়। এই পদ্ধতিতে রং তৈরি করলে তার মিশ্রণটা হয় নিখুঁত এবং বার্নিশ করার পর তা দেখতে হয় নয়নাভিরাম সুন্দর।

আরও বহু রকমের কাজ সম্পন্ন হতে পারে শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগে। তেলকালি মাথা নোংরা কাপড় এর সাহায্যে মালিন্যমুক্ত করা মোটেই অসাধ্য নয়, যদিও তা ব্যয়বহুল। তাছাড়া এর দ্বারা বাসন মাজা, হালকা ও ভঙ্গুর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং গহনাপত্রও দিব্যি পরিষ্কার করে নেয়া যায়। কোন পাত্রকে পরিষ্কার করতে হলে, সেটাকে কোন তরলে বা জলে ডুবিয়ে ত্রিশ হাজার কম্পাঙ্কের শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রয়োগ করলে ময়লা সব পাত্র থেকে নিঃশেষে বেরিয়ে আসবে।

আমাদের দেশের বিশেষ এক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, শঙ্খধ্বনি গৃহস্থের পক্ষে কল্যাণকর। শঙ্খনাদের ভেতরে শব্দোত্তর কম্পনের উদ্ভব হলে তা থেকে রোগবীজ নষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। সমুদ্রের জলের ভেতরে এই তরঙ্গ পাঠানোর ফলে দেখা গেছে যে দেহের আভ্যন্তরীন কোষের ওপর এর আঘাতে কোষ বিনষ্ট হওয়ার ফলে সামুদ্রিক প্রাণী বা মাছের মৃত্যু ঘটে। এইভাবে অনেক রোগবীজ ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে। দুধের ভেতরকার রোগবীজের কোষগুলিকে এই তরঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এতে কিন্তু তাদের রাসায়নিক গঠন অবিকৃত থাকে। জড়তাপ্রাপ্ত এই কোষগুলিকে রোগপ্রতিষেধক টিকা তৈরি করবার কাজে লাগানো যায়।

তবে শব্দোত্তর যে নিছক কল্যাণপ্রসূই হবে, এ কথা বলা যায় না। শরীরের ওপর ব্যাপকভাবে এর ক্রিয়া মোটেই সুখপ্রদ নয়। বেপরোয়া ব্যবহার করলে বিপদ ঘনিয়ে আসা মোটেই আশ্চর্যজনক হবে না। যা রোগবীজ ধ্বংস করতে পারে তা দিয়ে কি আরও বৃহত্তর ধ্বংসকার্য চলতে পারে না? অপেক্ষাকৃত কম কম্পাঙ্কের তরঙ্গ মনে আনে ভীতি ও অস্বস্তি; আর দেহে আনে জড়তা, অস্থিরতা আর শ্রান্তি। কানের পর্দা এই কাঁপুনিতে সাড়া না দিলেও এদের আঘাতে তা বিদীর্ণ হওয়া বিচিত্র নয়। এর ব্যবহার কি ভবিষ্যত মহামারণযজ্ঞের কাজে লাগানো চলতে পারে? বিজ্ঞানের সকল উন্নতির পরিণতির ঝোঁকত ঐদিকেই। অনাগত যুগে মারণাস্ত্র এই অশ্রুত নীরব রাগিণীর গোপন পদসঞ্চারেই এগিয়ে আসবে কি না তাই বা কে বলতে পারে।

মানুষের আদিতম আবিষ্কার যে কি তা সত্যি গবেষণার বস্তু। কিন্তু আর্থার লেঙ্গলী বলেন মানুষের সর্বপ্রথম বিরাট আবিষ্কার হচ্ছে ভাষা, পরস্পর যোগাযোগের মৌলিক বস্তু। তাঁর মতে এই কথা বলার শক্তি থেকেই মানুষ পেয়েছে প্রকৃতির উপর এবং সর্বোপরি তার নিজের উপর অগাধ শক্তি।

অথ আড্ডা তত্ত্ব

[সেপ্টেম্বর–১৯৬৩]

জ. ও. ম. শামসুল হোসাইন

আড্ডা সার্বজনীন। বাবারা আপিসে, মায়েরা রান্নাঘরে আর ছেলে-মেয়েরা কমনরুমে, আর তার চাইতেও বেশী ক্লাসরুমে চিরকাল আড্ডা দিয়ে এসেছেন। অবশেষে আড্ডাবাজকুলশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মুজতবা আলী আড্ডার আন্তর্জাতিকতাও সপ্রমাণ করেছেন। জাঁদরেল বিজ্ঞানীও কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু আড্ডা যে না মারেন তা নয়। এভাবেই হয়তো এক সময়ে আড্ডা বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারেও ঢুকে পড়েছে। আর তারই ফলে আজ আড্ডাকে বৈজ্ঞানিক কায়দায় বিশ্লিষ্ট হতে হচ্ছে। এভাবে বৈজ্ঞানিক হাতে নিপীড়িত হতে দেখে আড্ডা-প্রেমিকরা হয়ত বা মনে কষ্ট পাচ্ছেন, তবুও বান্দা নাচার।

আড্ডা সম্পর্কে ল্যাবোরেটরী থেকে প্রথম যে খবরটা পাওয়া গেছে তা হচ্ছে আড্ডা সবাই উপভোগ করে বটে, কিন্তু আড্ডাতে কেউ সন্তুষ্ট নয়। সবারই মনটা আড্ডার পর একটু খুঁত খুঁত করে, একটু অপরাধ বোধ জাগে। ব্যাপারটা এ রকমের— 'আড্ডা মারাটা ঠিক উচিত হচ্ছে না; আড্ডা যে মারি একথা স্বীকার করতেও বাধে; অথচ আমি জানি কষে একটা আড্ডা মারার চাইতে অধিকতর উপভোগ্য কোন কিছুই থাকতে পারে না।' এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীর মন্তব্য হচ্ছে এটা অনুচিত। কারণ আড্ডা জিনিসটা অপরাধ মোটেই নয়। এতে লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই। বরং নেহাত বাড়াবাড়ি না হলে এবং অন্যের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে না হলে এটা আপনার উপকারই করছে। আড্ডা সম্পূর্ণ ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নততর ব্যক্তিত্ব গঠনে অনেকখানি সাহায্য করতে পারে।

আড্ডার খুব বড় একটা উপকারিতা হচ্ছে এটা মানুষের ভাবোচ্ছ্বাসকে রোধ করে তাকে সুস্থ মানসিকতার অধিকারী করতে পারে। মানুষের মনে নিত্য যে সব অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে আড্ডা সাময়িকভাবে হলেও মনকে এগুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। মানসিক অশান্তি দূর করার চমৎকার একটা উপায় হচ্ছে আড্ডায় গিয়ে যোগ দেয়া। শুধু মানসিক স্বাস্থ্যই নয় আপনার দৈহিক স্বাস্থ্যের যত্নও এই আড্ডা নিতে পারে। অনেক সময় অকারণ আমাদের মন কেমন কেমন জানি করে। একটা অসন্তুষ্টি, একটা অশান্তির ভাব যেন মনের মধ্যে লেগেই থাকে। অথচ এর কোন কারণও খুঁজে বের করা যায় না। মনের এই ভাবটারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে আলসার, ব্লাড প্রেসার, নিউরোসিস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে। আর এর একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে আড্ডা। আড্ডা এই মারাত্মক অসন্তুষ্টি ভাবকে মন থেকে দূর করে দিয়ে আপনাকে এসব রোগ থেকে রক্ষা করছে। অতএব আড্ডাবাজরা জেনে রাখুন, আড্ডা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, দৈহিকও মানসিকও; আপনি বিনা দ্বিধায় আড্ডার দিকে এগুতে পারেন।

এতো গেল যারা আড্ডা মারে তাদের কথা। এবার দেখা যাক যাদের উপর আড্ডা মারা হয় তাদের কি অবস্থা। এটা অবশ্য নির্ভর করে আড্ডার বিষয়বস্তুর উপর। কোন কোন আড্ডা নির্দোষ। এসব কারো প্রতি প্রতিহিংসামূলকভাবে ব্যবহৃত হয় না বটে কিন্তু এর ঠিক উল্টোটাই সচরাচর দেখা যায়। শেষের গুলো নিঃসন্দেহে আলোচ্য ব্যক্তির পছন্দ হবে না। কিন্তু সমাজে এগুলোরও একটা মূল্য রয়েছে। 'অমুকের বউকে তমুকের সাথে দেখা গেছে' বা 'অমুক নেতার নৈতিক চরিত্রে অমুক দুর্বলতাটা দেখা গেছে' এ ধরনের কথাবার্তার ভয় যে সমাজ জীবনের অনেকখানি

উপকার সাধন করে থাকে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ধরনের আড্ডা অবশ্য মানুষের ক্ষতিসাধনেও ব্যবহৃত হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে দোষ আড্ডার নয়, আড্ডাবাজ মানুষের। যেমন ছুরি দিয়ে যে হত্যা করা হয় সে দোষ ছুরির নয়, হত্যাকারীর।

মানুষের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক আড্ডা তাকে দৃঢ়তর, ঘনিষ্ঠতর করে তোলে। আপনি যে আড্ডায় গিয়ে আর দশজন মানুষের কথা, তাদের দোষ-গুণ, সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করছেন তার মধ্যেই এর প্রকাশ। যে মানুষকে ভালবাসে সে আড্ডাকেও ভালবাসতে বাধ্য। যে লোক অপরের সম্বন্ধে কথা বলতে পছন্দ করে না সে কাউকেই পছন্দ করে না, এমনকি নিজেকেও না। অনেকে আড্ডা মারতে ভয় পায়, পাছে সে নিজেও আড্ডার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ বাজে একটা ভয়। যে লোক অপর কর্তৃক আলোচিত হয় না, বুঝতে হবে সমাজে সে বিরাট একটা শূন্যতার মধ্যে বাস করছে। তাকে কেউ ভালও বাসে না, ঘৃণাও করে না, প্রশংসাও করে না, হিংসাও করে না। সে ভাল-মন্দ কি করল বা না করল তাতে কারো কিছু আসে যায় না। এরকম অবস্থা যে কোন সামাজিক লোকের কাছে অসহ্য নয় কি?

অনেকের ধারণা আড্ডার কথাবার্তা শোনা নেহাত বোকামীর কাজ। কারণ এতে সত্য বলতে কিছু থাকে না। জনৈক খ্যাতনামা মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ এর বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন 'বিজ্ঞানী হিসেবে আড্ডা আমি শুনি একমাত্র এই কারণে যে এতে অনেকখানি সত্য নিহিত থাকে।' এমন সব সত্য যা লোকে হয়ত সাধারণত বলতে চায় না আড্ডার মধ্যে সেসবও বের হয়ে পড়ে। অনেকে কোন লোক সম্পর্কে সামনা-সামনি যা বলতে সঙ্কোচ বোধ করে তা পরে আড্ডায় স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারে। কাজেই সত্য আবিষ্কার করতে হলে অনেক সময় আড্ডার শরণাপন্ন হতে হয়।

মানুষের জীবনের সাথে আড্ডার সম্পর্ক এতটুকু অঙ্গাঙ্গিক হয়ে পড়েছে যে আড্ডার প্রতি তার মনোভাবকে তার ব্যক্তিত্বের একটা পরিমাপ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। এদিক দিয়ে সবাইকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) সব চাইতে সুসম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক হচ্ছে তারা যারা আড্ডা পছন্দ করে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করে না। আড্ডার সবগুলো সুফলের ছাপ এদের ব্যক্তিত্বের উপর পড়ে। কিন্তু কুফল যে কয়টা আছে সেগুলোকে এরা সযত্নে এড়িয়ে চলতে পারে।

(২) যারা একেবারে নীতিগতভাবে আড্ডার বিরোধী, সাধারণতঃ তারা চাপা, শক্তমনা প্রকৃতির লোক হয়ে থাকে। ভাবোচ্ছ্বাস এদেরকে সহজেই কাবু করে ফেলতে পারে। এদের মধ্যে সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বের অভাব দেখা যায়।

(৩) আবার যারা অত্যধিক পরিমাণে আড্ডাপ্রিয় তাদেরও ভয়ের কারণ আছে। এ ধরনের লোকের মধ্যে প্রায়ই অনিয়ম উশৃঙ্খলতা দেখা যায়। এরা নিজের কাজ ছাড়া দুনিয়ার আর সবার কাজ নিয়েই মাথা ঘামাতে অভ্যস্থ। নিজেদের জীবনে এদের শুধু শূন্যতাই আছে তাই অপরের জীবন নিয়েই এদেরকে বাঁচতে হয়।

আড্ডা, আড্ডাবাজ, আড্ডার বিষয়বস্তু, এদের কিছুই বিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থেকে আর রেহাই পাচ্ছে না। ধীরে ধীরে এ সম্পর্কে যতই তথ্য প্রকাশ পাবে আড্ডার নামে নাক না সিটকিয়ে ততই আমরা আড্ডার মাহাত্মকে বুঝতে শিখব। লোকে যদি আপনার নামে মন্দ বলে সে দোষ লোকের বা আড্ডার নয়, বরং সম্পূর্ণ আপনার। আপনি তাদেরকে ভাল বলতে বাধ্য করতে পারেন একমাত্র ভাল কাজ করেই। আড্ডাই আপনাকে সেই ভাল কাজের প্রেরণা যোগাবে।

শক্তির সন্ধানে মানুষ

[অক্টোবর-১৯৬৩]

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

এখন থেকে প্রায় আট বছর আগের কথা। আমি একবার আটাকলে গম ভাঙ্গাতে গেছলুম। সেখানে লক্ষ্য করি যে একটা বড়ো সড়ো চাকা আর একটা ছোটখাট চাকার সঙ্গে ফিতের সাহায্যে জোড় বেঁধে ঘোরানো হচ্ছে। এটুকু ভাল করে পরিষ্কার হয়েছিল যে বড়ো চাকা এক মিনিটে যতবার ঘুরছে ছোটোটা তার চেয়ে অনেক বেশি বার ঘুরছে। তখন একবার মনে হয়েছিলো আমি একটা প্রকাণ্ড চাকাটা যেমন করে হোক ঘোরাবো, আর বেশ জোরে। জোড়ায় থাকবে আর একটা অতি ক্ষুদ্র চাকা। কাজেই, হাসবেন না, আমার ধারণা হয়েছিলো যে ছোটোটার মাঝদণ্ডের সাথে আগের মত ফিতে লাগিয়ে আরেকটা বড়োসড়ো চাকা অনেক বেশি জোরে ঘোরানো যাবে। এইভাবে একটা বড় ও ছোটো চাকার যুগলে প্রথম বড়ো চাকাটা ঘুরবে বেশ আস্তে, আর শেষ বড়ো চাকাটা ঘুরবে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে কাজেই সামান্য একটু জোর দিয়ে অনেক বেশি পরিমাণ জোর বা তাকত পাওয়া যাবে। ব্যাপারটা যে আদপেই তা না সেটা বুঝেছি অনেক পরে, যখন কলেজে পড়ি তখন। কেন সম্ভব নয় সেটা বলে আপনাদের আরও বিরক্তি উৎপাদন করতে চাইনে। আজকের দিনের কোন পাইলট-স্কুলের বিজ্ঞানের ছাত্রও হয়ত জিনিসটা পারবে। যে শক্তির কথা আমি চাকা ঘোরানতে আন্দাজ করেছিলাম সেটাকে বলা যায় চলৎশক্তি বা Kinetic Energy। বস্তুর ভর এবং গতি এদুয়ের যুগপৎ একীভূত ফল এতে রয়েছে। তাই ভর কমলে গতি বেড়ে যাবে। আর ভর বাড়লে গতি কমবে। পরে বুঝেছি যে আমি যে সংগঠনের চিন্তা করেছিলাম সেটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। এ বিশ্বে শক্তির পরিমাণ স্থির। এটাকে গুণ করে বাড়ানো যায় না, কিংবা ভাগ করে কম করাও সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, রকম ফের আছে। যেন একটা ব্যবসা। ব্যবসাই বটে; কিন্তু রকমফেরের রদবদলের রেওয়াজ চালু না হলে আমি আমি এবং আপনি আপনি থাকতেন না এ নিশ্চয়। আমি আমার ভুল কল্পনার জন্য মোটেই লজ্জিত নই বরং মধ্যে মধ্যে ভাবি, হোক সে ভুল তবু এমনতরো বৈজ্ঞানিক জিনিস আমার অনুর্বর মগজে খেলেছিল! বস্তুতঃ সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে কয়লার প্রচুর অভাব। আমার ধারণা ছিল অল্প কয়লাতে ক্রমাগত কাজ হয় কিনা, রেলগাড়িগুলিকে চলতে হবেত।

এ দীর্ঘ ভণিতার প্রয়োজন ছিল। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো সাত মিটার নিবন্ধের জন্য সতেরো মিটার ভূমিকায় শক্তির সন্ধানে ভূধরে-সাগরে-বিজনে-নগরে পইপই করে ঘুরে বেড়ানোর আগে যে সরঞ্জাম ও জ্ঞাতব্য ছিল তার কিছুটা পেলাম।

একটা কথা আছে, জোর যার মুলুক তার। এই জোরের মোটামুটি পরিমাপকে বলতে পারি শক্তি। শক্তির নানারূপ জাগতিক রকমফের ও চেহারাবদল হতে পারে। মূলতঃ সবশক্তিই এক এই অর্থে যে তারা কাজ করে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় কাজ সেইটা যেখানের জাগতিক স্থানান্তর সব সময়ই আছে। অন্যকে দিয়ে কাজ করানোতে (এক্ষেত্রে শক্তি) রয়েছে বিপুল সুখ। বর্তমান সভ্যতার মূল কথা এইটে। আগেকার দিনে মানুষকে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে চলতে হত। হাঁটাতে প্রচুর শক্তির অপচয় হয়। যদিও সেগুলি প্রকৃতই হারিয়ে যায় না। এখন মানুষ গ্যাসোলিন পুড়ে দৌড়াচ্ছে! শুধু পায়ে অমন দৌড় সম্ভব ছিল না। অসংখ্য উদাহরণ আছে ও যার মধ্যে আমি একটা সস্তা নমুনা দিলাম। শক্তিটা যেন সুকুমার রায়ের 'এক যে ছিল সাহেবে'র গাধা। ওর পিঠে মানুষ আরোহন করে তার লম্বা নাক আর মুলোর কৌশলে বা-আরাম চলেছে। তাই শক্তি ছাড়া পৃথিবীর কল্পনা করা যায় না। সেটাই হয়তঃ Absolute Death হতে পারত। তাপহীন আলোহীন শব্দহীন–কম্পাসের কাঁটাঘুরত না, বাতাস বইত না, সে জগত মৃতের নয়ত কী।

এমন যে শক্তি তার আহরণের উৎসগুলি কি? বস্তুতঃ শক্তির এই আহরণ এবং তাকে প্রয়োগ করার মধ্যেই রয়েছে বর্তমানে যে কোন দেশের সমৃদ্ধি। সব উৎসই প্রাকৃতিক। কোন কোনখানে মেজেঘঁষে তবে নাবতে হয়, যেমন আণবিক শক্তি।

সূর্য পৃথিবীকে আলো দেয়। সূর্য থেকে আমরা তাপ পাই। আমরা গাছ, পাথুরে কয়লা, গ্যাস কিংবা কেরোসিন জ্বালাই। চিনি, মাখন, ভাত খাই যা দেহটাকে কাজ করবার শক্তি যোগায়। ঝড়ো বাতাসে আমাদের ঘর বাড়ী ভাঙে। জোয়ারে জাহাজ সমুদ্রে ভাসে। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত এগুলিও বেশ কাজ দিয়ে থাকে (যদিও তার চেহারাটা বড় সুখকর নয়) কাঠ, কয়লা, তৈল, আণবিক শক্তি, জলবিদ্যুত এ সমস্ত থেকে আমরা সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় শক্তিটা আহরণ করে থাকি। পৃথিবীতে শক্তির চাহিদা নিয়তই বাড়ছে। কাজে কাজেই নতুন উৎস থেকে শক্তির আহরণ প্রয়োজন। তেল, কয়লা বা জলবিদ্যুত এর সবটাই পরিমিত। সেক্ষেত্রে আণবিক শক্তি দিয়েছে পথের সন্ধান। রেডিও এ্যাক্টিভ ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, থোরিয়াম এগুলি থেকে 'ফিসন'-এর সাহায্য বিপুল শক্তির নাগাল পাওয়া যায়। মনীষী আইনষ্টাইনের একটি সূত্র এর মূলে। এতে ভর আর শক্তিকে দুটো ভিন্ন Physical Entity বলে স্বীকার করা হয় না। বরং বলা হয় একটা অন্যটার পরিপূরক। সূত্রটা এই : $E= mc^2$, E=Energy; M= Mass (ভর); C = আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে। এ থেকে হিসাব করে দেখা গেছে যে ১ পাউণ্ড ইউরেনিয়াম প্রায় ১৪০০ টন কয়লার সমান। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে ইউরেনিয়ামত অবশ্যই অসীম আকারে বিরাজ করছে না। একদিন শেষ হবে। তবে হ্যাঁ, সাগর জলে ইউরেনিয়াম লবণ আছে কতক পরিমাণ। উপকূলবর্তী স্থানে বালি, পাথরের নুড়ি ইত্যাদিতে এর খানিক সঞ্চয় আছে। জলের লবণটাই বড়ো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমুদ্রে এতো জল আছে যে যত সামান্যই হোক ইউরেনিয়ামএর পরিমাণ, তবু এতে রয়েছে এক বিরাট সঞ্চয়। যা দিয়ে বহু বহু লক্ষ বছর আরামে কাটান যাবে। যদি এর পরেও প্রশ্ন করেন তারপর কি? তবে উত্তর হল এই যে বিজ্ঞানীরা একটা পথ খুঁজে বের করেছেন। ভারী হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে পরিবর্তনটা হয় Fusion পদ্ধতিতে। জল থেকে যদি ভারী হাইড্রোজেন তৈরী করা যায় তবে ত কথাই নাই। সাগরের জল সত্যিই অগাধ। সেখান থেকে শক্তির আহরণ তাই শেষ হবে না। তারপরে কি? এক্ষণে আমার রাগ হওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে এবং একথা বলার যে, তারপর যাহা হবে। এ পর্যন্ত ত হোক আগে। এগুলো ছাড়া আরও কিছু কিছু উৎস আছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। যেমন ধরুন বাতাস। কিছুদিন আগে ডেনমার্কে বহু শত বায়ুকল ছিল। এগুলো দিয়ে পানি সেচ করা যেতো। হাওয়াতে শক্তি আছে প্রচুর। কিন্তু সে বড় উশৃংখল। কোন সময় জোরে বইবে কোন সময় এক্কেবারে কম। বছরের কোন সময় হয়ত হাওয়া বয়, আর কোন সময় বন্ধ থাকে প্রায়। কাজেই এমন উৎসের উপর নির্ভর করা যায় না। তবে যে সমস্ত অঞ্চলে সারাবছর প্রায় একইভাবে হাওয়া বয় সে সমস্ত জায়গায় ছোট ছোট ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া সমুদ্রউপকূলবর্তী জায়গায় সকালে ও সন্ধ্যায় বেশী নিয়মিত হাওয়া বয়ে থাকে। আমাদের দেশে দেশে মৌসুমী বায়ু থেকেও কয়েকমাস আমরা বেশ কিছু শক্তি আহরণ করতে পারি। শব্দ এক প্রকার শক্তি। যদিও এটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রকৃতির তবু যেমন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা গড়ে তোলে মহাসাগর অতল তেমনি করে অযুত ছোট ছোট শব্দকণা সম্মিলিত হয়ে বৃহৎ শক্তির উৎসমুখের সন্ধান কি দিতে পারবে না? মুশকিল কি যে বালিকণা ছোট বড় হলেও মরুভূমি গড়া যায়, জলবিন্দু যে আকারেরই হোক না কেন তা দিয়ে মহাসাগর গড়া যেতে পারে কিন্তু একই তেজওয়ালা শব্দ না হলে বৃহৎ উৎপাদন কষ্টকর বটে। কলকারখানায় যেখানে একঘেঁয়ে শব্দ চলতে থাকে সেখানে এ শব্দ থেকে বিদ্যুৎ তৈরী হতে পারে। এবারের বিজ্ঞান মেলায় বাস্তবে মুখ দিয়ে সামান্য শব্দ করে তা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করে টেপ বাজিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম পুরস্কার মিলেছে। অতএব কথাটা প্রণিধানযোগ্য। আদমজী বা ফেঞ্চুগঞ্জের শব্দ এভাবে কারখানারই কাজে লাগান যাবে। পৃথিবী ও চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণের ফলে জোয়ার ও ভাটা হয়। জিনিসটা Periodic প্রায় ৫২ ঘণ্টা পরপর একই স্থানে জোয়ার আসে। বিপুল পরিমাণ সাগর জল যখন উপরে উঠে যায় স্বাভাবিক সমুদ্র সমতল থেকে কিংবা যখন নিচে নামে তখন জলের গতিশীল অণুগুলো থেকে আমরা শক্তি আহরণ করতে পারি। এমন দিনের কল্পনা সহজেই করা যায় যখন কোন জলযানকে আর জ্বালানি বইতে হবে না। জোয়ারের শক্তিতেই সব জাহাজ চালু থাকবে।

সৌর শক্তি প্রায় অফুরন্ত। একে ধরবার নানা কায়দা আবিষ্কার হয়েছে এবং হচ্ছে। বস্তুতঃ সৌরশক্তি নিজ নামেই বিরাট আলোচনার যোগ্যতা রাখে। সাধারণভাবে একটু বলা যায় যে, গাছপালা তরু-লতা গুল্ম ইত্যাদিতে যে শক্তি লুকিয়ে আছে, বাষ্পীভূত জিনিসে যে শক্তি আছে বায়ুর প্রবাহে যে শক্তি আছে তার সবটুকুই সূর্যের দান। সূর্য পৃথিবীর শক্তি সংগ্রহের মূল উৎস।

শক্তির উৎসগুলোর মোটামুটি একটা ধারণা আমরা পেয়েছি। জ্বালানী হিসেবে যেটা সোজাসুজি কাজে লাগান যায় আর যা দিয়ে অন্যান্য কাজ সম্ভব এমন সম্পদ যথা কয়লা, পেট্রল ও গ্যাস আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে প্রয়োজনের তুলনায় ঢের ঘাটতি রয়েছে। ব্যবহারিক জীবনের মান কতটা উন্নত তা শক্তির খরচ হিসেব করে পাওয়া যায়। যে দেশে

বিদ্যুৎ যত বেশী ব্যবহার হচ্ছে সে দেশ তত উন্নত। মার্কিন মুলুক, রুশ, ব্রিটেন, সুইডেন, জাপান, ফ্রান্স এগুলো দেশের নাম করা যায়। বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানোতে শুধু বাইরের ঔজ্জ্বল্য যে বাড়ে তা নয়, বরং ব্যবহারিক নয় যে জগত সেখানেও প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়া যায়। জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন ও তৃষ্ণা দুটাই জেগে উঠে। জ্ঞানই আত্মার সম্পদ, হৃদয়বৃত্তির আলো। যেগুলো দেশের নাম উল্লেখ করেছি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ওরা যে কতটা এগিয়েছে তা আমি আপনি সকলেই জানি। আমাদের দেশে সন্ধ্যা লাগলেই আদিম আঁধারে ঢাকা পড়ে লোকালয়, জনপদ আর রাস্তাঘাট। আমাদের মনের অর্গলবদ্ধ ঘরে এখনও জ্বলেনি আলোর রেখা। সেই কবেকার রেড়ির তেলের পিদিম ঝড়ের দিনে নিভে যায় কিংবা জ্বালিয়ে যায় ঘর-বাড়ি। একারণেই হয়ত ঝড়টা বেশি হয়। আমরা তা'হলে কী করতে পারি? আমাদের কয়লা না থাকলেও কিছু কিছু গ্যাস আছে। গ্যাস ফিল্ডের সন্ধান ব্যাপকভাবে করা উচিত। গ্যাস পুড়িয়ে আমরা কারখানা চালু রাখতে পারব। আরও বহু কাজ করা যাবে যার কিছু কিছু আমি আশা করব এ লেখাটা যারা পড়ছেন তাঁরা জানেন। আমাদের দেশে জল সম্পদ আছে প্রচুর।

পূর্ব পাকিস্তানে নদীগুলোতে বাঁধ দিয়ে স্রোতের গতি বাড়িয়ে, পাড়ে পাড়ে বিরাট স্থায়ী জলাশয় তৈরি করে– যা থেকে গ্রীষ্মকালে জলের তোড় সমান রাখা যাবে– প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ আমরা তৈরি করতে পারি। পয়সা থাকলেও এমনভাবে ব্যয়ের ইচ্ছা আমাদের কম আছে। তাই...। উপকূলবর্তী অঞ্চলে মৌসুমী বাতাস, সমুদ্র বায়ু ও স্থল বায়ু কাজে লাগান যায়। সৌরশক্তিকেও আমরা আয়ত্ব করতে পারি। যদিও বর্ষার সময় এটা বেশ বন্ধ থাকবে তথাপি বছরের বেশির ভাগ সময় একে দিয়ে সুন্দর কাজ সম্ভব। ভাতরান্না, রেডিও বাজান ইত্যাদি খাতে জ্বালানীর খরচ তখন প্রচুর কমবে।

দেশে আণবিক শক্তি কমিশন আছে। এই সংস্থা দেশের দুই পাখায় দুইটা আণবিক চুল্লী স্থাপনের কাজে হাত দিয়েছেন। একটা করাচীতে (১৩২ মেগাওয়াট) ও একটা ঈশ্বরদীতে (৫০ মেগাওয়াট)। বালুচিস্তানের পার্বত্য প্রদেশে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম আছে। এই ইউরোনিয়ামকে চুল্লীতে পোড়ানর আগে Process করে নিতে হবে। এক ধরনের ইউরেনিয়াম আছে যা সোজাসুজি আণবিক চুল্লীতে ব্যবহার করা যায়। শক্তি সংগ্রহের দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান বড় পেছনে। তাই কেন যে বড়োসড়ো একটা কিংবা একাধিক চুল্লী এখানে স্থাপন করা হচ্ছে না, সেটা বুঝে উঠা দায়। আরও সুবিধা এই যে, আণবিক চুল্লী যত বড় হবে তুলনামূলক নির্মাণ ব্যয়, তথা উৎপন্ন বিদ্যুতের দামও তত কম হবে। মার্কিন মুলুকের 'ওকরিজ' ন্যাশনাল লেবারেটরীজ-এর ডিরেক্টর ডঃ ওয়েনবার্গ মহোদয় একথাটা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিদ্যা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এক বক্তৃতায়) বিশদভাবে আলোচনা করেন।

এর চেয়েও বড় প্রয়োজন উপযুক্ত মানুষের। পরিবার পরিকল্পনার কোন কথা বলছি না। আমি বোঝাতে চাচ্ছি সেই সমস্ত মানুষ, যারা আমাদের দেশের আণবিক শক্তিকে সহজলভ্য করে তুলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে নতুন নতুন সম্পদ দান করবেন। কেমন করে সাগর জল থেকে ইউরেনিয়াম লবণ পাওয়া সম্ভব, কেমন করে শুদ্ধ জল থেকে ভারী হাইড্রোজেন পাওয়া সম্ভব? এসব সমস্যার সমাধানকল্পে বহু বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞজন মাথা ঘামাচ্ছেন। আমরাও এক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারি। এতে যে শুধু নিজের দেশের শক্তির চাহিদা মিটবে তা নয়, বরং সারা বিশ্বের মহৎ উপকার হবে। এটা মানব সভ্যতা রক্ষায় সঞ্জীবনী রস হিসেবে বিবেচিত হবে। দেশে তাই পদার্থবিদ্যার, রসায়নের– বিশেষ করে আণবিক ক্ষেত্রে বিশদ গবেষণামূলক কাজের সময় এসেছে। আণবিক শক্তি কমিশন ঢাকায় একটা শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের এতে খুব উপকারই হবে। গবেষণার কাজ দ্রুত ও বেশি পরিমাণে চললে নিশ্চয়ই অভীষ্ট বস্তু দিল্লী দূর অস্ত হবে না।

৩

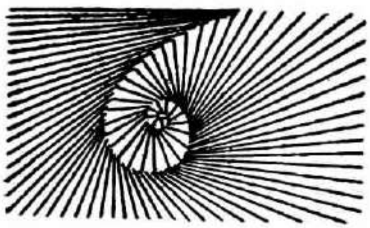

বিজ্ঞান-গুরুদের মূল থেকে [জানুয়ারি ১৯৬৫]

রেডিয়ামের আবিষ্কার

মারিকুরী (১৮৬৭-১৯৩৪)

[বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মহিলা বিজ্ঞানী মারিকুরীর নাম সুপরিচিত। রেডিয়াম আবিষ্কার করে তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মহিলাদের মধ্যে এই পুরস্কার সর্বপ্রথম তিনিই পান।]

রেডিয়াম ও তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে অনেক কথাই আমি বলতে পারি। কিন্তু তা বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। আমি বরং রেডিয়ামের উপর আমার প্রথম দিককার গবেষণাগুলো সম্পর্কে দু'একটা কথা বলি। রেডিয়াম এখন আর সেই শিশুটি নেই। বিশ বছর হল এর আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু এমন কতগুলো বিশেষ পরিবেশে এর আবিষ্কার হয়েছে যার জন্য এর সম্পর্কে আলোচনায় এখনো সবাই আগ্রহী হয়।

১৮৯৭ সনের কথা। প্রফেসর কুরী ও আমি সে সময় "স্কুল অফ ফিজিক্স এণ্ড কেমিষ্ট্রীর" পরীক্ষাগারে কাজ করতাম। প্রফেসর কুরী ওখানেই শিক্ষকতা করতেন। দু'বছর আগে প্রফেসর বেক্যুয়েরেল যে ইউরেনিয়াম রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন আমি তার উপর গবেষণারত ছিলাম। এই ইউরেনিয়াম রশ্মি কি করে ধরা পড়ে তা বলছি। ফটোগ্রাফিক প্লেট নিয়ে তাকে কালো কাগজে মুড়ে সাধারণ আলো থেকে দূরে যদি ইউরেনিয়ামের সাথে একে রাখেন, পর দিন একে ডেভেলপ করলে দেখবেন যেখানটায় ইউরেনিয়াম সল্ট ছিল সেখানে কালো দাগ পড়ে গেছে। এ দাগটা সৃষ্টি হয়েছে ইউরেনিয়াম রশ্মির ফলে, যা সাধারণ অলোর মতই ফটোগ্রাফিক প্লেটে সাড়া জাগাতে পারে। একটা ইলেকট্রোস্কোপের উপর রেখে আপনি অন্যভাবেও এর অস্তিত্ব বুঝতে পারেন।

প্রথম কিছুদিন আমি ইউরেনিয়াম রশ্মির ভাল মাপজোপ করার উপায় উদ্ভাবনে কাটালাম। তারপর দেখলাম এছাড়া অন্য কোন জিনিস থেকেও এ রকম রশ্মি বের হয় কিনা। এ উদ্দেশ্যে আমি যত মৌলিক পদার্থ জানা আছে তাদের সৃষ্ট বিভিন্ন সল্ট নিয়ে পরীক্ষাকার্য চালালাম। দেখলাম ইউরেনিয়াম আর থোরিয়ামের সবগুলো যৌগিক পদার্থেরই এই রশ্মি বিচ্ছুরণের ক্ষমতা আছে। কিন্তু বাকী কোন পদার্থেই আমি এ গুণ খুঁজে পেলাম না। ইউরেনিয়াম আর থোরিয়াম আছে এ ধরনের যৌগিক পদার্থগুলোর ক্ষেত্রে দেখলাম যে এর বিচ্ছুরণ ক্ষমতা নির্ভর করে এর মধ্যেকার ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামের পরিমাণের উপর। যত বেশী ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম থাকবে বিচ্ছুরণও তত বেশী হবে। এই বিচ্ছুরণ ক্ষমতাটা এই মৌলিক পদার্থ দুটির পারমাণবিক গুণ।

এরপর আমি বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ নিয়ে মাপজোপ শুরু করে দিলাম। দেখলাম এদের কয়েকটার মধ্যে ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম অথবা উভয়টাই থাকার দরুন এদের বিচ্ছুরণ ক্ষমতা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিচ্ছুরণটা হল আশাতীত রকমের বেশী। ঠিক যেমনটি শুধু এই দু'টা পদার্থের তৈরি হলেই সম্ভব। তখন মনে হল যে এসব খনিজে হয়ত এমন কোন জিনিস আছে যার বিচ্ছুরণ ক্ষমতা ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামের চাইতে অনেক বেশী। সেই বিশেষ

জিনিসটাকে আমি বের করে নিতে চাইলাম। এই উদ্দেশ্যে প্রফেসর কুরীর সাথে একযোগে কাজ আরম্ভ করলাম। আমরা ভেবেছিলাম এটা করতে কয়েক সপ্তাহ কি বড়জোর কয়েকমাস লাগবে। কিন্তু কার্যতঃ তা হল না। এ কাজ শেষ করতে অনেক বছরের কঠিন পরিশ্রম দরকার হয়েছে। আসলে এতে শুধু একটাই নতুন পদার্থ ছিল না, বেশ কয়েকটাই ছিল। কিন্তু রেডিয়ামই হলো এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একে বিশুদ্ধরূপে বের করে আনা সম্ভব।

বিচ্ছিন্নকরণের কাজটায় এক ধরনের ইলেকট্রোস্কোপের সাহায্যে আমরা বৈদ্যুতিক মাপজোপের সাহায্য নিয়েছিলাম। রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত পদার্থগুলোর বিচ্ছুরণ ক্ষমতা আমরা পরীক্ষা করে দেখি। প্রাপ্ত যে সব জিনিসে এই তেজস্ক্রিয়তা থাকত, ধরে নিতাম যে তার মধ্যে নতুন পদার্থগুলো আছে। এদের কোন কোনটার তেজস্ক্রিয়তা ছিল খুবই বেশী। বুঝতে পারলাম যে নতুন পদার্থকে ঘনীভূত আকারে পেতে আমরা সমর্থ হয়েছি, ঠিক যেমন করে বর্ণালী বিচ্ছুরণের পরীক্ষাগুলো চালানো হয়, তেমনিভাবে তেজস্ক্রিয়তাকে নিয়ে আমরা পরীক্ষা চালিয়ে গেলাম।

মুশকিল হল খনিজগুলোতে রেডিয়ামের ভাগ থাকে খুবই অল্প। শুরুতে এটা আমরা জানতাম না। কিন্তু এখন জানতে পেরেছি যে খুব ভালো খনিজেও দশলাখ ভাগের মধ্যে এক ভাগ রেডিয়াম থাকে কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই সামান্য এতটুকু বিশুদ্ধ রেডিয়াম পেতেও বিপুল পরিমাণ খনিজ নিয়ে কাজ করে যেতে হয়। গবেষণাগারে এটা বেশ মুশকিলের ব্যাপারই বটে।

সে সময় আমাদের ভাল একটা গবেষণাগারও ছিল না। এমন একটা হ্যাঙ্গারে আমরা কাজ করতাম কোন ভাল বন্দোবস্তই যেখানে ছিল না। কাজেই কাজ এগুতে বেশ অসুবিধাই হচ্ছিল। অসংখ্য দরকারী কৃষ্টালাইজেশনের কাজ আমাকে নিজেকেই করে নিতে হয়েছে। খনিজ আকর থেকে যে বোরিয়াম সল্ট বের করি তার থেকে রেডিয়াম সল্ট পেতে হলে এসব করতে হয়। অবশেষে ১৯০২ সালে আমি বিশুদ্ধ রেডিয়াম ক্লোরাইড বের করে নিতে সক্ষম হই। এর 'এটমিক ওয়েট' বের করে দেখলাম সেটা হল ২২৬ যে ক্ষেত্রে রেডিয়ামের এটমিক ওয়েট মাত্র ১৩৭।

...চিকিৎসাক্ষেত্রে রেডিয়ামের ব্যবহারের ফলে বিপুল পরিমাণ রেডিয়ামের প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল। প্রথমে ফ্রান্সে ও পরে আমেরিকায় এই উদ্দেশ্যে বড় বড় কারখানা চালু হয়েছে। যদিও আমেরিকায় প্রতি বছর বহু গ্রাম করে রেডিয়াম উৎপন্ন হচ্ছে তবুও এর দাম এখনো অত্যন্ত বেশী। এর কারণ খনিজ আকরের মধ্যে এর স্বল্পতা। এখন রেডিয়ামের দাম সোনার চেয়ে এক লক্ষগুণ বেশী।

এখন আমাদের ভুললে চলবে না যে যখন রেডিয়াম আবিষ্কার হয়েছিল তখন হাসপাতালে এর ব্যবহারের কথা কেউ চিন্তা করেনি। এটা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেরই একটি পরীক্ষা। এটা প্রমাণ করেছে যে বিজ্ঞানের গবেষণাগুলো কোন বিশেষ সরাসরি উপকারের দৃষ্টি ভঙ্গিতে না নিয়ে শুদ্ধ গবেষণার খাতিরেই গবেষণা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তা করলে কোনদিন রেডিয়ামের মত এটা মানুষের উপকারেও লেগে যেতে পারে।

ঙ

অঙ্কের জাদুকর রামানুজম

[ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫]

ইফতিখার গণি চৌধুরী

শ্রীনিবাস রামানুজম খুব অল্প সংখ্যক মানুষের কাছেই পরিচিত। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ তিনি এমন একজন গণিতবিদ ছিলেন, যার চিন্তার রাজ্যে শুধু প্রথম শ্রেণীর গণিতবিদরাই প্রবেশ করতে পারতেন। গাণিতিক চিন্তাধারায় তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে আশ্চর্য হলেও সত্য যে তিনি প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁর সব মৌলিক আবিষ্কারের ভিত্তি Car রচিত *Synopsis of pure mathematics* বইটা। উচ্চতর গণিতের সাথে রামানুজমের পরিচয় এই বইয়ের মারফতেই। তাছাড়া রামানুজম একজন বিশেষ ধরনের গণিতবিদ। তাঁর প্রতিভা Gauss কিংবা Poincre-এর মত বিভিন্নমুখী ছিল না। তাঁর পরিসর ছিল সংখ্যার বিভিন্ন জটিল ও বিচিত্র অলিগলিতে সীমাবদ্ধ। সংখ্যার সাথেই ছিল তাঁর মিতালী। ওগুলোর সাধারণ সারিতেই তিনি খুঁজে বের করতেন নানা গুণ, মিল ও সামাঞ্জস্য যা বড়বড় গণিতবিদদের চোখ গিয়েছে এড়িয়ে।

মাদ্রাজের তান্জোর জেলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে রামানুজমের জন্ম হয়। বাবা ছিলেন কাপড়ের দোকানের হিসাবরক্ষক। রামানুজম হলো দেবী নমগিরির বরপুত্র নানার প্রার্থনার উত্তর স্বরূপ। বিয়ের অনেকদিন পরে যখন সন্তান হল না, রামানুজমের নানা মানত করেন দেবী নমগিরির কাছে। প্রায় সাথে সাথেই, তাঁর জন্ম হয়, ১৮৮৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর দিনটিতে।

ছোটবেলা থেকেই রামানুজম মেধাবী ছিলেন। তাঁর প্রতিভা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বভাবতই তিনি ছিলেন শান্ত, চিন্তাশীল। তাঁর খেলার বস্তু ছিল নানা ধরনের গাণিতিক সূত্র। সংস্কৃত ধাতুর সম্পূর্ণ তালিকা তিনি মুখস্ত বলতে পারতেন। বন্ধুদের ফরমাস মত দুইয়ের বর্গমূল দশমিকের কোন স্থান পর্যন্ত বলেও ক্লান্ত হতেন না।

পনোর বৎসর বয়সে Car-এর *Synopsis of mathematics* তাঁর হাতে আসে। গণিতের এক বিস্ময়কর জগত খুলে যায়।

রামানুজম বলতেন, তাঁর অনেকগুলো সূত্রই স্বপ্নপ্রাপ্ত। নমক্করের দেবী প্রায়ই তাঁকে নানা ধরনের সূত্র স্বপ্নে দেখাতেন। সত্যিই দেখা গিয়েছে যে ঘুম থেকে জেগে তিনি প্রায়ই নানা অঙ্কের সমাধান চট করে লিখে দিতেন, যার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ তিনি দিতে পারতেন না। তাঁর সারা জীবনে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

ষোল বছর বয়সে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে তিনি কুম্বকোনাম সরকারী কলেজে ভর্তি হন। তিনি ইংরেজীতে খুবই কাঁচা ছিলেন, আর তার জন্য কোন মাথা ব্যথাই ছিল না তাঁর। কারণ অতি সহজ—ভালো লাগত না। ফলে পরবর্তী পরীক্ষায় ফেল করে বৃত্তি হারাতে হয়। কুম্বকোনাম ছেড়ে মাদ্রাজে চলে আসেন তিনি। এখানে আর একবার পরীক্ষা দেন। কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে, শিক্ষা জীবনের ইতি টানেন।

১৯০৯ সালে বিয়ে করেন রামানুজম। ফলে সংসারী হওয়াটা খুব জরুরী হয়ে পড়ে। অনেক কষ্টে চাকরীর জন্যে, মাদ্রাজ হতে ৮০ মাইল দূরবর্তী নেলোরের কালেক্টর রায়বাহাদুর রামচন্দ্র রাওয়ের নামে এক সুপারিশ পত্র যোগাড়

করেন। রামচন্দ্র রাও ছিলেন গণিতের এক বিরাট অনুরাগী লোক। ইতিমধ্যেই তিনি রামানুজমের মোটা খাতাটার অংকগুলো পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রামচন্দ্র রাও রামানুজমের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলেছেন,

"অনেক বছর আগে, গণিত বিষয়ে অজ্ঞ আমার এক ভাইপো এসে আমাকে বলে, 'চাচা, একজন অতিথি এসেছেন, যিনি খালি গণিতের কথাই বলছেন। আমি কিছুই বুঝি না। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?' রামানুজমকে দেখা করার অনুমতি দেই আমি। একজন বেঁটে, সহিষ্ণু ও অপরিচ্ছন্ন লোক ঘরে ঢোকে। বগলে তার এক মলিন নোট খাতা, কিন্তু চোখগুলো খুব উজ্জ্বল।"

"তিনি খুব গরীব ছিলেন। অবসর সময়ে গণিতচর্চা করার জন্যই তিনি কুম্বকোনাম হতে মাদ্রাজে পালিয়ে এসেছেন। সম্মানের জন্য কাংগাল ছিলেন না তিনি। অবসরটুকু ছিল তাঁর কাম্য। এটুকু তাঁকে দিতেই হবে— দিতে হবে নিজের স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকার স্বাধীনতা।"

"খাতা খুলে রামানুজম আমাকে তাঁর সূত্রগুলো বোঝাতে শুরু করেন। সেগুলো ছিল গতানুগতিকতার বাইরে। তবুও বিদ্যার স্বল্পতার ফলে ওগুলো মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁকে আমি পরে দেখা করতে বলি। তিনি আসেন। আমার জ্ঞানের সীমা বুঝতে পেরে এবার কতগুলো সহজ সূত্র দেখান। আমার কোন সন্দেহ থাকে না, তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে ক্রমে তাঁর *Divergent series*-এর (তখনও অপ্রকাশিত) সাথে আমার পরিচয় ঘটে। রামানুজমের কামনা ছিল বাঁচার জন্য এক সাধারণ অবলম্বন, যাতে করে গবেষণার ব্যাঘাত না ঘটে।"

কিছুকাল রামচন্দ্র রাও রামানুজমের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। এদিকে রামানুজমও বৃত্তির জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন অথচ পরের পয়সায় চলেন, এটাও তাঁর পছন্দ নয়। ফলে তিনি মাদ্রাজে পোর্টট্রাস্ট অফিসে এক সাধারণ চাকরী নিতে বাধ্য হন।

কিন্তু গণিত ছিল তাঁর সব সময়ের বন্ধু। রামানুজমের লেখাগুলো আরো আস্তে ভারতীয় গাণিতিক সমিতির জার্নালে প্রকাশ পেতে থাকে। এদিকে রামচন্দ্র রাও চেষ্টা করতে থাকেন রামানুজমকে স্বীকৃতি পাইয়ে দেয়ার জন্য। কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর অনুরোধে ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক হার্ডি সাহেবের কাছে রামানুজম ১৯১০ সালে এক চিঠি দেন। এক বন্ধু চিঠিটা ইংরেজীতে লিখে দেন। রামানুজম লিখেছিলেন,

মহাশয়,

অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে আমি মাদ্রাজ পোর্টট্রাস্ট অফিসে হিসাব বিভাগে বাৎসরিক ২০ পাউণ্ড বেতনের একজন কেরাণী। আমার ২৩ বৎসর। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি নাই, তবে স্কুলের সাধারণ বিদ্যা আমার আছে। স্কুল ত্যাগের পর হইতে অবসর সময়ে গণিত চর্চা করিয়া কাটাইয়া থাকি প্রচলিত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারা অনুযায়ী আমি পড়ি নাই। তবে নিজের চেষ্টায় খুঁজিয়া লইবার চেষ্টায় আছি। *Divergent series* সম্বন্ধে আমি বিশেষ গবেষণা করিয়াছি। স্থানীয় গাণিতিকরা উহাকে 'বিস্ময়কর' অভিহিত করিয়াছেন।

আমার অনুরোধ, আপনি সংলগ্ন রচনাগুলো পড়িবেন। উহার মধ্যে যদি কিছু মূল্যবান থাকে, আমার প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। আমি অনভিজ্ঞ। আপনার যে কোন উপদেশ আমার কাম্য। আপনাকে এই কষ্ট দিবার জন্য লজ্জিত।

বিনীত
শ্রী নিবাস রামানুজম

চিঠির মধ্যে ১২০টা সূত্র ছিল

একজন অপরিচিত হিন্দু কেরাণীর এই চিঠি হার্ডি সাহেবকে বিস্মিত করে। তিনি ওগুলোর মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর গণিতবিদের সন্ধান পান। সূত্রগুলো ছিল নিখুঁত। এতে তিনি লেখকের সৃজনশীলতার পরিচয় পান। কারণ বিখ্যাত গণিতবিদদের সংখ্যা খুব নিপুণ চোর কিংবা প্রতারকের চাইতে কম নয়।

অনেক ক্ষেত্রে রামানুজম যে রকম নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, ভুলের সংখ্যাও তার চাইতে কম ছিল না। গণিত সম্পর্কে রামানুজমের জ্ঞান খুব বিস্তৃত ছিল না। কোন বিদেশী বই তিনি পড়েন নি, এমন কি প্রয়োজনীয় ইংরেজী জ্ঞানটুকুও তাঁর ছিল না। তবুও আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে, রামানুজম ঐ সব সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতেন, যার সমাধান করতে যেয়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছিল, যার এখনও কোন সমাধান হয়নি।

১৯১৩ সালে বন্ধুদের সহায়তায় রামানুজম এক বিশেষ বৃত্তি পান। হার্ডি সাহেব নিজেই Cambridge-এ ভর্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বেঁকে বসলেন রামানুজম। কারণ হল, সম্প্রদায়গত কুসংস্কার ও মায়ের অসম্মতি।

অপ্রত্যাশিতভাবেই রামানুজমের যাওয়া ঘটল। এক রাতে রামানুজমের মা স্বপ্নে দেখলেন, ছেলে তাঁর এক বিরাট হলঘরে একদল শ্বেতাংগের মাঝে বসে আছেন। আর দেবী নমগিরি তাঁকে আদেশ করছেন, ছেলের উন্নতির পথে বাধা না দিতে।

রামানুজম মাদ্রাজ হতে পাওয়া ২৫০ পাউণ্ডের বৃত্তির ৫০ পাউণ্ড সংসারে খরচের জন্য পাঠাতেন। এ'ছাড়া ট্রিনিটি হতে তিনি ৬০ পাউণ্ড করে এলাউন্স পেতেন।

রামানুজমকে আধুনিক গণিত পড়াতে যেয়ে হার্ডি সাহেব খুব বিপদে পড়েন। রামানুজমের জ্ঞানের সংকীর্ণতা ছিল তাঁর পারদর্শিতার মতই বিস্ময়কর। একদিকে গণিতের জটিলতম শাখায় তিনি নতুন দিকের অবতারণা করতেন, আবার সাধারণ জ্ঞানটুকুও কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁর ছিল না। এক দিকে তিনি *Cauchy's theorem*-এর নাম শুনেন নি, অন্যদিকে *Modular equation* তিনি করতে পারতেন, *Continued fraction*-এর উপর যে কোন গণিতবিদের চাইতে তাঁর দখল বেশি বই কম ছিল না। কিসের উপর গাণিতিক প্রমাণগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান তিনি রাখতেন না। শুদ্ধ অশুদ্ধ, নতুন পুরনো তাঁর সবগুলো সমাধান করা হয়েছে তালপাকানো যুক্তির সাহায্যে অনেক অনুমানের উপর ভিত্তি করে, যার কোন ধারাবাহিক বর্ণনা তিনি দিতে পারতেন না।

এরকম মানুষকে প্রথম থেকে হাতে ধরে গণিত শেখান অসম্ভব। হার্ডি সাহেব তা করেনও নি, পাছে এর ফলে রামানুজম নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন, বা ছিন্ন হয়ে পড়েন তাঁর গণিতের মায়াবী জগতের মোহ থেকে অথচ এমন সব জিনিস রয়ে গেছে যা জানাটা রামানুজমের পক্ষে খুব জরুরী। তাই অনেক কিছুই রামানুজমকে শেখাতে হয়, যদিও হার্ডি সাহেবের মতে তিনি যা শিখিয়েছেন তার চাইতে বেশি শিখেছেন।

সাহিত্যে রামানুজমের মোটেই উৎসাহ ছিল না। তবে দর্শন শাস্ত্রে আগ্রহী ছিলেন। ধর্মীয় বিধিনিষেধ সব সময় তিনি মেনে চলতেন, কিন্তু শুধু আচারেই। একবার তিনি হার্ডি সাহেবকে বলেন যে সব ধর্মই তাঁর কাছে একই রকম মনে হয়। তিনি নিরামিষ খেতেন। নিজের রান্নাটাও নিজেই করতেন। আর তাও রান্নার আলাদা পায়জামা পরে।

১৯১৭ সালে রামানুজম অসুস্থ হয়ে গরমের প্রথম দিকে নার্সিং হোমে ভর্তি হন। ওয়েলস, লণ্ডন, মেটলক প্রভৃতি জায়গার সেনাটোরিয়ামে অনেকদিন কাটাবার পর অসুখ ছাড়ে। এরপর তিনি রয়েল সোসাইটিতে নির্বাচিত হন। ফলে উৎসাহিত হয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। এসময়ই তাঁর অনেকগুলো বিখ্যাত সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৯১৯ সালে রামানুজম ভারতে ফিরে আসেন। তার পরের বছরই তিনি মারা যান।

হার্ডি সাহেব রামানুজমের মূল্যায়ন করতে যেয়ে বলেছেন "আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয়েছে রামানুজমের বিশেষ কোন গুণ ছিল কিনা, তাঁর পদ্ধতি কি অন্যান্য গণিতজ্ঞদের চাইতে ভিন্ন ছিল, তাঁর চিন্তাধারা কি সত্যই অসাধারণ ছিল? কোন স্থির নিশ্চয়তার সাথে আমি এর উত্তর দিতে পারব না। আমার বিশ্বাস, সব গণিতবিদই গোড়া থেকে একই পথে চিন্তা করেন; রামানুজম তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। অবশ্য, তিনি অসাধারণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। সংখ্যার জটিলতাগুলো তিনি রহস্যজনকভাবে মনে রাখতে পারতেন। *Littlewood*-এর মতে, প্রত্যেক সংখ্যা তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিল। মনে পড়ে, পাটনীতে তাঁর অসুখের সময় একবার দেখতে গিয়েছিলাম। আমি গিয়েছিলাম ১৮২৯ নম্বর ট্যাক্সিতে চড়ে। কথা প্রসঙ্গে বললাম সংখ্যাটা বড় নীরস, বোধ হয় কুলক্ষণ। রামানুজম বললেন, না। এটা ভারী মজার সংখ্যা। এটাই হীনতম সংখ্যা যাকে দুটো Cube-এর যোগফল হিসেবে দু' ভাবে প্রকাশ করা চলে। স্বভাবতই আমি জিজ্ঞেস করলাম, একইভাবে তিনি fourth power-এর উত্তর জানেন কিনা। এক মুহূর্ত চিন্তার পর তিনি বললেন ও রকম সংখ্যা তাঁর নজরে পড়ছে না। থাকলে প্রথম সংখ্যা নিশ্চয়ই খুব বড় হবে। তাঁর স্মরণশক্তি ও গণনার ক্ষমতা ছিল অবিশ্বাস্য। তবু তা অস্বাভাবিক বলা চলে না। দুটো সংখ্যার গুণ তিনি সাধারণ নিয়মেই করতেন খুব দ্রুততা ও নিপুণতার সাথে, তবে তা স্বভাবতই দ্রুত হিসাবে অভ্যস্ত একজন গণিতবিদের চাইতে তাড়াতাড়ি ও সূক্ষ্মভাবে নয়।"

তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, ধৈর্য্য, নিজের অনুমানে ভুল শুদ্ধ করার দ্রুত ক্ষমতা রামানুজমকে তাঁর ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে। তাকে Euler কিংবা Jacobi-র সাথে তুলনা করা চলে।

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, Analysis -এর প্রথমযুগের গণিতবিদদের তুলনায় এখনকার গণিতবিদদের পক্ষে নতুন কিছু আবিষ্কার করা অনেক বেশি দুরূহ। কথটা কিছু পরিমাণ সত্য। রামানুজমের আবিষ্কারের গুরুত্ব, গুণাগুণ ও ভবিষ্যত গণিতবিদদের উপর প্রভাব সম্বন্ধে নানা মতভেদ হতে পারে। এতে খুব বিরাট কিছুর সরলতা বা অবশ্যম্ভাবিতা নেই। তবে তাঁর একটা গুণ কেউ অস্বীকার করতে পারবে না– তা হল মৌলিকতা। অল্প বয়সে যদি ঠিক পথে চালিত হতেন তিনি আরও বড় গণিতজ্ঞ হতে পারতেন। আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করতেন যা নিঃসন্দেহে হত যুগান্তরকারী। তবে, তখন রামানুজম থাকার চাইতে একজন ইয়োরোপীয় প্রফেসরের ভাবই তাঁর মাঝে বেশি প্রকাশ পেত। লাভের চাইতে হয়ত ক্ষতিই হত বেশি।

তৃতীয় বিজ্ঞান মেলা প্রসঙ্গে

[মে-জুন, ১৯৬৫]

মুহম্মদ সালামত উল্লাহ

বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের চরম যুগ, আজ মানুষ মহাশূন্যে অভিযান করছে, তার প্রয়াস চালাচ্ছে চন্দ্র আর মংগল গ্রহে পৌঁছুতে। মানুষ আজ তার মাটির পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ থাকতে অনিচ্ছুক। তবু এ যুগেও পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ রয়েছে যারা বিজ্ঞানে অনুন্নত তাদের মাঝে সবার আগে পাকিস্তানের নাম করা যেতে পারে। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল পূর্ব পাকিস্তানী তথা পাকিস্তানীদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছিল না এবং নেই, কিন্তু আমাদের সে ধারণা আজ মিথ্যায় পর্যবসিত করেছেন পূর্ব পাকিস্তানের বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণকারী স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। শুধু তাই নয়, তিন দিবস ব্যাপী আয়োজিত এ বিজ্ঞান মেলায় সমাগত উৎসুক বিপুল সংখ্যক নর-নারী ও ছাত্র-ছাত্রীর ভীড় সত্যিই আমাদের সুনিশ্চিত সুন্দর ভবিষ্যতের নির্দেশ দেয়।

গত ২৬শে মার্চ শুক্রবার বিকেল ৪-৩০ মিনিটে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এ বিজ্ঞান মেলা ও বক্তৃতার আসর উদ্বোধন করেন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর এম, ও, গণি এবং বক্তৃতা করেন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পূর্ব পাকিস্তান বিজ্ঞান মেলার সভাপতি ডক্টর আবদুল মতিন চৌধুরী সমাগত বিপুল সংখ্যক দর্শকমণ্ডলীর আগ্রহ এবং অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি দেখে তিনি খুবই প্রীত হন। এবং এরাই যে দেশের প্রতিশ্রুতিশীল বৈজ্ঞানিক এতে তিনি সুনিশ্চিত মত পোষণ করেন।

তিনি বলেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি বৈজ্ঞানিক উন্নতির দ্বারাই সম্ভব আর বৈজ্ঞানিক উন্নতি দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উপর ন্যস্ত। সুতরাং তিনি সেই ভবিষ্যৎ নাগরিক এবং প্রতিশ্রুতিশীল বিজ্ঞানের ছাত্রদেরকে তথা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন যে, তারা যেন তাদের প্রচেষ্টা দ্বারা ভবিষ্যতের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে অনাগত ভবিষ্যতের যে কোন বৃহত্তর চ্যালেঞ্জ-এর মোকাবিলা করতে পারে। আর সে জন্য তারা যেন এখান থেকেই পূর্ণ সচেতনতার সাথে কাজ করে যায়। তিনি প্রদেশের আরও বহুসংখ্যক স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন করার জন্য সুপারিশ জানান। কেননা এ-ভাবেই আমাদের বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টির এক সবল ভিত্তি স্থাপিত হবে।

বক্তৃতা প্রসংগে ডা. গণি ঢাকায় এবং লাহোরে দু'টি বিজ্ঞান এবং কারিগরী যাদুঘর স্থাপনের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন।

বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রদেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক, পরিসংখ্যান, ভূ-তত্ত্ব, রসায়ন, পদার্থ, মৃৎবিজ্ঞান, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল ও বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগ, ঢাকার গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হাই স্কুল, ওয়েষ্ট এ্যাণ্ড হাই স্কুল, সেন্ট গ্রেগোরী হাই স্কুল, সেন্ট জোসেফ হাই স্কুল, অগ্রণী বিজ্ঞান সংঘ, নটরডাম কলেজ, শাহীন স্কুল, গভর্ণমেন্ট গালর্স ইন্সটিটিউট, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, আহমদ বাওয়ানী একাডেমী, নওয়াবপুর গভর্নমেন্ট

হাই স্কুল, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, পূর্ব পাকিস্তান কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, বগুড়া জিলা সেন্ট্রাল হাই স্কুল, রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা জিলা স্কুল, রংপুর জিলা স্কুল, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এ বয়সে বিজ্ঞানের যে সুনিপুণতা দেখিয়েছে তা সত্যিই অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এই মেলায় প্রদর্শিত তাদের তৈরি বিভিন্ন কল-কব্জা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রতি শুধু তাদের আগ্রহই নয়- সাফল্যের ছাপও প্রদর্শন করেছে।

এ ছাড়াও পূর্ব-পাকিস্তান কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি কলেজ, অডিও ভিসুয়াল শিক্ষা কেন্দ্র, মার্কিন প্রচার সংস্থা এবং অধুনা গঠিত বাংলা প্রচলন সমিতিও এতে অংশগ্রহণ করে।

বলা বাহুল্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগগুলোর মধ্যে মৃৎবিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞান এবং ভূগোল বিভাগই সবচাইতে কৃতিত্ব ও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ভূগোল বিভাগ নদীর বিভিন্ন গতির পরিবর্তন এবং তার ফলাফল খুব চমৎকারভাবে দেখিয়েছে। এ ছাড়া বায়ু-চালিত কল, কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রও অতি সুন্দর ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়েছেন। মৃৎবিজ্ঞানের ঝুমিং দেখানোও প্রাণবন্ত হয়েছে এবং প্রদেশের মাটির বিশেষত্ব এবং কোন্ মাটির কোন প্রয়োজনীয়তা তা সহজ ও সুন্দরভাবে ফসলের ফলন দেখিয়ে সুচারুরূপে বুঝিয়েছেন। তা ছাড়া এ বিভাগ চিনা মাটির বাসন তৈরি পদ্ধতিও দেখিয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রেডিও ট্রান্সমিসন টেলিভিশন এবং ফটো ইলেকট্রিক দেখানোও আকর্ষণীয় হয়েছিল।

তিন দিবস ব্যাপী বিজ্ঞান মেলায় ঐতিহ্যময় কার্জন হল এক নূতন রূপ ধারণ করে। তার আলোকসজ্জার অপরূপ দৃশ্য দর্শকমন হরণ করে– এ যেন লক্ষ তারার দেয়ালী যা বে-রসিককেও রসিক করে তোলে। বছরে এক বার যেন কার্জন হল সহস্রাধিক নর-নারীর কল-কাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল আর তার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছিল। প্রতিদিন সহস্রাধিক লোক ভিড় ঠেলে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে যেভাবে বিভিন্ন বিভাগের বিপণী পরিদর্শন করেছেন তাতে তাদের বিজ্ঞানের প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় এবং বিজ্ঞান পিপাসু, আর বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক বলে স্বীকৃতি দেয়।

বিজ্ঞান মেলার এই জাঁক-জমক ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের অবসান ঘটে ২০শে মার্চ, রোববার।

জেমস টেলরের ঢাকা বর্ণনা থেকে(১৮৪০) :

ঢাকায় তৈরী মসলিন সুতা সাধারণত ইংল্যান্ডে যন্ত্রে-কাটা সুতার চেয়ে বেশ মোলায়েম এবং সবারই জানা যে এই সুতোয় তৈরী বস্ত্রাদি অনেক বেশী টেকসই। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে একে একটি এলোমেলোভাবে পাকানো দড়ির মতো যার থেকে অনেক আঁশ বেরিয়ে থাকে এ রকম দেখায়। এই সূক্ষ্ম তন্তুর ব্যাস এক ইঞ্চির $\frac{১}{১০০০}$ থেকে $\frac{১}{১৫০০}$ ভাগ পর্যন্ত হয় এবং সুতা কিছুটা চ্যাপ্টা ও ফিতার আকৃতির। এই আকৃতির উপরই ঢাকাই মসলিনের স্বচ্ছতা নির্ভরশীল। এ সুতো আরো ঘনভাবে পাকানো হলে নাকি তা বৃটেনের সুতার মত অস্বচ্ছ হয়ে পড়তো। ..প্রতি তোলা সুতা ৭২০০ গজ দীর্ঘ যা সূক্ষ্মতায় অতুলনীয় অথচ টেকসই।

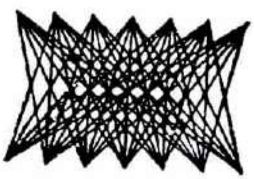

কম্পিউটার বিভ্রাট

[জুন-জুলাই ,'৬৬]

মইনুল আনাম

[অটোমেশন যা স্বয়ংক্রিয়তাটা আজকাল উন্নততর দেশগুলোতে যথেষ্ট আধিক্য ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। আমেরিকার মত দেশে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো কম্পিউটার বা যান্ত্রিক মস্তিষ্ক ছাড়া এক রকম অচল বল্লেই হয়। নানা ধরনের জটিল চিন্তাভাবনা থেকে শুরু করে চিঠিপত্র লেখালেখির কাজগুলো পর্যন্ত আজ যান্ত্রিক মস্তিষ্ক করে যাচ্ছে। এর ফলে একই সঙ্গে হাজার হাজার কাজ অভাবনীয় দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হতে পারে বটে কিন্তু অনেক সময় এতে দারুন বিভ্রাটের সৃষ্টি হয় যা মানুষের হাতে কখনো হতো না। এমন ক্ষেত্রে একমাত্র চিরন্তন মনুষ্য হস্তের হস্তক্ষেপই সমস্যার সমাধান করতে পারে। এমনি একটা বিভ্রাটের শিকার হয়েছিলেন আমেরিকার একজন গিন্নী। কোন এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর পত্রালাপ থেকেই সেটা স্পষ্ট হবে।]

বেগম সাহেবা, আগষ্ট ১৭

আমাদের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আপনার কাছ থেকে ২ ডলার ৯৮ সেণ্ট পাওনা আছি। ইতিমধ্যে যদি আপনি এটা শোধ করে থাকেন তবে দয়া করে এ চিঠিকে কোন গুরুত্ব দেবেন না।

বি. দ্র. এটা বিজনেস মেশিন কার্ড। দুমড়ানো বা মোচড়ানো নিষেধ।

জনাব, আগষ্ট ১৯

আপনার আমার কাছ থেকে কিছুই আর পাওনা নাই। ভুল বশতঃ আপনারা আমার নামের দু' অংশ ব্যবহার করে একই বিল দু'বার করেছিলেন। বিল শোধের সময় একটা নোটে সে কথা আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম। দয়া করে আপনাদের হিসেব পরীক্ষা করে দেখবেন।

বেগম সাহেবা, সেপ্টেম্বর ১৭

আমাদের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আপনার কাছ থেকে ২ ডলার ৯৮ সেণ্ট পাওনা আছি। দয়া করে ৩ ডলার ৪৯ সেণ্ট পাঠিয়ে দেবেন। বিলম্বের জন্য বাকী টাকাটা হেন্‌ড্‌লিং চার্জ হিসেবে ধরা হয়েছে।

বি. দ্র. এটা 'বিজনেস মেশিন কার্ড'। দুমড়ানো বা মোচড়ানো নিষেধ।

প্রিয় মেশিন, সেপ্টেম্বর ১৯

আপনি কিন্তু আমার চিঠির প্রতি মোটেই নজর দিচ্ছেন না! আপনারা আমার কাছ থেকে এক সেণ্টও পান না। একই বিল আমাকে দুবার করা হয়েছে। দয়া করে জিনিসটা খতিয়ে দেখুন।

বেগম সাহেবা, অক্টোবর ১৭

আমাদের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আপনার কাছ থেকে ৪ ডলার ১০ সেন্ট পাওনা আছি গত তিন মাস ধরে। (বিলম্বের জন্য এর সাথে হেন্ডলিং চার্জ যোগ করা হয়েছে)। এ ব্যাপারে আপনার আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ ছাড়া আপনার নূতন বিল ১৩ ডলার ৪৬ সেন্ট পরিশোধ করুন।

বিঃ দ্রঃ এটা 'বিজনেস মেশিন কার্ড'। দুমড়ানো বা মোচড়ানো নিষেধ।

প্রিয় মেশিন, অক্টোবর ১৯

আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন!! ভারী মজার ব্যাপার তো। মনোযোগ দিয়ে জেনে নিন। আপনার ভুল হয়েছে!!! আপনারা আমার কাছে ৪ ডলার ১০ সেন্ট পান না। নূতন যে ১৩ ডলার ৪৬ সেন্ট বিল করেছেন সেটাও ভুল। কিনেছেন আমার মা, বিল করা হয়েছে আমাকে! দয়া করে শিগ্ গির জিনিসটা শুধরে নিন।

বেগম সাহেবা, নভেম্বর ১৭

আমাদের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে গত চার মাস ধরে আমরা আপনার কাছ থেকে মোট ১৭ ডলার ৫৬ সেন্ট পাওনা আছি। এর সাথে হেণ্ডলিং চার্জ বাবদ আরো ডলার ৮৭ সেন্ট দিতে হবে।

দয়া করে দশদিনের মধ্যে টাকাটা শোধ করে দিন। নইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাপারটা আমাদের 'অডিট' বিভাগকে জানানো হবে।

বিঃ দ্র এটা 'বিজনেস মেশিন কার্ড'। দুমড়ানো বা মোচড়ানো নিষেধ।

প্রিয় কম্পিউটার চালক বা যে কোন মানুষ, নভেম্বর ১৯

আপনি কি দয়া করে এক মিনিটের জন্য আপনার মাথাটা কম্পিউটার মেশিন থেকে বের করে অধীনের চিঠিখানা পড়বেন? আপনারা আমার কাছ থেকে কিছুই পাননা এক সেন্টও না!!!

বেগম সাহেবা, ডিসেম্বর ১৭

আপনি কি আমাদের আগের হিসেব সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়ে ছিলেন? আমাদের রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে আপনি গত অগাষ্ট মাস থেকে আমাদের প্রাপ্য শোধ করছেন না। এ ব্যাপারে আরো কিছু জানতে হলে আপনি দয়া করে ৭-৯৬০১ নম্বরে ফোন করে মিস গিলবার্টের সাথে আলাপ করুন।

বিঃ দ্রঃ এটা 'বিজনেস মেশিন কার্ড'। দুমড়ানো বা মোচড়ানো নিষেধ।

'হ্যালো' ডিসেম্বর ১৮

"....কারভারস আশা করি আপনি আমাদের "ক্রীষ্টমাস সঙ্গীত" শুনে খুশি হয়েছেন। আমি কি আপনার কোন কাজে আসতে পারি?"

ঃ হ্যাঁ নিশ্চয়ই......আমার বিল........কি ব্যাপার?

ঃ আপনার বিল?

ঃ হ্যাঁ আমার বিল, এতে একটা ভুল..........

ঃ দয়া করে এক মিনিট অপেক্ষা করুন। সুপ্রভাত, একটি আনন্দোজ্জল ক্রীষ্টমাস কামনা করি। আপনি এখন একটি রেকর্ড করা কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন। আমাদের ফোনের সব কটা লাইন আপাততঃ ব্যস্ত আছে। আপনি যদি ধৈর্য ধরুন তবে একটি লাইন ফ্রি হওয়া মাত্রই আমাদের একজন অপারেটর আপনার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবেন। ততক্ষণ কারভারস আশা করে আপনি আমাদের ক্রীষ্টমাস সঙ্গীত শুনে খুশি হবেন।............"

প্রিয় মেশিন, ডিসেম্বর ২৬

আমি পর পর ১৮ই, ১৯শে, ২০শে, ২১শে, ২৩শে এবং ২৪শে তারিখ আপনাদেরকে ফোনে পাওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু রেকর্ড করা কণ্ঠ আর ক্রীষ্টমাস সঙ্গীত ছাড়া কোন সাড়া পাইনি। দয়া করে আমার ব্যাপারটা কোন মানুষের হাতে দেবেন কি?

বেগম সাহেবা, জানুয়ারি ১৭

আমাদের হিসেব-বিভাগ জানিয়েছে যে আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা পাওনা আছি। আমরা সব রকম উপায়েই আপনার সাথে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। তবে টাকাটা অনেকদিন ধরে পড়ে আছে। আশা করি এবার আপনি এটা শোধ করবেন।

আপনারই একান্ত
হেনরী, জে, হুপার, অডিটর

প্রিয় জনাব হুপার, জানুয়ারি ১৯

আপনারা মানুষ বেশি পুতুল বৈ নন! আমি গত সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখে যে ক'খানা চিঠি লিখেছি, তাতে পরিষ্কার করে জানিয়েছি যে আপনারা আমার কাছ থেকে কিছুই পান না। এদ্দিনে জিনিসটার ইতি হওয়া উচিত।

বেগম সাহেবা, ফেব্রুয়ারি ১৭

আমাদের মাইক্রোফিল্‌ম্‌ রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের বিলটা ভুল ছিল। আপনার কাছ থেকে আমাদের কোন পাওনা বাকী নেই।

আশা করি ভবিষ্যতে আপনার এ ধরনের অসুবিধা আর ঘটবে না। দোষটা আমাদেরই।

আপনারই একান্ত
হেনরী, জে, হুপার, অডিটর

প্রিয় জনাব হুপার, ফেব্রুয়ারি ১৯

ধন্যবাদ! আহ্‌ বাঁচালেন। ধন্যবাদ! অসংখ্য ধন্যবাদ!!

বেগম সাহেবা, মার্চ ১৭

আমাদের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আপনার কাছ থেকে ২ ডলার ৯৮ সেন্ট পাওনা আছি। এটা ভুলক্রমে এমন একটা একাউন্টে দেয়া হয়েছিল যার আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই দয়া করে এবার টাকাটা শোধ করবেন।

বিঃ দ্রঃ এটা বিজনেস মেশিন কার্ড। দুমড়ানো বা মোচড়ানো নিষেধ।

প্রিয় মেশিন, মার্চ ১৭

আমি হার মানলুম। সাথে ২ ডলার ৯৮ সেন্টের একটা চেক পাঠাচ্ছি। কেমন খুশি তো?

বেগম সাহেবা,

আমাদের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে আপনি আমাদের ২ ডলার ৯৮ সেন্ট বেশি দিয়ে দিয়েছেন। এই বাড়তি টাকাটা আপনার একাউন্টে জমা লিখে রাখছি।

বিঃ দ্রঃ এটা বিজনেস মেশিন কার্ড। দুমড়ানো বা মোচড়ানো নিষেধ।

[একটি বিদেশী পত্রিকা অবলম্বনে]

আপেক্ষিক তত্ত্বের এক অধ্যায়

[এপ্রিল -'৬৭]

মুসলেহ উদ্দীন

জড়প্রকৃতি কতগুলো নিয়মে চলে। এই নিয়মগুলো যুক্তিতর্ক এবং পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা বের করাই পদার্থবিদের কাজ। আর এ কাজের প্রধান বাধা হল মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তির ক্ষুদ্রতা বা অক্ষমতা। বিশ্বপ্রকৃতিতে এমন অনেক কিছু আছে যা মানুষ দেখে না, অনেক কিছু আছে শোনে না, অনেক কিছু আছে যা ছুঁয়েও স্পর্শ অনুভব করতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ আমাদের দর্শন ইন্দ্রিয়ের কথাই ধরা যাক। কোন পদার্থ থেকে আলো এসে আমাদের চোখের রেটিনায় আঘাত করলে আমরা পদার্থটি দেখতে পাই। তরঙ্গের দৈর্ঘভেদে আমরা বিভিন্ন রংএর আলো দেখি। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ রেটিনার সামর্থ্যের তুলনায় ছোট বা বড় হলে আমরা তা দেখতে পাই নে। লালেতর রশ্মি (infra red), অতি বেগুনী (ultraviolet) রশ্মি, রঞ্জনরশ্মি (x-ray) এবং আরো অনেক রশ্মি আমাদের রেটিনার আয়ত্তাধীন নয়। ক্যামেরায় বা ফটোগ্রাফের প্লেটে অবশ্য এদেরকে নানাভাবে ধরা যায়, কিন্তু মানুষের চোখে এরা কোনমতেই ধরা দেয় না। যদি দিত তাহলে এ জগতকে এখন যেমনটি দেখছি তেমনটি কোনমতেই দেখা যেত না। বিশ্বের রূপ সম্পূর্ণ বদলে যেত। তাই জড়জগতের যেটুকু আমরা দেখি দৃষ্টিশক্তির সঙ্কীর্ণ সীমার জন্য তা খুবই বিকৃত, অসম্পূর্ণ বা কমপক্ষে পরিবর্তিত। প্রকৃতপক্ষে কী আমরা জানি না। আমরা নিছক আমাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সাথে পরিচিত এবং এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ সত্যই যে সনাতন সত্য, আমরা যেমনটি দেখছি তেমনটিই যে ঘটছে এ ধারণা করা সঙ্গত নয়। কোনমতেই তাই বলতে পারি না আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভিত্তিতেই জগতের রূপ বা নিয়মগুলো তৈরি হয়েছে। বরং, জগতের অথবা পারিপার্শ্বিকের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের ইন্দ্রিয়ক্ষমতা জন্ম এবং বিকাশ লাভ করেছে এমন বলা চলে। এবং এভাবে বলাটাই যুক্তিসঙ্গত।

আমাদের আদি পুরুষগণ অর্থাৎ সাগর পারের প্রাথমিক ক্ষুদ্র জীবকোষগুলি যে কিছুই দেখতে পেত না, কিছুই শুনতে পেত না— সে কথা আমরা জানি। বিশ্বনিয়মগুলো অবশ্য সেদিনও ঠিক আজকের মত এমনিভাবেই চলছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের আদিপুরুষগণ তার কিছুই জানত না। রেডিও তরঙ্গকে ঠিকমত ট্রান্সমিট করানো গেলে সেদিনও যে টেলিভিশানে ছবি দেখা যেতো সেদিন এটা ধারণা করারও কোন কথা আসে না। তারা সাধ্যমাফিক প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করেছে এবং সাধনার জয় হয়েছে। মাথা ফুটে চোখ বেরিয়েছে, কান হয়েছে। তারা দেখতে পেয়েছে, শুনতে পেয়েছে, যত ক্ষুদ্রই হোক সে দৃষ্টিশক্তি আর যত ভোতাই হোক তাদের শ্রবণশক্তি। তাদের সাথে শুধুমাত্র একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রেখে আজ আমরা সেই একই সংগ্রহ করছি একই সত্যকে জয় করার চেষ্টায় আছি। পারমাণবিক ও নাক্ষত্রিক জগতের নানা সত্যাসত্য নিয়ে আলোচনা করছি। আপেক্ষিক তত্ত্ব কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার করছি। সেদিনের মত আজও আমরা শুধু বিশ্বকে দেখতে যাচ্ছি, সব জানতে চাচ্ছি, সব গলি– ঘুজি ঘুরতে চাচ্ছি। তবে আমরা সম্পূর্ণ নতুন করে অন্য চোখে দেখছি, এই মাত্র পার্থক্য।

আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকৃতির কোন সত্য উদঘাটন করেছে তা বলতে গেলে প্রথমেই শব্দটার মানে জানা দরকার। 'আপেক্ষিকের' (relative) শাব্দিক ও বৈজ্ঞানিক অর্থ প্রায় এক। যা কিছু অন্যের অপেক্ষায় চলে, নিজে এককভাবে

কোন অর্থ প্রকাশ করে না তাকেই আপেক্ষিক বলা চলে। 'সলিমুল্লাহ হল শহীদ সড়কের ডানে বা বায়ে অবস্থিত' বললে কিছুই বলা হয় না। ডান বা বাম এককভাবে কোন অর্থ প্রকাশ করে না, এর স্বাধীন কোন সত্ত্বা নেই। কিন্তু যদি বলা হয় পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে সলিমুল্লাহ হল শহীদ সড়কের ডানে পড়ে অথবা পশ্চিম থেকে পুর্বে যেতে বাঁয়ে পড়ে তাহলে সলিমুল্লাহ হলের অবস্থান সঠিকভাবে নির্দেশিত হয়। তাই, দিকের উল্লেখ না থাকলে ডান বা বাম শব্দদুটো সম্পূর্ণ অর্থহীন। ডান এবং বাম আপেক্ষিক ধারণা।

স্থানের আপেক্ষিকতার কথা বলতে গেলে দার্শনিক জন রকের একটা উপমার উল্লেখ করা দরকার। তিনি লিখেছেন— দাবার বোর্ডে রাজা-মন্ত্রী হাতি-ঘোড়া সবাই স্ব স্ব কোঠায় স্থির আছে। কিস্তিটাকে এখন এক রুম থেকে সরিয়ে আরেক রুমে নিয়ে গেলেও আমরা বলি গুটিগুলো নাড়ানো হয়নি, ওগুলো স্ব স্ব স্থানে আছে। আবার কিস্তিটা যদি কোন জাহাজের কেবিনের টেবিলের ওপর স্থির হয়ে থাকে তাহলে বলি কিস্তিটা একই জায়গায় আছে, একে সরানো হয়নি। জাহাজ কিন্তু ইতিমধ্যে সমুদ্রে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেছে। আবার, মনে করি জাহাজটা বন্দরে নোঙর করা আছে। তীরবর্তী যে কোন লোক বলবে জাহাজ স্থির দাড়িয়ে আছে যদিও পৃথিবী এর মধ্যে মহাশূন্যে অনেকখানি সরে গেছে। তবে দাবার গুটি, বোর্ড এবং জাহাজ কিছুই দূরবর্তী কোন গ্রহ নক্ষত্রের তুলনায় এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই, সবাই স্থান পরিবর্তন করে চলেছে।

জাহাজের কোন যাত্রী বলবে দাবার বোর্ড টেবিলের ওপর একই জায়গায় আছে। তীরবর্তী কোন লোক বলবে, ওটা দশ মিনিট আগে যেখানে ছিল, এখন সেখানে নেই। উত্তরে দক্ষিণে বা যে কোন দিকেই হোক পাঁচ বা দশ মাইল সরে গেছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কার উক্তি ঠিক? কোন বৈজ্ঞানিককে যদি পাঠানো হয় গবেষণা করে সঠিক তথ্যটা বের করার জন্যে তাহলে তিনি তীর থেকে বলবেন তীরবর্তী লোকের কথা ঠিক এবং জাহাজ থেকে বলবেন যাত্রীর কথা ঠিক। অর্থাৎ উভয়েই ঠিক। কিন্তু উক্তি দুটো পরস্পর বিরোধী। একজনের মতে একই জায়গায় অন্যজনের মতে বিভিন্ন জায়গায়। এই দুই পরস্পর বিরোধী উক্তিতে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে আমাদের বলতে হয় বিশ্বে যে কোন বস্তুর অবস্থিতি একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। বস্তুর অবস্থান নির্দেশ করলেই তা করতে হবে পারিপার্শ্বিক কোন নির্দিষ্ট কাঠামোর ওপর। জাহাজের কেবিনটাকে কাঠামো ধরলে দাবার বোর্ড একই জায়গায় আছে। এবং সমুদ্রকে কাঠামো ধরলে দাবার বোর্ড স্থান পরিবর্তন করেছে। 'একই জায়গায় আছে' অথবা একই জায়গায় নেই' ধারণাগুলো সম্পূর্ণভাবে তুলনা করার সেই কাঠামোর আপেক্ষিক।

স্থানের আপেক্ষিকতা (relativity of space) থেকে আরেকটি ধারণার উদ্ভব হয়। সেটা হল গতির আপেক্ষিকতা। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে দাবার বোর্ডটা স্থির না গতিশীল তাহলে সেটা হবে একটা অর্থহীন বোকার প্রশ্ন। সলিমুল্লাহ হল শহীদ সড়কের ডানে বা বাঁয়ে অবস্থিত বলার যেমন কোন মানে হয়না, বোর্ডটা শুধুমাত্র গতিশীল বা স্থির—এ উক্তিও কোন অর্থ প্রকাশ করে না। জাহাজের তুলনায় ওটা স্থির, কিন্তু সমুদ্র বা তীরের তুলনায় গতিশীল। স্থিতি এবং গতি এককভাবে কোন অর্থ প্রকাশ করে না। স্থির বললেই তা কিসের তুলনায় স্থির তার উল্লেখ করতে হবে। সাইকেলের সীটে আমি স্থিরভাবে বসে আছি, কিন্তু দুপাশের দালান বা লাইটপোস্টগুলোর তুলনায় হয়ত ঘণ্টায় পাঁচ বা দশ মাইল বেগে চলছি। একই বস্তু একই সময়ে বিভিন্ন কাঠামোর তুলনায় স্থির এবং গতিশীল। স্থিতি ও গতির ধারণা আপেক্ষিক।

সম্পাদকীয়

লক্ষ মানুষ কেন ভেসে যাবে?

[জানু-'৭১]

গত ১২ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে দশ লক্ষাধিক মানুষের অসহায় মৃত্যু আমাদের আজ সন্দিহান করে তুলেছে—আমরা কি সত্যিই বাস করছি বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পাদে, বৈজ্ঞানিক সাফল্যের অহঙ্কারে স্ফীত এই আধুনিক কালে, না, প্রস্তর যুগের অব্যয় অন্ধকারে?

আড়াই লক্ষাধিক মাইল দূরবর্তী চাঁদে মানুষের অবতরণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি টেলিভিশনের পর্দায়, চন্দ্র বিজয়ীদের সোল্লাস সম্বর্ধনা জানিয়েছি রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে, অভিনন্দন জানিয়েছি মানবেতিহাসে প্রথম হৃৎপিন্ড বদলকারী শৈল্য-চিকিৎসককে। কিন্তু, আমাদের জীবনে ফলবান হয়ে উঠলো না বিজ্ঞানের এই উদার আশীর্বাদ। ইতিহাসের অন্ধকার যুগের অসহায় মানুষগুলোর মতো পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃশব্দে প্রাণ দিল ঘূর্ণিঝড়ে, ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের আবর্তে। সারা উপকূল জুড়ে ছড়ানো মানুষের লক্ষ লক্ষ লাশ, ঘূর্ণিঝড়ের ফুৎকারে উড়ে যাওয়া সাধের জনপদ, আর বিধ্বস্ত সংসারের মর্মভেদী ছবি দেখে সুখী মানুষের চোখ বাষ্পাকুল হয়ে উঠেছে কিন্তু তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা পায়নি।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চার আবশ্যকতা সম্পর্কে গালভরা বাণী অহরহ শুনতে পাওয়া যায় সভায় আর সেমিনারে। গত ২৩ বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বেশ কয়েকটি কেন্দ্র মাথা তুলেছে এখানে ওখানে। এদেশের মানুষ বিজ্ঞানের সর্বশেষ বিজয়ের ফলে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত এ কথাও হয়ত বলা যাবে না। কিন্তু এদেশে বিজ্ঞানের চর্চা আর বিজ্ঞানের গবেষণায় যে সাধারণ মানুষের কল্যাণ চিন্তা সর্বাগ্রে নেই সে কথা অহরহ প্রমাণিত হলেও নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হল এবারের ঘূর্ণিঝড়ের সময়। বেতারে সামান্য বিপদ সঙ্কেত সঠিকভাবে দেয়া হয়নি বলে মৃত্যুর শিকার হল লক্ষ লক্ষ মানুষ। জলোচ্ছ্বাসের মুখে দাঁড়ানোর মত আশ্রয় তৈরি হয়নি বলে ভেসে গেল উপকূলের অসংখ্য অধিবাসী। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সুরম্য অট্টালিকা, স্ফীত বেতনের গবেষক, ভারী ওজনের বইপুস্তক দিয়ে তাহলে কি লাভ? বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এই যুগে দশ লক্ষ মানুষ যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হতে পারে তবে বিজ্ঞানের নামে জয়ধ্বনি তুলে কি লাভ?

অপরাধ বিজ্ঞানের নয়। ত্রুটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির। বিজ্ঞান সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে। বিজ্ঞান চর্চার লক্ষ্য মানব কল্যাণ নয়, বিজ্ঞানের গবেষণার উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে জয় করা নয়—আমাদের দেশে বিজ্ঞান অর্থার্জনের হাতিয়ার, চাকরী জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র মাত্র। মানুষের কল্যাণ যতদিন না আমাদের প্রধান ভাবনা হবে, যতদিন না অধিষ্ঠিত হবে চেতনার কেন্দ্রমূলে ততদিন বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের ব্যবধানও থাকবে দুস্তর হয়ে। মানুষ একদিন উপনিবেশ গড়ে তুলবে চাঁদে, পৌছাবে মঙ্গল গ্রহের মাটিতে, ভেদ করবে শুক্র গ্রহের রহস্যজাল কিন্তু অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে অসহায় মৃত্যুবরণ করতে থাকবে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ।

বাংলাদেশ ও গণমুখী বিজ্ঞান

[আগষ্ট-'৭২]

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

স্বাধীনতার মুহূর্তটিকে যদি আমরা দেশের সার্বিক প্রগতির জন্য একটা বৈপ্লবিক মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই, তা হলে খুব বড় একটা পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চেতনার ক্ষেত্রে। পুরনো ব্যবস্থার কোন রকম চুনকামই এই ক্ষেত্রে আমাদের ভয়ানক শূন্যতাকে ঢাকতে অক্ষম। আর সত্যি সত্যি যদি কিছু করতে হয়, তবে এই-ই তার সময়।

আমাদের দেশ বিজ্ঞানের উর্বর ক্ষেত্র কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর। বিশ্বখ্যাত কয়জন বিজ্ঞানী এদেশ থেকে বেরিয়েছেন, প্রতি বছর বিজ্ঞান গ্রাজুয়েটের সংখ্যা কি হারে বাড়ছে বা বিশ্বের বিজ্ঞান জার্ণালগুলোতে বাঙালী বিজ্ঞানীদের কয়টি মৌলিক অবদান স্থান পাচ্ছে, এর কোনটাকেই সামগ্রিক উর্বরতার মাপকাঠি হিসেবে নেয়া চলে না। বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার এক বিজ্ঞান শিক্ষক বন্ধুর লেখা থেকে একটু তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। তিনি লিখেছেন : "ইংরেজ আমলে শিক্ষার সৌখিন অনুষংগ হিসেবে যে বিজ্ঞান এদেশে আমদানী হয়েছিল, আজও সে বিজ্ঞান বিদ্যায়তন ও গবেষণাগারের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গণ্ডিতে লালিত। এদেশের উন্মুক্ত জলহাওয়ায় সে মুক্তি পায়নি, তার অভিযোজনও তাই অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞানের আশ্বাস এদেশে আজও মরুদ্যানের সবুজের মতই সীমিত, সংকীর্ণ ও ব্যাপক ঊষরতার বেষ্টনীতে ত্রস্ত।" এমনই একটা মরুদ্যানের সমস্ত অপ্রাসঙ্গিকতাকে তুচ্ছ করে কিছু ভাগ্যবান বিজ্ঞানের সফল ছাত্র হতে পারে বটে, কিন্তু আশে পাশের মরুভূমির পক্ষে তাতে বড় একটা কিছু আসে যায় না। এ অবস্থায় প্রাসঙ্গিকতার খোঁজে হয় সেই ছাত্র দেশের মায়া কাটায় অথবা নিজেকে একটা হতাশ গতানুগতিকতার মধ্যে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

একটু কাছে এসে দেখলে দেখব সমস্যাটি আমাদের সমাজের আর দশটা সমস্যার সাথে সম্পর্কহীন নয়, বরং মূলতঃ সমস্যা একই। এ সমাজের সব কিছুর মত আমাদের বিজ্ঞান জগতটাও অবিশ্বাস্য রকমের মাথাভারী। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ যে বহু কোটি জনতার হয়নি তাদেরকে প্রথমেই বাদ দিয়ে রাখতে হয়; কারণ শুধু বিজ্ঞান কেন, অক্ষর, কৃষ্টি বা শিক্ষার অন্য কোন আশীর্বাদই তাদের উপর বর্ষিত হয় না। যারা স্কুলে ঢুকল অতি অল্প বয়সে তাদের শতকরা সত্তর-আশিভাগকে জানিয়ে দেয়া হল যে, যেহেতু তারা অংকে আশানুরূপ ভাল করেনি বা যেহেতু ঐ স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়নি, সেহেতু পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞানের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক না রাখলেও চলবে। বাকীদের মধ্যে যারা ভাল ছাত্র হয়ে স্কুল কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগুলো শীগগির তারা জানলো যে পদার্থবিদ্যা মানেই হচ্ছে পরমাণু রহস্যের সমাধান করা বা জীববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রোটিনের আণবিক গঠনের উদ্‌ঘাটনটাই আসল কাজ। স্বভাবতঃই এ পরিস্থিতিতে বেশীর ভাগের পক্ষে বিজ্ঞান ডিগ্রীটা হস্তগত করে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়াই কাম্য হয়। যে জীবনে বিজ্ঞান জিনিসটা নেহাত অপ্রাসঙ্গিক। আর বাকী মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবানের জন্য এবং আন্তর্জাতিক দরবারে দেশের 'সুনামের' খাতিরে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগার, আণবিক শক্তি কেন্দ্র (এটমিক এনার্জি সেন্টার) ইত্যাদি কয়েকটা সুদর্শন বিজ্ঞান-মন্দিরে কিছু উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা হয়েছে। এ যেন সত্যিকার চোর ধরা দেখে বাচ্চাদের চোর চোর খেলার মত আমরাও এক নিষ্ঠুর বিজ্ঞান-বিজ্ঞান খেলায় ব্যস্ত আছি।

অথচ বিজ্ঞান মানে কি তাই? বৈজ্ঞানিক জগতে বাস করার মানে সার্বিক ও সার্বজনীন চিন্তার বিপ্লব ও কারিগরী বিপ্লব। বিজ্ঞানের বিশ্ব-সীমারেখা যেখানে জানা ও অজানার যুদ্ধটা চলছে সেটা এই বিপ্লবেরই ফলশ্রুতি, এর সাথে সম্পর্ক বিহীন কোন ঘটনা নয়। আজকের উন্নত দেশগুলো এ পথেই এগিয়েছে। কাজেই তারা দাবী করতে পারে এ বিজ্ঞান আমাদের বিজ্ঞান ও আমাদের জন্যে বিজ্ঞান। উদাহরণ স্বরূপ স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবে মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের যতখানি অবদান, মাঞ্চেষ্টারের কামার আর কারিগরদের অবদান তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। এর কারণ, বিজ্ঞান-চেতনা ও শিল্প-বিপ্লব সমগ্র সমাজকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে। তাই এখানে বাগানের মালী আর গবেষণাগারের উদ্ভিদবিদের মধ্যে তফাৎটা আপেক্ষিক, মৌলিক নয়। দু'জনেরই চেতনাটা ও উৎসাহটা মূলত বৈজ্ঞানিক। দু'জনের পক্ষেই বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সিক্ত হবার প্রবৃত্তি ও সুযোগ রয়েছে।

আমাদের দেশেও বিজ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত গবেষণাগার ও বিদ্যায়তনের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে বাড়িতে, ক্ষেতে, খামারে, কারখানায় ছড়িয়ে পড়তে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে না। এ পর্যন্ত সত্য অনুসন্ধানের বিশ্বব্যাপী দু'একজন স্বদেশবাসী প্রতিভাবানের অংশগ্রহণকেই আমরা দেশের বিজ্ঞান প্রচেষ্টা বলে চালিয়েছি। অথচ সত্য অনুসন্ধানের মত সত্য প্রতিষ্ঠাও বিজ্ঞানের একটি বড় কাজ। এতদিন আমরা এ কাজটির কাছে ধারেও যাইনি। ফলে মানুষের জয়যাত্রায় আমরা পিছিয়ে গিয়েছি সাংঘাতিকভাবে। এ অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে একমাত্র বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। পরিবর্তনটা আনতে হবে দুদিক থেকে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে আর দেশের যে সংখ্যাতীত জনতা স্কুল-কলেজের সুযোগ পায়নি, দ্রুত, ব্যাপক ও সত্যিকার গণশিক্ষার মাধ্যমে তাদের জীবিকা ও জীবনের চেহারা বদলিয়ে। দুটি বিষয়েই সম্ভাব্য কয়েকটি ব্যবস্থা সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে, দেশের প্রত্যেকটি ছেলে ও মেয়ে শহর, গ্রাম, পরিবার বা শ্রেণী নির্বিশেষে বিনা খরচে একটা স্কুলে গিয়ে সাত আটটি বছর (অন্ততঃ চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত) যেন সেখানে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করা। এরা মেধাবী হোক বা না হোক পরবর্তী জীবনে যে যাই করুক, এদের কাছ থেকে কোন রকম উৎপাদনমূলক শ্রম যেন পরিবার বা জাতির আশা করতে না হয়। যেহেতু এদের উপর ভিত্তি করে পুরো জাতি গড়ে উঠবে, সুতরাং এরাই পাবে সবচেয়ে বেশী যত্ন ও দৃষ্টি, আর দেশের সার্বিক বিজ্ঞান চেতনার ভিত্তিও হবে এরাই। সবচেয়ে বড় কথা, এদের শিক্ষাকে শুধু ভবিষ্যতে উচ্চতর শিক্ষার যাচাই ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করলে চলবে না। বরং এর মধ্যেই এমন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকবে, যা পরবর্তী জীবনে ছাত্ররা উচ্চতর একাডেমীক শিক্ষা গ্রহণ করুক বা না করুক উভয় ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে। এদের আগাগোড়া শিক্ষায় বিজ্ঞান চেতনা খুব বড় স্থান পাবে।

এই পর্যায়ের ছাত্রদের সবার বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি আছে কিনা বা প্রত্যেক স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার মত প্রয়োজনীয় অর্থ আছে কিনা, এ দুটো প্রশ্নই অবান্তর। প্রথমতঃ মনোবৃত্তির প্রশ্ন আসে বিশেষজ্ঞ তৈরির বেলায়। প্রগতিশীল যে কোন বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রত্যেক সদস্যেরই বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ স্কুল পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশ হাজার টাকা খরচে বহু কাচের আলমারী ভর্তি Griffin & George-এর তৈরি যন্ত্রপাতি সাজানো অত্যাবশ্যক নয় মোটেই। এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির আরো একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

বিজ্ঞান শিক্ষাকে খুব সহজেই "জীবন ও প্রকৃতির দিকে তাকাও" ও "নিজে করার চেষ্টা করো" এই ভিত্তিতে নেয়া সম্ভব। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রকৃতিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার জন্য তো আমাদের গ্রামীণ পরিবেশের চেয়ে উপযুক্ততর কোন পরিবেশ কল্পনা করা যায় না। তারপর ধরা যাক পদার্থবিদ্যার কথা। পদার্থবিদ্যার মূল বিষয়গুলো খুব সাধারণ, সব টুকিটাকি ও খুবই অল্প খরচের জিনিসপত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্ভব। এ ব্যাপারে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, "নিজে করার চেষ্টা করো।" শুধু এর মাধ্যমেই বিজ্ঞান শিক্ষাকে ছাত্রের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তোলা যেতে পারে। নিত্যকার শিক্ষার জন্য সেটা খুবই প্রয়োজনীয়। ফলতঃ বিজ্ঞানের যে সব সফল ছাত্র বিদেশে উচ্চতর গবেষণা করতে যায়, বিদেশী গবেষণাগারে ঢুকে প্রথম যে জিনিসটা তাদের ঘাবড়িয়ে দেয় তা হলো, যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক বস্তু তাদের নিজের হাতে তৈরি করতে হয়। ওয়ার্কশপ বস্তুটার সাথে আমাদের পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্রের সাক্ষাৎ ঘটে না সব পর্যায়েই ওটা তারা কামার ছুতোরের এলাকা মনে করে আসছে। আমরা ভুলে গিয়েছি যে এক টুকরা ধাতু, এক টুকরা কাঠ বা একখণ্ড কাঁচকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসে রূপ দেয়াটা শুধু প্রয়োজনই নয়, বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কথাটা মনে রেখে আমাদের প্রত্যেকটা স্কুলের ভেতর যেন এক একটা ক্ষুদে কামার, ছুতোর, glass-blower ও ইলেকট্রিশিয়ানের ওয়ার্কশপ গড়ে উঠে যেখানে ছাত্ররা বিজ্ঞানের মাধ্যমে পদার্থ ও প্রকৃতির সাথে নিজের প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তখন দেখা যাবে যে শুধু ছুরি, কাঁচি, সুতো, বল, চাকা, বেলুন, ড্রাইসেল, তার ইত্যাদি দিয়ে পদার্থবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার বহু রহস্য অর্থপূর্ণ করে তোলা যাচ্ছে নিজের হাতে

হাতেই। এই প্রসঙ্গে একটা জিনিসের কথা মনে পড়ল। বৃটেনের বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের জন্ম দিনে অথবা খ্রিস্টমাসে উপহার দেবার জন্য খুব অল্প খরচে একটা জিনিস পাওয়া যায়, নাম chemistry set। এর মধ্যে থাকে ছোট ছোট কয়েকটা কাচের নল, টেষ্ট টিউব ও ফ্লাস্ক যেগুলো যে কোন হাতুড়ে glass blower তৈরি করতে পারে যে কোন জায়গায়। আর থাকে লেবুর রস, সিরকা, লবণ ইত্যাদি জাতীয় খুবই নিরাপদ ও সাধারণ কয়টা জিনিস। নিজের কৌতূহল ও সাথের বইটাকে ভিত্তি করে যে কোন বাচ্চার কাছে এর মাধ্যমে রসায়ন বিদ্যাটা খুবই অর্থপূর্ণ ও চমকপ্রদ হয়ে উঠতে পারে। এরপরও হয়তো আমাদের স্কুলে কিছু তৈরি যন্ত্রপাতি দরকার হবে। যেগুলো আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দিকে খেয়াল রেখে দেশীয় সম্পদের ভিত্তিতে তৈরি করলে খরচের বোঝাটা মোটেই ভয়াবহ হয়ে উঠবে না।

এই স্কুল থেকে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে ছেলে মেয়েরা পরবর্তী জীবনের মোকাবেলা করবে। যারা আরো একাডেমিক শিক্ষার জন্য মনোবৃত্তি ও মেধার পরিচয় দেবে, তারা উচ্চতর স্কুল হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগুবে। এখানেও প্রত্যেক পর্যায়ে দৃষ্টিভঙ্গিটা হবে একই—গণমুখী ও দেশের প্রয়োজনের সাথে গাঁথা। তবে স্বাভাবিকভাবেই এরপর থেকে specialization ইত্যাদির প্রশ্ন উঠবে। বাকী যারা উচ্চতর একাডেমীক শিক্ষা নেবে না, তাদের জন্যও কিন্তু শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা এখানেই শেষ হবে না। তারাও নিজেদের পছন্দ ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষা নিতে থাকবে প্রয়োজন হলে উৎপাদনমূলক পেশা চালিয়ে যাবার সাথে সাথে। এদের জন্য শুধু শহরে নয়, দেশের সর্বত্র ছোট বড় বহু দিবা ও নৈশ পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, প্রয়োজন মত কৃষি খামার, কল-কারখানা বা প্রজেক্টের পাশাপাশি। এখান থেকে মানুষ পাবে উন্নততর চাষী, শ্রমিক, কারিগর, ইলেকট্রিশিয়ান, কর্মচারী, সেক্রেটারী, একাউনটেন্ট হবার ও সর্বোপরি উন্নততর মানুষ হবার শিক্ষা। জীবনকে ও জীবিকাকে সত্যিকার অর্থে উপভোগ করার উৎসাহ। এ রকম একটা সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক থেকে যারা বেরুবে তাদের মধ্যে বাগানের মালী ও গবেষণাগারের উদ্ভিদবিদের তফাতটা হবে আপেক্ষিক, মৌলিক নয়। উভয়ের চেতনাটা ও উৎসাহটা জীবিকা নির্বাহের সাধারণ প্রয়োজনকে অতিক্রম করে হবে বৈজ্ঞানিক।

এবার আসতে হয় দ্বিতীয় বিষয়টার অর্থাৎ গণশিক্ষার আলোচনায়। প্রথমোক্ত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নিতে দেশের সংখ্যাতীত অশিক্ষিত জনতার জন্য দেরী হয়ে গিয়েছে। অথচ তাঁদেরকে হিসেবের মধ্যে না ধরলে সার্বিক পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই উঠে না। স্বাধীনতা উত্তর বৈপ্লবিক পরিবেশে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশকে পূর্ণ শিক্ষিতের দেশে পরিণত করার একটা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। এখন গণশিক্ষা বলতে যদি আগের মত একখানা সরকারী শিক্ষা অফিস ও সরকারী চকচকে ম্যাগাজিনে কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষার ছবির সংযোজন মনে করা হয়, তাহলে বলার কিছু নেই। কিন্তু সত্যি যদি সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরিকল্পনা করা হয়, তা হলে নিম্নের পন্থাটা চিন্তা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে শহরে-গ্রামে সর্বত্র সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ছাত্রদের অগাধ মর্যাদা ও প্রভাব রয়েছে। আর আমাদের ছাত্রদের আদর্শবাদ, ত্যাগ ও ক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে পুরো স্বাধীনতা সংগ্রামটাই রয়েছে। তাছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত সুযোগ নিয়ে যারা উচ্চতর স্কুল ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার দিকে পা বাড়াচ্ছে, উৎপাদনমূলক শ্রম ছাড়াও তাদের উপর সমাজের একটা সাধারণ দাবীও আছে। উচ্চতর স্কুলের শেষ আর বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর মধ্যে ছয় মাসের একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে। এই ছয় মাস এই পর্যায়ের পুরো ছাত্র সমাজকে কাজে লাগাতে হবে গণবিদ্যালয়ের শিক্ষকতায়। কোন সৌখিন সময় কাটাবার সুযোগ হিসাবে নয়, একটি কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিষ্কার লক্ষ্য নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে তাদের এ কাজে নামতে হবে। গণবিদ্যালয়গুলো গঠিত হবে গ্রামে গ্রামে, খামারে, কারখানায় শ্রমিক যেখানে মাটি কাটছে বা পুল বানাচ্ছে ঠিক সেখানে দিনে বা রাত্রে তাদের অবসর সময়ে। খুবই সুসংগঠিত একটি ব্যাপক গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে পরিচালক ও ট্রেড ইউনিয়নের সহায়তায় এই বিদ্যালয়গুলো গড়ে তোলা হবে। শিক্ষণীয় বিষয় হবে সোজা তিনটি—(১) অক্ষরজ্ঞান ও হিসাব শিক্ষা, (২) কৃষ্টি চেতনা, (৩) জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান। এখানে আমরা তৃতীয় বিষয়টির উপর একটু আলোচনা করতে পারি।

অশিক্ষিত জনতার মধ্যে অল্প সময়ে বিজ্ঞান শিক্ষার কথা বললে অনেকে আঁৎকে উঠবেন। কিন্তু সেটা হবে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণার জন্য। স্বাস্থ্য, খাদ্য, মাটি, কৃষিকল, সার, পাম্প, পাওয়ার ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু ধারণা লাভ দেশের কোন লোকের কাছেই অসম্ভব বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। আর স্বাধীনতার যুদ্ধে যে কৃষক যেই ছাত্রের কাছ থেকে ব্রেনগান চালনার শিক্ষা নিয়েছে, একই ছাত্রের কাছ থেকে সে পাম্প চালাবার শিক্ষা নিতে না পারার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ছাত্রদের দেয়া বক্তৃতামূলক শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে সারা দেশব্যাপী কতকগুলো শিক্ষা-প্রসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সুপরিকল্পিত অসংখ্য পোস্টার, সহজবোধ্য পুস্তিকা ও ছবি, ভ্রাম্যমান শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র ইত্যাদির সাহায্য নেয়া যেতে পারে। রেডিওর বহুল প্রচার ও সহজলভ্যতার সুযোগ নিয়ে শুধু গণশিক্ষার জন্য বহু বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকারী ছাত্রদের ছ'মাসের শিক্ষকতা ছাড়াও অন্য সময়, বিশেষ করে স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সময় সেখানকার ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে গণবিদ্যালয়গুলো চালু রাখা যেতে পারে। মানুষ যেন গণবিদ্যালয়গুলোর সুযোগ গ্রহণ করে এবং একে গুরুত্ব দেয় সেজন্য ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে দেশময় একটা উৎসাহের জোয়ার সৃষ্টি করতে হবে। আর যারা গণবিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করবে তাদের জন্য উপযুক্ত স্বীকৃতি ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। এ শিক্ষা লাভ করা যেন সবার জন্যই একটা প্রতিযোগিতা ও সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

গণশিক্ষার জন্য এ ধরনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়। উদাহরণ স্বরূপ কিউবার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিউবার সমাজ বিপ্লবের সাথে সাথে প্রায় এ রকমেরই একটা পরিকল্পনা নিয়ে হাজার হাজার ছাত্র ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামে গ্রামে, সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে। যেদিন কোন খামার বা কারখানার সমস্ত শ্রমিকরা শতকরা একশ' ভাগ শিক্ষিত হয়ে যেত, সেদিন থেকে ঐ খামার বা কারখানা বিশেষ একখানা পতাকা ওড়াবার অধিকার পেত। এভাবে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে কিউবার শিক্ষিতের হার প্রায় আমাদের অবস্থা থেকে এখন শতকরা একশ' ভাগের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই গণবিদ্যালয়ের জন্য ও গণবিদ্যালয়ের ফলে মানুষের জীবন, জীবিকা ও উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসবে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও আমাদের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে সাথে সাথে। এটি শুধু যে অন্ন-বস্ত্রের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাতে সাহায্য করবে তা নয়—প্রথমবারের মত এটা বৈজ্ঞানিক বিশ্বে আমাদের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। এ বিজ্ঞান হবে জনগণের বিজ্ঞান; জনগণের জন্যে বিজ্ঞান।

নেশা যার নাম

[আগষ্ট '৭২]

হামিদ রেজা

খাঁটি বাংলায় আমরা যাকে গাঁজা বলি উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে তার পোষাকী নাম ক্যানাবিস সাটিভা। মোরাসি উদ্ভিদ্‌ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। লম্বা অমসৃণ এই উদ্ভিদ মূলত এশিয়ার অধিবাসী। আফ্রিকা-ইয়োরোপ এবং আমেরিকাতেও এর চাষ হয়। এর শুকনো পাতা এবং মুকুল বিড়ি-সিগারেটের মত পাকিয়ে অথবা পাইপ বা কল্কে পুড়ে ধূমপানের প্রচলন আজকে নতুন নয়। ভাঙ্গ, চরস, গাঁজা তিন বস্তুই আসলে এই একই উদ্ভিদ্‌জাত।

আমাদের দেশের গাঁজারই জাত ভাই মারিজয়ানা। নিকোটিনা গ্লাউকা নামে উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত। পশ্চিমা দেশগুলিতে একে নিয়ে সাঙ্ঘাতিক হৈচৈ। মার্কিনী তরুণ সম্প্রদায় এর উপরে ভর করে স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করে। রোগ-শোক-যুদ্ধ-যন্ত্রণা যাবতীয় পার্থিব সমস্যার অনিবার্য আবর্ত থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে অলৌকিক অনির্বচনীয় এক স্বপ্ন জগতের আস্বাদ যোগায় এই মারিজুয়ানার নেশা। ষাট দশকের পর থেকে ইউরোপের কোথাও কোথাও বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক কৈশোর থেকে শুরু করে কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ পর্যন্ত সমাজের বিরাট একটা অংশ এই নেশায় বুঁদ হয়ে ভেঙে পড়ার মত হয়েছে। ভয়ঙ্কর মহামারীর মত সমগ্র মার্কিন তরুণ সমাজকে গ্রাস করেছে এই মারিজুয়ানার নীল নেশা। আমাদের দেশের তরুণ সমাজেও দেশী গাঁজার পথ ধরে এই বস্তুর অনুপ্রবেশ একটু একটু ঘটছে না এটা হলপ্‌ করে বলা যাবে না।

অদ্ভুত অবাক শোনাবে গাঁজার গল্প গাঁজা খেয়ে গ্যাঁজানোর মতই। বিড়ি-সিগারেটের মত মুড়িয়ে অথবা কল্কে দম মেরে আপনি অবাধে স্বর্গ রাজ্যে ঢুকে যেতে পারেন। অদ্ভুত একটা সম্মোহিত ভাব আপনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। চোখে ফুটে উঠবে রং বেরং-এর আলোর সমারোহ। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আশ্চর্য এক শূন্যতায় ভাসতে ভাসতে আপনি উর্দ্ধমুখী হবেন। শরীরের সমস্ত ভার বোধ শিথিল হয়ে আসবে আপনার অনুভবে। প্রার্থিত সুখের ইচ্ছায় সমর্পিত আপনার মনে হবে আপনি যেমন করে যেমনটি চাইছেন ঠিক তেমন করেই সেই ঘটনাগুলোই ঘটছে। আপনি যদি পারস্যের রাজা হতে চান– আপনি তাই। সিনকনোরীর মত স্বাস্থ্যবান সুন্দর নায়ক হতে চাইলে আয়নায় নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখুন– দেখবেন রূপান্তরের মুগ্ধ বিস্ময়ে আপনি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। সমস্ত পৃথিবী-জাগতিক কর্মকাণ্ড-পরিচিত পরিবেশ নিথর নিশ্চল হয়ে ধরা দেবে আপনার অনুভবে। অভূতপূর্ব এক আবেগ যেন পালকের পরশ বুলিয়ে আপনাকে ও পরিচিত পৃথিবীটাকে অনড় জড় দশায় দাঁড় করিয়ে দেবে। দিন ও রাত্রির পারস্পরিক অস্তিত্ববোধ এবং নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধি বিবেচনা অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

কিন্তু এ ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণ কি? গাঁজাই বলি আর মারিজুয়ানাই বলি বিজ্ঞানীরা এর থেকে টেট্রাহাইড্রো কেন্নাবিনোল বা সংক্ষেপে টি, এইচ, সি নামে এক ধরনের জটিল রাসায়নিক যৌগ বিশ্লেষণ করেছেন। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন এই বস্তুটিই সব অনর্থের মূল। দেশী গাঁজাতে আরো যেসব রাসায়নিক যৌগ উপস্থিত আছে তারা হল, ক্যান্নাবিন, উদ্বায়ু তৈল সম্পন্ন ক্যানিবিন, কলিন, ক্যালসিয়াম কারবোনেট এবং ক্যালসিয়াম অক্সালেট। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের ধারণা আসল গেঁজেল পদার্থ হচ্ছে টি, এইচ, সি। ১৯৬৮ সালে ড: ডোনাল্ড আর জাসিনসকি জনৈক রোগীর উপর এই বস্তুটি আলাদাভাবে প্রয়োগ করে এই ধারণার যথার্থতা লক্ষ্য করেছেন।

গাঁজা বা মারিজুয়ানা সেবনে শরীর ও মনের উপর ক্ষতির পরিমাণ কতটুকু? জর্জিয়া মেডিক্যাল স্কুলের ড. উইলিয়াম এফ. জেবার অন্তসত্ত্বা খরগোশের উপর বেশি মাত্রায় মারিজুয়ানা প্রয়োগ করে লক্ষ্য করেছেন, খরগোশগুলো মৃত অথবা শারিরীক বৈকল্য সহ বাচ্চা প্রসব করেছে। এই পরীক্ষার ফলাফল মানব জাতির জন্যে সত্য হলে তা অবশ্যই ভয়াবহ। কিন্তু মানুষের উপর এ ধরনের পরীক্ষা এখনও করা হয়নি বলে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে অপরিণত বয়সে এর ব্যবহার যে মানসিক পরিবর্তন ঘটায় তা সমস্যাসঙ্কুল আধুনিক বিশ্বের জন্যে উদ্বেগের কারণ বটে। নিজেকে পাঁচ জনের মধ্যে বিশিষ্ট করে তোলার প্রয়াসেই সাধারণত তরুণেরা মারিজুয়ানার আশ্রয় নেয়। যদিও শেষ পর্যন্ত তাদের সমস্ত ব্যক্তিত্ব নিদারুণ হতাশার আবর্তে নিক্ষেপিত হয়। মারিজুয়ানা সেবীরা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হতে ভয় পায়। এক ধরনের অন্তর্মুখী ভাব এবং পলায়নী মনোবৃত্তি তাকে ক্রমে গ্রাস করে ফেলে যায়। পরিণামে সে আরো বেশি করে মারিজুয়ানার কাছে সমর্পিত হয়। গাঁজাখোর তরুণেরা আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলে এবং স্বপ্নরাজ্যে বিচরণের প্রবণতা তাদের সাংঘাতিকভাবে পেয়ে বসে। বস্তুটি মানুষের ভাবপ্রবণ অন্তর্দ্বন্দ্বকে ভীষণভাবে জাগিয়ে তোলে। বিশেষ করে কঠিন মানসিক রোগে আক্রান্ত যারা তাদের রোগকে তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দেয় এই অভ্যাস। এমনকি শেষ পর্যন্ত উন্মাদ করে তুলতে পারে। সেই সঙ্গে বিচিত্র ধরনের সামাজিক অপরাধ ও খুন করার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। পার্থিব জীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নিদারুণ নিঃসঙ্গতা মারিজুয়ানা সেবী তরুণকে আত্মহননে প্ররোচিত করতে পারে। এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ দিক। দেখা গেছে মারিজুয়ানা সেবীরা ক্রমে ক্রমে আরো বেশি উত্তেজক ও অনিষ্টকারী মাদক বস্তু হিরোইন, এল, এস, ডি প্রভৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে।

দীর্ঘকাল মারিজুয়ানা বা গাঁজা ব্যবহার করার ফলে মানসিক বা শারিরীক কোন অসুস্থতার লক্ষণ ধরা পড়লে উপযুক্ত কোন চিকিৎসক বা মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নেয়া উচিত। তবে প্রাথমিকভাবে এই অভ্যাসের জন্যে অহেতুক ভয় না পেয়ে আলাপ-আলোচনা বা স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে এর হাত থেকে নিস্তারের পথ খোঁজাই উত্তম।

গাঁজা শুধু নেশার বস্তুই নয় এর কল্যাণকর ব্যবহারও সম্ভব। সাধারণভাবে গাঁজা মস্তিষ্কের উত্তেজক হিসেবে চিহ্নিত। হিষ্টেরিয়া, নিউরেলজিয়া, খিঁচুনী সহ কফ, মস্তিষ্কের বেদনা প্রভৃতি প্রশমনে এবং পরিপাক তন্ত্রের বৈকল্যে এর একক কিংবা সহযোগী হিসেবে ব্যবহার ফলপ্রদ। এক গ্রামের এক দশমাংশ নিরাপদ ঔষধ হিসেবে ব্যবহার যোগ্য। অনুমোদিত মানের ঔষধ প্রস্তুত পুস্তকে অবশ্য এখন পর্যন্ত গাঁজাজাত কোন ঔষধকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি তবে ঔষধবিদ্রা (ফার্মাসিস্ট) 'এক্সট্রাকটাম ক্যানাবিস' বা গাঁজার নির্যাস নামে যা তৈরি করেন তা প্রয়োজনে নির্ধারিত মাত্রায় নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঘুম নির্ঘুম

বইয়ের পাতার কালো কালো অক্ষরগুলো যখন চোখের পাতাকে ক্লান্তির ভারে নুইয়ে ফেলে তখন ছাত্র মাত্রই মহাসমস্যার সম্মুখীন হন। পরীক্ষা সামনে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু নিস্তারের উপায়? চোখে সর্ষের তেলের ফোটা কিংবা কাঁচা লঙ্কা ঘষে দেয়া? হ্যাঁ, ঘুম কাতুরে ছেলের কানের ডগা টানতে টানতে অনেক অভিভাবকই তাদের ছাত্রজীবনের এহেন বীরত্বের কাহিনী বিবৃত করেন। কিন্তু আজকের ছাত্ররা বিজ্ঞানের আশীর্বাদ পুষ্ট। ঘুম তাড়াবার মোক্ষম ঔষধটি তাদের অনেকেরই জানা। আদুরে নাম 'পেপ পিলস্'। রাসায়নিক নাম এমফেটামিকন। ডেক্সীড্রিন, বেঞ্জীড্রিন প্রভৃতি নামে বাজারে বিক্রী হয়।

না, শুধু ঘুম তাড়াবার জন্যই এর কদর নয়। মুটিয়ে যাওয়া মানুষদের সৌন্দর্য সাধনায় এর আদর বিশ্ব জুড়ে। মোটা মানুষের বেঢপ শরীর থেকে পোয়া পোয়া মেদ ঝেড়ে ফেলতে এমফেটামিন সিদ্ধহস্ত।

এমফেটামিন কি করে? কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে আপনার সব অবসাদ দূর করে দেয়। কাজের স্পৃহা এবং ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। আত্ম-বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। ক্ষিধে অনুভূত হয় না বলে আপনার বাড়তি মেদ কমে গিয়ে নষ্ট ফিগার এর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে।

সমস্যা শুধু ঘুম তাড়াবার নয় সমস্যা ঘুম নামাবারও। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত ভেড়ার পাল বা নদীর ঢেউ গুনে এখন আর কেউ ঘুমের আরাধনা করতে চান না। এখন বাজারে ঘুমের বড়ি পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় আধখানা একখানা বড়িই যথেষ্ট। বাজারে এসব বড়ি বিভিন্ন রং ঢং এ পাবেন। রাসায়নিক নাম বারবিচুরেট। সেকনাল, নেম্বুটাল, এমাইটাল, ফেনোবারবিটাল, ভেরনাল, পেন্টথাল প্রভৃতি বহু নামে বাজারে চালু রয়েছে।

বারবিচুরেট নামের এই আশ্চর্য রাসায়নিক পদার্থটি আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। খিঁচুনী বন্ধ করে বহু মৃগী রোগীকে সমাজের স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এই ঔষধ। রক্ত চাপের আধিক্যজনিত মানসিক উদ্বেগ কমাতে এর ব্যবহার অনিবার্য। বারবিচুরেট আন্ত্রিক প্রদাহে ভোগা রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ। চিকিৎসকের ব্যবস্থা পত্রে বারবিচুরেটের ভূমিকা আশ্চর্যজনকভাবে কল্যাণকর।

বারবিচুরেট কাজ করে কিভাবে? এমফেটামিনের ঠিক উল্টো। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে নিস্তেজ করে ফেলে বারবিচুরেট।

এমফেটামিন বা বারবিচুরেট দুটোই রোগ শোকের জগতে খুবই মূল্যবান। কিন্তু এসবের অতিব্যবহার মানব দেহে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই ঔষধগুলির একটা অনভিপ্রেত দিক হল এরা মানুষের মানসিক অবস্থার উপর সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং এদের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। এমফেটামিন প্রেমিকরা নিয়ত উত্তেজিত হতে চায় আর বারবিচুরেট সেবীরা অতল অবসাদে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে আশ্চর্য আনন্দ খোঁজে। নেশার জগতে এই দুই ধরনের ঔষধ খুবই সহজ লভ্য এবং ব্যাপক ব্যবহৃত।

নেশাগ্রস্ত লোকদের এসব নিষিদ্ধ দ্রব্য থেকে বিরত রাখতে চাইলে সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। হঠাৎ করে নেশার দ্রব্য প্রত্যাহার করলে নানা রকম শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া যেমন, গা বমি ভাব, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসা, ডায়রিয়া, পেশীর খিঁচুনী এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

এমফেটামিনের অতি ব্যবহার শরীরের স্বাভাবিক কর্মবিরতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। শরীরের সংরক্ষিত শক্তি নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে পড়ে। যার পরিমাণ মৃত্যু।

দেখা গেছে যেসব লোক মারাত্মকভাবে নিরাপত্তাহীনতা বা হতাশায় ভোগে তাদেরই এমফেটামিন ও বারবিচুরেটের প্রতি ঝোঁক বেশি থাকে এবং রোগী ক্রমশ নিজেই ঔষধের মাত্রা একটা বড়ি থেকে দুই, তিন, চার প্রভৃতি বর্ধিত মাত্রা নির্ধারণ করতে শুরু করে।

নিজের অজ্ঞাতে বারবিচুরেট প্রতিক্রিয়ার শিকারে পরিণত হলে রোগীর মধ্যে নিউমোনিয়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে পারে। নেশার জন্যে যারা বারবিচুরেট ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলের শরণাপন্ন হয় তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রায় ক্ষেত্রেই আশ্চর্যজনকভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। বারবিচুরেট সেবীরা অনেক ক্ষেত্রে ভীষণ অস্থির, বিরূপ মনোভাবাপন্ন, ঝগড়াটে এবং যৌন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দূরে অনির্দিষ্ট দৃষ্টি মেলে বসে থাকা, নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ বা চেহারা সম্পর্কে অনীহা, চালচলনে মাতলামী ভাব অথবা অস্বাভাবিক মন্থর, অতিরিক্ত নিশ্চল একটা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মত লক্ষণ যদি আপনি কারো মধ্যে লক্ষ্য করেন তাহলে সে ব্যক্তি বারবিচুরেট সেবী বলে সন্দেহ করতে পারেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক জরীপ চালিয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করেছে, হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধ সংঘটনে এমফেটামিন নেশাগ্রস্ত লোকেরা যখন অপরাধী হয় তখন নেশার ঘোরে এই সব অপরাধীরা নৃশংস ও নির্মমভাবে তাদের অপরাধ সংঘটিত করে থাকে। আবার এটাও দেখা গেছে যে বেশির ভাগ আত্মহত্যা বারবিচুরেট দ্বারাই সংঘটিত হয়।

বিশ্বজুড়ে মানুষের নৈতিক শিথিলতার সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। স্বভাবতই এইসব ব্যবসায়ীদের প্রধান শিকারে পরিণত হয় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বারবিচুরেট বা এমফেটামিন ততক্ষণই আমাদের জঘন্য কল্যাণকর যতক্ষণ তারা ডাক্তারের প্রেসক্রিপসনের অন্তর্ভুক্ত থেকে অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্টের সতর্ক দৃষ্টির পাহারায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছে। কিন্তু পরীক্ষা প্রস্তুতির সহায়ক হিসেবে অথবা কোমরের মাপ ছত্রিশ থেকে ছাব্বিশে নামিয়ে আনতে কিংবা চমৎকার নিদ্রার প্রলোভনে বন্ধুর দেয়া পরামর্শে এমফেটামিন বা বারবিচুরেট হাতে নেয়া কোন মতেই ঠিক নয়।

১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র থেকে :

আগামী সপ্তাহে Photographic Society -তে বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি– দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে বলিতে হইবে। চক্ষে যে ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায়, কেবল তাহার প্রতিধ্বনি সুপ্ত ও জাগরিত স্মৃতি রূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু photo র ছবি একেবারে অপরিবর্তিত রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া সেই আণবিক আড়ষ্টতা (molecular arrest) সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে আশ্চর্য experiment এ সফলতা লাভ করিয়াছি। হঠাৎ মনে হইল, তুমি আমার আবিষ্কার চুরি করিয়া ইতিপূর্বে কবিতা রূপে প্রচার করিয়াছ। সুরদাস যখন তাহার চক্ষু শলাকাবিদ্ধ করিতে যাইতেছিল তখন তাহার মনে হইল যে, চির অন্ধকারে পলকহীন স্মৃতি চিরমুদ্রিত থাকিবে।

তোমাদের জন্যে, ভালবাসা

[ডিসেম্বর-'৭২]

হুমায়ূন আহমেদ

(ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনী)

সবাই এসে গেছেন।

কালো টেবিলের চারপাশে সাজানো নিচু চেয়ারগুলিতে চুপচাপ বসে আছেন তাঁরা। এত চুপচাপ যে তাঁদের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক কিছুক্ষণের ভেতর শুরু হওয়ার কথা। কাল রাতের বেলায় সবার কাছে গাঢ় লাল রঙের কার্ড গিয়েছে। যেখানে লেখা "আসন্ন মহাসংকটে বিজ্ঞানী হিসেবে আপনার সহায়তা প্রয়োজন।" স্বাক্ষর করেছেন এস. মাথুর মহাকাশ প্রযুক্তি বিদ্যা গবেষণাগার প্রধান। আজকের এই বৈঠকে অবশ্য শুধু তিনিই আসছেন না, আসছেন ফিহা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞের দুর্লভ সম্মান তিনটি লাল তারা যাকে দেয়া হয়েছে। কার্ডে তাঁর নাম অবশ্য নেই। তা কখনো থাকে না। অতীতে অনেকবার বিজ্ঞানী সম্মেলনের মহাপরিচালক হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হয়েছে। কিন্তু তিনি আসেন নি। বলে পাঠিয়েছেন তাঁর ভালো লাগছে না। আসবেন না। পরবর্তী সম্মেলনগুলিতে তাই তাঁর নাম আর ছাপা হোত না। গতকালও যেমন হয়নি। অবশ্য সবাই জেনে গেছেন তিনি আসবেন। তাঁকে আসতেই হবে। এ জাতীয় সংকট দু একদিন পর পর হয় না। লক্ষ লক্ষ বছরেও দু একবার হয় কি না সন্দেহ। এ সময়ে ফিহার মত বিজ্ঞানী ভালো লাগছে না অজুহাতে তাঁর অভ্যাস মতো শুয়ে শুয়ে গান শুনে কাটাবেন? ঠাণ্ডা ঘরে মূর্তির মত বসে থাকা বিজ্ঞানীরা উদ্বেগে ঘামতে লাগলেন।

'আমার মনে হয় মাথুর এসে পড়তে আর দেরী নেই।'

যিনি কথা বললেন সবাই ঘুরে তাকালো তাঁর দিকে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে নীরবতা ভাঙ্গার জন্যেই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় এ কথাগুলি বলা হয়েছে। দু একজন বক্তার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকালেন। বক্তা একটু কেশে বললেন–

'কাল কেমন ঝড় হয়েছিলো দেখেছেন? জানালার একটা কাঁচ ভেঙ্গে গেছে আমার।' কথার উত্তরে কাউকে একটি কথাও বলতে না শুনে তিনি অস্বস্তিতে আঙুল মটকাতে লাগলেন। মাথা ঘুরিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন।

ঘরটি মস্ত বড়। প্রায় হল ঘরের মত। জরুরী পরিস্থিতিতে হাজার দুয়েক বিজ্ঞানীর বসার জায়গা আছে। আজ অবশ্য এসেছেন আটাশ জন। বসবার ব্যবস্থা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের পাশের ফাঁকা জায়গাটায়। পর্দা টেনে নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত ধরনের ঘর। শীতকালে জমে যাওয়া হ্রদের জলের মত মসৃণ মেঝে। কালো পাথরের ইমিটেশনে তৈরি দেয়াল, দেখা যায় না এমন উঁচুতে ছাদ। এমনিতেই এখানে বসে থাকলে বুকের উপর ভয় জমাট বাঁধতে থাকে। দুঃখজনক অনেক স্মৃতিই এই ঘরের কালো দেয়ালে মিশে মিশে বাতাস ভারী করে রেখেছে। মাস ছয়েকও হয়নি মহাজাগতিক স্টেশন হুন ৫১১ বিকল হয়ে বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণে দ্রুত নেমে যেতে লাগলো গ্রহের দিকে। তিন ঘণ্টার মত সময় হাতে এর ভিতরই স্টেশনটি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পড়বে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিভিশন পর্দায় ছবি দেখা গেলো ভয়ে কুঁচকে যাওয়া একদল বিজ্ঞানীর মুখ যারা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন মৃত্যুর দিকে।

অনেকেই জড়ো হলেন নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। তিন ঘণ্টা মাত্র সময়। এর ভেতর হুন ৫১১-র সংগৃহীত সমস্ত তথ্যাবলী উদ্ধার করতে হবে। এস. মাথুর বললেন, 'হুন ৫১১-র বিজ্ঞানীরা, আপনাদের হাতে সময় খুব অল্প আপনারা আপনাদের যাবতীয় সংগৃহীত তথ্যাবলী পাঠাতে থাকুন।' আড়াই ঘণ্টা ধরে অনবরত খবর আসতে থাকলো। কম্পিউটরের মেমরী সেলে দ্রুত জমা হতে লাগলো সে সব। হুন ৫১১ অপরিচিত মহাজাগতিক বস্তুকণার উপর সত্যি সত্যি অসাধারণ গবেষণা চালিয়েছিল। সেই সব হতভাগ্য বিজ্ঞানীদের কোন মূল্য এস. মাথুরের কাছে নেই কিন্তু গবেষণালব্ধ ফলাফলের গুরুত্ব অপরিসীম। হুন ৫১১ ধ্বংস হবার দু এক সেকেণ্ড আগে পর্যন্তও সেখানকার বিজ্ঞানীদের আশাহত ক্লান্ত মুখের ছবি নিয়ন্ত্রণ কক্ষের পর্দায় ভাসতে থাকলো। পরদিন পৃথিবীর খবরের কাগজগুলোর এক কোনায় লেখা হলো– 'বিধ্বস্ত হুন ৫১১-র বিজ্ঞানীদের সম্মানসূচক নীল তারা দেয়া হলো।'

যদিও কালো পর্দা টেনে নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে আলাদা রাখা হয়েছে তবু তার স্মৃতি থেকে মুক্ত হওয়া তো সম্ভব নয়। যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে আছেন তার পাশের ঘরটি মহাশূন্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে যাওয়া স্টেশন, অভিযাত্রী দল, সন্ধানী দলের সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। যদিও সে ঘরটিতে একটি মানুষও নেই। যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে কম্পিউটার সিডিসি। বিজ্ঞানীদের হাজার বছরের সাধনার তৈরি, মানুষের মস্তিষ্কের নিওরোনের নিখুঁত অনুকরণে তৈরি নিওরোন যার জন্যে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে। কম্পিউটার হওয়া সত্ত্বেও যাকে মানুষের মতই লাল তারা সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। কে বলবে আজকের এ বৈঠকে হয়তো কম্পিউটর সিডিসিও অংশগ্রহণ করবে, নয়তো ঠিক তার পাশের ঘরেই বৈঠক বসানোর কোন কারণ নেই।

'এস. মাথুরের আসবার সময় হয়েছে ঠিক দেড় ঘণ্টা আগে।' কথাগুলি বলেই পদার্থবিদ সুরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অল্প বয়সেই অকল্পনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তিনি সম্মানসূচক ১টি লাল তারা পেয়েছেন। তাঁর আবিষ্কৃত দ্বৈত অবস্থানবাদ নিয়ে তিন বছর ধরেই ক্রমাগত গবেষণা হচ্ছে। সেদিন হয়তো খুব দূরে নয় যখন দ্বৈত অবস্থানবাদ স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা সুরার দিকে তাকিয়ে রইলেন। উত্তেজনায় সুরা অল্প অল্প কাঁপছিলেন। তার টকটকে ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কপালের উপর এসে পড়া লালচে চুলগুলি বাঁ হাতে সরিয়ে তিনি দৃঢ় গলায় বললেন :

একটি মিনিটও আমাদের কাছে দামী যেখানে মাথুর কি করে দেড় ঘণ্টা দেরী করেন ভেবে পাই না। এই মহা সংকটে আমার নিজস্ব একটি সমাধান আছে সেটি সবার জানা, সমাধান পছন্দ হলে এই মুহূর্ত থেকে কাজ করা উচিত। অথচ মাথুরের জন্যে' ...

বিরক্তিতে সুরা কাঁধ ঝাঁকাতে লাগলেন। প্রায় চেঁচিয়ে বললেন মাথুরের মনে রাখা উচিত সমস্যাটি একটি মারাত্মক সমস্যা। বিজ্ঞানীরা নড়ে চড়ে বসলেন। সমস্যাটি নিঃসন্দেহে মারাত্মক। হয়তো ইতিমধ্যেই তা তাঁদের গ্রাস করতে শুরু করেছে। এই ঘর, এই গোল কালো রঙের টেবিল, ঘরের ভেতরের ঠাণ্ডা বাতাস সমস্তই বলছে 'সময় খুব কম সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের ভয় পাওয়া মুখের ছায়া পড়েছে ঘরের কালো দেয়ালে। বুকের ভেতর শির শির করা অনুভূতি নিয়ে তাঁরা নীরবে বসে আছেন।

মাঝে মাঝে একেকটা সময় আসে যখন পুরনো ধারণা বদলে দেয়ার জন্যে মহাপুরুষদের মত মহাবিজ্ঞানীরা জন্মান! কালজয়ী সে সব অতি মানব মানুষের জ্ঞানের সিঁড়ি ধাপে ধাপে না বাড়িয়ে লাফিয়ে ধারণাতীত উঁচু ধাপে নিয়ে যান। বিধাতার মত ক্ষমতাধর এ সমস্ত মানুষরা বহু যুগে এক আধজন করে জন্মান। জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বর্ণ যুগ শুরু হয় তখন। মানুষের আদিমতম কামনা দৃশ্য অদৃশ্য যাবতীয় বিষয় আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলবো, অজানা কিছুই থাকবে না, অদেখা কিছুই থাকবে না। কোন রহস্যই রহস্য থাকবে না।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়টায় পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের ক্ষমতার কাল চলছে। পুরনো ধারণা বদলে গিয়ে নতুন নতুন সূত্র ঝড়ের মতো এসে পড়ছে। যে সমস্ত জটিল রহস্যের হাজার বৎসরেও সমাধান হয়নি, অতীতের তাবৎ বিজ্ঞানীরা যা অসহায়ভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছেন তাদের সমাধানই শুধু হয়নি সে সমাধানের পথ ধরেই নতুন সূত্রাবলী, নতুন ধারণা কম্পিউটারের মেমরী সেলে সঞ্চিত হতে শুরু হয়েছে। জন্ম হয়েছে ফিহার মত মহা আঙ্কিকের যিনি তাঁর তুলনাহীন প্রতিভা নিয়ে ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের সমাধান করেছেন মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে। জন্ম হয়েছে পদার্থবিদ সুরা, পদার্থবিদ এস, মাথুরের। মানুষের তৈরি কৃত্রিম নিওরোন নিয়ে তৈরি হয়েছে মানবিক আবেগ সম্পন্ন কম্পিউটার সিডিসি। গ্রহ থেকে গ্রহে মহাকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। কে বলে জ্ঞানের শেষ নেই? সীমা নেই। মানুষের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তেই হবে জ্ঞানকে। বিজ্ঞানীদের পিছু ফেরবার রাস্তা নেই। আরো জানো, আরো বেশি জানো।

এম্নি যখন অবস্থা ঠিক তখনি আবিষ্কৃত হলো টাইফা গ্রহ। এণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের একপাশে পড়ে থাকা ছোট্ট একটি নীল রঙের গ্রহ। চারপাশের উজ্জ্বল ধোয়াটে রঙের ছায়াপথের মাঝামাঝি গ্রহ একটি। একটি হঠাৎ আবিষ্কার। বৃহস্পতির কাছাকাছি মহাকাশ গবেষণামন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল WGK ১৬৬ একটি সাদা বামুন নক্ষত্রকে যা দ্রুত উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে প্রবল বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে যাবার জন্যে। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন সাদা বামুন নক্ষত্র থেকে বেড়িয়ে আসা বিকিরণ তেজের প্রায় ষাট ভাগ কেউ যেন শুষে নিচ্ছে। এই প্রকাণ্ড ক্ষমতাকে কে টেনে নিতে পারে? অন্য কোন গ্রহের কোন উন্নত প্রাণী কি এই মহাশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে চেষ্টা করছে? যদি তাই হয় তবে সেই প্রাণী কত উন্নত? আবিষ্কৃত হলো টাইফা গ্রহ।

বৃহস্পতির কাছাকাছি অবস্থিত মহাজাগতিক ষ্টেশন নিনুপ ৩৭ এর অধিনায়ক টাইফার অনন্যসাধারণ আবিষ্কারক। সেই স্টেশনের সবাই অতি সম্মানসূচক দুই নীল তারা উপাধি পেলেন।

টাইফা গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ হতে সময় লাগলো এক বৎসর। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা হকচকিয়ে গেলেন। টাইফা গ্রহের গণিতশাস্ত্রের খবর আসতে লাগলো। বিস্মিত বিজ্ঞানীরা কি করবেন বুঝতে পারলেন না। সমস্তই তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির আগোচরে। সেখানে সময় বলে কি কিছু নেই? সময়কে সব সময় শূন্য ধরা হচ্ছে – কেন? বস্তু বলে কি কিছু নেই? বস্তুকে শুন্য ধরা হচ্ছে কেন? শক্তিকে দুই মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করছে কেন?

মহা আঙ্কিক ফিহা পৃথিবীর সব অঙ্কবিদদের নতুন গণিতশাস্ত্রের নিয়মাবলী পরীক্ষা করতে লাগলেন। ভুতুড়ে সব গণিতবিদ্যা পদার্থবিদ্যা কোত্থেকে কি হচ্ছে। তাদের ফলাফল হিসেবে মহাশূন্যে কোথাও কোন বস্তু নেই। চারদিকে অনন্ত শুন্য। মানুষ মহাজাগতিক শক্তির একটি আংশিক ছায়া। তাহলে আমাদের ভাবনা, চিন্তা, আমাদের অনুভূতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রেম ভালোবাসা সমস্তই কি মিথ্যা? ছায়ার উপরই জন্ম মৃত্যু?

পৃথিবীর খবরের কাগজগুলিতে আজগুবী সব খবর বেরুতে লাগলো। কেউ কেউ লিখলো টাইফা গ্রহের মানুষরা পৃথিবী ধ্বংস করে দিচ্ছে। কেউ লিখলো তারা পৃথিবীতে তাদের ঘাঁটি বানানোর জন্যে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। কেউ লিখলো বিজ্ঞানীদের মাথা গুলিয়ে ফেলবার জন্যে তারা আজগুবি সব তথ্য পাঠাচ্ছে। গুজবের পিঠে ভর করেই গুজব চলে। টাইফা গ্রহ নিয়ে অজস্র বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখা হতে লাগলো। দুজন পরিচালক এই নিয়ে থ্রি ডাইমেনশনাল ছবি তৈরি করলেন। ছবির নাম 'নরক থেকে আসছি।' কেমন একটি অদ্ভুত ধারণা ছড়িয়ে পড়লো টাইফা গ্রহের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিজ্ঞান পল্লী সিরানে এসে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক কাজ কর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে। মহাশূন্য গবেষণা বিভাগ, খাদ্য উৎপন্ন বিভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণে। বাধ্য হয়ে এস. মাথুর সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। জনসাধারণকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে। অমূলক ভয় ভীতি সরিয়ে দিয়ে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। বিজ্ঞান পল্লী সিরানে সেবারই সর্বপ্রথম অবিজ্ঞানীরা নিমন্ত্রিত হলেন।

সাম্প্রতিক

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

[মার্চ -'৭৩]

সুন্দর একটা হাসপাতাল ঘর, প্রচুর যন্ত্রপাতি আর ওষুধপত্র থাকলেই কি আমাদের গ্রামীণ সাধারণ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট হবে? মোটেই না। প্রথম কথা হল এ রকম আদর্শ হাসপাতাল আর্থিক কারণে খুব বেশি জায়গায় করা যাবে না। তাছাড়া দেখতে হবে অশিক্ষিত গ্রামবাসীর সেই জায়গায় যাওয়ার প্রবৃত্তি ও সুযোগ আছে কিনা। এটা তাঁদের বাড়ীর যথেষ্ট কাছে কিনা। আর সবচেয়ে বড় কথা ঐ হাসপাতালের ধারে কাছে না গিয়েও গ্রামীণ স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব কিনা। ঐ সব প্রশ্নের একটি উত্তর হলো সাভারে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি উদ্যোগে পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র'। ঢাকা-সাভার রাস্তায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে গেলেই ডান দিকে নজর পড়বে কয়েকটা তাঁবু, কিছু টিন শেড ও কি বারে আপনি গেলেন তার উপর নির্ভর করে নারী, পুরুষ অথবা শিশুর খুবই সুশৃঙ্খল দীর্ঘ লাইন, চিকিৎসার জন্য বা ওষুধ নেয়ার জন্য। কাছেই খোলা ময়দানে ছায়া আর বাঁশের তৈরি বেঞ্চির ব্যবস্থা করে একটা বিরাট ক্লাস রুম, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি সহ। এটা প্যারামেডিক্যাল শিক্ষা কেন্দ্র। এই নিয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থান। এখানে কাজ করেন নামমাত্র বেতন নিয়ে পরিচালক ড. জাফরুল্লা চৌধুরী সহ তিনজন ডাক্তার, কয়েকজন শিক্ষার্থী নার্স ও সাহায্যকারী আর কিছু ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক।

ডাক্তাররা ওখানেই থাকেন মাঠের উপর তাঁবুতে। কারণ স্থানীয় গ্রামবাসীদের আস্থা অর্জন করতে হবে, ওদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে হবে, নইলে আসল লক্ষ্যই ব্যর্থ। ওষুধপত্র, আয়োজন যা আছে মোটেই বিরাট কিছু নয়। তবে জাফরুল্লা চৌধুরীর মতে অধিকাংশ রোগও বিরাট কিছু নয়। বেশির ভাগই ত আসে পেটের কৃমি আর পুষ্টিহীনতা, রক্তশূন্যতা জনিত সাধারণ সব অভিযোগ নিয়ে। এর স্থায়ী সমাধান তো ওষুধে হবে না। রক্তশূন্য মহিলাদের কয় লক্ষ আয়রন টেবলেট আপনি বিলোবেন? বরং ওদের বুঝিয়ে বলতে হবে পালং শাকেই এর সমাধান– ওটা বেশি করে লাগাতে হবে, খেতে হবে। কৃমির মূলটাকেই নষ্ট করতে হবে যত্রতত্র পায়খানা না করে খুবই সহজ ও সরল অথচ স্বাস্থ্যসম্মত গর্ত পায়খানার ব্যবহার শিখিয়ে। সব কিছু শেষ পর্যন্ত এই জাতীয় সাধারণ শিক্ষার সমস্যা। বড় বড় রোগ কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড সবেরইতো সুন্দর প্রতিষেধক রয়েছে। শুধু সেগুলো নেয়ার মত শিক্ষা ও সুযোগ থাকলেই এ সব শিগ্‌গির নির্মূল করা যায়।

তাই গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্দেশ্য এই শিক্ষা ও সুযোগ গ্রামবাসীদের কাছে এনে দেয়। পুরো সাভার থানা জুড়ে এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা। শীতকালে জীপে এর সব জায়গায় যাওয়া যায়। বর্ষাকালে এর কোন কোন জায়গায় নৌকা নিয়ে যেতে হয়। ডাক্তার ও কর্মীরা এর বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি জরীপ চালিয়েছেন, চিকিৎসার জন্য লিষ্টিভুক্ত করেছেন। প্রত্যেক গ্রাম থেকে দু' একজন করে স্বেচ্ছাসেবক নেয়া হয়েছে প্যারামেডিক্যাল-এর জন্য। শিগ্‌গির ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে তাঁরাই যার যার গ্রামের সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে পারবেন, দরকারমত সাহায্য করতে পারবেন। জরীপের ফলে ওসব এলাকার গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান সম্বন্ধে বহু খুঁটিনাটি তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে যা সামগ্রিক পরিকল্পনায় খুব কাজে লাগবে। প্যারামেডিক্যাল ট্রেনিং-এ গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাতে করে তাঁরা গ্রামীণ স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবেন কম, কাজে লাগবেন বেশি। থানার ভেতর দূরবর্তী বিভিন্ন স্থানে কয়েকটা শাখা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনেরও পরিকল্পনা আছে। ইতিমধ্যে মূল কেন্দ্রটির ঘর ও যন্ত্রপাতির আরো উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে পুরো পরিকল্পনা জোরদার করে তোলার চেষ্টা চলছে।

এত সুষ্ঠু চিন্তা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে শুধু কয়েকজন উৎসর্গীকৃত কর্মীর সাধনা ও অক্সফাম এবং বাংলাদেশ ফাউণ্ডেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ও ব্যক্তিগত সাহায্যের উপর ভিত্তি করে এই বেসরকারী উদ্যোগ যেভাবে এগিয়ে চলেছে তা দেখলে অবাক হতে হয়। হয়তো বা আমাদের গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার চাবিকাঠি এখানেই।

সম্পাদকীয়

চাই দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যকর পলিটেকনিক

[এপ্রিল–'৭৩]

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ও উৎসব মেলা উপলক্ষে পুরো প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একবার ভাল করে চিন্তার অবকাশ ঘটেছে। প্রথমতঃ এই বিজ্ঞান মেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা প্রকৌশল ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা ও কাজের মান এবং সমাজ-সচেতনতা দেখে অবাক হয়েছেন। আর সব বাদ দিয়ে শুধু তাঁদের দেয়া পোষ্টারগুলোর কথা চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব একটি সুপরিকল্পিত ও সমাজসচেতন কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য তাঁদের আগ্রহ কতখানি। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এ ধরনের চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার আর তার বাস্তব রূপায়ণ হচ্ছে না কেন? সবার কাছেই শোনা যায় শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি মোড় দেবার কথা, একে গণমুখী করার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গতানুগতিকতার উর্ধ্বে বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে না। আগের মত হুবহু আরো অধিক কলেজ আর তাদের জাতীয়করণ করে কোন লাভ হবে না শুধু নূতন সমস্যা সৃষ্টি করা ছাড়া।

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞানমুখী স্কুল শিক্ষাকে ভিত্তি করে দেশব্যাপী অসংখ্য 'পলিটেকনিকই' হওয়া উচিত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল মাধ্যম, আমাদের আগামী কৃষি-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবের মূল হাতিয়ার। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সহ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নেবে এই ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ, হবে এর মধ্যমণি। শুধু একাডেমিক মনোবৃত্তির ও মেধাসম্পন্ন কিছু ছাত্র এতে অধ্যয়ন করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হবে সমাজের প্রয়োজনের উপর। শিক্ষিত, সফল মানুষ হওয়া মানেই হবে না বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করা। শিক্ষার আরো অনেক বিকল্পের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী হবে একটি। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শুধু তার সমানুপাতিক অংশ ও মনোযোগই দাবী করবে, তার বেশি নয়। এ ধরনের উদ্দেশ্য থাকলে শিক্ষা সম্বন্ধে পুরানো ডিগ্রী সর্বস্ব মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে ফেলতে হবে। ঠিক এই মুহূর্তে তার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না– বরং উল্টোটিই ঘটতে দেখা যাচ্ছে। এই ব্যাপারে সর্বস্তর থেকে আশু মনোযোগ প্রয়োজন।

বহির্বিশ্বে জীবন

[মে-'৭৩]

মোহাম্মদ আতাউল করিম

শুধু জুলভার্ণ আর জিওলকবস্কির সায়েন্স ফিকশানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং বহির্গ্রহে জীবনের উপস্থিতির সম্ভাবনা বর্তমান পৃথিবীর নভোবিজ্ঞানীদের সবাইকে অতিমাত্রায় সচেতন করে তুলছে। ফ্লাইংসসার আর রবোট মানুষের কল্পনাকে বাস্তব উপলব্ধি দিয়ে যাচাই করার প্রয়োজনে সবাই এখন একমত।

আমরা যাদের প্রাণী বলে চিহ্নিত করি, সে এককোষী এ্যামিবা (Amoeba)ই হোক অথবা বহুকোষী ডাইনোসোরই হোক, তার অস্তিত্বের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন তিনটি অনস্বীকার্য শর্তের। বাতাস; পানি এবং পরিমিত পরিবর্তন (variation) বিশিষ্ট তাপমাত্রার অনুপস্থিতিতে জীবনের টিকে থাকা মোটেই সম্ভব নয়। বহির্গ্রহে জীবনকে খুঁজে নেয়ার আগে তাই এই তিনটি শর্তের উপস্থিতিকেই নিরিখ করতে হবে।

বেশ ক' বছর আগে প্যাট্রিক মূর নামীয় একজন জ্যোতির্বিদ চাঁদের অ্যারিসটারকাস (Aristarchus) খাদের মেঝেয় কতকগুলো সরু সরু ফালি দেখতে পান এবং লক্ষ্য করলেন যে উক্ত ফালিগুলো একবার লম্বা হচ্ছে এবং তারপরেই আবার ছোট হয়ে পড়ছে, যেন এক বিরাটাকৃতির দানবের মাথার শুণ্ড নড়াচড়া করছে। এবং এমনতর নড়াচড়া তিনি আরো কয়েকটি জ্বালামুখে দেখতে পেলেন। আশ্চর্য হয়েই লক্ষ্য করা গেল যে, সেই ফালিগুলো রং পরিবর্তন করে সবজে বাদামী রঙে পরিণত হচ্ছে। দুপুরের দিকে (সেখানকার দিন কিন্তু দু' সপ্তাহেরই সমান) উক্ত ফালিগুলোকে প্রলম্বিত ও পরিষ্কার হতে এবং বিকেলের দিকে সেগুলোকে ছোট ও দুর্বোধ্য হতে দেখা গেলো। অবশ্যই কোন দানবের দেহাংশ ছিল না; তবে সেগুলো কি কোন উদ্ভিদের অংশবিশেষ, সেটাই ছিল তখনকার প্রশ্ন।

জীবনের উপস্থিতি যেমন করে প্রমাণ করা কঠিন, ঠিক তেমনি জীবনের অনুপস্থিতি সম্বন্ধেও সঠিক কিছু বলা রীতিমত দুষ্করই। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে জানা গিয়েছে যে, চাঁদের বেশ কিছুটা অংশে তাপমাত্রার পরিবর্তনের হার খুবই সীমিত। দিনে সেসব জায়গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হচ্ছে ৮৬° ফারেনহাইট আর রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমাণ দাঁড়ায় – ১০৩° ফারেনহাইট। বলা বাহুল্য, আমাদের পৃথিবীর মেরুদেশে এমন অনেক জায়গাই পড়ে আছে। অবশ্য প্রশ্ন তোলা যায়, "চাঁদে তো বায়ুমণ্ডল নেই"। এবং এতে ভুল নেই সত্যিই। তথাপি প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম প্রদেশে এবং বায়ুমণ্ডলের একেবারে উপরিভাগে আমরা জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাই। আবার বায়ুমণ্ডলের অনুপস্থিতিতে আমরা নিশ্চয়ই প্রাণঘাতী বিকিরণের শিকার হয়ে পড়বো। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য যে, বিজ্ঞানীরা আলামোস আণবিক শক্তি কেন্দ্রের আবর্জনাতেও জীবাণুকে বাঁচতে এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে দেখেছেন। সেখানে সেই আবর্জনাতে এতোই বেশি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার উপস্থিতি যে, তার দুহাজার ভাগের মাত্র একভাগই একজন মানুষকে শেষ করার পক্ষে যথেষ্ট। আপাতত এ সমস্ত অনেকটা রহস্যগোছের তথ্যই বটে।

বসন্ত রোগের ফলে মানুষের মুখের অবস্থা ঠিক যেমনটি হয়, বাস্তব ক্ষেত্রে চাঁদের উপরিভাগ অনেকটা তেমনিই। সারাটা চন্দ্রপৃষ্ঠ জুড়ে আছে অগুণতি খাদ (Crater), যাদের জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদরা এখনো সম্পূর্ণ অবগত

হননি। কিছুসংখ্যক বিজ্ঞানীর মতে এসব খাদ উল্কাপাতের ফলেই সৃষ্ট হয়েছে। আমাদের পৃথিবীর উপরিভাগে বাতাস থাকায় উল্কাপাতের সময় উল্কা বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর ওখানটায় চাঁদের উপরিভাগে বাতাসের অভাব হেতু উল্কাগুলো চাঁদের বুকে যেয়েই পড়ে। এমনিভাবেই হয়তো সৃষ্টি হয়েছে ছোট বড় লক্ষ লক্ষ খাদের। এবং শুধু এজন্যই চাঁদের বুকে অবস্থান করাটা প্রত্যেক জীবের পক্ষেই রীতিমত বিপদজনক।

আমাদের পৃথিবীর আকর্ষণকে ভেদ করে একটা রকেট বা কৃত্রিম উপগ্রহকে ছুটে যেতে তার গতিবেগ অন্তত সেকেণ্ডে সাত মাইল (ঘণ্টায় ২৫২০০ মাইল) হওয়া চাই। এর কম হলে রকেটকে অবশ্যই বিরক্ত হয়ে ফিরে আসতে হবে পৃথিবীর ভর-কেন্দ্রের দিকে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ গতিবেগকেই পৃথিবীর মুক্তিবেগ (Escape Velocity) বলা হয়ে থাকে। বাতাসের অণুগুলোও অনবরত ছুটোছুটি করছে এবং পরস্পর ধাক্কা খেয়ে ফিরছে। এই অণুগুলোর ছুটে বেড়ানোর গতিবেগ মুক্তিবেগের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে প্রায় সেকেণ্ডে দেড় মাইল। কিন্তু বাতাসের অণুগলোর গতিবেগ চাঁদের মুক্তিবেগের চেয়ে বেশি বলেই চাঁদের উপরিভাগে বাতাস থাকার সম্ভাবনা একেবারেই নেই।

এছাড়াও এ্যাপোলো–১১ কর্তৃক আনীত তথ্যসমূহকে তোলপাড় করেও বিজ্ঞানীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে জীবনের উপস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক মতামত দিয়ে অনেকাংশে ব্যর্থই হয়েছেন। রসায়নবিদরা চাঁদের মাটির কণাকে ৩.০০০০০ ক্ষমতা বিশিষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যন্ত পরীক্ষা করেন। কিন্তু কেউই জীবনের কোন খোঁজ পাননি। অবশ্য একজন রসায়নবিদ চন্দ্রশিলার মধ্যে খানিক কার্বন কণা খুঁজে পান; উল্লেখ যোগ্য যে, কার্বন জীবনের একটা অত্যাবশকীয় উপাদানই। অবশ্য উক্ত কার্বনও ছিল হাইড্রোকার্বন গোছের, যা' সাধারণতঃ পিচ্ছিলকারক (lubricant) তৈলের উপাদান হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেকে অবশ্য অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এই কার্বন কণা হয়তো বা ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে যা দাঁড়ায় তা'হলো, চাঁদে জীবনের সম্ভাবনার হার আশংকাতীতভাবেই কম বলে বিজ্ঞানীরা মত পোষণ করেন।

মঙ্গলগ্রহের বিষুব অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় আমাদের পৃথিবীর মতই, যার পরিমাণ হলো ৮০° ফারেনহাইটের কাছাকাছি। বাতাস আছে বলে জানা গিয়েছে ঠিকই, তবু সেখানকার বাতাসের ঘনত্ব পৃথিবীর চেয়ে অনেক গুণে কমই। সেখানকার মেরুপ্রদেশ শীতের সময় সাদাই দেখায়– পৃথিবী থেকে দেখতে সেই অংশকে অনেকটা বরফের টুপির মতই লাগে, কেউ কেউ একে পানির জমাটকৃত রূপ বলেই অভিহিত করেন, কেননা গ্রীষ্মকালে তা' আর সাদা দেখায় না। অতীতে অনেকেই মঙ্গলগ্রহের গায়ে দেখা নানারকম জ্যামিতিক রেখাকে জল সেচের জন্য নির্মিত বড় বড় খাল বলেই মনে করতেন। মঙ্গলগ্রহের মানুষ অথবা মানুষসদৃশ প্রাণীরা (?) হয়তো তাদের পানির চাহিদা মেটাবার জন্যই এসব করেছেন বলেই তাঁরা ধারণা করতেন।

যদি একান্তই মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিপ্রবণ প্রাণী থাকে, তবে তাদের আকৃতি কেমন হবে, তা নিয়ে পর্যন্ত অনেক কল্পনা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। হয়তো বা আমাদের মতই একটা মস্তিষ্ক এবং তৎসংলগ্ন ঘনীভূত দৃষ্টি এবং শ্রবণেন্দ্রীয়ই হবে তাদের বৈশিষ্ট্য। সেখানকার আবহাওয়া কঠোর হওয়ায় তারা নিশ্চয়ই দেখতে হবে অনেকটা কুৎসিত। আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম হওয়ায় এবং বাতাসে অম্লজানের স্বল্পতাহেতু ওরা হয়তো হবে একটু লম্বাটে এবং তাদের শ্বাসযন্ত্রটা হয়তো হবে একটু বেশি রকমেরই বিকশিত। অবশ্য এর সবকিছুই কল্পনা– স্রেফ অনুমানই।

আমাদের সৌরজগতের মাঝে পৃথিবীর পরে জীবনের অস্তিত্ব আর কেবল মঙ্গলগ্রহে আছে বলেই সবার ধারণা। গেলো শতাব্দীতেই রুশ বৈজ্ঞানিক তিমিরিয়াজেভ মঙ্গলগ্রহে ক্লোরোফিল (Chlorophyll) আছে বলেই সন্দেহ করেন। বলা বাহুল্য যে, ক্লোরোফিলই উদ্ভিদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে– তার সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) সম্বন্ধীয় গুণের জন্যই। ক্লোরোফিল সৌরবর্ণালীর (Solar spectrum) একটা বিশেষ তরঙ্গকে শোষণ করে থাকে সাধারণত; ফলে সেখানটায় একটা বর্ণহীন এলাকাকেই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মঙ্গলগ্রহের বর্ণালী পরীক্ষায় তেমন শূন্যস্থানকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবার লালেতর (Infra-red) কিরণে পৃথিবীর উদ্ভিদের ছবি সাদা দেখায় ঠিকই; কিন্তু মঙ্গলগ্রহের ছবিতে সাদা দেখায় না। অবশ্য জাবরিল আঁদবিয়াঁনভিচ তিখোভ এ ব্যাপারে একটা আকর্ষণীয় প্রস্তাব দেন। তাঁর মতে লালেতর কিরণের ছবিতে পৃথিবীর উদ্ভিদের ছবি সাদা দেখায় এজন্যই, কেননা যতটুকুন কিরণ উদ্ভিদের প্রয়োজনে লাগে না, শুধু সেটুকুই (সাদা অংশ) ছবির প্লেটে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। মঙ্গলগ্রহে সূর্যের তেজ বেশি নয় বলে সেখানে হয়তো বা "সব রকম-সম্ভব" কিরণ উদ্ভিদের (?) কাজে ব্যয়িত হয়। অতিলাল কিরণে মঙ্গলগ্রহের উদ্ভিদ (?) যে সাদা দেখায় না, এটা তারই একটা কারণ হতে পারে বইকি।

মঙ্গলগ্রহ একটা মুমূর্ষু গ্রহই। পৃথিবীর চেয়ে আকারে ছোট হওয়ায় এর মুক্তিবেগ সেকেণ্ডে মাত্র তিন মাইলই। তাই অধিক পরিমাণ বাতাস ধরে রাখার মত ক্ষমতা এই গ্রহের নেই। মঙ্গলগ্রহস্থিত বাতাস এতোই বেশি পাতলা, যা আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠের নয় মাইল উপরকার বাতাসেরই সমমানের। সমুদ্রতলে পাওয়া অম্লজানের পরিমাণের হাজার ভাগের একভাগ হতেও কম হলো মঙ্গলস্থিত অম্লজানের পরিমাণ।

আবার সেখানকার বাতাসের শতকরা মাত্র পাঁচভাগ হচ্ছে জলীয় বাষ্প; এই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ দেখে খুব বেশি পানির আশাও করা যায় না। বিষুব রেখা এবং মেরুর মাঝামাঝি এলাকায় শীতকালীন তাপমাত্রা হচ্ছে – ১১২° ফারেনহাইট। এদিক দিয়ে আমাদের উত্তর মেরুর চেয়ে অনেক অনুকূল সে তাপমাত্রা; আবার মেরু এলাকায় মাসের পর মাস ধরে সূর্য অস্তমিত হয় না। মোটামুটিভাবে মঙ্গলের অংশ বিশেষে প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা খুব কম ঠিকই, এতে 'একেবারে নেই' বলার মত কোন যৌক্তিকতাও নেই। বিশেষ করে কিছু কিছু উদ্ভিদের পক্ষে মঙ্গলগ্রহ একটা চমৎকার পরিবেশই বটে। ম্যারিনার নামীয় নভোযান যে সব তথ্য পাঠিয়েছে, সেগুলোও আর কোথাও জীবন আছে বলে ধারণা করতে মোটামুটি নারাজ। যন্ত্রসজ্জিত এই নভোযান মঙ্গলগ্রহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানটায় কোন নাইট্রোজেন (Nitrogen) গ্যাসের সন্ধান পায়নি। কিন্তু নাইট্রোজেন গ্যাস পৃথিবীর জীবনসমূহের একটা মূল্যবান উপাদান বিশেষই। এমনকি সেখানকার বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওযোন (Ozone) গ্যাসেরও কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কিন্তু একমাত্র ওযোনই সূর্য হতে আগত মারাত্মক অতিবেগুনী রশ্মিকে (Ultraviolet ray) বাধা দিয়ে থাকে। ২২,০০০ মাইল উপর হতে তোলা ছবিগুলোতে মঙ্গলকে একটা লালচে রংয়ের হিমশীতল গ্রহ বলেই বোঝা যায়।

এর এক সপ্তাহ পরে ম্যারিনা–৭ এ রাখা লালেতর বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র (Infra-red Sepectrometer) মঙ্গল গ্রহে অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। এ দুটো গ্যাসের উপস্থিতি মৌলিক জীবনের পক্ষে খুব বেশিই প্রয়োজনীয় এবং পৃথিবীতে সাধারণ, জৈবিক ক্ষয়ের (Organic decay) ফলেই এগুলো সৃষ্টি হয়ে থাকে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ জর্জ সি পাইম্যানটাল জোর দিয়েই ঘোষণা করেন যে, "এগুলো হয়তো মঙ্গলগ্রহের কুমেরুস্থিত অপেক্ষাকৃত ভালো অংশে (যেখানে তাপমাত্রা হচ্ছে ৯৪° ফারেনহাইট) অবস্থিত কোনরূপ জীবেরই রূপান্তরিত অবয়ব। তিনি আরোও বললেন, "এই জীবগুলো হয়তো মেরুর বরফ হতেই পানি পেয়ে থাকে এবং অতিবেগুনী রশ্মির হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য সম্ভবত তাদের উপরের অঙ্গারাম্লজান (Carbon di oxide) গ্যাসের স্থরই সাহায্য করে।" অবশ্য অনেক বিজ্ঞানীই উপরোক্ত বরফকে 'বরফ' বলতে নারাজ। তাদের মতে ওগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া অঙ্গারাম্লজান গ্যাস যাকে সাধারণত আমরা শুষ্ক বরফ (Dry Ice) বলে থাকি। তাদের যুক্তিকে অনেকাংশে মদদ জুগিয়েছে ম্যারিনার-৭ এর লালেতর বেতার পরিমাপ যন্ত্রের (Infrared Radiometer) একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। উক্ত তথ্যানুসারে মঙ্গলের কুমেরুর তাপমাত্রা হচ্ছে ২৫৩° ফারেনহাইট, যা অঙ্গারোম্লজান গ্যাসের হিমাঙ্কের (Freezing Point) কাছাকাছি একটা তাপমাত্রাই।

মঙ্গলে কোন কৃত্রিম সেচ খালের সন্ধান পাওয়া যায়নি এবং ওখানটায় কোন পর্বতশ্রেণী, উপত্যকা বা সমুদ্র আছে বলেও কোন তথ্য আসেনি। তবু বিজ্ঞানীরা জীবনের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছেন না। অনুসন্ধানীরা মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে মঙ্গলগ্রহে রোগজীবাণু, মৌলিক জীব অথবা শ্যাওলা পরীক্ষার দ্বারা জীববিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, মঙ্গলগ্রহের তাপমাত্রায় এ্যালজি (Algae), গাছের বীজ এমনিক গুবরে পোকা পর্যন্ত বাঁচতে সক্ষম।

বাংলাদেশে পদার্থবিদ্যা চর্চা

[মার্চ '৭৪]

অজয় রায়

পদার্থবিদ্যা একটি সুশৃঙ্খল এবং জটিল শাস্ত্র; বিষয়ের ব্যাপ্তি ও গভীরতায় যেমন অনন্য তেমনি তত্ত্ব ও তথ্য সম্ভারে ন্যুব্জ। বিষয়ের মনোহারিত্বে আকর্ষণীয় অথচ প্রবেশদ্বার সবার জন্যে উন্মুক্ত নয়। প্রতিভাধর নিষ্ঠাবান সাধকই কেবল এ বিশেষ জগতের সৌন্দর্য উপলব্ধিতে পারঙ্গম। যে কোন দেশের পরিসংখ্যানে তাই লক্ষ্যণীয় যে তুলনামূলকভাবে মেধাবী ছাত্ররা পদার্থবিদ্যা অধ্যয়নে অধিকতর উৎসাহী। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু অধুনা বিশেষ করে এদেশ নতুন নামে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান লাভের পর একটি প্রায়শঃ উচ্চারিত প্রশ্ন শ্রুত হয়– 'বাংলাদেশে পদার্থবিদের ভবিষ্যত কি?' এ জিজ্ঞাসা শিক্ষাদান ও গবেষণারত পদার্থবিদের, এ প্রশ্ন অধ্যয়নরত ভাবী পদার্থবিদের। পদার্থবিদ্যা ও পদার্থবিদ্ পরস্পর অনুবদ্ধ। সুতরাং প্রশ্নটি অন্যভাবে উত্থাপন করা যায়– 'এদেশে পদার্থবিদ্যার ভবিষ্যত কি?' অর্থাৎ বাংলাদেশে পদার্থবিদ্যা চর্চায় কতখানি অগ্রসর হওয়া সম্ভব! এ প্রেক্ষিতে পদার্থবিদের ভবিষ্যত নির্ধারিত এবং বিচার্য।

বিজ্ঞানের অন্য শাখার মত পদার্থবিদ্যা চর্চার দুটি দিক রয়েছে– একটি মৌলিক গবেষণামুখী, অন্যটি ফলিত বা প্রযুক্তির। প্রযুক্তি ও ফলিত দিকটি সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে অন্বিষ্ট– সমাজ কল্যাণ ও চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মৌলিক গবেষণা আবার পারস্পরিক সম্পূরক দুটি খাতে প্রবহমান– একটি বিশুদ্ধ তত্ত্বীয়, অপরটি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ নির্ভর। বলা নিস্প্রয়োজন যে পদার্থবিদ্যার যে কোন শাখা ও উপশাখার চর্চা ও অধ্যয়ন ব্যয়সাপেক্ষ, বিশেষ করে পরীক্ষণ নির্ভর গবেষণা। পরীক্ষা ও নিরীক্ষার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের প্রয়োজন – এ জন্য দেশকে বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়(!) করতে হয়। প্রয়োজন ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত গবেষণাগার। প্রয়োজন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সহায়ক আধুনিক 'কামারশালা' এবং সর্বোপরি প্রয়োজন একটি দেশজ শৈল্পিক পটভূমি। বিশুদ্ধ তত্ত্বীয় গবেষণার জন্য প্রয়োজন একটি উচ্চমানের গ্রন্থাগার ও সহজে ও অত্যল্প সময়ে প্রাপ্তব্য জার্নাল ও সাময়িকীর। প্রয়োজন একটি উৎকৃষ্ট কম্পিউটারের। এদেশের পদার্থবিজ্ঞান চর্চাকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনার সমতলে প্রক্ষেপ করে বিচার করা প্রয়োজন। আকাশচুম্বী প্রকল্প ও যোজনা কেবল পদার্থবিদদের আশাভঙ্গের কারণ ঘটাবে– পদার্থবিদ্যা বাংলাদেশ অচলায়তনে বন্দীর জীবন-যাপনে বাধ্য হবে।

স্বাধীনতালব্ধির পর আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিপর্যস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। আহার্য সংস্থান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ স্রোতকে গতিশীল রাখতে সরকার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও দিশাহারা, এমতাবস্থায় ব্যয়বহুল পদার্থবিদ্যা চর্চার প্রবাহকে জীবিত ও স্ফীত করার প্রচেষ্টা কতখানি সফলতা এনে দেবে তা পদার্থবিদদের ভাবিয়ে তুলছে। যেখানে শিক্ষায়তনে পদার্থবিদ্যা শিক্ষাদান কার্যটি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না, সেখানে গবেষণায়, তা ব্যবহারিক প্রয়োজনে অথবা বিশুদ্ধ জ্ঞান-চর্চার জন্যেই হোক, কতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব? অথচ এমনটি আমরা চাই না। যে অর্থে সোভিয়েত পদার্থবিদ্যা বা চৈনিক পদার্থবিদ্যা, সে অর্থে বাংলাদেশীয় পদার্থবিদ্যার একটি সুদৃঢ় ভিত্তি-নির্মাণ অবশ্য প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যার প্রয়োগের যে বিরাট ও ব্যাপক পশ্চাদভূমি রয়েছে তাকে অস্বীকার করে তো

দেশের বস্তুগত উন্নতি সম্ভব নয়। শুধু বস্তুগত উন্নতি নয়, জ্ঞানের অন্যান্য শাখার পরিপুষ্টির জন্যও পদার্থবিদ্যার পরিশীলন আবশ্যক – কারণ যে কোন সুশৃঙ্খল জ্ঞান আজ বাঙময় হয়ে উঠছে পদার্থবিদ্যার ভাষায়, ভৌত কৌশল প্রয়োগে।

এছাড়া সমস্যার আর একটি দিক রয়েছে– কার্যক্ষেত্রে পদার্থবিদের নিযুক্তির সুযোগ ও সুবিধা। কিছুদিন পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান সমিতির এক সমীক্ষণে দেখা যায় যে বাংলাদেশে বর্তমানে গড়ে প্রতি বৎসর অন্যূন দেড় শত পদার্থবিদ্যায় এম এস সি উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির উৎপাদন হয়। এ সমীক্ষানুযায়ী ও উৎপাদিত পদার্থবিদের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ পদার্থবিদ্যা বিবর্জিত জীবিকায় নিয়োজিত। বাকীদের মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগ কলেজ অধ্যাপনায় এবং অন্যরা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে নিযুক্ত। বর্তমানে দুচার জন মেধাবী ও ভালভাবে উত্তীর্ণদের সংখ্যা বাদ দিলে চাকুরীর ক্ষেত্রে ইতিহাসের এম. এর সঙ্গে পদার্থবিদ্যায় এম এস সি র কার্যতঃ কোন প্রভেদ নেই। ফলে ক্রমবর্ধমান হারে কার্যক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যায় উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। সম্ভবতঃ উল্লিখিত দু কারণে ভাবী পদার্থবিদের শঙ্কাকুল জিজ্ঞাসা 'পদার্থবিদের ভবিষ্যত কি?'

বলাবাহুল্য উপরিবৃত প্রশ্নটির গাণিতিক কোন সহজ সূত্র-সিদ্ধ উত্তর নেই। 'ট্রিভিয়াল' সমাধান অবশ্য আছে যা একটি শব্দে প্রকাশ করা যায়– 'অন্ধকারময়'। ট্রিভিয়াল সমাধান যে সমস্যার সমাধান নয়, সমস্যার নিশ্চিহ্নকরণ মাত্র তা বলার অপেক্ষা রাখে না! কোন পদার্থবিদই নিশ্চিহ্নকরণের সমাধান মেনে নিয়ে পদার্থবিদ্যাকে বাক্স বন্দী করে রাখতে চাইবে না। অতএব যৌক্তিক সমাধান চাই; এবং এ সমাধান পদার্থবিদকে খুঁজে পেতে হবে। শুরু করতে হবে একেবারে গোড়া থেকে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পরীক্ষা নির্ভর মৌলিক বা ব্যবহারিক গবেষণা একটি ব্যয়বহুল ব্যাপার। অথচ পরীক্ষা-নীরিক্ষা বর্জন করে পদার্থবিদ্যা অনুশীলনের উপায় নেই; পদার্থবিদ্যা মুখ্যতঃ পরীক্ষা ধর্মনশাস্ত্র। প্রথমেই পদার্থবিদ্যাকে ফলিতভাবে বাংলাদেশের কোন শৈল্পিক শাখায় প্রয়োগ সম্ভব তা বিচার করা প্রয়োজন। বলে রাখা ভাল, পৃথিবীর কোন দেশই সব শিল্পে সমান দক্ষতা বা বিশেষত্ব অর্জন করেনা। দেশের সম্পদ, লৌকিক ক্ষমতা ,প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের অবস্থান সম্পদ ও সঙ্গে বিশেষ ধরনের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশে যে তিনটি শিল্পের সম্ভাবনা অধিকতর সমুজ্জ্বল তা হল- বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, চর্মশিল্প। এ তিনটি ক্ষেত্রে পদার্থবিদদের কাজে লাগান যেতে পারে। তুলাজাত ও পাটজাত সূত্রের গুণাগুণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ও গুণের তারতম্য বিধানের সমস্যা মূলতঃ পদার্থবিদ্যার আয়ত্বাধীন। পাট গবেষণা কেন্দ্রে পদার্থবিদ্যার একটি শাখা রয়েছে; এ শাখাটিকে আরও উন্নততর স্তরে আনা সম্ভব এবং পাট নিয়ে আরও তীক্ষ্ণ গবেষণা চালাবার অবকাশ আছে। চটের থলি ও কাঁচা পাট বিক্রয় করে আর বেশী দিন আমাদের মুমূর্ষ অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। তুলাজাত সূত্র ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে গবেষণা চালাবার জন্য একটি টেক্সটাইল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধীনে উন্নতমানের পদার্থবিদ্যা বিষয়ক সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার থাকা আবশ্যক। এ গবেষণাগারে টেক্সটাইল যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উদ্ভাবন ও নির্মাণের পরিকল্পনা সংযোজিত হবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন এদেশের সমস্যা আমাদেরই সমাধান করতে হবে, আমাদের হয়ে অন্যরা এগিয়ে আসবে না। সাধারণভাবে সূত্রের মাধ্যমে অন্য দেশীয় বিজ্ঞান চর্চার ফলটুকুই পেতে পারি তার দেশজ প্রয়োগ এদেশের বিজ্ঞানীদের এবং প্রযুক্তিবিদদের উপর নির্ভরশীল।

কৃষির উন্নয়নে পদার্থবিদরা তাদের অবদান রাখতে পারে দুটি ক্ষেত্রে–প্রথমতঃ তেজস্ক্রীয় রশ্মির ব্যবহারে উন্নতমানের বীজ উদ্ভাবন ও ফসল বৃদ্ধিতে। তেজস্ক্রীয় রশ্মির প্রভাবে বীজের গুণগত পরিবর্তনের অর্ন্তনিহিত প্রক্রিয়া পদার্থবিদ অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে বুঝতে সক্ষম; কারণ প্রক্রিয়াটি মূলতঃ জৈব অণুর সঙ্গে রশ্মির মিথস্ক্রিয়াজনিত। ভৌত কৌশল প্রয়োগে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর সহযোগিতায় পদার্থবিদ সমস্যাটি বুঝবার ক্ষেত্রটি প্রশস্ততর করে তুলতে পারে। দ্বিতীয়ত সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পদার্থবিদ উন্নততর পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হতে পারে। জলের সংরক্ষণ, সুষম বন্টন- প্রকৃতিভেদে আঞ্চলিক সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাকার সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে পদার্থবিদদের কাজে লাগান যেতে পারে। এছাড়া আমাদের দেশোপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ কাজেও পদার্থবিদরা সহায়তা দানে সক্ষম। তাই কৃষি গবেষণাসমূহে এ ধরনের সমস্যার মোকাবিলার জন্য গবেষণা শাখা স্থাপন ও পদার্থবিদ নিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে।

বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স শিল্প এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প গড়ে তুলতে পদার্থবিদগণ সব চাইতে বেশী অবদান রাখতে পারবে। এজন্য সরকারী সহায়তায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন ও পদার্থবিদ নিযুক্তির

প্রয়োজন। প্রথম পর্যায়ে অন্য দেশের 'Technical know how' কে সরাসরি অনুকরণে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। জাপান, চীন, ও ভারতবর্ষ একই পন্থা মোটামুটিভাবে অনুসরন করেছে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এখনও করছে।

আমেরিকার তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের অগ্রণী ওপেনহাইমার সেখানে তাত্ত্বিকদের চমৎকার একটা গ্রুপ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা পদার্থবিদ্যাকে বেশ বিমূর্ত ও গাণিতিক করে প্রকাশে অভ্যস্ত ছিলেন। আর এনরিকো ফার্মী ছিলেন এর বিপরীত– তিনি সরল সরাসরি বর্ণনা পছন্দ করতেন। ফার্মী একবার বলেছিলেন, আমি বোধ হয় পুরানো জংধরা হয়ে পড়েছি,কারণ ওপেনহাইমারের ছাত্রদের তত্ত্বকথা ইদানিং বুঝতে না পেরে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষের একটা বাক্য আমাকে চাঙ্গা করে তুললো বাক্যটা ছিল: "আর এটাই ফার্মীর বীটা ক্ষয়ের তত্ত্ব।"

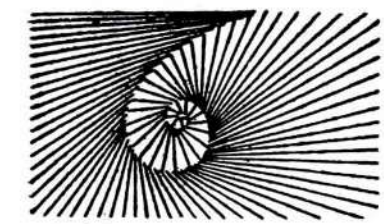

যে চিঠি আমরা বিলম্বে পেলাম

[এপ্রিল '৭৪]

[গত চৌদ্দই মার্চ আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর লেখা একটা চিঠি আমাদের হাতে এসেছে। এটি লেখা হয়েছে, বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদকের কাছে। আচার্যের নিজের হাতে লেখা এই চিঠিতে কোন তারিখ দেয়া নেই, তবে খামের উপর ডাকঘরের সীল থেকে দেখা যাচ্ছে এটা পোষ্ট করা হয়েছে জানুয়ারীর বাইশ তারিখ। এর বারদিন পর ফেব্রুয়ারীর চার তারিখ আচার্য বসু পরলোক গমন করেন। ঠিকানার ভুলে নানা হাত ঘুরে যখন আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে-তখন আচার্য আর নেই। শুনেছি মৃত্যুর আগে কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। এমনও হতে পারে এটা তাঁর লেখা শেষ চিঠি। নানা কারণে শুধু বিজ্ঞান সাময়িকীর কাছে নয়, বাংলাদেশে আচার্যের অসংখ্য অনুরাগী ও উত্তরসূরীদের কাছে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে বলে আমরা মনে করি।]

সত্যেন বোস — বাইশ ঈশ্বর মিল লেন, কোলকাতা ছয়

বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদক মহাশয়,

নিয়মিতভাবে আপনার কাগজ পাচ্ছি ও পড়ে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছি। প্রায় তিরিশ বছর পর বাংলাদেশের এই সংস্কৃত চর্চা ও আলোচনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। মনে পড়ছে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো তখন আমরা কয়জন নবীন মিলে 'বারোজনা' বলে একটি সভায় মিলিত হতাম। তার মধ্যে পেয়েছিলাম সবে বিলাত প্রত্যাগত হাকিম শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়কে ও পরলোকগত পূর্ণেন্দু মজুমদার, তখন ঢাকা কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক। কাজী মোতাহার হোসেন তখন ছিলেন সভ্য সকলের থেকে বয়সে ছোট। সেই আড্ডায় নানা বিষয়ের আলোচনা হতো। শেষ অবধি 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে বাঙলায় একটি মাসিক পত্র বার করা হয়। দেশ ভাগ হলো আমি চলে এলাম, তারপরেও কিছুদিন সে কাগজ চলেছিল বলে শুনেছি। বিজ্ঞানের বিষয়ে ঝরঝরে সুন্দর রচনা বার হচ্ছে আপনার সাময়িকীতে তবে একটা কথা বলে (একটি বিষয়ে) আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে ইচ্ছে করছে। বিদেশে যেসব অদ্ভুত আবিষ্কার হয়েছে সেই কথায় শুধু প্রচার করা এদেশের বিজ্ঞানীর মূখ্য কর্ম নয় বলে আমার ধারণা। নিজের দেশের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তার গাছপালা জীবজন্তুর কথা, তার নদ-নদী কৃষি বাণিজ্য এবং শেষাবধি বর্তমানে দেশের মধ্যে যেসব নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিলে দেশে বিজ্ঞানের হাওয়া চলবে ও মনোভাব তাড়াতাড়ি বদলাবে বলে আমার ধারণা। প্রাচ্যদেশে সনাতনী মনোভাব, গোঁড়ামী ও জাতিবিদ্বেষ হলো সর্বনাশের মূল।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে মনোহর। চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ , পদ্মা-মেঘনা ঘেরা বিস্তৃত সমতল ও তার পরিশ্রমী অধিবাসীরা এসব মিলে আকর্ষণীয় করে রেখেছে চিরদিনই বাংলাদেশকে। নতুন প্রগতির যুগে শিল্প কিবা গড়ে উঠলো, আরো দেশের প্রয়োজনীয় কত কী গড়তে বাকী রয়েছে সে সবের হিসাব আপনার সাময়িকীতে প্রকাশিত হোক। বাংলা ভাষাভাষী আমরা দুদেশে শুনেছি ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে অনেক উন্নতি করেছেন, সংগ্রহ করেছেন অনেক প্রাচীন গাথা ও কাহিনী, বলার ভঙ্গী ধরে রেখেছেন নানা সংগ্রহে। সেসব অমূল্য সম্পদ এদেশের লোকে অংশীদার হিসেবে ভাবলে হয়ত আপনাদের আপত্তি হবে না।

'৭৩ সাল মোটামুটি দুর্বৎসর বলে সাধারণে ভাবছে। চারিদিকে সংঘাত, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয় ইত্যাদি। আমাদের মতো বাঙলাদেশের লোকেরা নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। তবে আপনাদের মতো আশাবাদীদের দেখে মনে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে— যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যোগ্য হাতে অর্পিত হয়েছে! ভাষা ও দেশ সংস্কৃতি ও সম্পদ আপনারা ধাপে ধাপে উচ্চে তুলতে থাকুন। যেসব নবীনেরা বাঙলাদেশে বঙ্গবন্ধুর চারিদিকে জড়ো হয়েছে তারাই বাঙলা মাকে সুজলা শস্যশ্যামলা প্রসন্নময়ী সোনার বাঙলা করে রাখবে।

সবহুমান অভিবাদন জানিয়ে শেষ করি।

ইতি—

সত্যেন বোস

আচার্যের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ

[এপ্রিল '৭৪]

আনোয়ারুর রহমান খান

সত্যেন বোসকে দেখার বাসনা ছিল অনেক দিনের। বলতে গেলে ছেলেবেলা থেকেই। আমার এক বড় মামাতো ভাই ছিলেন তাঁর ছাত্র, অনেক গল্প শুনেছি এই অনন্যসাধারণ মানুষটি সম্বন্ধে তার কাছে। কিন্তু স্কুল পেরিয়ে যখন ঢাকায় এসে কলেজে ভর্তি হলাম, তখন উনি ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন কোলকাতায়। তারপর কার্জন হলে এলাম ফিজিক্স পড়তে, আরও পরিচিত হলাম সত্যেন বোসের কর্মজীবনের ছোট বড় নানা দিকের সঙ্গে। বাসনাটা তীব্রতর হলো কিন্তু রাজনৈতিক কারণে আশাটা হলো ক্ষীণতর। তারপর হঠাৎ একদিন রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই সে সুযোগ এসে উপস্থিত হলো।

গত অক্টোবরের শেষের দিকে ভারতীয় ইলেকট্রন- মাইক্রোস্কোপ সোসাইটির কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলাম বারানসি। সেখান থেকে দিল্লী ফেরার পথে কোলকাতায় ছিলাম দুদিন, সাহা ইনসটিটিউটের অতিথি হিসাবে। ৪ঠা নভেম্বর রবিবার সকালে কোলকাতা নেমেই প্রথম গেলাম সাহা ইনসটিটিউটের প্রফেসর নরেন্দ্রনাথ সাহার বাসায়। প্রোগ্রামের কথা উঠতেই বললাম এখানে আমার প্রধান প্রোগ্রামই হচ্ছে প্রফেসর বোস এর সঙ্গে দেখা করা। উনি একটু সন্দিহান হয়ে বললেন 'প্রফেসর বোসের শরীরটা বিশেষ ভাল নয়, এখন সাধারনতঃ কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করেন না। আমার ঐকান্তিকতা দেখে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে সন্ধ্যায় জানাবো কি হয়।'

ফোন এলো, নিরাশ কণ্ঠ 'প্রফেসর বোস তেমন সুস্থবোধ করছেন না, দেখা সাক্ষাত এখন স্থগিতই রেখেছেন'। অনেকটা বেপরোয়া হয়েই বললাম 'আমি নিজেই একবার অনুরোধ করে দেখবো?'

বললেন 'দেখতে পারেন'। ফোন নাম্বার দিলেন ৫৫১৫৬৪।

কয়েকবার রিং টোনের পর ভেসে এলো 'হ্যালো'।

বললাম, 'এটা কি প্রফেসর সত্যেন বোসের বাসা?'

'হ্যাঁ'

'প্রফেসর বোসের সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?'

'বলছি,'

ঢোক গিলে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার নাম বলে বললাম 'আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছি'। আমি 'আপনার ছাত্র নই, আপনার ছাত্রের ছাত্র।'

'কবে এসেছো?'

'ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ কনফারেন্সে এসেছিলাম। সেখান থেকে দিল্লী হয়ে আজই সকালে কোলকাতা পৌছেছি, কাল আছি, পরশু সকালে ঢাকা ফিরে যাবো। যাওয়ার আগে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে চাই।

একটু থেমে বললেন, 'আচ্ছা তুমি এসো কাল সকালে। আমার শরীরটা আজকাল ভাল যাচ্ছে না। সকাল নটা থেকে দশটার মধ্যে এসো।'

পরদিন ৫ই নভেম্বর সোমবার। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে রইলাম। গাড়ী এলো সময় মতই, রওনা দিলাম। ড্রাইভারের পরিচিত পথ। স্কটিস চার্চ কলেজের কাছে একটা সাধারণ গলি, ঈশ্বর মিল লেন। তার বাইশ নম্বর বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামলো। নিতান্তই একটা সাধারণ লালচে রং এর দোতলা। আমার যেন বিশ্বাস হোলো না। ড্রাইভার কাশীনাথের দিকে তাকালাম। কাশীনাথ বললো 'হ্যাঁ এটাই প্রফেসর বোসের বাড়ী'।

নেমে যেয়ে কড়া নাড়লাম, যুবা বয়সের এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম 'প্রফেসর বোসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি'। ভেতরে আসতে বললেন। ঘরের ভেতরে যেয়ে দেখলাম এটা কোন সাজানো গোছানো 'ড্রইং রুম, নয়। ঘরের একদিকে রয়েছে একটা খাট। আর রয়েছে গোটা দুই চেয়ার একটা টেবিল, কিছু আসবাবপত্র।

খাটে শুয়ে আছেন প্রফেসর সত্যেন বোস, পরনে একটা লুঙ্গি,গায়ে একটা হাফসার্ট, তার উপর একটা জাম্পার। একটা কাগজে ছকের মত সাজিয়ে কতগুলি সংখ্যা লিখে কি যেন করছেন। পাশে একটা থালা,তাতে কিছু মুড়ি। আর এদিক সেদিক ঘিরে আছে দশটা বেড়াল। আমাকে দেখে উঠে বসলেন। চোখে পুরু লেন্সের চশমা ,বিস্তর্ণ কপাল, সাদা এক মাথা চুল, মুখে মিষ্টি হাসি।

অভিবাদন জানিয়ে নাম বললাম। বসতে বললেন কাছে।

তারপর প্রশ্ন। কবে ভারতে এসেছি? কোথায় কোথায় গেলাম। কবে পাশ করেছি? কতদিন ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট-এ আছি? নানা প্রশ্ন। বিদেশে কোথায় ছিলাম? কি বিষয় রিসার্চ করেছি? কতদিন ছিলাম? এমনি প্রশ্ন করে যেন আমাকে সম্পূর্ণ জেনে নিতে চান। প্রশ্ন করলেন,আমি দেশে বিয়ে করেছি না বিদেশে? বললাম, 'দেশে'। খুব খুশি হলেন। তাঁর এক বিধবা আত্মীয়া ছিলেন কাছে। তাকে ডেকে বললেন 'দ্যাখো কি লক্ষী ছেলে, দেশী বৌ নিয়ে বিলেতে সাত বছর সংসার করে এসেছে।' প্রশ্ন ও কথার ফাঁকে কোন সময় যে আপন করে নিয়েছেন- বুঝতেই পারিনি, ভুলেই গেছি আমাদের পরিচয় মাত্র কয়েক মিনিটের ।

আমি একবার সেই কাগজটার কথা জিজ্ঞাসা করলাম 'স্যার কি করছিলেন'?

উত্তর দিলেন, 'ও কিছু নয় পুরোনো জিনিস, গুণ, ভাগ।' বললাম, আপনার একটা লেখা পড়লাম- সেদিন দেশ পত্রিকায় (দেশ ২৯শে ভাদ্র ১৩৮০)।

হেসে দিয়ে বললেন 'পাড়ার ছেলেরা এসেছিল চাঁদা চাইতে, ওদেরকে লেখাটা দিয়ে বললাম 'পত্রিকায় দিও যা পাও তোমরা নিয়ে নিও।' হাইনরিখ বোল এর গল্প। বোল নোবেল প্রাইজ পেলো,ওর কোন লেখা আমি আগে পড়িনি, লাইব্রেরী থেকে একটা বই আনিয়ে পড়লাম, গল্পটা ভালো লাগলো। তাই অনুবাদ করেছিলাম। আর একটা অনুবাদ করেছি, সেটা ইহুদীদের সম্বন্ধে, কেমন করে সরল ধর্মপ্রাণ ইহুদী মেয়েদের অনেকে ঠকায় তাই নিয়ে লেখা। এখন আরব ইস্রাইল যুদ্ধ চলছে বলে পত্রিকায় ছাপছে না। যুদ্ধ থেমে গেলে ছাপবে। পড়ো।

সেটা এরপর ঢাকার কথা উঠলো। অনেক জানতে চাইলো। জানতে চাইলেন তাঁর সময়কার কে কে আছে ডিপার্টমেন্টে। কাজী সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। 'মোতাহার হোসেন কোথায় আছে?'

বললাম, উনি পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন কিছুদিন হয় ফিরে এসেছেন।

মতীন চৌধুরী সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, ইন্নাস আলী সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কার্জন হলের পশ্চিমদিকে যে বাড়িটায় থাকতেন সেটার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন 'সেটা নাকি ভেঙ্গে ফেলেছে?' বললাম হ্যাঁ সেখানে বিজ্ঞান ভবন উঠছে। কার্জন হলের পূর্বদিকে যে বাড়ীটায় আগে ছিলেন সেটার কথাও জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন, 'অনেক বোগেন ভ্যালিয়ার গাছ লাগিয়েছিলাম, সেগুলো কি আছে? বললাম 'না স্যার, রাস্তাটা চওড়া করায় সেগুলি কাটা পড়েছে।'

বুঝলাম ফেলে আসা ঢাকা এখনও তাঁর চোখে ভাসছে। বললাম 'ঢাকার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আবার অনেক কিছু ঠিক আগের মতই আছে, কার্জন হলে আপনার রুমটা ঠিক তেমনি আছে। আলমারীগুলো তেমনি সাজানো আছে। টেবিলটা,ঘড়িটা তেমনি আছে। আপনার ফটো টাঙ্গানো আছে',. তার নীচে বসেই আমরা কাজ করি। আপনি গেলে সব দেখতে পাবেন।'

একটু থেকে বললেন, 'দেখার শক্তি এখন আমার কমে গেছে। একটা চোখে তো মোটেই দেখতে পাই না, আর একটা চোখেও পাওয়ার অনেক বেড়েছে।'

বললাম, 'বোস সংখ্যায়নের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী পালিত হচ্ছে ঢাকায়। সবাই আগ্রহ করে আছে, আপনি যাবেন। আপনি গেলে সবাই খুব খুশি হবে।' বললেন 'শরীরের যা অবস্থা কিছুই বলতে পারছি না।'

'আপনি যদি যেতে না পারেন তাহলে আপনার একটা ফটো তুলে নিয়ে যাই।

'ফটো তুলবে? ক্যামেরা এনেছো? কই দেখিতো কি ক্যামেরা?'

ক্যামেরাটা হাতে তুলে দিলোম। শুনেছি ওঁর নিজেরও ফটো তোলার ঝোঁক ছিল। ফটো তুলে নিজেই 'ডেভেলপ' করতেন, প্রিন্ট করতেন ডার্করুমে ঘন্টার পর ঘন্টা।

ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ফেরত দিলেন বললেন, 'রোলী ,ভাল ক্যামেরা, তা কোথায় তুলবে ফটো?'

বললাম 'বাইরে ভাল আলো আছে, যদি একটু উঠোনে যেয়ে বসতে পারেন- আস্তে আস্তে খাট থেকে নামলেন বললেন, 'চলো'।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'স্যার, গায়ে একটা কিছু দিয়ে নেবেন?' ঐ কোচকানো হাফসার্ট আর জাম্পার পরিহিত অবস্থায় ফটো তুলতে সংকোচ লাগছিল।

'ও! এর উপর কিছু পড়তে হবে?' এই বলে আলনা থেকে খয়েরি রঙের একটা গলা বন্ধ কোট নামিয়ে নিলেন।

ফটো তুলে ঘরে ফিরতে ফিরতে বললাম ' এবারে আমার ভাগ্যে ছিল অনেক তীর্থ দর্শন, কাশী গেলাম, সারনাথ গেলাম, আজমীর শরীফ গেলাম, এখানেও এসেছি তীর্থ মনে করেই।' শুনে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন,বললেন 'বলে কি পাগল ছেলে।' স্নেহের স্পর্শে অভিভূত হলাম। ভাবলাম বিশ্বজগতে যত শক্তি ও বস্তুকণা আছে তাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে 'ফার্মিয়ন, আর একটা হচ্ছে 'বোসন ' এই সত্যেন বোসের নাম অনুসারে। কিন্তু আমি যে মানুষটির পরিচয় পেলাম সারা বিশ্বটাই যে তার আপন।

বিদায় নিয়ে এলাম অসীমের অনুভূতি নিয়ে।

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান ও কাজ ভিত্তিক শিক্ষা

[জুন-১৯৭৪]

শিক্ষা কমিশন তার রিপোর্ট সরকারের হাতে পেশ করেছে। কতগুলো খুব সাধারণ নীতি ও সংকল্পবাক্য ছাড়া এর সম্বন্ধে বেশী কিছু জানি না। এটুকু জানি যে একটি কার্যকর সেল শিগগির এটা কার্যকরী করার পন্থা ও উপায় নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করবে। কিন্তু মাঝখানে আরও কিছু জিনিস ঘটার দরকার আছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মতো একটা মৌলিক জিনিসের আমূল পরিবর্তন যেখানে লক্ষ্য, সেখানে সমাজের বিভিন্ন অংশের বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জড়িত অনেকের চিন্তা ভাবনা ও বক্তব্য রয়েছে। শিক্ষা কমিশন এমনভাবে গঠিত হয়নি বা এটা এমন কোন ব্যাপক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেনি যার ফলে সব মূল্যবান মতামত ও চিন্তার ফসল রিপোর্টে প্রতিফলিত হবে। এটা পুরোপুরি সম্ভব নয়। তাই এখন প্রয়োজন শিগগির এই রিপোর্টকে জনসমক্ষে এনে এর উপর ব্যাপক ও গভীর সমালোচনার সুযোগ দেয়া এবং দরকারমত এর সংশোধনীর ব্যবস্থা রাখা। একমাত্র তখনই সরকার, কার্যকর সেল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আত্মবিশ্বাস নিয়ে সত্যিকারের শিক্ষা সংস্কারে এগুতে পারবে।

যে সাধারণ নীতিগুলো জনসমক্ষে আনা হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো শিক্ষাব্যবস্থা হবে বিজ্ঞানভিত্তিক ; বৃত্তিমূলক ও হাতে কলমে শিক্ষা অধিকতর গুরুত্ব পাবে। নীতি হিসেবে এটি শুধু চমৎকারই নয়, আমাদের দেশের বহু যুগ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল গলদটি দূর করার প্রতিশ্রুতি এর মধ্যে বিধৃত। কিন্তু রিপোর্টের বিস্তারিত জানার আগে আমরা বুঝতে পারছি না এই নীতির বাস্তবায়নে কি কি পন্থা সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার 'ফরম' এর মধ্যেই শুধু এই নীতি প্রয়োগ করে, এর 'স্পিরিট' এর মধ্যে তা না করলে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যাবে না। স্কুলে বিজ্ঞান পাঠ্য বাড়িয়ে বা আরো বেশী সংখ্যক কাঠের কাজ, ইত্যাদির মতো ঐচ্ছিক অনুসঙ্গের সৃষ্টি করে এক ধরনের ব্যবস্থা করা যায় বটে কিন্তু তাতে মূল সমস্যার সমাধান হয় না। এই নীতির স্পিরিট বলতে আমরা যা বুঝি তাহলো একেবারে গোড়া থেকে পরিবেশ সচেতনতা ও কর্ম সচেতনতাকে আমাদের শিক্ষার মুল ধারার অঙ্গীভূত করা। আরো বেশী সংখ্যক ছাত্রের মুখে নির্ভুল শব্দ-বিন্যাসে নিউটনের নিয়ম বা আর্কিমিডিসের সূত্র আওড়ানোর ব্যবস্থা করা নয়, প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে এই নিয়মকে বুঝে নিয়ে তাকে কর্মে , চিন্তায় ও সৃজনশীলতায় মূর্ত করা। আর যারা তা করবে তাদেরকেই ভাল শিক্ষিত বলে স্বীকৃতি দেবার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা কমিশনের বিস্তারিত রিপোর্টে আমরা এসব ব্যবস্থা দেখার আশা রাখি।

সাক্ষাৎকার [জুন-'৭৪]

এ শিক্ষা হবে তদারকীর জন্য নয় নিজে করার জন্য

ডঃ কুদরাত-ই-খুদা

বাংলাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-ই-খুদা। বৃটিশ ভারত থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার যেটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার সাথে তাঁর পরিচয় ও সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি কমিশনের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন। তারপরে পরেই আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম বিজ্ঞান সাময়িকীর তরফ থেকে। আন্তরিকতার সঙ্গে এবং গভীর উৎসাহ নিয়ে তিনি আলাপ করলেন কমিশনের রিপোর্ট ,বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে। ড. খুদা জানালেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন– এই মূল চিন্তাকে কমিশনের রিপোর্টে সর্বত্র মনে রাখা হয়েছে। বললাম, বিজ্ঞান শিক্ষা আমাদের দেশে যতটুকু হয়েছে ,এর প্রয়োগ কি ঠিক মতো হচ্ছে? তিনি বললেন, সে জন্যেই কমিশন বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার পর বিভিন্ন স্কুলও পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে নানা ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক ও কুশলীর সৃষ্টি করা হবে। আজ যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিলেই সবাই চাকুরীর বাজারে ভিড় করে এবং তা না পেলে শিক্ষা বরবাদ বলে মনে করে তার কারণ এ শিক্ষা তদারকী করা, শ্রমিকদের উপর খবরদারী করার জন্যই দেয়া। ভবিষ্যতের বুত্তিমূলক শিক্ষা হবে শুধু করানোর জন্য নয়, করার জন্যও বটে। এই করা চাকুরীতে যেমন হতে পারে দক্ষ কারিগর বা শ্রমিক হিসেবে স্বাধীন বৃত্তি নিয়েও হতে পারে। তার জন্য দরকার মত সরকার তাদেরকে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করতে পারে।

হাতে কলমে কাজ করার যে শিক্ষা তার প্রতি সমাজের বর্তমান অবজ্ঞার কথা তুললাম। শিক্ষার্থীর নিজের মনেও কি এই নিয়ে একটা হীনভাব থাকে না একে অযোগ্যতার লক্ষণ মনে করে? উত্তরে তিনি বললেন, অর্থনৈতিক কারণেই এই মনোভাব কেটে যাবে ও যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকেই লাভজনক বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হবে হিতাহিত না ভেবে সাধারণ একাডেমিক শিক্ষার মধ্যে যাবার পরিবর্তে। ঐ শিক্ষায় ওরা আনন্দ পাবে,দক্ষতা দেখাবে, সৃজনশীলতার পরিচয় দেবে সমাজেরও তাদের প্রতি অবজ্ঞা দেখানোর প্রশ্ন উঠবে না।

বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদানের উপর একটু বিস্তারিত জানতে চাইলে ড. খুদা বললেন এর উপায় উপকরণ সম্বন্ধে কমিশন বিশেষ কিছু বলেনি। তবে এর সুপারিশ কার্যকরী করার জন্য যে সেল গঠিত হবে তারই কাজ হবে উপায়- উপকরণ উদ্ভাবন করা। বললাম কার্যকারণ সম্পর্কিত কাজ শুরু হবার আগে সম্পূর্ণ রিপোর্টটি আমাদের সবার একটু দেখার কি প্রয়োজন ছিল না? ড. খুদা একমত হলেন রিপোর্টটি শিগগির জনসমক্ষে আনার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে। কিন্তু দায়িত্বটি সরকারের এবং সরকার কখন তা করবে তা তিনি জানেন না।

ড. খুদা জানালেন একেবারে গোড়ার দিকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতি-পাঠের ভেতর দিয়েই বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হবে- বিশেষ করে জীববিজ্ঞানে এটা খুবই সহজ । স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রপাতির অভাবের প্রশ্ন তুললাম। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি তৈরীর কথা এডুকেশনাল একুাপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ব্যুরোর কথা উঠল। তিনি বললেন নীতিগতভাবে এই পন্থাই অবলম্বিত হবে তবে বিস্তারিত এখনো ঠিক হয়নি।

প্রয়োজন ও মানের দিকে লক্ষ্য না রেখে শিক্ষার অব্যবস্থা প্রসারের বিরোধী ড. খুদা। গোড়া থেকেই শিক্ষার্থীরা যোগ্যতার প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দিকে এগুবে। বাছাই-এর কাজটা পঞ্চম শ্রেণীর পর একটি সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হবে। এত অল্প বয়সে বাছাই করতে গিয়ে ইংলন্ডের 'ইলেভন প্লাস, পরীক্ষার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন ভালভাবে পরীক্ষা করলে ছেলেদের প্রবণতা ও দক্ষতা অল্প বয়সেই নির্ধারণ করা সম্ভব। তাঁর নিজের জীবনের উদাহরণ দিলেন এর স্বপক্ষে। বললাম কোন বিষয় ভাল লাগবে বা কোনটাতে ভাল করবে তা কিছুটা বিভিন্ন শিক্ষকের উপরওতো নির্ভর করবে! স্কুলে অঙ্কের মাস্টার ভাল না হলে যেমন সবার অঙ্ক ভীতি থাকবে- স্বাভাবিক অঙ্কপ্রতিভা সত্ত্বেও। জবাবে তিনি বললেন, সেই জন্য সব বিষয়েই ভাল শিক্ষক লাগবে। আমরা শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়েছি আগাগোড়া। প্রস্তাবিত একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিকের সাফল্য সম্বন্ধেও তিনি আশাবাদী, ভারতে এর কিছু কিছু কুফল দেখা গেলেও আমাদের তো আর ওদের মতো অতগুলো ভাষা শিখতে হবে না!

ভাষার প্রসঙ্গে ড. খুদা বললেন কমিশন শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন সুপারিশ করেছে। তবে ষষ্ঠ শ্রেণীর পর থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজীটাও পড়ানো হবে।

এর পর আমাদের আলোচনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার দিকে এলো। প্রশ্ন করলাম বিষয় ভিত্তিক যে রকম কারিগরী ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী উঠছে– তা কি কমিশনের রিপোর্ট সমর্থিত হয়েছে? তিনি বললেন,না, সব শৃঙ্খলা সমন্বিত পূণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এই সান্নিধ্য পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সাহায্য করবে, পৃথিবীর সবর্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এরকম সবাঙ্গীন পরিবেশেই দেয়া হয়। বর্তমান প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর শিক্ষাকেও উচ্চতম পর্যায়ে নেবার সুপারিশ আমরা করেছি। বললাম , অনেকে সামর্থের দোহাই তুলে এদেশে মৌলিক গবেষণায় অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত কি? তিনি বললেন , মৌলিক গবেষণা ছাড়া প্রায়োগিক গবেষণা দাঁড়াতে পারে না, উচ্চতর শিক্ষাও অসম্ভব হয়। কাজেই প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করতেই হবে।

ড. খুদা চান এদেশের ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়িত হোক, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান ঘটুক। তবে বাস্তবায়ন কঠিন কাজ ও ব্যয়সাপেক্ষ। পর্যায়ক্রমে এটি হবে, যদি প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা হয় ও সবাই মিলে সহযোগিতা করে।

ড. খুদার ব্যক্তিগত কর্মজীবন গবেষণা ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর কাছে জানলাম তাঁর ডি,এস,সি,ডিগ্রীর জন্য যে কাজ ,তা ছিল বেনজিন জাতীয় রিং কম্পাউণ্ডের বিকার সম্পর্কে। দেশে ফিরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছিলেন কিন্তু গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও অর্থ জোটেনি। জিজ্ঞাসা করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা না করে সরকারী চাকুরীতে ঢুকলেন কেন? বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য যে অর্থ ও সুযোগ চেয়েছিলেন তা এক রকম ইচ্ছে করেই দেয়া হয়নি বলে তা হয়ে উঠেনি। ঢাকা সি,এস আই,আর ল্যাবরেটরীজ বলতে গেলে ড. খুদার হাতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান। এখানে গবেষণা গড়ে তুলতে বহু প্রতিবন্ধক পার হতে হয়েছে। কিছু কিছু কাজ হয়েছে, কিন্তু শিল্পগতভাবে কাজগুলোকে প্রযুক্ত করা হয়নি বলে দেশ উপকৃত হতে পারেনি।

দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ হচ্ছিল ড. খুদার সঙ্গে। এক নাগাড়ে ক্লান্তিহীনভাবে জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন আমাদের প্রশ্নের। তাঁর চোখে ছিল দেশের আগামী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে উজ্জ্বল আশাবাদ।

সাক্ষাতকার ঃ ডঃ আলী আসগর

প্রোটিনের অভাবে অপুষ্টি

[আগষ্ট-সেপ্টেম্বর-'৭৪]

মাসুদ সিদ্দিকী

প্রোটিন এনার্জী ম্যালনিট্রিশন যাকে সোজা করে PEM বলা হয়, বাংলা করলে দাঁড়ায় প্রোটিনের অভাবজনিত অপুষ্টি। এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের দেখতে হবে প্রোটিন কি কাজে লাগে। আমাদের শরীরের চুল, নখ, এসব নগন্য জিনিস, কিন্তু প্রোটিন। পশুদের শিং এবং খুরও প্রোটিন দিয়ে তৈরি। এছাড়া শরীরের চামড়া সমেত মাংস প্রোটিন। রক্তের মধ্যেও প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশী, প্রাজমা তো (Plasma) প্রায় পুরোটাই প্রোটিন, তাছাড়া হিমোগ্লোবিন নামটা হয়েছে 'গ্লোবিন' নামক প্রোটিনের সঙ্গে হিম-এর সংযুক্তির ফলে। শরীরের সমস্ত এনজাইম (Enzyme), হরমোন (Hormones) এগুলোও প্রোটিন। এতেই বোঝা যাচ্ছে শরীরের গঠনে প্রোটিন কত দরকারী, সত্যি কথা বলতে কি কার্বোহাইড্রেট শরীরে শুধুমাত্র শক্তি (energy) দেবার জন্যেই কাজে লাগে। চর্বি দিয়ে অবশ্য জীবকোষের আকৃতি ঠিক রাখা হয়। মগজে (brain) এবং সর্বোপরি সঞ্চিত শক্তি উৎস হিসাবে ফ্যাট বা লিপিড দরকার লাগে।

আমরা বাইরে যেরকম দেখি, নখ এবং চুল নতুন করে গজায়, স্বভাবতই পুরোনোকে ফেলে দিতে হয়। তেমনি করে কিন্তু শরীরের যাবতীয় প্রোটিন নতুন করে হচ্ছে। কাজেই পোষাক বদলানোর মতই শরীরে নতুন প্রোটিন বদলাচ্ছে, এবং নতুন পোষাক কেনার মতই নতুন প্রোটিন খেতে হয়। হ্যাঁ, কিন্তু সংরক্ষণের জন্য। মানুষের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবার পরে মানুষকে শুধুমাত্র নিজের সংরক্ষণের জন্য যা দরকার ঠিক ততটুকু প্রোটিন খেতে হবে, অন্যদিকে যখন বৃদ্ধি হতে থাকে, নতুন মাংস হবে, নতুন প্রোটিন হবে, সুতরাং তখন সংরক্ষণের জন্য তো বটেই, তদুপরি বৃদ্ধির জন্যও বেশী করে প্রোটিন খেতে দিতে হয়। তখন খাবারে যদি প্রোটিনেব পরিমাণ কম থাকে, তবে স্বভাবতই শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এটা আমাদের দেশে এবং আফ্রিকা এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় দরিদ্র ও অনুন্নত দেশগুলোতে বেশ হতে দেখা যায়।

প্রোটিনের অভাবজনিত দুরকমের অসুখের দুরকমের নাম দেয়া হয়েছে। 'কোয়াশিওর কর' (Kwashior Kor) এবং ম্যারেসমাস (Marasmus) কোয়াশিওর কর থেকে 'ম্যারাসমিক কোয়াশিওর কর' হয় এবং সবশেষে 'ম্যারাসমাস' হয়, কোয়াশিরও কর পরিমাণে কম হয়, নিকৃষ্ট মানের প্রোটিন খাওয়ার জন্য অন্যদিকে ম্যারাসমাসের পেছনে এ দুই কারণ তো আছেই, তা ছাড়াও কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটও সময় কম পড়ে যায় যাতে এনার্জী পাওয়াই কষ্টকর হয়ে পড়ে। যখন এগুলোর সাথে সাথে ভিটামিন, মিনারেলস (minerals) এসবও কম পড়ে এবং সঙ্গে খনিজ আনুসঙ্গিক সংক্রমণ (infection) হয়, এই অবস্থাকে সাধারনতঃ ম্যারাসমিক কোয়াশিওর কর এবং Nutritional dwarfing বলে এবং এটাই সবচাইতে বেশী। PEM অনুন্নত দেশগুলোতেই বেশী, এসব দেশে বাচ্চারা পাঁচ বছরের বেশী বাঁচে না, শিশু মৃত্যুর হার এসব দেশে অনেক বেশী।

ম্যারাসমাস : শব্দটি গ্রীক, মানে হল ফেল্না। এই রোগটি সাধারণত হয় মেয়েরা একটা শিশু জন্মানোর পরে তাড়াতাড়ি অন্তঃসত্ত্বা হয় বলে। এতে শিশুটি সময়ের অনেক আগে মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত হয়, তারপর শিশুকে পয়সা-কড়ির অভাবের জন্যই নোংরা পাতলা করে দুধ বা দুগ্ধজাত জিনিস খেতে দেয়া হয়, এগুলোতে প্রোটিন এবং

এনার্জী দুটোই কম থাকে। এছাড়াও অপরিষ্কার ঘরবাড়ীতে পরিষ্কার করে খাবার তৈরি করা রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার, ফলে শিশুদের ঘন ঘন সংক্রমণ হয়, সাধারণতঃ পেটের অসুখ। পেটের অসুখ হলে আবার মায়েরা শিশুকে সাধারণত উপোস রাখে অথবা শুধু পানি বা ভাত তাও পানি মিলিয়ে অথবা অন্যান্য পুষ্টিহীন নরম খাবার খেতে দেয়।

অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া ছাড়াও মায়েরা বিভিন্ন কারণে শিশুকে বুকের দুধ দেয়া বন্ধ করতে পারে। ছেলের অথবা মায়ের পেটের অসুখ বা অন্য রকমের সংক্রমণ হয়, অথবা তিনি হয়ত রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ ইত্যাদিতে বিভিন্ন রকমের কৃত্রিম খাদ্যের উপকারিতা শুনে প্রভাবান্বিত হন, আসলে এসব প্রচার তো কেবলমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই করা হয়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অন্তসত্ত্বা হয়ে পরাটাই আসল কারণ হয়ে দাঁড়ায়, মেয়েরা বিশেষ করে অশিক্ষিতরা ভাবে যে, অন্তঃসত্ত্বা মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর। শহরাঞ্চলে যেসব মেয়েরা খেটে খায়, তাঁরা অবশ্য প্রয়োজনের অথবা ইচ্ছার তাগিদে কাজে ফিরে যাওয়ার জন্যই শিশুকে তাড়াতাড়ি দুধ ছাড়িয়ে নেন।

ম্যারাসমাস হলে শিশুটি শুকিয়ে যায়, চামড়ার মসৃণতা চলে যায়, সাধারণ ওজনের চাইতে অনেক কম ওজন থাকে, শরীরের তাপমাত্রা সাধারণের চাইতে বেশ কম থাকে, মানে মোটামুটি ঠাণ্ডা। যদি অসুখটি অনেকদিন ধরে চলে থাকে, তবে লম্বাতেও আর বাড়ে না। এ সময় সাধারণত পানির মত পায়খানা বা বেশ নরম পায়খানা হয়, পেট হয়ত ঢুবে যাবে, নইলে গ্যাস জমে ফুলে যাবে। পেটের চামড়া মিইয়ে যাবার ফলে এসময় পাকস্থলীর Peristalsis বাইরে থেকে দেখা যাবে।

খাবারের অভাবজনিত ম্যারাসমাস আর অন্যান্য infection বা ক্ষয়রোগজনিত ম্যারাসমাসকে অনেক সময় এক করে দেখা হয়, কোন শিশুর যদি PEM হয় তবে সাধারনতঃ এর পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকে যার সবগুলোই বের করা উচিত, অনেক সময় সন্তান যদি মায়ের স্নেহ এবং যত্ন থেকে বঞ্চিত হয় তবে তার খাবার রুচি থাকে না ফলে PEM হতে পারে।

এ সময় ভালো খাবার খেতে দেয়াটাই একমাত্র করণীয়। দুধ সবচাইতে ভালো, PEM আক্রান্ত হলে অনেক সময় দুধ হজম করতে কষ্ট হয় বলে দুধ হতে Casein prepration অথবা মাখন তোলা দুধ খেতে দেয়া চলতে পারে।

কোয়াশিওর করঃ ঘানার রাজধানী আক্রার আশে-পাশে 'গা' বলে একটা উপজাতি থাকে, নামটি ওদেরই দেয়া, এটার মানে হ'ল—"নতুন শিশু জন্মাবার পরে পুরানোটির যে অসুখ হয়"। এ থেকেই রোগটির কারণ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়, দুধ ছাড়াবার পরে শিশুকে ভালো খাবার দেবার অভাব, এটা অজ্ঞতার জন্যও হতে পারে অবাার দারিদ্র এবং অন্যান্য কারণেও হতে পারে।

কোয়াশিও কর : অনেক কারণে হতে পারে, শিশুকে অনেক বেশী সময় (সাধারনতঃ ২ বছর) পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়াবার পরে যদি (weaning period-এ) সাধারণ খাবার, যেটা হয়ত দারিদ্রের জন্য প্রোটিন– বর্জিত হতে পারে, খেতে দিলে এটা হয়। অনেকে আবার মাংস জাতীয় খাবারগুলি বাড়ীর বড়কর্তা জাতীয় পুরুষদেরকেই শুধু খেতে দেন। অনেক জায়গায় হয়ত ক্ষেতে ফসল উঠার আগমুহূর্তে "দুর্ভিক্ষ" দেখা দেয়, এই সময়েই ওসব অঞ্চলে এ জাতীয় অপুষ্টিজনিত রোগগুলো হয়। আবার এমন অনেকে খান যেটাতে প্রোটিনের ন্যূনতম উপস্থিতি থাকে, ওসব খাবারে শিশুটি মোটামুটি বাড়তে থাকে, কিন্তু একবার যদি শিশুটির সংক্রমণ হয়, তবে তার প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাবে এবং সে PEM-এ ভুগবে।

এটা অনেক সময় দারিদ্রের চাইতেও অজ্ঞতার জন্য বেশী হয়। বাজারের খারাপ খাবার কিনে খাওয়া অথবা ঠিকমত রাঁধতে না জানাটাও অনেক সময় দায়ী।

কোয়াশিওর কর হলে শিশুটির ডায়রিয়া হবে, সব সময় 'অসুখী' থাকবে মানে কান্নাকাটি করবে। শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কিন্তু খাবারে লবণ এবং পানির পরিমাণের উপরে নির্ভর করে শিশুটি ফুলে যায়। তার সারা দেহই ফুলতে পারে, কিন্তু নীচের দিকের limb গুলোই ফুলে, এতে শিশুকে স্বাস্থ্যবান মনে হয়।

একটি জিনিস লক্ষ্যণীয় ম্যারাসমাস হয় তাড়াতাড়ি দুধ ছাড়ানোর জন্য, আর কোয়াশিওর কর হয় দেরী করে দুধ ছাড়ানোর জন্য। সাধারনতঃ শিশুকে প্রথম ছ মাস পুরোপুরিই মায়ের দুধ খেতে দেয়া উচিত। এই সঙ্গে আমি আমাদের দেশের উপযোগী একটি সুষম খাদ্য তালিকা দিচ্ছি (ইনষ্টিটিউট অফ নিউট্রিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে)

০-৬ মাস : মাতৃস্তন্যই সবচাইতে ভালো।

৬ মাস থেকে ১ বছর : মায়ের দুধ সমেত নিম্নলিখিত খাবার :

১। ভাত — $\frac{৩\text{-}১}{৪}$ ছটাক
২। ডাল — $\frac{১\text{-}১}{৪}$ ছটাক
} নরম খিচুড়ি করে।

৩। আলু ভর্তা — ৩০ গ্রাম (একটি ছোট সাইজের আলু)

৪। পালং শাক, পুঁইশাক ইত্যাদি $\frac{১}{২}$ ছটাক (স্যুপ করে খাওয়ানো উচিত)

৫। অন্যান্য সবজী যেমন, পটল, লাউ, কুমড়া, বেগুন $\frac{১}{২}$ ছটাক।

আর যারা পারবেন, তাঁদেরকে এই বয়েস থেকেই শিশুকে দৈনিক একটি করে ডিমের কুসুম খেতে দেয়া উচিত। অনেক শিশুই ডিমের সাদা অংশ সহ্য করতে পারে না।

১ থেকে ২ বৎসর :

১। ভাত—২ ছটাক

২। গম (বিস্কিট পাউরুটি) –১ ছাটক।

৩। ডাল — $\frac{১}{২}$ ছটাক

৪। আলু ও মিষ্টি আলু—১০০ গ্রাম (দুটো মাঝারি সাইজের)

৫। পালং শাক, পুঁইশাক, কচু শাক ইত্যাদি—১ ছটাক

৬। আলু, বেগুন, কুমড়া, লাউ —$\frac{১}{২}$ ছটাক

৭। মাছ, মাংস, ডিম —$\frac{১}{২}$

৮। চিনি, গুড় — $\frac{১}{২}$ ছটাক

৯। তেল — $\frac{১}{২}$ ছটাক।

১০। দুধ — ৩ ছটাক।

১১। ফল যেমন : পেয়ারা, টম্যাটো, কলা, জাম্বুরা, আম, আনারস ইত্যাদি।

এই চার্টটি আমাদের দেশের বাঙালীদের জন্যই করা হয়েছে, এবং এটা তেমন ব্যয়বহুলও বোধ হয় না। এটা অবশ্যই দৈনিক হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এভাবে মেনে খাওয়ালে এদের থেকে তো PEM পালাবেই আর তদুপরি ভবিষ্যত বাঙালিরা আর 'মাথায় ছোট, বহরে বড় হবে না।'

সংশয় ঊনবিংশতি

[আগস্ট-সেপ্টেম্বর-'৭৪]

স্বাতী

১৮৭৫ সালে আমেরিকান জনৈক পাদ্রীর সাথে একজন কলেজ প্রেসিডেন্টের আলাপ হচ্ছিল। পাদ্রী বলছিলেন, যা কিছু আবিষ্কার হওয়ার সব হয়ে গেছে। এরপর বিজ্ঞানের আর কোন উন্নতি অসম্ভব। কলেজ প্রেসিডেন্টের কিন্তু ভিন্ন মত। তিনি বললেন 'মোটেই না, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মানুষকে আকাশেও উড়তে দেখা যাবে। পাদ্রী এতে বেশ রেগে গেলেন—'আকাশে ওড়া দেবদূতদের কাজ, মানুষের পক্ষে ও ধরনের চিন্তা করাটাই ঈশ্বর অবমাননা।'

ঘটনাটির মধ্যে অদ্ভুত কিছু নেই। শুধু পাদ্রী কেন, অনেক বিজ্ঞানীরও সে আমলে এই ছিল মত। নূতনত্ব যা, তা হলো এই পাদ্রীর নাম ছিল মিলটন রাইট আর তাঁর দুটি ছেলে ছিল— অরভিল ও উইলবার। এই দুই ভাই ঘটনাটির ত্রিশবছর পর প্রথম আকাশে বিমান ওড়ান।

১৮০৭ সালে ফুলটন নামে এক কারিগর নেপোলিয়নের দর্শনপ্রার্থী হলেন। প্রস্তাব করলেন ফরাসী নৌবাহিনীকে বাষ্পীয় জাহাজ দিয়ে সজ্জিত করার। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'বাষ্পীয় জাহাজ দিয়ে আপনি ইংলণ্ডের দফারফা করে দিতে পারবেন।' কিন্তু নেপোলিয়ন তাঁকে পত্রপাঠ বিদায় দিলেন। বললেন, 'এমন কোনদিন যাচ্ছে না যে, কোন না কোন হাস্যকর প্রস্তাব আমার সামনে হাজির না হচ্ছে। এই সেদিন একজন এসে পরমার্শ দিল ট্রেনিংপ্রাপ্ত ডলফিনের পিঠে সওয়ার করে অশ্বারোহী বাহিনীকে ইংলণ্ডের উপকূলে নামাতে। তুমি বাপু এই পাগলদেরই একজন। ওসব শোনার সময় আমার নেই।'

আট বছর পর বন্দী নেপোলিয়ানকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপ থেকে নিয়ে যাচ্ছিল বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'বেলেরফোন'। পথে এই জাহাজের পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেগে চলে গেল আমেরিকান বাষ্পীয় জাহাজ 'ফুলটন'। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেপোলিয়ান সঙ্গী বারট্রাণ্ডকে বললেন 'যেদিন ফুলটন লোকটাকে সামনে থেকে তাড়িয়ে দিলাম সেদিনই আমার রাজত্বের আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে।' হয়তো বা তাই, কে জানে?

আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময়কার কাহিনী। জার্মানীর কাউন্ট ফন জেপ্‌লিন কনফেডারেটদেরকে চালনক্ষম বেলুন দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন (কাউন্টের সহানুভূতি আর কোন দিকেই বা থাকবে?)। হাস্যভরে তাঁর কথা উড়িয়ে দেয়া হলো। আর হবেই না বা কেন? এ সময় ফরাসী একাডেমীর মত গুণী প্রতিষ্ঠান নিয়ম করে দিয়েছিল যে তিনটি বিষয়ে আবিষ্কারের দাবী এটা মোটেই বিবেচনা করবে না— বৃত্তের সমান বর্গক্ষেত্র, ইংলিশ চ্যানেলের তল দিয়ে সুড়ঙ্গ, আর চালনক্ষম বেলুন। চ্যানেল সুড়ঙ্গ এখন যে কোনদিন তৈরি হতে পারে। আর চালনক্ষম বেলুন তো এখন জাদুঘরের সামগ্রী।

রসায়নবিদ বার্থালোট ১৮৮৭ সালে বলেছেন— "অতঃপর বিশ্বের আর কোন গোপন কথা রাইলো না।" যেন তাঁরই প্রতিধ্বনি করে পদার্থবিদ ক্লসিয়াস বললেন, 'বিশ্বটা হচ্ছে একটা দম দেয়া ঘড়ির মতো। গোড়ায় একবার এবং ঐ একবারই দম দিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন দম ফুরোবে, তখন সবকিছুর অবসান ঘটবে। স্থান আর কাল? সে তো মানুষের মন গড়া, প্রকৃতিতে নেই।

হার্ৎস সর্বপ্রথম রেডিও তরঙ্গ পরীক্ষার মারফত প্রমাণ করেন। অথচ এই হার্ৎসই ড্রেসডেন চেম্বার অব কমার্সের কাছে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন রেডিও তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা অপ্রয়োজনীয় এবং এটা বন্ধ করে দেয়া উচিত।

তাই বলে না লুপ্ত হয়েছে রেডিও, না মুছে গেছে হার্ৎসের নাম। আজো এই তরঙ্গের পর্যায়বৃত্তি হার জানানো হয় 'কিলো হার্ৎস' বা 'মেগা হার্ৎসে'র হিসাবে।

ফরাসী একাডেমীতে যেদিন প্রথম ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের প্রদর্শনী হয় সেদিনকার বিবরণী এভাবে লেখা আছে : "যন্ত্রটা সবে দু একটি শব্দ উচ্চারণ করেছে ঠিক তখন সেক্রেটারী সাহেব দৌড়ে গিয়ে যে প্রতারক এটা চালাচ্ছিল তার গলাটা সজোরে টিপে ধরলেন। আর বললেন, 'দেখলেন মঁসিয়েরা, শব্দ কোত্থেকে আসছিল?' কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে যন্ত্র তখনো কথা বলে চলেছিল।"

তার পরেও

১৯১২ সনে প্রফেসর ফ্রাঙ্ক প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা শুরু করছিলেন। বিজ্ঞানের ডীন বললেন, 'আপনার কাছে আমরা শুধু যা চাই তা হলো স্বাভাবিক ব্যবহার।'

ফ্রাঙ্ক অবাক হয়ে বললেন, 'তার মানে পদার্থবিদদের মধ্যে এটা কি কোন বিরল গুণ?'

ডীন উত্তর দিলেন 'আপনি বলুন না, আপনার পূর্ববর্তী প্রফেসর ভদ্রলোক কি খুব স্বাভাবিক ব্যক্তি ছিলেন?'

বলাবাহুল্য প্রাগে ফ্রাঙ্কের পূর্ববর্তী প্রফেসর ছিলেন আলবার্ট আইনষ্টাইন!

তেল সংকট ও আগামী দিনের পৃথিবী [আগষ্ট-সেপ্টেম্বর-'৭৪]

সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন আহম্মদ

এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান-কেন্দ্রিক সভ্যতার এ যুগে আমরা যখন অনবরত বিজ্ঞানের জয়যাত্রা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, আর কেবলই শুনতে পাচ্ছি অপরাজেয় বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি, ঠিক তখনই যদি কেউ আদিম যুগে ফিরে যাবার কথা তোলেন আর আমরাও দেখি যে, পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে সভ্যতার গতিধারা হঠাৎ ছিটকে কয়েক যুগ পিছনে চলে যাচ্ছে, তখন আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে। আর সেই সুযোগে মুষ্টিমেয় ক'জন নৈরাশ্যবাদী যদি বাহ্‌বা, বাহ্‌বা করে উঠেন তখন তাদের উদ্দেশ্যে 'দূয়ো' দেয়া ছাড়া আমরা আর কিইবা করতে পারি?

ঠিক এমনি একটা ব্যাপারই আজ বিশ্ববাসী লক্ষ করছে। সভ্যতার 'প্রাণরস'—তেলের অভাবে যখন সমগ্র পৃথিবী দিশেহারা, আর এই একই জিনিসের তীব্র অভাবের পরোক্ষ ফলস্বরূপ যখন খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য দিকে দিকে উঠছে হাহাকার, বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যখন পরিস্থিতির মোকাবিলায় কিছু একটা উপায় বের করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন—ঠিক এ সময়টাকে সময়োপযোগী ভেবে নিয়ে কিছুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যদ্বাণী করে বসেছেন। করেছেন "ক্লাব অব রোম" নামক একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা, এ বছরেরই গোড়ার দিকে। তাঁরা বলেছেন, "আগামী একশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবে। সেইজন্য বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন প্রয়াসের সীমা বেঁধে দেয়া উচিত।"

এটা তাঁদের সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না দরিদ্র অথচ উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তা ভেবে দেখতে হবে। অবশ্য এও হতে পারে যে, এটা তাদের বিশেষ অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ।

এখন অবস্থাটা পর্যালোচনা করে দেখা যাক! বর্তমানে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত তেলসংকট থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোন অস্বাভাবিক রকমের পরিবর্তন পৃথিবীর বুকে না ঘটে তবে সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার একদিন না একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবেই এবং পৃথিবী মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হবে।

তবে কথা হল তখন পৃথিবীর অবস্থা কি দাঁড়াবে? পৃথিবী কি আদিম যুগে ফিরে যাবে, না উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে।—প্রথম কথাটির কল্পনা করাও বোকামী, কেননা আদিম যুগে ফিরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না, উঠতে পারে না।

কিছুদিন পূর্বে আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ব্রিটেনের আষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জে, এ, পোপ। তিনি বলেছেন যে, আগামী ৮০ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর তেল সম্পদ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর ফলেও বিভিন্ন মহলে প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে বেশ জল্পনা-কল্পনা চলছে। পক্ষে-বিপক্ষে নানারকম মতামত প্রকাশিত হচ্ছে।

এদিকে আরবরা সময় বুঝে তেলকে যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। শুরু করেছেন কূটনৈতিক সূত্র হিসেবে প্রয়োগ করা। তাদের তেল রপ্তানীর উপর সৃষ্ট অবরোধ (বর্তমানে অনেকাংশে স্তিমিত) এবং তেলের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করার ফলে পৃথিবী জুড়ে উন্নয়নের গতিধারা ব্যাহত হচ্ছে। ব্রিটেন ও জাপান জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল। বন্ধ হয়েছিল জাপানের অনেক কলকারখানা। মারাত্মক ক্ষতির

সম্মুখীন হয়েছে আমেরিকাও। সেখানে বেশ কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছিল, তার কিছু এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি।

আরবদের এই তেল অবরোধের ফলে পৃথিবীর সব উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে সৃষ্টি হতে পারে মারাত্মক ভাঙ্গনের। কেননা— তাদের বাজেটের সিংহভাগ তেলের পিছনেই খরচ হবার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে আরবরা এখনও দাম বাড়িয়ে চলেছেন। গত ১৬ই জুনের সম্মেলনেও তারা তেলের রপ্তানী মূল্য আরও ১২% বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ফল দাঁড়াচ্ছে— পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্র তাদের নিজেদের তেল সম্পদ বাড়ানোর জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। যে সকল দ্বীপের মালিকানা নিয়ে কেউ কোনদিন মাথা ঘামায়নি সে সকল দ্বীপ নিয়ে লড়াই পর্যন্ত হচ্ছে। কয়েকমাস আগে একটি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে চীন ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যে এ রকম একটি লড়াই হোল, অবশেষে চীন মালিকানা পেল। এরকম আরও বহু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

এখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা থেকে তেল উত্তোলনের জোর প্রচেষ্টা চলছে। এখনও এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তবে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমোন্নতির ফলে এবং বিশ্ব জুড়ে তেলের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে আজ হোক বা কাল হোক ওই তেল উঠানো হবেই। তাতেও এমন কিছু সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের ধরে নিতে হবে জ্বালানী সম্পদ অফুরন্ত নয় এবং এই সীমিত সম্পদ নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। আর এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জ্বালানীর খরচ কমিয়ে আনতে হবে।

এ প্রচেষ্টা বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে। ব্রিটেনে বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে দেয়া হয়েছে। জাপানে কলকারখানায় কাজের সময় সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ভারতে আবার বিদ্যুৎ রেশনিং শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে রবিবারে আজকাল সব পেট্রোলপাম্প বন্ধ থাকে।

তেলের খরচ কমানোর ব্যাপারে সবাই যখন আগ্রহী, তখন নামী মোটর কারখানাগুলোও পিছিয়ে নেই। জাপানের 'টয়োটা', 'ডাটসান' এবং মার্কিন ফোর্ড কোম্পানী এখন তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। এ প্রতিযোগিতা হোল 'ইকনমি কার' তৈরির প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ কোন কোম্পানী সবচেয়ে কম তেল খরচে সবচেয়ে বেশী মাইল চলনক্ষম গাড়ী তৈরি করতে পারে এ তারই প্রতিযোগিতা। এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত জাপানী কোম্পানীগুলোই এগিয়ে আছে।

তেলের বিকল্প হিসেবে গ্যাসের বহুমুখী ব্যবহার এ ব্যাপারে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়েছে ব্যাপকভাবে। জাপান কয়েক বছর আগে থেকেই গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করেছে। শুধু জাপানই নয়, বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে গ্যাসের সাহায্যে গাড়ীও চালানো হয়।

আমাদের দেশে প্রচুর গ্যাস আছে এবং এ গ্যাস গুণগত দিক থেকে খুবই উন্নতমানের। খনিজ গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ যত কম থাকে গ্যাস ততই উন্নতমানের হয়। আমাদের দেশে যে কটি খনি থেকে গ্যাস আহরণ করা হচ্ছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ মিথেনের পরিমাণ হোল মাত্র ৫% এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ০.৫% এরও কম যার জন্য খনি থেকে উঠিয়েই ব্যবহার করা যায়, বিশুদ্ধিকরণের প্রয়োজন হয় না।

এখন আমাদের দেশে এই গ্যাস কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে, অন্য কয়েকটি কারখানায় জ্বালানী হিসেবে এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কিছু কিছু বাড়ীতে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। হিসেব করে দেখা গেছে যে, বর্তমান হারে ব্যবহার করা হতে থাকলে এ পর্যন্ত যে গ্যাস পাওয়া গেছে তাতে আমাদের ৩০০ বছর চলবে। আর যদি সমস্ত কলকারখানায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেলের পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহার করা হয় তা হলে চলবে ১০০ বছর। এরপরে আছে আরও গ্যাস পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় বার্ষিক ভূতাত্ত্বিক সম্মেলনে (১৮৭৩) বাংলাদেশের প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদগণ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সারা দেশে গ্যাস-পাইপ-লাইন বসাতে এবং কলকারখানায় জ্বালানী হিসেবে তেলের পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহার করার। বিদ্যুৎ উৎপাদনে তাঁরা গ্যাস ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিছুদিন পূর্বে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরাও একই প্রস্তাব করেছেন বাংলাদেশ সরকারের কাছে। তাঁরা মোটরলঞ্চসমূহও গ্যাস দ্বারা চালনা করার কথা বলেছেন। সরকার তার কয়েকদিনের মধ্যে ঘোষণা করেছেন যে, ধীরে ধীরে তাই করা হবে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘও সরকারকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে গ্যাস সম্পদও সীমবদ্ধ, তাই শুধু গ্যাসের উপর ভরসা করে বসে থাকলে চলবে না।

এখন দেখা যাক অন্য কোন বিকল্প পাওয়া যায় কিনা? পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে যে,মার্কিন বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই কয়লা থেকে ৩০% তেল, ৩০% গ্যাস, ৩০% আলকাতরা ও ৫% ডিজেল বের করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এর অর্থনৈতিক দিকটা এখনও বিবেচনাধীন।

একজন জার্মান অধ্যাপক আবর্জনা থেকে পরীক্ষামূলকভাবে তেল তৈরি করেছেন। এছাড়াও বিশ্বজুড়ে চলছে তেলের বিকল্পের সন্ধান। সাড়া পড়ে গেছে দেশে দেশে তেল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ খুঁজে বের করার। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও শুরু হয়েছে ব্যাপক জরীপ কাজ এবং তাঁরা বেশ সাফল্যও অর্জন করেছেন। আমাদের দেশও অনুসন্ধান শুরু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আমাদের সমুদ্র-উপকূলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্যে বেশ কয়েকটি উন্নত দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এদের কারো কারো সঙ্গে সরকার তাড়াতাড়িই চুক্তি সম্পাদন করবেন বলে মনে হচ্ছে।

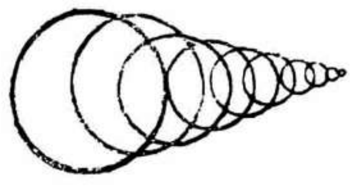

মতামত [অক্টোবর-'৭৪]

কেমন হয়?

"বিজ্ঞান সাময়িকী" স্বল্প পরিসরে মায়ের কথায় বিজ্ঞানকে আমাদের হাতে এনে দিচ্ছে। এজন্য শুধু আক্ষরিক ধন্যবাদ দিলে যে তাঁদের হেয় করা হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জানা মতে 'বিজ্ঞান সাময়িকী'র অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল 'বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ'। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, বিজ্ঞান পঠন না প্রয়োগ,কোনটার জনপ্রিয়তা? যদি দু'টোই হয়ে থাকে তবে "বিজ্ঞান সাময়িকী' একটা পর্ব এড়িয়ে যাচ্ছে।

'বিজ্ঞান সাময়িকী'র মাধ্যমে বিজ্ঞান পঠন না হয় জনপ্রিয় করা গেল সুন্দর সুন্দর বক্তব্য সমৃদ্ধ করে কিন্তু প্রয়োগ?

এ ব্যাপারে 'বিজ্ঞান সাময়িকী'র ঘোষণা কি?

আমি বলি আমরা 'বিজ্ঞান সাময়িকীর' পাঠকরা তথা বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ উৎসাহীরা বিজ্ঞানের কিছু কাজ করলে হয় না? আমরা Science project work বা অন্য কিছু নামাবলী জড়িয়ে সুচিন্তিতভাবে একটা সংঘের তত্ত্বাবধানে ছোট-খাট একটা গবেষণাগার গড়ে তুললে কেমন হয়? আমাদের স্বল্প সামর্থ্যে যা পরিচালিত হবে। হয়ত বিজ্ঞানের বিপুল ব্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটা হাস্যকর হতে পারে। তবুও একটু জ্ঞান বা শিক্ষাও যদি আমরা পেতে পারি তাহলে সেটাও কি কম? সেই গবেষণাগারে হাতেকলমে আমরা বিজ্ঞানকে চিনব। সীমিত সামর্থ্যে আপন করে নেব বিজ্ঞানকে।

দূর-দুরান্তের পাঠক যাঁরা আছেন তাঁরাও সংঘবদ্ধ হতে সচেষ্ট হোন। বাস্তবে বিজ্ঞানকে চিনুন। আসুন প্রত্যেক জেলায় জেলায় প্রথমে বিজ্ঞান সংঘ গড়ে তুলি। তারপর না হয় এর ব্যাপ্তি ঘটানো যাবে।

আমি এ ব্যাপারে 'বিজ্ঞান সাময়িকী'কে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করব। কারণ আপনারা পঠনের জন্য যথেষ্ট করেছেন এবার প্রয়োগের জন্যও কিছু করুন। আপনারা অনেকটা প্রতিষ্ঠিত।

পাঠক সমাজ! আপনারাও ভেবে দেখুন। আমাদের দেশে শুধু প্রয়োগেরই অভাব। পাতার পর পাতা বিজ্ঞান মুখস্ত করে চলেছি দু'একটার ছবি দেখছি—কিন্তু চর্মচোখে তা দেখার ভাগ্য হচ্ছে না। কলেজ ছেড়ে এসেও বকযন্ত্রের পা খুঁজি। এইতো দশা।

আমাদের আশা কোন প্রকারে শুরু করলেই হল। তাহলে অনেকে এগিয়ে আসবেন—অনেকেই সাহায্য করবেন—উৎসাহ দেবেন। এটুকু বিশ্বাস আমাদের রয়েছে।

আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে Science club গড়ে তোলার। উপযুক্ত সাড়া পেলে তা পাঠকদের সমীপে স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আমাদের জানা মতে অনেকেই কিছু করা উচিত ভাবছেন—কেউ বা বলছেন, করলে ভাল হয়—অন্যরা করব করব করছেন। ঠিক তখনই যদি আমরা করা শুরু করি তা হলে কেমন হয়?

জিয়াউদ্দিন আহমেদ (কচি)
নটরডেম কলেজ

বই আলোচনা

দ্বিজেন শর্মা

চার্লস ডারউইন

পিতামহ, সুহৃদ, সহযাত্রী

[জানুয়ারি-'৭৫]

এটি একটি জীবনীগ্রন্থ। এক জনের নয়, ছয় জনের। তবে বাকী পাঁচ জনকে বাছাই করা হয়েছে এক জনের সাথে তাঁদের সম্পর্কের ভিত্তিতে; ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ভাবগত সম্পর্ক। সেই একজন হলেন চার্লস ডারইউন–বিবর্তনবাদের জনক।

অন্যরা হলেন ইরেসমাস ডারইউন, আলফ্রেড ওয়ালেস, চার্লস লায়েল, ড্যালটন হুকার এবং টমাস হাক্সলী। ইরেসমাস ডারউইন চার্লস ডারউইনের পিতামহ, বিবর্তন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের একজন আদি প্রবক্তা। ঐতিহ্যের ঋণে চার্লস তাঁর কাছে ঋণী, যদিও তিনি এটা পুরাপুরি স্বীকার করেন নি। আলফ্রেড ওয়ালেস ডারউইনের সমসাময়িক, বিবর্তন তত্ত্বের একজন সহ প্রবক্তা। 'অরিজিন অব স্পেসিজ' গ্রন্থ প্রকাশ করতে ডারউইন যখন বিলম্ব করছিলেন ইতিমধ্যেই ওয়ালেস তাঁর নিজের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফল প্রকাশ করলেন একটি নিবন্ধে, যেটি পড়ে হতবাক ডারউইনের মনে হয়েছে : 'এ যে তাঁরই দীর্ঘ বিশ বছর গবেষণার সংক্ষিপ্ত সার।' ওয়ালেসের রচনার মৌলিকত্বে কোন সন্দেহ না থাকলেও বিবর্তন তত্ত্বের স্বপক্ষে যুক্তি সম্ভার ডারউইনের ছিল অনেক বেশি তাই তিনিই স্বীকৃতি পেলেন এর জনক হিসেবে। চার্লস লায়েল ছিলেন সাধক ভূতত্ত্ববিদ, ডারউইনের বন্ধু। জীবনের দীর্ঘকাল ধরে বিবর্তনবাদের বিপক্ষে ও প্রজাতির স্থিরত্ব সম্বন্ধে স্বীয় বিশ্বাসে অটল ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যিকার যুক্তিবাদী, খাঁটি বিজ্ঞানী। তাই ডারউইনের অযৌক্তিক সমালোচনার বিরুদ্ধে সব সময় রুখে দাঁড়িয়েছেন। নিজেও শেষ পর্যন্ত ডারউইনকে লেখা এক চিঠিতে প্রজাতি রূপান্তরে তাঁর আস্থার কথা ঘোষণা করেছেন : 'যেহেতু আমার সামনে আর নতুন পথের কোন ঠিকানা আপাততঃ সুস্পষ্ট নেই, তাই বাধ্য হয়েই আমি আমার প্রাচীন বিশ্বাস ত্যাগ করছি।' ডালটন হুকার ভূ-পর্যটক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ; ডারউইনের কথায় তাঁর 'সহযাত্রী ও সহকর্মী'। ডারউইনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সুহৃদদের একজন, অথচ ডারউইন তত্ত্বের দ্বারা কোনদিনই বিশেষ প্রভাবিত হননি, অরিজিন অব স্পেসিজ প্রকাশের পরও নয়। টমাস হাক্সলী কিন্তু এই ব্যাপারে ঠিক উল্টো। ডারউইনের বন্ধু জীবতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে তিনি খুবই সোচ্চার, খুবই সচেষ্ট। এই-ই সেই হাক্সলী যিনি বিবর্তনবাদের উপর জনসমক্ষে বিতর্কে বিশপ উইলবারফোর্সের অজ্ঞ ও অযৌক্তিক ব্যঙ্গের উত্তরে বলেছিলেন : 'আমি বংশসূত্রে বানরের উত্তরাধিকারী হতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই, কিন্তু যে লোকে জ্ঞানতঃ সত্যকে বিকৃত করে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্বীকারে অবশ্যই আমি অপার কুণ্ঠা বোধ করবো।'

সবকিছু মিলিয়ে একটি ব্যতিক্রমী জীবনীগ্রন্থ এটি। জীবনটাই এখানে মুখ্য। তাই লেখক সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাঁদের জীবনের নানা খুঁটি-নাটি ঘটনার। পরিবারের, পেশার, বিভিন্ন সময় মানসিক অবস্থার, কোনকিছুর কথা বাদ যায়নি। তাছাড়া তাঁদের লেখা থেকে, চিঠি থেকে উদ্ধৃতির মাধ্যমে বক্তব্যগুলোকে যথেষ্ট প্রামাণ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে নিসর্গ পাঠ সম্পর্কে যাঁদের সামান্য জ্ঞান আছে এবং আগ্রহ আছে

তাঁদের কাছে বইটি খুবই উপভোগ্য মনে হবে। এছাড়া জ্ঞানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ নিসর্গ পর্যবেক্ষক বিজ্ঞানীরা কিভাবে কাজ করে গেছেন তা উৎসুক মনে অপার কৌতুহল উদ্রেক করে বৈকি!

বইটির একটি দুর্বলতা মনে হলো সবগুলো জীবনীকে একত্রে গ্রথিত করে কোন মূল সূত্র থাকলেও তার উপর মোটেই জোর দেয়া হয়নি কোথাও। জীবনীগুলোকে তাই খানিকটা এলোমেলো মনে হয়। যদি মনে করা হয় বিবর্তনবাদের উপর প্রভাব ও অবদানের কারণে এই চরিত্রগুলো বাছাই করা হয়েছে, তাহলে তা সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। এমন কি ব্যক্তিগতভাবে ডারউইনের উপর প্রভাবও এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়। বড়জোর একে পরস্পর পরিচিত সমসাময়িক নিসর্গ বিজ্ঞানীদের জীবনীমালা বলা যেতে পারে। ডারউইনের সাথে সবার ব্যক্তিগত ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক যথেষ্ট দেখা গেলেও ভাবগত সম্পর্ক সব জায়গায় ততটা দেখা যায় না। তাছাড়া বইটির মূল চরিত্র ডারউইনের সম্পর্কে লেখা হয়েছে সবচেয়ে কম। তাঁর শেষ জীবনের কিছু একান্ত ভাবনা আর তাঁর আত্মজীবনী থেকে কিছু উদ্ধৃতিতেই এটা শেষ হয়েছে। ডারউইন ও বিবর্তনবাদকে মূল সূত্র করতে হলে এদের সম্বন্ধে আরেকটু বিস্তারিত লেখা উচিত ছিল। নাম এবং প্রচ্ছদ এরকম মূল সুরেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বইটির ব্যতিক্রমী রচনাভঙ্গী একে চমকপ্রদতা প্রদান করেছে এবং স্থানে স্থানে অধিকতর উপভোগ্য করে তুলেছে বটে কিন্তু সাথে সাথে এর এলোমেলো ভাবটাকে কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে দিয়েছে।

লেখকের সংস্কৃতপ্রধান শব্দ চয়ন ঘনিষ্ঠ জীবনীগ্রন্থের অনুকূল হয়নি সব জায়গায়। প্রচ্ছদটিও আরো ভাল হতে পারত। বিশেষ করে বিবর্তনবোধক চিত্রটি এতই অস্পষ্ট হয়েছে যে বেশি কিছু বোঝার উপায় নেই।

বাংলায় বিজ্ঞানের উপর বই কম, বিজ্ঞানীর উপর বইও কম, বিশেষ করে প্রাণীবিদ্যা ও নিসর্গ বিদ্যার বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী সম্পর্কে বই একেবারেই কম। এ রকম অবস্থায় দ্বিজেন শর্মার এই বই গতানুগতিকতাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে আমাদের কাছে একটি নতুন বাতায়ন উন্মুক্ত করল। ডারউইনের উপর তাঁর সংকল্পিত বই তিনটার মধ্যে শেষটাই প্রথমে প্রকাশিত হওয়াতে কিছু খাপছাড়া ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্য দুটা বই প্রকাশিত হলে এটা অনেকাংশে নিরসিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সম্পাদকীয়

মাটির কাছের সংস্কৃতি

[এপ্রিল-মে-'৭৪]

'আমরা ফসল ফলাই,' 'মাছের দেশ বাংলাদেশ,' গ্রীষ্ম ও বর্ষার শাকসব্জি,' 'গভীর পানির ধান'– ছোট একটা পত্রিকার কয়েকটি লেখার শিরোনামা। পত্রিকাটির নাম মাসিক গণকেন্দ্র— বাংলাদেশ পল্লী প্রগতি পরিষদের মুখপত্র। চমৎকার আঙ্গিক, অত্যন্ত যোগ্য ও রুচিবান সম্পাদনার পরিচয়বাহক। তবুও এমন একটি পত্রিকা অতীতে আমাদের শহরে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, সংস্কৃতিসেবীদের কাছে খুবই স্থূল ও অসংস্কৃত ঠেকত, হাতে পড়লে হয়তো এক মিনিটও সেখানে টিকত না। কিন্তু সেদিন আজ গত হয়েছে।

সেদিন যে গত হয়েছে তার প্রমাণ শহরের আবাসিক এলাকায়, ছাত্রাবাসে, খোলা ময়দানে সব্জী ও শস্যের সযত্ন পরিচর্যা। ক্রমেই আমরা মাটির কাছাকাছি ফিরে যাচ্ছি, খুঁজে পাচ্ছি আমাদের অস্তিত্বের উৎসকে, সচেতনভাবে। যে কারণেই ঘটে থাকুক এই পরিবর্তনকে আমরা স্বাগত জানাই। 'সভ্যতার পিলসুজের' কথা ভুলে গিয়ে, এমনকি তার তেলটুকুর কথাও ভুলে গিয়ে কৃত্রিম একটা সংস্কৃতির অভিনয় কিছুদিন করা যেতে পারে– কিন্তু সে প্রদীপ বেশিদিন জ্বলার নয়। তেল, পিলসুজ সবকিছু নিয়ে যে সংস্কৃতি সেটাই খাঁটি। হাজার হলেও সংস্কৃতি মানে বাঁচার মতো করে, সুন্দরভাবে বাঁচা তো! স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশ, শ্রম, স্বাচ্ছন্দ্য, জ্ঞান এছাড়া কি বাঁচা যায়, নিজে এবং দেশের সকলে? জীবন্ত লোকের জন্যই তো লোক-সংস্কৃতি।

তাই গত একুশে ফেব্রুয়ারিতে যখন কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার এই মহান দিনটিকে এবার থেকে দেশের অর্থনৈতিক খতিয়ান অর্থাৎ বাঁচার মত বেঁচে থাকার সংগ্রামে অগ্রগতির খতিয়ান নেবার দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হোক, আমাদের কাছে তাকে সঠিক প্রস্তাব বলে মনে হয়েছে। একুশে সংকলনের নিরর্থক পুনরাবৃত্তির ভীড়ে যখন সুদূর সিলেটের কোন এক গ্রাম সমবায়ের অভিনব একুশে সংকলন 'খেতে পানি আন্দোলনে' নতুন একুশে শপথ দেখলাম খাদ্যে স্বাবলম্বী হবার, তখন দিনটিকে আবার চ্যালেঞ্জ নেবার দিন বলে মনে হলো।

মাসিক গণকেন্দ্রের মত পত্রিকা হাতে নিয়ে তাই আজ এত ভাল লাগে।

সম্পাদকীয় [মে-জুন-'৭৬]

বাংলা ও ইংরেজি

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল এমন বেশ কিছু শিক্ষক-বিজ্ঞানী আজকাল একটা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বত্র অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিষয়গুলো বাংলায় পড়ছে। তাঁদের যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হতে আসছে তারা পড়ছে রীতিমত বিপদে। ভর্তি পরীক্ষা থেকেই তাদের বিপদের শুরু। তারপর অনার্সের অত্যন্ত ঠাস বুনুট পাঠ্যসূচী সম্পূর্ণ নতুন মাধ্যম ইংরেজিতে আয়ত্ব করতে গিয়ে তাদের হিমসিম খাওয়া স্বাভাবিক। ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতির পক্ষেও একই কথা প্রযোজ্য। পূর্বের ও পরের বিষয়গুলোর মধ্যে ভাষাগত কারণে যোগসূত্র হারিয়ে অনেককেই মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অথচ এটি তাদের কোন দোষে নয়।

এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? হার মেনে উচ্চ-মাধ্যমিক ইংরেজি পুনর্বহাল করা? না শিক্ষার উচ্চতর ধাপগুলোতে এক্ষুণি ইংরেজি উঠিয়ে বাংলার ব্যবস্থা করা। প্রথমটি করলে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পড়ার যাবতীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে ফিরে যাব, সেটা হবে পিছু হটা। আর দ্বিতীয়টি যদিও বা যেনতেন প্রকারে সম্ভব হয় তবে সেটা উচ্চতর শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। আমাদের মতে সবচেয়ে উপযোগী ও বাস্তবধর্মী সমাধান হবে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে বাংলাকেই মুখ্য মাধ্যম হিসেবে চালু করা, অথচ ইংরেজিকেও উঠিয়ে না দেয়া। আর উচ্চ-মাধ্যমিক থেকেই এই ধরনের ব্যবস্থার জন্য খানিকটা প্রস্তুতি নেয়া। সমাধানটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। পূর্ব পাঠের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে উচ্চতর পর্যায়েও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া শুরু করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন বিষয়ে কিছু মূল ও অনূদিত বাংলা পাঠ্য পুস্তক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের কিছুটা বাংলায় বক্তৃতা ও আলোচনা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হওয়া, যেমনটি ইতিমধ্যেই হয়েছেন কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক। কিন্তু ব্যাপারটি এখানেই শেষ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ছাত্র মাত্রকেই ইংরেজিতে লেখা বইগুলো পড়তে এবং বাংলায় পড়া জ্ঞানের সাথে তা মিলিয়ে নিতে সক্ষম হতে হবে। কাজেই বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোর নাম ও তার প্রকাশভঙ্গীর ইংরেজি রূপের সাথেও তাদের পরিচিতি থাকতে হবে এই পরিচিতি উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকেই শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় ও বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি বইগুলো পড়ার অভ্যাসের মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। আলোচনা বক্তৃতা এবং পরীক্ষায় উত্তর লেখা ইত্যাদি প্রায় সর্বাংশে বাংলার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি বই, জার্নাল থেকে স্বীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ এবং প্রয়োজনে ইংরেজিতে এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা অনুধাবন করার অভ্যাস ও যোগ্যতা শিক্ষার্থীর থাকতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রের কাছ থেকে এইটুকু অনুশীলন ও যোগ্যতা দাবি করা মোটেই অন্যায্য নয়। তাছাড়া এটি নতুন ব্যাপারও নয়, পৃথিবীর অসংখ্য দেশে এইই নিয়ম। উদাহরণস্বরূপ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষার মাধ্যম স্প্যানিশ, কিন্তু বেশিরভাগই ইংরেজি বই পড়া হয়। ইতালির স্নাতক শ্রেণীর কোন ছাত্রের সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে চাইলে আপনি খুব সম্ভব ব্যর্থ হবেন। কিন্তু তার পড়ার টেবিলের দিকে নজর দিলে দেখবেন নাম করা ইংরেজি বইগুলোই সেখানে বেশি। অনেক সময় এমনও হতে পারে যে তর্ক উঠলে সে ইংরেজি বইয়ের সঠিক অনুচ্ছেদ আপনাকে পড়ে শুনাবে এবং তার বরাত দিয়ে বাকী কথা ইতালিয়ানের তুবড়ি ফুটিয়ে বলবে। কারণ ইংরেজি বলা বা লেখার ক্ষমতা তার খুবই সামান্য। আমাদের ছাত্রদের ইংরেজি জ্ঞান অন্তত তারচেয়ে ভাল এবং আশা করি ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে ভয় কিসের?

প্রফেসর আবদুস সালাম

[মে-জুন–'৭৬]

বিজ্ঞান সাময়িকীর বিশেষ সাক্ষাৎকার

[আবদুস সালাম নামটি আধুনিক পদার্থবিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। গত কয়েক দশক ধরে যে কয়েকজন ব্যক্তি কণিকাবিদ্যাকে বিশ্ববিজ্ঞানের সবচেয়ে চমকপ্রদ য়্যাডভেঞ্চারে পরিণত করেছেন সালাম তাঁদের একজন। পাকিস্তানের এই বিজ্ঞানী অতি অল্প বয়সে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত ও ইম্পেরিয়াল কলেজের অধ্যাপক পদে ব্রত হন। বর্তমানে এই অধ্যাপক পদ ছাড়াও তিনি ইতালির ত্রিয়েস্তে অবস্থিত আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রের ডিরেক্টর। একজন বিশ্বখ্যাত পদার্থবিদ হওয়া ছাড়াও বিজ্ঞান সাময়িকীর কাছে প্রফেসর সালামের আরেক পরিচয় অনুন্নত দেশের চরম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা, এসব দেশের বিজ্ঞানোন্নয়ন সম্বন্ধে তাঁর গভীর সক্রিয়তা। ১৯৬১ সনের ১১ই জানুয়ারি ত্রয়োদশ পাকিস্তান বিজ্ঞান সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে ঢাকায় প্রফেসর সালাম তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তৃতা 'দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান' প্রদান করেন। তিনি বলেন 'যে বিপ্লব আমরা আনতে চাচ্ছি তা হলো কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। বিজ্ঞানী হিসেবে আমরা, দেশের দারিদ্র্য যে চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে তার মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জন করতে চাই।' বিজ্ঞান সাময়িকীরও সবে যাত্রা শুরু সে মুহূর্তে। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় বিজ্ঞান সাময়িকী এই ভাষণ প্রকাশ করে এবং তার আগাগোড়া যাত্রাপথে সালামের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে।

আজ এত বছর পর ত্রিয়েস্তে সলিড স্টেট পদার্থবিদ্যার একটি শীতকালীন কলেজের অবসরে প্রফেসর সালাম বিজ্ঞান সাময়িকীর পাঠকের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বর্তমান মনোভাব ব্যক্ত করলেন। বলাবাহুল্য ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক ফারাকের এবং উন্নয়নশীল জাতির অর্থনীতি ও বিজ্ঞান চর্চায় এক নৈরাশ্যজনক পটভূমিতেই এই আলোচনা। বিজ্ঞান সাময়িকী সম্পাদক ছাড়াও এই সাক্ষাৎকার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রফেসর হারুন-অর-রশীদ, ডঃ আলী আসগর ও ডঃ মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ। –সম্পাদক

প্রশ্ন : বাংলাদেশে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রধান উদ্দেশ্য। এই জনপ্রিয়করণের ব্যাপারেই প্রথমে আপনার মতামত জানতে চাই।

সালাম : এটি আমি অনেকদিন ধরে বলে আসছি। আমাদের দেশগুলোতে যদ্দিন পর্যন্ত না বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হচ্ছে তদ্দিন আমাদের পরিত্রাণ নেই। এই সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে হলে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সাথে বিজ্ঞানীদের বাইরে এসে সমাজের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। মানুষকে বিজ্ঞানমনা করে তুলতে হবে। বিজ্ঞানীর, কারিগরের ক্রিয়াকলাপ মানুষ কি চোখে দেখছে তা বুঝতে হবে। সেখানে পপুলার সায়েন্সের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে যা জানি সেখানে এই ধরনের আন্দোলনের বিরাট হাতিয়ার হতে পারে সেখানকার ছাত্র শিক্ষক গোষ্ঠী। সমাজে পরিবর্তন আনা সম্পর্কে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ যে অগ্রণী বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে তা আমি জানি এবং সেইজন্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ ধরনের প্রয়াস দ্রুত সমাজে জাগরণ আনবে।

প্রশ্ন : পদার্থবিদ্যা যেভাবে এগুচ্ছে তাতে এ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে গিয়ে তার চেহারা কি রকম দাঁড়াবে বলে আপনার ধারণা?

সালাম : পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি এত জটিল এবং ব্যাপক যে, সব বিষয়ে কোন রকমের ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু আমার নিজের বিষয় কণিকা বিদ্যা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলতে পারি। বহু নতুন নতুন কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, হচ্ছে। মনে হয় আগামী দশ বছরে এসব কণিকার একটা ভিত্তি খোঁজার চেষ্টা সাফল্যের দিকে যেতে পারে। বৈদ্যুতিক চার্জের মতো কণাগুলোর আরো অন্যান্য নানা গুণের ভিত্তিতে এগুলোর বিভিন্ন কোয়ান্টাম সংখ্যা স্থিরিকৃত হয় সেগুলোকেও এক এক ধরনের 'চার্জ' বলা যায়। শেষ পর্যন্ত এরকম প্রায় আট'ন রকমের চার্জ হয়ত থাকবে।

এইসব চার্জ যেমন বারিয়ন সংখ্যা, লেপ্টন সংখ্যা ইত্যাদি আগেও জানা ছিল। অতি সম্প্রতি কোয়ার্ক তত্ত্বের তিন রঙের কোয়ার্ক এবং প্রত্যেক রঙের কোয়ার্কের মধ্যে আবার চারটি 'গন্ধের' (ফ্লেভার) কোয়ার্কের চিন্তা করা হচ্ছে। কোয়ার্ক এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি তবুও তত্ত্বগত দিক দিয়ে এদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আমার নিজের প্রচেষ্টা হলো এতগুলো কোয়ার্কের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত তত্ত্বগত নক্সা আবিষ্কার করা। আমার ধারণা আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব যেমন একদিন একটি বিরাট সমন্বয়ের দিকদর্শন আমাদের দিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে কণা বিজ্ঞানেও এই ধরনের সমন্বিকরণ সম্ভব হবে। অতি সম্প্রতি উইক এবং ইলেকট্রোমেগনেটিজমের প্রক্রিয়ায় গেজ তত্ত্বের মাধ্যমে যে সমন্বয় আনা হয়েছে, * মনে হয় সেদিক থেকেই একটি সর্বব্যাপী ঐক্য ও সমন্বয় সম্ভবপর হবে। তবে এটা সময় সাপেক্ষ এবং আরও নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। জেনেভা, হামবুর্গ এবং আমেরিকায় যে তিনটি মহাকার ত্বরণ যন্ত্রের পরিকল্পনা হচ্ছে তা এই কাজে আমাদের সহায়তা করবে বলে সবাই আশা করছেন।

প্রশ্ন : গেলম্যান সম্প্রতি বলেছেন, কণিকা বিদ্যা একটি বিরাট যুগান্তরের অপেক্ষা করছে– অনেকটা কোয়াণ্টাম বিপ্লবের মতো। এর মাধ্যমে আসবে একটা বিরাট সংশ্লেষণ। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

সালাম : এটা প্রত্যেক বিজ্ঞানীরই অন্তঃস্থলের কামনা। 'আমার জীবদ্দশাতেই আমার বিষয়টির ইতি ঘটুক মহা সংশ্লেষণের মাধ্যমে'– এ যেন এক ধরনের Death wish। আইনস্টাইন এটা প্রকাশ করেছেন, গেলম্যানও তাই করছেন। না, আমি তো কণিকা বিদ্যার জন্য আপাততঃ সেরকম কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না।

প্রশ্ন : অনেকে বলছেন উচ্চশক্তি পদার্থবিদ্যা (কণিকা বিদ্যা) আজ সারা দুনিয়ায় বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যয়কৃত অর্থ ও মেধার সিংহভাগ নিয়ে নিচ্ছে। বিজ্ঞানের একটা সুষম বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ন্যায্য বা স্বাস্থ্যকর নয়। এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

সালাম : এটা যদি উন্নত দেশগুলোর বিজ্ঞান গবেষণা সম্বন্ধে বলা হয় তবে সে সম্বন্ধে আমার বেশি কিছু বলার নেই। ঘটনাটির কারণ নিছক বিজ্ঞান গবেষণার মধ্যে নিহিত নেই। ইউরোপীয়দের কাছে এই মুহূর্তে উচ্চশক্তি পদার্থবিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপীয় ঐক্যের একটা বিরাট প্রতীক। আর আমেরিকা-রাশিয়ার ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তুও আপাততঃ এটাই। এই সুযোগে উচ্চশক্তি পদার্থবিদ্যা যদি কিছুদিন সূর্যস্নান করে নেয় তা নিক। অন্যান্য সব বিষয়ে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র তখন তত প্রস্তুত নয় যে অতি বিরাট অঙ্কের অর্থ সেখানে সরিয়ে নিলেই সাথে সাথে সেখানে গবেষণা ফলবতী হতে পারবে। বরং এই সরানো অর্থ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

তবে ক্ষতির দিকটি হলো অন্যত্র। এক একটি দেশে, বিশেষ করে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের সামনে এটা খারাপ উদাহরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পদার্থ বিদ্যার কোন কোন বিষয়ে গবেষণায় ভাল করতে হলে যেসব সুযোগ-সুবিধার দরকার তা আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে যোগান সম্ভব নয়। সেজন্য উন্নত দেশগুলোর বিজ্ঞানীদের মত একই মেধাসম্পন্ন হয়েও এখানকার বিজ্ঞানীরা সবসময় এই ধরনের কাজ করতে পারেন না। তাঁদের উচিত গবেষণার ক্ষেত্র সেইভাবে পছন্দ করা যা দেশের এবং সমাজের পক্ষে দরকারী এবং যার ব্যয় বহন করা সম্ভব।

অবশ্য একথাও আমি স্বীকার করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা পড়ান তাঁদের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। গরীব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান আন্তর্জাতিক মানের সমকক্ষ করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বিষয়ে বাধ্যবাধকতা না রাখাই ভাল।

---

* এখানে অধ্যাপক সালাম যে সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করেছেন তার জন্যই তাঁকে এবং ভাইনবার্গকে নোবেল পুরস্কার দেবার প্রস্তাব উঠেছে– সম্পাদক

প্রশ্ন : আধুনিক পদার্থবিদ্যার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে অনেক পদার্থবিদ ও দার্শনিকরা আজকাল দর্শনের ক্ষেত্রে নূতন চিন্তাধারা আনছেন। আপনার মতে এভাবে পদার্থবিদ্যা দর্শনকে কতখানি প্রভাবান্বিত করতে পারে?

সালাম : আমার মতে এ নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে। দার্শনিকরা পদার্থবিদ্যার কিছু তত্ত্বের মর্ম পুরোপুরি না বুঝেই তার থেকে দার্শনিক সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করেছেন। অনেক প্রথিতযশা পদার্থবিদ নিজেরাও এই বিষয়ে অংশগ্রহণ করে এ ধরনের ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। যেমন হাইজেনবার্গ তাঁর অনিশ্চয়তার নীতির দার্শনিক গুরুত্ব সম্বন্ধে বেশী কথা বলাতে সাধারণের কাছে তাকে কোয়াণ্টাম বিপ্লবের কেন্দ্রীয় ঘটনা বলে মনে হয়েছে। অথচ ব্যাপারটি পদার্থবিদ্যায় বিশেষ ব্যবহার্য একটি গানিতিক সিদ্ধান্ত মাত্র। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে একবার ডিরাককে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি অনিশ্চয়তা নীতিকে কতখানি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি বললেন, আমার 'কোয়াণ্টাম মেকানিক্স বইটা পড়েছ তো?' 'পড়েছি।' 'তাতে অনিশ্চয়তা নীতি সম্বন্ধে কতখানি লেখা আছে?' 'এক পৃষ্ঠা'। 'এটা ঠিক ততখানিই প্রয়োজন।'

প্রশ্ন : উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিজ্ঞান চর্চায় সহায়তা করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আপনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন। গত দশ বছরে এদিক থেকে যা অগ্রগতি হয়েছে তা কি সন্তোষজনক। ভবিষ্যৎই বা কেমন মনে হচ্ছে?

সালাম : এই পুরো বিষয়টিই আমার এবং আমার কিছু সহযাত্রীর জন্য একটা সার্বক্ষণিক সংগ্রামের ব্যাপার। ত্রিয়েস্তের আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা কেন্দ্র জাতিসংঘ সমর্থিত এই ধরনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠা সহজ হয়নি। মজার ব্যাপার হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বের ভেতর থেকেও এর বিরোধিতা করা হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত বহু উন্নয়নশীল দেশের অনেক বিজ্ঞানী তাঁদের বিজ্ঞান কর্মে এটার দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সহযোগিতার এই আগাগোড়া ব্যাপারটি এখন সঙ্কটের মুহূর্তে। যারা এদ্দিন এর জন্য অর্থ যুগিয়েছেন তাঁরা বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের বিজ্ঞানের পুরো প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন। ত্রিয়েস্তে যে এদ্দিন মৌলিক কণিকা ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজ বেশী হয়েছে— তা ব্যাপারটিকে আরো খারাপ করেছে। প্রাসঙ্গিকতার দিকে নজর রেখে গুরুত্বের রদবদল হয়ত করতে হবে—কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কট সত্ত্বেও বরং অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রয়োজনেই যে মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে এই জিনিসটি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে বুঝতে হবে। এই ব্যাপারে আমার কর্তব্য আমি যথাসাধ্য করছি। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ থেকে ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার অধিবেশনে যেসব প্রতিনিধি আসেন তাঁদেরও এই ব্যাপারে মুখর হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : আমরা জানি আপনি অনুন্নত বিশ্বের চরম দারিদ্র্যের দূরীকরণ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করেন। এসব দেশের পদার্থবিদরা এই ব্যাপারে কিভাবে কাজে আসতে পারেন?

সালাম : পদার্থবিদ শুধু তাঁর মৌলিক গবেষণার গোঁ ধরে বসে থাকলে বেশী কাজে আসবেন না। তাঁকে যখন যেখানে দরকার কাজে লাগতে হবে। গবেষণা ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের যে কোন কর্মপন্থায় তাঁকে অংশ নিতে হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণ সমাজ বিপ্লবের জোয়ারের মধ্যেই সম্ভব। পদার্থবিদকে সেখানে তাঁর অংশটুকু নিতে হবে।

প্রশ্ন : দরিদ্র দেশে কর্মরত একজন তরুণ বিজ্ঞানীর যাবতীয় নৈরাশ্যের সাথে আপনি ভালভাবেই পরিচিত। তার প্রতি আপনার উপদেশ কি?

সালাম : এই নৈরাশ্য দূর করার উপায় বিজ্ঞানীর নিজের কাছেই রয়েছে। প্রশিক্ষণের সময় যে ধরনের কাজ করেছি সারা জীবন সে ধরনের কাজ চাইলে নৈরাশ্যে ভুগতে হবে বৈ কি! যে দেশে যে কালে আমার বাস তার যাবতীয় সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই এগুতে হবে। একেবারে বিশ্বজনীন অর্থে সবাইকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী হতে হবে এমনও কোন কথা নেই। উন্নয়নশীল দেশে গুটিকতেক অত্যন্ত মেধাবীর ছাড়া বাকীদের জন্য সেই ভূমিকা অর্থহীন। দেশের জন্য যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই কাজে লেগে যেতে হবে। নিজের বিজ্ঞান শিক্ষাকে, অভিজ্ঞতাকে সেখানেই কাজে লাগাতে হবে।

যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরগাছা হিসেবে সব বিজ্ঞানীকে বেঁচে থাকতে হয় সেটা বড় দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা। উৎপাদনে, পরিকল্পনায়, পরিচালনায়, প্রশাসনে সর্বত্র বিজ্ঞানীরা ছড়িয়ে পড়তে পারে, দায়িত্ব নিতে পারে। তাদের শিক্ষা এসবের জন্য চমৎকার হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে এবং তাকে সবচেয়ে মেধাবীদের হাতে পরিচালিত হতে হবে। এখানে বিশ্ববিজ্ঞানের সবগুলো বাতায়ন উন্মুক্ত রাখতে হবে। কিন্তু নিজেদের কাজ করতে হবে নিজেদের প্রয়োজনে, নিজেদের সমস্যায় তাড়িত হয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে শিক্ষিত নাগরিকেরা বেরিয়ে পড়বে সমাজের সর্বত্র। এই মুহূর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিজ্ঞানের শিক্ষা ও চর্চার এই সবচেয়ে সন্তোষজনক পন্থা হতে পারে।

পাখ-পাখালীর নীড়ে [জুলাই-'৭৬]

দীপক কুমার দাঁ

দোয়েল

সচরাচর দেখা পাখিদের মধ্যে দোয়েলের ছিমছাম ফুর্তিবাজ চেহারা এবং নানাভঙ্গীতে শীষ দেবার অপূর্ব ক্ষমতা— বাংলার সবুজ শ্যামল পরিবেশে দোয়েলকে পাখির জগতে প্রথম সারিতে স্থান দিয়েছে। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ দোয়েলের স্মার্ট চেহারা,মাথা, গলায় নীলাভযুক্ত চকচকে কালো রঙ; তুলোর মত ধবধবে সাদা পেট, সাদাকালোয় মেশানো ডানা; কালো কুচকুচে পিঠ, দেহের সঙ্গে প্রায় সমকোনে ল্যাজ নাচিয়ে যখন সু-ই-ই-ঙ্গ স্বরে শিষ দেয়, তাতে একে নাইটিঙ্গেল নামে আখ্যা দিলে ভুল হবার কিছু নেই। বস্তুতঃ দোয়েল যে কত বিচিত্র এবং অভিনব কৌশলে ডাকতে পারে,তা সত্যিই বিস্ময়কর! তবে এসব কৃতিত্বের ভাগ পুরুষ দোয়েলের। স্ত্রী দোয়েল খুব কমই ডাকে; ডাক মিষ্টি নয়। দেখতে মেটে মেটে রঙের। বাংলার পাখীদের মধ্যে সব থেকে ভোরে বোধ হয় দোয়েলই ডাক শুরু করে। (কেউ কেউ আছে—কানাকুয়া, পাপিয়া অবশ্য সারা রাত্রি ডাকে)

দোয়েল (ইং নাম—ম্যাগপাই রবিন), দণ্ডচারী বর্গের, শলভাস বংশের, তর্দাশ উপবংশের, দধ্যক গানের পাখি। বৈজ্ঞানিক নাম—কপ- সাইচাস সওলারিশ। পাখির কুলে এরা বেশ নিরীহ; কোন ঝুট ঝামেলায় নেই। নির্দিষ্ট এলাকায় দম্পতিরা থাকে।

অন্য প্রবেশ ঘটলে ঝগড়া অনিবার্য; তেমনি প্রজনন ঋতুতে পুরুষে পুরুষে সংঘর্ষ অবধারিত—কারণ, সঙ্গিনী নির্বাচন। সাধারণতঃ জোড়ায় থাকে। স্বজাতির ভিতর বিরোধ বেশ তীব্র। বাসা তৈরিতে এরা তেমন পটু নয়। সাধারনত: দেয়ালের গর্তে বা সজনে গাছে, কাঁঠাল গাছে, খেজুর গাছের খোড়লে, কিংবা গাছে টাঙানো হাঁড়িতে বাসা করে। দোয়েলকে প্রায় যত্রতত্র বাসা করতে দেখা যায়। একবার একটা গোটানো পুরানো মাদুরের খোলের মধ্যে (বাইরে গাছের ডালে আটকানো ছিল) দোয়েলের বাসা দেখেছিলাম। এমনকি কলার কাঁদির ফাঁকের মধ্যেও এরা বাসা করে।

বাসার গড়ন চ্যাপ্টা, অর্ধচন্দ্রাকৃতি। সাধারণ খড়-কুটো দিয়ে তেরী। ঘাসের শিকড়, নারিকেল, খেজুর আঁশ, সরু খড় কুটো-এসবই বাসা তৈরীর উপাদান। দৈঃ – ১৫ সে: মি: ভিতরের ডিম রাখার গোলাকৃতি অংশের ব্যাস ১০ সে: মি: মত। ডিম পাড়ার কাল মার্চের শেষ থেকে জুন পর্যন্ত। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫ ফুট -২০ ফুট উচ্চতার মধ্যে বাসা বানায়। বাসা তৈরী, তা দেয়া এবং বাচ্চা লালন পালনে স্ত্রী পাখির ভূমিকাই মুখ্য। তবে পুরুষ পাখিটা পাহারা এবং বাচ্চাদের জন্য খাদ্য সংগ্রহে সক্রিয় অংশ নেয়। ডিমের রঙ পটকিলে নীলাভ সবুজে মেশানো, লালচে বাদামী ছোপ যুক্ত। বাসায় ৫ থেকে ৬টি পর্যন্ত ডিম থাকে।

অত্যন্ত নিরীহ এবং মানুষের বসতির খুব কাছাকাছি বাসা তেরি করে বলে এদের ডিম ও বাসা নষ্ট হয় প্রচুর। গড়ে এদের ১০– ১৫টি বাচ্চা পাওয়া সম্ভব হয় প্রতি ১০০টি ডিমে। বাসা কোন কারণে নষ্ট হলে অন্যত্র পুনরায় বাসা

বানিয়ে নিয়ে ফের ডিম পাড়ে। খাদ্য নানা জাতীয় ছোট পোকামাকড়। একবার এক ঝুঁট শালিক দম্পতির সঙ্গে বাচ্চা কাচ্চাসহ দোয়েল দম্পতির ঝগড়া দেখেছিলাম। দোয়েল দম্পতি আগে থেকেই একটি কোটর দখল করে ৬টি বাচ্চা ফুটিয়ে নিরাপদেই ছিল। হঠাৎ ঝুঁট শালিক দুটির প্রয়োজন পড়ল ঐ কোটরটি নিজেদের ডিম পাড়ার তাগিদে এবং শুরু হল দখল লড়াই। প্রায় ঘন্টা দুয়েকের প্রচন্ড হাতা হাতির (দুপক্ষের পুরুষ দুটিই সাক্ষাৎ সমরে অংশ নিল এবং স্ত্রী দুটি দূরে দাঁড়িয়ে সমর্থক হিসাবে সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল) পর ঝুঁট শালিক দম্পতিরা কোটরটি দখল করল। ৬টি নিরীহ বাচ্চা অকালে প্রাণ দিল। দোয়েল দম্পতিরা অন্যত্র আশ্রয়ের খোঁজে সাময়িক উদ্বাস্তু হোল। এমন কতশত প্রাকৃতিক ঘটনা অহরহ ঘটছে তার হদিশ নিলে অনেক অজানা তথ্যের দ্বার উম্মোচন হবে।

শক্ত জিনিস শক্ত কেন?

[জুলাই-'৭৬]

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

বাজার থেকে গ্লাসটা কিনে আনলে, দু'একটা ধাক্কা সইবে তো? নদীর উপর সাঁকোটা দেয়া হয়েছে, থামগুলো টিকবে তো? দড়িতে বেঁধে মাল নামানো হচ্ছে, ছিঁড়ে পড়বে না তো? প্রশ্নগুলো তোমার মনে যেমন জাগে, তেমনি এই জাতীয় প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে ভাবিয়েছে নির্মাতাদের, স্থপতিদের, প্রকৌশলীদের। এদের উত্তরও তাঁরা হরদম দিচ্ছেন। কোন্ জিনিষ দিয়ে কি কাজ হবে, কোনটা কতখানি ভার নিতে পারবে, ধাক্কা সইতে পারবে এসব তাঁরা মোটামুটি আগে থেকেই জানতেন। কিছুটা অভিজ্ঞতা আর কিছুটা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা ব্যবহার্য বস্তুগুলোর কাঠিন্যের গুণাগুণ জেনে নিয়েছিলেন। অভিজ্ঞতা থেকে এদের কিছুটা বদলে নেবার কলাকৌশলও তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। 'কতখানি' এবং কি ভাবে'র উত্তর এভাবে কমবেশী জানা বেশ কিছুদিন থেকে। কিন্তু আসল প্রশ্নটির উত্তর পেতে তখনো বাকী –সেটা হলো 'কেন?' কেন ইস্পাত কাঁচা লোহা থেকে শুরু? পেটালে লোহা শক্ত হয় কেন? কাঁচেরই বা এই ভঙ্গুরতা কেন? কাঠের সহনশীলতা বা দুর্বলতা আসে কোথা থেকে?

এই কেনর উত্তর না পাওয়া গেলে মূল জিনিসটাই বোঝা হলো না। আর তা না বোঝা গেলে নতুন নতুন গুণাগুণসম্পন্ন বস্তু তৈরী করা যায় কি করে? নির্মাণের নানা বস্তু নিয়ে যদিও মানুষ মহেঞ্জোদারোর যুগ থেকে আম্পায়ার এষ্টেট বিল্ডিং তৈরীর যুগ পর্যন্ত কারবার করে এসেছে তবুও এদের সত্যিকার অর্থে সে বুঝতে আরম্ভ করেছে এইমাত্র গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানতঃ পদার্থবিদ্যার কল্যাণে। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে মানুষ যখন বেতারে এক মহাদেশ থেকে অন্যত্রে খবর পাঠিয়েছে, জানতে পেরেছে সুদূর নক্ষত্রের মধ্যে কি ঘটছে তখনো সে জানত না তার এত কাছের এত প্রয়োজনের এক টুকরা ইস্পাত কোথা থেকে তার গুণগুলো পাচ্ছে।

যেসব জিনিস আমরা নির্মাণের কাজে ব্যবহার করি তার মধ্যে কয়েক ধরনের গুণ আমরা সাধারণত চাই। এটা শক্ত হতে হবে দৃঢ় হতে হবে। মনে রাখবে শক্ত হওয়া আর দৃঢ় হওয়া এক কথা নয়। শক্ত হওয়া মানে জিনিসটাকে দুভাগে ভাগ করতে বেশী জোর লাগা। দৃঢ় হওয়া মানে জোর খাটালে বেশি বিকৃত না হওয়া। শুধু শক্ত হলে একটা জিনিস বেশি পীড়ন সহ্য করতে পারবে বটে, কিন্তু সাথে সাথে দৃঢ়ও না হলে এটা এত নেতিয়ে পড়বে যে অত জোর খাটানোই যাবে না! একটা বিস্কুট শক্ত নয়, কিন্তু দৃঢ়। ইস্পাত শক্তও আবার দৃঢ়ও। নাইলন শক্ত, কিন্তু দৃঢ় নয়। কমলা লেবুর জেলী শক্তও নয়, দৃঢ়ও নয়। আরেকটা ব্যাপার হলো ভঙ্গুরতা। যাবতীয় বস্তুর মধ্যে হীরা সবচেয়ে কঠিন (Hard)। অন্য কঠিন বস্তু কাটতে বা তার উপর আঁচড় দিতে হীরার এই গুণ কাজে লাগে। কিন্তু তাই বলে মনে করো না খুব করে পেটালেও বড় হীরার টুকরা কিছু হবে না। এটা গুড়িয়ে যেতে পারে, কারণ এটা ভঙ্গুর। ধাতু, কাঠ, রাবার, হাড় ইত্যাদির ভঙ্গুরতা কম, আবার কাঁচ, ইট, সিমেন্ট ইত্যাদি ভঙ্গুর। সাধারণ কাঁচ দিয়ে আমরা মোটর গাড়ী তৈরী করবো না; এটা দুর্বল বলে নয়, ভঙ্গুর বলে।

একটা জিনিসকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হলে যে শক্তি প্রয়োজন তা নির্ভর করা উচিত ঐ জিনিসের পরমাণুগুলোর পরস্পরের মধ্যেকার টানের উপর। এর উপর ভিত্তি করে আঁক কষে বিভিন্ন বস্তু যে জোর পাওয়া যায় বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় তার জোর এর একশ ভাগের এক ভাগ এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে হাজার ভাগের এক ভাগের বেশী নয়। ভঙ্গুর

জিনিসের কথাই প্রথমে ধরা যাক। হিসেব মত সাধারণ কাঁচের যত শক্ত হওয়া উচিৎ এটা তার চেয়ে অনেক কম শক্ত। কিন্তু দেখা গেল কাঁচের খুব সরু সূতা তৈরী করা হবে তা তার আকারের তুলনায় বড় কাঁচের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত হচ্ছে। সূতা যত সরু ততই তার জোর হিসেবের সাথে মিলে ভাল। শুধু তাই নয় সূতা বেশী সরু না হলেও এর গাটা যদি খুব ভাল করে পালিশ করে নেয়া হয় তা হলে জোর বেড়ে যায় অনেকখানি। ক্রমে বোঝা গেল আসলে কাঁচের কম শক্ত হওয়ার জন্য দায়ী হলো এর গায়ের অনেকগুলো অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটল-এত ক্ষুদ্র যে সাধারণ অনুবীক্ষণেও এদের দেখা যায় না। কাঁচের উপর যখন জোর খাটানো হয় তখন পীড়নটি (Stress) ফাটলের আগায় এসে জমা হয় এবং এখানে বহুগুণ বেশী হয়ে দেখা দেয়। এর ফলে খুব তাড়াতাড়ি ফাটলটি এগিয়ে চলে এবং শেষ পর্যন্ত পুরো জিনিসটাই ভেঙ্গে পড়ে। পালিশ করা গায়ে এসব ক্ষুদ্র ফাটল থাকে না, তাই তার এত জোর। অবশ্যই অতি অল্পতেই, হাত দিয়ে ছুলেই ঐটুকু আঁচড় লেগে আবার এসব ফাটলের সৃষ্টি হয় আর জিনিসটাও আবার কমজোর হয়ে পড়ে। খুব সরু সূতার গায়ে আঁচড় পড়ার ও ফাটল সৃষ্টি হয় আর জিনিসটাও আবার কম জোর হয়ে পড়ে। খুব সরু সুতার গায়ে আঁচড় পড়ার ও ফাটল সৃষ্টি হবার সম্ভবনা কম বলে এরাও শক্ত। সাধারণ কাঁচই শুধু নয় কাঁচ জাতীয় ভঙ্গুর সব জিনিস এই কারণেই ভঙ্গুর।

কাঁচ জাতীয় জিনিসের বৈশিষ্ট্য হলো এদের অণুগুলো এলোমেলো ভাবে দলা পাকিয়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন ধাতুসহ বেশীরভাগ কঠিন জিনিসের অণুগুলো সারিবদ্ধ হয়ে সুশৃংখলভাবে থাকে। তাদের আমরা বলি ক্রীষ্টাল বা স্ফটিকের আকারে থাকা জিনিস। লবণ বা চিনির একটা দানা তুলে নিলে দেখবে স্পষ্টত এর সুন্দর স্ফটিক রূপ আছে। তামা বা লোহার টুকরার এরকম কিছু ষ্পষ্ট দেখা যায় না বটে কিন্তু এরাও অসংখ্য ছোট ছোট স্ফটিকে তৈরী। এই জাতীয় জিনিসও ভঙ্গুর হতে পারে। স্তরে স্তরে অণু সাজাবার সময় স্ফটিকের গায়ে অনেক সময় সিঁড়ির মত ধাপ থেকে যায়; অন্যমনস্কভাবে ইটের গাথুনি করলে যেমনটি হতে পারে। এই ধাপগুলোই এক ধরনের ফাটলের কাজ করে এখানে দুর্বলতার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। খুব সরু স্ফটিক তৈরী করলে তার জোর অনেক বেশি হয় কারণ অণুস্তরের সংখ্যা খুব কম বলে এখানে ধাপ সৃষ্টির সম্ভাবনাও কম।

কোন জিনিস ভঙ্গুর না হয়ে নমনীয় হতে পারে। তখন তাকে টানলে বা মোচড়ালে আস্তে বিকৃত হতে হতে শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে যাবে। বেশীর ভাগ ধাতু এরকম নমনীয়। টানের বা মোচড়ের চোটে স্ফটিকের এক স্তর অণু পরবর্তী স্তরের উপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে পারে বলেই ওরা নমনীয়। এভাবে গড়াতে যে রকম বল প্রয়োগ করতে হওয়া উচিৎ তার চেয়ে অনেক কম বলেই কিন্তু ধাতুকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা যায়। এখানেও নিশ্চয়ই দুর্বলতার কোন ভিন্ন উৎস আছে। ১৯৩৪ সন পর্যন্ত ব্যাপারটির কোন ব্যাখ্য পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই বছরেই দুর্বলতার উৎসটি আবিষ্কৃত হলো। স্ফটিকে অণুগুলো সাজানো থাকে সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে লাইনে। এ রকম অসংখ্য লাইনের মধ্যে কিছু কিছু বে-লাইন হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। একটা লাইন হয়ত কদ্দুর গিয়েই থেমে গিয়েছে, দু'পাশের লাইন দুটো বেঁকে গিয়ে এরপর সোজা হয়ে গেছে। এ রকম বে-লাইনে বলা হয় বিচ্যুতি (Dislocation)। যে কোন স্ফটিকে এর রকম বিচ্যুতি কমবেশী যথেষ্ট থাকে, নতুন নতুন সৃষ্টিও হয় বিশেষ বিশেষ অবস্থায়। এরাই হলো সেই দুর্বল জায়গাগুলো। অণুর একটা স্তরকে আরেক স্তরের উপর দিয়ে গড়িয়ে অনেক শক্তির দরকার হতে পারে। কিন্তু একটা বিচ্যুতিকে অপেক্ষকৃত কম শক্তি প্রয়োগে সরিয়ে দেয়া যায় অন্যত্র। এভাবে সরতে সরতে এটা যখন পুরো জিনিসটার অন্য প্রান্তে পৌছায়, তখন বিচ্যুতিটি আর থাকে না, কিন্তু পুরো স্তরটাই পরবর্তী স্তরের তুলনায় সামান্য সরে যায়। বিচ্যুতির সংখ্যা অনেক বলে প্রক্রিয়াটা চলতেই থাকে। মনে করো ঘরের মেঝেতে একটা কার্পেট পাতা আছে। পুরো কার্পেটটাকে এক পাশে সরাতে বেশ শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু যদি কার্পেটের কোথাও একটা ভাঁজ থাকে তা হলে সামান্য শক্তিতে আঙ্গুলে টিপেটিপেই ভাঁজটাকে কার্পেটের এক পাশে নিয়ে যাওয়া যায়। তখন ভাঁজটা আর থাকবে না আর কার্পেটটা সেদিকে খানিকটা সরে যাবে। ব্যাপারটা যেন অনেকটা সেরকম।

বিচ্যুতি শুধু থাকলেই একটা জিনিস নমনীয় হয় না, সেগুলো সহজে চলাফেরা করা চাই। একটা জিনিসের উপর যদি অনবরত পীড়ন চালানো হয় তাহলে নানাদিক থেকে বিচ্যুতি এসে জট পাকিয়ে যায়, ফলে এরা আর সহজে নড়াচড়া করতে পারে না। জিনিসটার নমনীয়তা কমে গিয়ে এটা শক্ত হয়। একটা তার বা টিনের পাতকে ভাঙ্গতে তুমি তাকে এদিক ওদিক মোচড়াও। খেয়াল করে দেখেছো যে প্রথমে একে মোচড়ানো যত সহজ হয় পরে কিন্তু তা হয় না। যতই মোচড়াও ততই এটা শক্ত হতে থাকে। বারবার, মোচড়াবার ফলে বিচ্যুতিগুলো জট পাকিয়ে গিয়েই এটা ঘটে। শেষ পর্যন্ত নমনীয়তা একেবারে কমে গিয়ে জিনিসটি ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। লোহা পিটিয়ে শক্ত করার কথা বহুকাল থেকে মানুষ জানে। এখানেও একই কারণ। এভাবে শক্ত করা ধাতুকে যদি আবার নমনীয় করতে চাই তা হলে তাকে খুব উত্তপ্ত করে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করতে হবে। উত্তাপে অণুর নড়াচড়ার ফলে বিচ্যুতির জটগুলো ছুটে যায় আর ধীরে

ধীরে ঠান্ডা করার দরুণ অণুগুলো আবার সুশৃঙ্খল লাইনে আসার সময় পায়। একটা বিচ্যুতির সামনে যদি বিজাতীয়, বেঢক একটা অণু এসে পড়ে তা হলেও এর এগুতে অসুবিধা হয়। বিজাতীয় অণুটি যেন বিচ্যুতিকে একজায়গায় আটকে রাখে। ফলে এক্ষেত্রেও জিনিসটির নমনীয়তা কমে যায়। সোনা এমনিতে বড় নরম কিন্তু অল্প একটু তামার খাদ মিশিয়ে যেই কিছু বিজাতীয় পরমাণু ঢুকিয়ে দেয়া হয় তখনই এটা অলঙ্কার তৈরী করার মত শক্ত হয়। একই কারণে খুব সামান্য কার্বন মিশিয়ে ও তার পরিমাণ কম বেশী করে কাঁচা লোহা থেকে বিভিন্ন রকম নমনীয়তার লোহা ও ইস্পাত তৈরি করা সম্ভব হয়।

সুযোগ পেলে সব জিনিসই ভঙ্গুর হতে পারে। জোর খাটালে ক্ষুদ্র ফাটল এগিয়ে গিয়ে বড় ফাটলে পরিণত হয়, আর জিনিসটা ভাঙ্গে। ফাটলটাকে এভাবে বাড়তে না দিলে জিনিসটা সহজে ভাঙ্গতে পারে না। যেমন নমনীয় ধাতুতে রয়েছে বিচ্যুতিগুলো -সেগুলো ফাটলের আগায় এসে পড়লে ফাটল আর বাড়তে পারে না। সেই কারণেই ধাতুগুলো নমনীয়, ভঙ্গুর নয়। একটা ভঙ্গুর জিনিস যদি সর্বত্র নিরবিচ্ছিন্নভাবে তৈরি না করে ছোট ছোট খন্ডে একে বিভক্ত করে দেয়া হয় আর এই বিভক্ত খন্ডগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস দিয়ে জুড়ে দেয়া যায়, তা হলে কিন্তু এটা আর তত ভঙ্গুর থাকবে না। কারণ একটি ফাটল এগিয়ে গিয়ে যেই এই জোড়ার মধ্যে আসবে তখন এর দুর্বলতার জন্য এর মধ্য দিয়ে চলে যাবার পরিবর্তে জোড়াটাকেই বরং একটু ফাঁক করে দেবে। এই ফাঁকটুকু ফাটলটিকে গিলে নেবে, আর বাড়তে দেবে না। তোমার কাছে ধারে যত শক্ত জিনিস রয়েছে তার মধ্যে তোমার দাঁতগুলো অন্যতম। যত্ন নিলে এই একই দাঁত দিয়ে তুমি আরো অন্তত: চল্লিশ বছর নির্বিঘ্নে হাঁড় চিবুতে পারবে। কারণ কি জান? দাঁতের মধ্যে ছোট ছোট অজৈব স্ফটিককে জোড়া দিয়ে রেখেছে এদের ফাঁকে ফাঁকে পাতলা প্রোটিনের অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্তর। ফাইবার গ্লাস বা তন্তু কাঁচের কথা তুমি হয়ত শুনেছ। সেখানেও একই কৌশল। সরু কাঁচের আঁশকে আঠার মত রেজিন দিয়ে বেঁধে এটা তৈরী হয়। কাঁচ ভঙ্গুর জিনিস, রেজিনও তাই। অথচ এই ফাইবার গ্লাস মোটেই ভঙ্গুর নয়। আগে বলেছি কাঁচ দিয়ে আমরা মোটর গাড়ী তেরী করবো না। কিন্তু ফাইবার গ্লাস দিয়ে তা তৈরী না করার কোন কারণ নেই।

এরকম জিনিসই আগামী দিনে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য হবে। ফাইবার গ্লাস ছাড়াও একইভাবে বোরন, সিলিকন, কার্বাইড অথবা কার্বন তন্তু দিয়ে তৈরী হচ্ছে শক্ত প্লাষ্টিক। এরা শুধু শক্ত জিনিস দেবে না, দেবে দৃঢ় জিনিসও– যা বর্তমানে ব্যবহৃত ধাতুর মধ্যে অমিল। তাছাড়া সিলিকন, ম্যাগনেশিয়া ইত্যাদির মত দৃঢ় ও শক্ত বস্তুর মধ্যে ধাতুর নমনীয়তা এনে প্রয়োজনীয় সব গুণের সমাবেশ করারও চেষ্টা চলছে। এ সবের বেশীরভাগ এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু আসল কথা হলো এখন আমরা নির্মাণের বস্তুগুলো নিজেরাও প্রয়োজন মত গড়ে নিতে পারছি তার কারণ বিভিন্ন কেনর উত্তরগুলো ক্রমেই আমাদের জানা হচ্ছে পদার্থবিদ্যার গবেষণার মাধ্যমে। জ্ঞানমানেই তো ক্ষমতা।

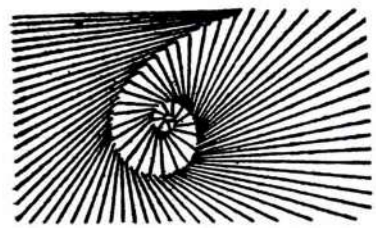

সাম্প্রতিক

মঙ্গলের খবর আসছে সেখানে কি প্রাণ আছে

[সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-'৭৬]

ভাইকিং-১ ও ভাইকিং -২ এখন মঙ্গলের পিঠে বসে আছে। প্রথমেই নেমেছে ভাইকিং-১। নামার মত উপযুক্ত জায়গা বেছে নিতে কিছু দেরী হয়েছে বটে-তবে এ কাজ ভালভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। মূল যানটি মঙ্গলের চারদিকে পরিক্রমণ করে যাচ্ছে আর সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে অবতরণকারী ল্যান্ডার অংশটি-যার ওজন ১৩ শত পাউন্ড। নিজের রকেট ইঞ্জিন কিছুক্ষণ চালিয়ে এটা মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে এসে ঢুকে। মঙ্গল পৃষ্ঠ থেকে ২০ হাজার ফুট উপরে থাকতে খুলে যায় এর অতিকায় প্যারাসুট। শেষ পর্যন্ত প্যারাসুটটাও ফেলে দিয়ে নিজের ইঞ্জিন চালিয়েই এটা আস্তে মঙ্গলের পিঠে নেমে এসেছে। নামার কয়েক ঘন্টা আগে থেকেই ভাইকিং মঙ্গলের চমৎকার প্রাণবন্ত সব ছবি ও তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে চলেছিল। রঙীন টেলিভিশন ছবিতে মানুষ দেখেছে মঙ্গলের আকাশ কি রকম হালকা গোলাপী, মঙ্গলের জমিও রক্তিম গোলাপী। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ছোট বড় নুড়ি, পাথর। খবর এসেছে সেখানে হাওয়ার গতিবেগ ঘন্টায় সর্বাধিক ১৫ মাইল। মঙ্গলে বড় বড় আগ্নেয়গিরির খবরও পাওয়া গেছে। এভারেষ্টের চেয়ে চার গুণ বেশী উঁচু আগ্নেয়গিরিও নাকি সেখানে আছে, উপকারী ওযোন গ্যাসের অস্তিত্বের খবরও এসেছে ইতিমধ্যে।

অবশ্য সব কিছু ভালয় ভালয় যায়নি। প্রথম দিকেই কাজ করছিল না ভাইকিং-এর একটা বাহু, সেটা দিয়ে মঙ্গলের কিছু মাটি এতে তুলে নেয়ার কথা। এটা মেরামত করলেন কোটি কোটি মাইল দূরে কালিফোর্ণিয়ার পাসাডোনায় বসা প্রকৌশলীরা প্রয়োজনীয় সংকেত পাঠিয়ে। মহাশূন্য কারিগরীর এক অপূর্ব দক্ষতা। এরপর ভাইকিং যথারীতি মঙ্গলের মাটি কুড়িয়ে নিয়েছে।

এই কুড়িয়ে নেবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সারা দুনিয়ার মানুষ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে মঙ্গলে কোন রকমের প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভাইকিং কি খবর পাঠায় তা জানতে। ভাইকিং এর আসল কাজ এটাই। এর জন্য তার সাথে দিয়ে দেয়া হয়েছে একটা পুরোদস্তুর ল্যাবোরেটরী। যদিও এই ল্যাবোরটরীর আয়তন মাত্র এক ঘনফুট, তবুও এটা তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে পাঁচ কোটি ডলার। এই ল্যাবোরটরীতেই এখন পরীক্ষা চলছে মঙ্গলের মাটি নিয়ে। পরীক্ষার কিছু কিছু খবরাখবর এসে পৌছছেও। পরীক্ষাগুলো মঙ্গলে মাটিতে ক্ষুদ্র জীবাণু জাতীয় প্রাণের অস্তিত্ব সংক্রান্ত। প্রধানতঃ তিনটা পরীক্ষা দ্বারা এটা মোটামুটি আঁচ করা যাচ্ছে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে না পারলেও। প্রথম পরীক্ষা-এই ক্ষুদ্র জীবাণু কতখানি কার্বনডাইঅক্সাইড নিচ্ছে এবং আত্মস্থ করছে তার পরিমাণ জানায়। দ্বিতীয় পরীক্ষা –দেখছে জীবাণুর খাবারগুলো কিভাবে ভেঙ্গে গিয়ে হজম হচ্ছে, আর তৃতীয় পরীক্ষা – দেখছে মাটির মধ্যের গ্যাসগুলোতে জীবাণুঘটিত কোন পরিবর্তন ঘটছে কি না। এই তিনটা পরীক্ষাই একাধিকবার সম্পন্ন হলে বিভিন্ন দিক থেকে প্রাণের অস্তিত্ব যাচাই হবে।

ভাইকিং–২ নেমেছে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে প্রথমটার ৬০০ মাইল উত্তরে ইউটোপিয়া নামক আরেকটি অবতরণ স্থানে। সেখানে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হতে পারে, কারণ কিছু পানি সেখানে তরল অবস্থায় থাকতে

পারে, জলীয় বাষ্পও সেখানে অনেক বেশী। ভাইকিং-২ এও রয়েছে হুবহু একই ল্যাবোরেটরী। সেখানেও একই পরীক্ষাগুলো করা হচ্ছে। তারপর মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। এ পর্যন্ত পরীক্ষার যা ফলাফল পাওয়া গিয়েছে তাতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হ্যাঁ বাচক কিছু লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা এখনো কিছুই নিশ্চিতভাবে বলতে চান না, পুরোপুরি পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে। বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তাঁরা এই ব্যাপারে বলার ব্যাপারে রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করছেন যাতে বেফাঁস কিছু বলা হয়ে না যায়।

জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষা ছাড়াও ভাইকিং মিশনের অনেক কিছু করার আছে। সেটা করবে প্রধানতঃ ভাইকিং অরবিটার অংশ যেটি এখন মঙ্গলকে পরিক্রমণ করছে–আরো বহুদিন ধরে করবে। গ্রহটির তাপীয় ম্যাপ নিয়ে এটা এর আগ্নেয়গিরির ক্রিয়া লক্ষ্য করছে। তা ছাড়া মঙ্গলে বাতাসে ধুলার পরিমাণ, বাতাসে ও জমিতে পানির পরিমাণ ইত্যাদি এটা নির্ণয় করে যাচ্ছে। মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ, আবর্তন অক্ষ, ত্বকের গুণাগুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাবে এটা। অরবিটার যখন সূর্যের কাছে থাকবে তখন সৌর-করোণা সম্বন্ধেও খবর নেবে যাতে করে সেখানকার ইলেক্টন সম্বন্ধীয় তথ্য জানা যায় আর দেখবে ভাইকিং থেকে পৃথিবীতে পাঠানো রেডিও সংকেত সূর্যের ভরের জন্য কতখানি বেঁকে যাচ্ছে যার ফলে এটা পৃথিবীতে পৌছতে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু দেরী হচ্ছে। এমনকি বেঁকে যাওয়ার কথা আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বেও রয়েছে। পৃথিবীর যেমন একটি চাঁদ মঙ্গলের তেমনি রয়েছে ডাইমোস আর ফোবোস নামে দুটা ছোট্ট ছোট্ট চাঁদ। আগামী বছরের প্রথম দিকে পর পর ডাইমোস ও ফোবাসের ২৫/৩০ মাইল কাছে দিয়ে অরবিটার চলে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। তখন সৌর জগতের অতি ক্ষুদ্র এই দুই সদস্য সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যাবে।

আমাদের প্রতিবেশী এই রক্তিম গ্রহ মঙ্গলে আজ এ মুহূর্তে আমাদের দুজন করিৎকর্মা দূত ভাইকিং বসে আছে। শুধু বসে নেই তারা এই সম্ভাবনাময় গ্রহটির নানা দিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সব খবর নিয়মিত আমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে। কোন অঘটন না ঘটলে আরো বহুদিন সে কাজ করে যাবে।

কুকুরের কান থেকে ব্যাঙের চোখ

[সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-'৭৬]

ড. জহুরুল হক

আমার বোনের বাড়ীতে একটি কুকুর আছে তার নাম 'টম'। আমি যখনই বোনের বাড়ি বেড়াতে যাই, দরকার না থাকলেও সে বাড়ীর অনেক দূর থেকেই দু 'একবার গাড়ীর 'হর্ণ' বাজিয়ে দিই। কেননা,আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, আর কেউ বুঝুক বা না বুঝুক টম বহু দূর থেকেই সে আওয়াজ চিনে ফেলবে, আর সবার আগে ছুটে এসে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কোথাও গেলে কেউ যদি এগিয়ে এসে তোমাকে নিয়ে যায় তাহলে কি তোমার খুব ভালো লাগবে না? আমি অবাক হয়ে দেখেছি, কোনদিন টম ছুটে আসতে ভুল করেনি। কোনোদিন টমের আসতে একটু দেরী হয়েছে, তখনি মনে সন্দেহ জেগেছে, হয়তো কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে।

কিন্তু না, টম কোনোদিনই নিরাশ করেনি। কিন্তু মুশকিল হয় গাড়ী থেকে নামলেই। টম দৌড়ে এসে পায়ের কাছে মাথা ঘষে নানান রকমভাবে আদর করতে চায়। আমি তাকে মাথায় হাত দিয়ে নিরস্ত করতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমার সঙ্গে যারা থাকে তারা ভয়েই অস্থির হয়ে চীৎকার করে। টম কোনো ক্ষতি করবে না জানা কথা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জোর করে না সরালেই চলে না। আমার খুব মন খারাপ করতে থাকে। কেননা আমি তো জানি টমের আর তার জাতভাইদের কতো গুণ। কতো বিষয়ে যে কুকুরদের ক্ষমতা মানুষের চাইতে বেশী, তা ভালভাবে জানলে অবাক হতে হয়।

কুকুরের প্রভুভক্তির কথা তো বিখ্যাত। কোনো কোনো পোষা কুকুর প্রভুভক্তির আর ভালোবাসার এমন নিদর্শন দেখিয়েছে যে, সেসব গল্প বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কুকুররা কথা বলতে আর লিখতে পড়তে জানলে হয় তো তাদের মন যে মানুষের চেয়ে কতো বড়ো তা- সগৌরবে প্রচার করে বেড়াতো। কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কি জঘন্য ব্যবহার আমরা করি। কুকুর কথা বলতে পারেনা, বা তাদের কথা আমরা বুঝতে পারি না বলেই হয়তো তাদেরকে এমন ঘৃণা করি। কিন্তু অন্য জাতের মানুষ, যারা আমাদের কথা বুঝতে পারে না, তারাও যদি আমাদের সঙ্গে এমনি ব্যবহার করতো?

কুকুরের হৃদয়ের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তার অন্য কয়েকটি শক্তি আছে যা মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। সেদিক থেকে ভাবতে গেলে মানুষেরই লজ্জা পাবার কথা। কুকুর যে শুধু প্রভুভক্তই তা নয়, বাড়ী ঘর পাহারা দেবার জন্যেও খুব কাজের সে কথা তোমাদের জানা আছে। কিন্তু কুকুর কেন পাহারা দেবার কাজে পটু সে কথা কি কোনোদিন ভেবে দেখেছো? আমি প্রথমেই টমের যে গল্পটি দিয়ে শুরু করেছি, তাতে একথাই বোঝাতে চেয়েছি যে কুকুরের কান খুব পরিষ্কার। তার মানে কুকুর বিভিন্ন শব্দের তারতম্য খুব ভালোভাবে ধরতে পারে। অবশ্য, মানুষেরও সে ক্ষমতা বেশ ভালোভাবেই আছে এবং এও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে মানুষের মধ্যে কারো কান বেশি পরিষ্কার কারো বা কম। বৈজ্ঞানিকরা এই শোনার ক্ষমতা নিয়ে নানান রকম সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে দেখেছেন।

যখন কোথাও কোনো শব্দ হয় তখন বাতাসে তরঙ্গ ওঠে। সেই তরঙ্গ কানে পৌঁছলে তখন আমরা শব্দটা শুনতে পাই। মানুষ কোন শব্দ শুনতে পাবে তা নির্ভর করে অবশ্য শব্দটা কতো জোরে হচ্ছে তার উপর। খুব দূরে শব্দ হলে কানে পৌঁছতে শব্দের শক্তি এত কমে যায় যে তা থেকে আর কোনো অনুভূতি হয় না, তখন সেটা শোনাও যায় না। আবার যদি খুব কাছে থেকে বাতাসে কম্পন হয় কিন্তু তার শক্তি যদি খুবই অল্প হয় তাহলে তাও শোনা কঠিন হয়। কিন্তু শব্দ শোনার আরো একটা দিক আছে। সেটা হলো বাতাসে যে তরঙ্গ ওঠে তার কম্পন সংখ্যা, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে কতবার তা উঠছে ও পড়ছে বা দিক পরিবর্তন করছে। বিভিন্ন কম্পন সংখ্যা কানে বিভিন্ন শব্দের অনুভূতি দিয়ে থাকে। একটা খালি কাচের গ্লাসে আঙ্গুল দিয়ে টোকা মেরে দেখ, মিষ্টি একটা আওয়াজ হবে। যখন আওয়াজ বেরোচ্ছে তখন গেলাসটাকে হাল্কা করে ছুঁয়ে দেখ, বুঝতে পারবে গেলাসটা কাঁপছিল। অবশ্যি তোমার ছোঁবার পরে পরেই গেলাসের কাঁপুনি থেমে যাবে,আওয়াজও বন্ধ হবে। এবারে গেলাসে কিছুটা পানি ঢেলে আবার টোকা মেরে দেখ, আওয়াজের ধরনটা একটু অন্য রকম বোধ হবে। এবারে যা কাঁপছে তার ওজন বেড়ে যাওয়ার ফলে কম্পন সংখ্যা কিছুটা বদলে (কমে) গেছে। তাই আওয়াজও বদলে অনেকটা ভারী হয়ে এসেছে।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মানুষ যেসব আওয়াজ শুনতে পায় তাদের কম্পন সংখ্যা থাকে একটা বিশেষ সীমার মধ্যে। নীচের দিকে এই সীমা হলো, সেকেন্ডে প্রায় ৩০ বার, আর উপরের দিকে সেকেন্ডে ১৫ হাজারের কাছাকাছি। তার মানে হলো এই যে কোনো কিছু যদি সেকেন্ডে ৩০বারের চেয়ে কম কম্পন সংখ্যার, কিংবা ১৫০০০ হাজারের চাইতে বেশী কম্পন সংখ্যার ,আওয়াজ তোলে তাহলে মানুষের কানে আওয়াজের কোনো অনুভূতি হবে না, অর্থাৎ মানুষ তাকে কোনো শব্দ বলে মনেই রাখতে পারবে না। মনে রাখবে, আমি একথা বলছি শুধু মানুষের সম্বন্ধে।

কিন্তু কুকুরের কথা আলাদা। স্বাভাবিকভাবেই কুকুরের কানের গড়ন মানুষের গড়নের চাইতে কিছুটা আলাদা। আর শুনলে কি রাগ করবে যে কুকুরের কানের গড়ন মানুষের কানের গড়নের চাইতে অনেক ভালো? কেননা কুকুরের শব্দের জগৎ মানুষের জগতের চাইতে অনেকটা বড়ো। অর্থাৎ কুকুর যেমন ৩০ কম্পন সংখ্যার কমের শব্দ শুনতে পায়, তেমনি ১৫ হাজারের বেশি কম্পন সংখ্যাও দিব্বি শুনতে পায়। সেদিক থেকে তাদের অনুভূতির বিস্তার আমাদের চাইতে বেশী সমৃদ্ধ বলা উচিৎ নয় কি? আশ্চর্য নয়, কুকুর জাতটি পাহারা দেয়ার কাজে আশ্চর্য ক্ষমতা দেখায়। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার নিস্তব্ধ রাতে ,কুকুর যখন হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে ওঠে তখন সে হয়তো শুনেছে এমন কোনো আওয়াজ ,যা মানুষের কখনো শোনার সাধ্যি ছিল না। শুধু তাই নয়। জীবজগতে অনেক প্রাণী আছে যারা মুখ দিয়ে, শরীরের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে নানান রকম আওয়াজ তুলে থাকে। বহু ক্ষেত্রে সে আওয়াজের কম্পন সংখ্যা মানুষের শ্রবণ-সীমার বাইরে। কিন্তু তা হয়তো অন্য কোন প্রাণীর শ্রবণ সীমার ভেতরে আর তারা হয়তো সে শব্দকে দিব্বি শুনতে পায় এবং হয়তো তার কোন একটা মানেও বুঝতে পারে। তাহলে কি একথা বলা চলে না যে মানুষ তার কানের বিশেষ গড়ন নিয়ে শব্দ জগতের একটা বিশেষ এলাকার মধ্যে আবদ্ধ এবং কোনো কোনো জীবজন্তুর অনুভূতির জগৎ আমাদের চাইতে বড়ো?

কুকুরের ঘ্রাণশক্তি যে খুবই প্রখর তাও তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। হয়তো দেখে থাকবে শোঁকা কাজটা কুকুর মানুষের চাইতে অনেক বেশি করে থাকে— কুকুর প্রায় সারাক্ষণই এটা ওটা শুঁকে বেড়াচ্ছে। জগৎ সম্বন্ধে তাদের অনুভূতি যা দিয়ে তৈরি, গন্ধ খুব সম্ভব তার একটা বিশেষ অংশ। মানুষের জগতে ঘ্রাণের একটা জায়গা আছে কিন্তু সেটা সারাক্ষণ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। মানুষ হয়তো বা স্পর্শের অনুভূতিকে তার চেতনার জগতে অনেক বেশি জায়গা করে দিয়েছে। তার কারণ বোঝাও কঠিন নয়। কুকুরের হাত নেই,তার চারটি পায়ের থাবা বা নরম অংশ বেশ ছোটো আর পায়ে নখগুলো বেশ প্রধান। মানুষের হাত আছে– হাতের নরম অংশটি বেশ বড়ো, আর অন্ততঃ পুরুষ মানুষের হাতে নখগুলি খুব প্রধান নয়। সে যাই হোক, মানুষ কুকুরের এই আশ্চর্য ঘ্রাণশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কতো চোর, ডাকাত খুনিকে যে ধরে ফেলেছে তার গল্প শুনে অবাক লাগে। মানুষের ঘ্রাণশক্তির চাইতে কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অনেক বেশি প্রখর আর বিস্তৃত বলেই তা সম্ভব হয় । আমাদের আশে-পাশে এমন অনেক জীবজন্তু আছে যাদের কোনো না কোনো শক্তি মানুষের চাইতে বেশি। কিন্তু মানুষের বাহাদুরীই হলো এই যে, অন্য জীবজন্তুর সেই শক্তিকে মানুষ নিজের কাজে লাগাবার কোনো উপায় বের করে ফেলেছে। আর না হয়তো, জীবজন্তুর সেই বিশেষ বিশেষ শক্তির গূঢ় তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবিষ্কার করে, তা বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কাজে লাগাবার পথ বের করেছে।

মানুষের চোখে দেখার ক্ষমতাটাই ধরা যাক। অন্ধকারে মানুষ চোখে দেখে না। কিন্তু বেড়াল এবং আরো অনেক নিশাচর প্রাণী অন্ধকারেও দিব্বি দেখতে পায়। তা কি করে সম্ভব হয়? লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, বেড়ালের চোখের মণি রাত্রিকালে অনেকটা বড়ো হয়ে যায়। কেন? রাত্রিকালে আলো কম বলে বেড়াল যেন তার নিজের চোখটাকেই বড়ো করে ফেলে, যাতে সেই কম আলোরই বেশি সম্ভব তার চোখে ঢুকতে পারে। মানুষের চোখের মণি রাত্রে বড়ো করার ব্যবস্থা থাকলে মানুষ নিশ্চয় অন্ধকারে আরো ভালো দেখতে পেতো। সেদিক থেকে মানুষের দুর্ভাগ্যই বলতে

হবে। কিন্তু এ ব্যাপারটিকে কাজে লাগাতে মানুষ পিছিয়ে থাকে নি। তোমরা যারা ক্যামেরা ব্যবহার করেছো,তারা নিশ্চয় জানো, আলো কম থাকলে 'অ্যাপারচার' বা ক্যামেরার সামনের অতসী কাঁচটার ফুটোটাকে বাড়িয়ে নিতে হয়। আবার উল্টো দিকও আছে। সুর্যের দিকে কি, কোন উজ্জল আলোর দিকে তাকানোর সময় চোখের পাতা নেমে এসে আপনিই গোটা চোখটিকে (চোখের মণিটিকে নয়) যেন ছোট করে দেয়। ক্যামেরাতেও তেমনি কাচের ফুটো ছোটো করে নিতে হয়, বেশী আলোতে ছবি তোলার সময়।

এতো গেলো খুব সহজ উদাহরণ। কিন্তু শুনলে কি অবাক হবে, মানুষ সত্যি সত্যি অন্ধকারে দেখার উপায় আবিষ্কার করে ফেলেছে? আমরা অন্ধকারে যে জিনিসের নিজের কোনো আলো নেই তাকে দেখি না এইজন্য যে তা থেকে কোনো আলোর তরঙ্গ এসে আমাদের চোখে দেখার অনুভূতি জাগায় না। দিনের বেলায় কিম্বা আলোর মাঝখানে প্রত্যেকটি জিনিস থেকে কিছু তরঙ্গ ছিটকে এসে আমাদের চোখে ঢোকে বলে তাদের আমরা দেখতে পাই। কিন্তু দেখার জন্যে আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যেরও প্রশ্ন আছে যেমন আছে শোনার ব্যাপারে শব্দ তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের। (তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কম্পন সংখ্যার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক; একটা বাড়লে অন্যটিতে ঠিক সেই অনুপাতে কমতে হবে)। এককথায় বলা যেতে পারে, মানুষের দেখার জগতও দু'টি সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আর সেই সীমা দুটি হলো একদিকে লাল আলোর কম্পন সংখ্যা, আরটিতে বেগুনি আলোর কম্পন সংখ্যা। কম্পন সংখ্যা লাল আলোর চাইতে কম হলে,কিংবা বেগুনি আলোর চাইতে বেশি হলে তাকে আর আলোর তরঙ্গ বলা যাবে না- অর্থাৎ সেই তরঙ্গে চোখে কোনো দেখার অনুভূতি হবে না।

রাতের অন্ধকারে লাল থেকে বেগুনি কোনো আলোই চোখে এসে পড়ে না কোনো জিনিস থেকে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় ধরা পড়ে গিয়েছে যে, সে অন্ধকারেও কিছু তরঙ্গ আসতেই থাকে যে কোন জিনিস থেকে, যাদের কম্পন সংখ্যা লালের চাইতে কম। বিজ্ঞানের ভাষায় এই তরঙ্গের নাম লালেতর - (Infra red)। এই তরঙ্গকে আলোর তরঙ্গ না বলে 'তাপ এর তরঙ্গ বলাই ভালো। সে তরঙ্গ অবশ্যই চোখে দেখা যায় না। কিন্তু তাকে ধরার যন্ত্র বিজ্ঞানীদের আছে। বিভিন্ন জিনিস আলাদা আলাদাভাবে এই লালেতর তরঙ্গ পাঠায়। আর তাই সে তরঙ্গ ধরার যন্ত্র দিয়ে সেই জিনিসটার বিশেষ চেহারাও মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ১৯৩৯-৪৫ সালের মহাযুদ্ধে এই যন্ত্র দিয়ে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারেও শত্রুকে দেখে গুলি করে মারা সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধের পরে অবশ্য এই যন্ত্র মানুষের অনেক বেশী উপকারে এসেছে। ঘন কুয়াশা ভেদ করে বা রাত্রিকালে উড়োজাহাজ চালানোর কাজে এই অন্ধকারের চোখ যে খুবই কাজে লেগে থাকে তা আর বলার প্রয়োজন নেই।

শুধু কুয়াশায় বা রাতের অন্ধকারে চলা নয়, এমনিতেই না দেখে চলার প্রয়োজন হয়ে থাকে মানুষের জীবনে। সমুদ্রে যে জাহাজ চলে তার নাবিকেরা জাহাজের ঠিক তলায় কি আছে তা কি চোখে দেখতে পায়? সমুদ্রের তলার মাটি থেকে আলোর তরঙ্গ জাহাজ পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না, তাই তলায় কি আছে না জেনেই চালাতে হয় জাহাজ। কিন্তু জাহাজ যদি চলতে চলতে হঠাৎ খুব অগভীর পানিতে গিয়ে পড়ে, আর শেষ পর্যন্ত আটকে যায়? কিম্বা হঠাৎ গিয়ে ধাক্কা খায় কোনো ডুবে থাকা পাহাড়ের গায়ে? তাই প্রতি মুহূর্তে জানা চাই সমুদ্রের গভীরতা কতোটা -জাহজের নীচে সমুদ্রের তলার মোটামুটি একটা ছবি।

জীবজগতে একটা অতি নগণ্য প্রাণী আছে, না দেখে চলার ক্ষমতা যার অদ্ভুত। এই প্রাণীটিকে পাখী বলতে পারতাম, কিন্তু এটি পাখি হিসেবে এমনই জাতের যে একে পাখী বলাটাকে ঠাট্টার সামিলই মনে করা হয়ে থাকে। কেউ ঠিক যতোটা নয় ততোটা মানসম্মানের অধিকারী যদি মনে করে নিজেকে তা হলে লোকে বলে- "বাদুড়ও একটা পাখী"! কিন্তু মজা এই যে এই ঠাট্টাটা দুই অর্থে সত্যি। বাদুড়ের সৌন্দর্য্য বলতে কিছু নেই, যেকোনো পাখীর যা আছে। আর আশ্চর্য এই, উড়তে পারে এমন প্রাণীর মধ্যে একমাত্র বাদুরই ডিম পাড়ে না, তাদের ছানা সরাসরি ভূমিষ্ঠ হয় (না কি 'বৃক্ষষ্ঠ বলা উচিত')।

সে যাই হোক এই কুৎসিত, নগণ্য বাদুড়ের এমন এক ক্ষমতা আছে যা মানুষের থাকলে নিজেদের খুব ভাগ্যবান মনে করা চলতো। বাদুড় যে বিশেষভাবে নিশাচর প্রাণী তোমরা তা নিশ্চয় জেনেছ। রাত হলে অন্যান্য পাখী যখন বাসায় ফেরে বাদুড় তখন বাসা ছাড়ে। বাদুড় যে অন্ধকারে চলাফেরা করে তাই নয় দেখা গেছে অত্যন্ত ঘন অন্ধকারে চলাফেরা করতে তাদের কোনই অসুবিধা নেই। এমনকি তাদের চোখ পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেও দেখতে তাদের কোনই কষ্ট হয় না। অর্থাৎ তাদের চলার জন্যে আলো আর অন্ধকার সমান।

বাদুড়ের এই 'দিব্যদৃষ্টি' নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা বহু অনুসন্ধান করেছেন। অন্ধকার ঘরে অনেক ক'টি লোহার তার ছাদ থেকে ঝুলিয়ে সেই ঘরে বাদুড় ওড়ানো হয়েছে। দেখা গেছে, কোনো তারকে এক বারো না ছুঁয়ে বাদুড় দিব্বি উড়ে চলতে পারে। ভাবছো বুঝি বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তি অতিরিক্ত প্রখর। বেশ তা হলে এসো বাদুড়ের চোখে ঠুলি পরিয়ে দেই। এবারে? স্বচ্ছন্দে বাদুড় উড়ছে তারের স্পর্শ বাঁচিয়ে। তা হলে বাদুড় দেখছে কি করে?

জবাব যা দিচ্ছি, তা পড়ে ভেবো না যে, ছাপার ভুল হয়েছে। 'বাদুড় দেখে তার কান দিয়ে। উঁহ, ওটা চোখ নয় কান, অবশ্য বলতে পারো.তা হলে দেখা শব্দটি ব্যবহার করা ঠিক হয় না। তা স্বীকার করছি। কিন্তু এরকম উল্টোপাল্টা ব্যাপার বোঝানোর জন্যে অন্য কোন শব্দ আমার জানা নেই।

আমার জবাবটা যে সত্যি, তার প্রমাণ কি? অন্ধকার সেই ঘরে, বাদুড়ের চোখ খোলা রেখে, কিন্তু কান ভালোভাবে বন্ধ করে দিয়ে ওড়ানো হয়েছিল। এবারে বাদুড়ের অবস্থা দেখে যতোটা দুঃখ হয়েছিল তার চেয়ে আশ্চর্যও কম লাগেনি। তারের সঙ্গে ঠোক্কর খেতে খেতে বাদুড়ের আর কিছু বাকি থাকেনি। এর পরে বাদুড়ের মুখটি সুতো দিয়ে বেঁধে কিন্তু চোখ আর কান দুই-ই খোলা রেখে দিয়ে ওড়ানো হয়েছিল। এবারেও একই দশা হয়েছিল বাদুড়ের।

তা হলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অন্ধকারে বাধা এড়িয়ে চলার ব্যাপারে বাদুড়ের মুখ আর কানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু চোখের নেই। ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেল,ওড়বার সময় বাদুড় মুখ থেকে এক রকম আওয়াজ বের করে থাকে। সে আওয়াজ বাতাসে কম্পন তুলে বাদুড়ের সামনে তার অনেক আগে আগে চলতে থাকে। বাদুড়ের সামনে যদি কোন বাধা থাকে তা হলে বাতাসের সেই তরঙ্গ ঐ বাধায় প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, আর বাদুড় সেই ফিরে আসা শব্দ কানে শুনতে পায় বাধাটির কাছাকাছি পৌছবার বেশ আগেই। তার ফলে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে এগিয়ে যেতে বাদুড়ের কোনোই অসুবিধা হয় না। কিন্তু আশ্চর্য কি জানো? বাদুড় ওড়বার সময় তেমন কোনো আওয়াজ করে না; নিঃশব্দেই উড়ে চলে। তাহলে ঐ যে আগে বললাম, বাদুড় উড়বার সময় মুখ থেকে এ রকম আওয়াজ বের করে, বাধা থেকে যা প্রতিফলিত হয়ে আসে? কেমন গোলমাল লাগছে তাই না?

কিন্তু যদি বলি যে, বাদুড় যে -আওয়াজ মুখ থেকে বের করে তা বাদুড়ের নিজের পক্ষে আওয়াজ,কিন্তু মানুষের কানের পক্ষে নয়? তাহলে গোটা ব্যাপারটা নিশ্চয় বোঝা যাবে। কুকুরের শব্দের জগৎ সম্বন্ধে আগে যা বলেছি ,তা মনে করলেই এই আশ্চর্য ব্যাপারটা আর ততো আশ্চর্য মনে হবে না। আসলে কি জানো? বিশেষ যন্ত্র দিয়ে মেপে দেখা গেছে বাদুড় মুখ দিয়ে যে আওয়াজ বের করে থাকে তার কম্পন সংখ্যা খুব বেশি, সেকেন্ডে প্রায় ৮০ হাজার। মানুষের কান এতো পরিষ্কার নয় যে ঐ কম্পন সংখ্যার আওয়াজ শুনতে পাবে; কিন্তু বাদুড়ের কান সে আওয়াজ খুব ভালোভাবেই শোনে।

তরঙ্গ ছড়িয়ে ছড়িয়ে তার প্রতিধ্বনি 'শুনতে শুনতে' এগিয়ে যাওয়ার এই পদ্ধতিটি মানুষ অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছে। জাহজের নীচে সমুদ্রের গভীরতা, অর্থাৎ তলার মাটির দুরত্ব মাপা সম্ভব ছড়িয়ে দেয়া এবং ফিরে আসা শব্দ তরঙ্গের সাহায্যেই। পানিতে শব্দের তরঙ্গ চলে একটা বিশেষ বেগে; তাই জাহাজের তলা থেকে ছড়িয়ে দেয়া শব্দ তরঙ্গ তলায় প্রতিফলিত হয়ে আসতে কত সময় নিচ্ছে, তা সঠিক ভাবে মেপে সহজেই বলা যায়, সেখানে সমুদ্র কতোটা গভীর। শুধুমাত্র জাহাজ চালানোর ব্যাপারেই নয়, প্রতিফলিত তরঙ্গের সাহায্যে শক্ত মাটির নীচে কোথায় কি আছে তাও অনেক ক্ষেত্রে অনুমান করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন ধাতুর খনির অস্তিত্ব মাটি না খুঁড়েই জানা গেছে অনেক সময়। এমনি আরো অনেক কাজে লাগানো হয়েছে বাদুড়ের সেই তরঙ্গ ছড়ানো, আর ফিরে পাওয়া তরঙ্গের বিচার করে চলার পদ্ধতিটিকে।

কিন্তু বাতাসে শব্দ তরঙ্গের একটা দোষ হলো এই যে, তা খুব বেশি দূর যেতে পারে না, তার শক্তি সহজেই শেষ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয়তঃ শব্দ তরঙ্গের গতিবেগ খুব বেশি নয়। অবশ্য বাদুড় যে বেগে ওড়ে শব্দ তরঙ্গ চলে তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত। তাই বাদুড়ের ছড়ানো শব্দ তরঙ্গ বাধা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে পারে। বাদুড়ের বেশি দুর এগোনোর আগেই। তার ফলে বাদুড় সময়মতো সাবধান হতে পারে, কিন্তু যেসব জিনিস চলে অত্যন্ত দ্রুতবেগে -যেমন জেট বিমান কিম্বা তারো কাছাকাছি তারা যদি চলতে চায় বাদুড়ের পদ্ধতিতে, তাহলে শব্দ তরঙ্গ দিয়ে কোনো কাজ হয় না। তখন প্রয়োজন হয় বেতার তরঙ্গের। এই তরঙ্গ চলার জন্যে বাতাসের দরকার নেই, তরঙ্গ অনায়াসে যেতে পারে বহুদূর। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এই যে, বেতার তরঙ্গের গতিবেগ পৃথিবীর যে কোন জিনিসের গতিবেগের চাইতে অনেক বেশি-সেকেন্ডে ১,৮৬০০০ মাইল (আলোক তরঙ্গের গতিবেগও এই)।

তোমরা বিমান চলাচলের ব্যাপারে রাডার (Radar) যন্ত্রের নাম হয়তো অনেকেই শুনেছো। রাত্রে কিম্বা ঘন কুয়াশার মধ্যে চলার সময় উড়োজাহাজ এই যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। বাদুড় যেমন শব্দ তরঙ্গ ছড়ায়, তেমনি রাডার যন্ত্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিজলী তরঙ্গ শুন্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ছড়িয়ে পড়া সেই তরঙ্গ যদি কোনো জিনিসের গায়ে ঘা খায়, তক্ষুনি তা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে গিয়ে ধরা পড়ে রাডারের গ্রাহক যন্ত্রে। রাডারের গ্রাহক যন্ত্রটি একটা ছায়াছবির পর্দার মতো। বিজলী তরঙ্গ যদি ফিরে আসে কোনো বাধায় ঘা খেয়ে, তা হলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার একটা মোটামুটি ছবি ফুটে উঠবে পর্দায়। এবং যেহেতু ঐ বিজলি তরঙ্গের গতিবেগ খুবই বেশি, সেহেতু বাধার ছবিটি দেখা যাবে বাধার কাছাকাছি পৌছবার অনেক আগেই। রাডার যন্ত্রের বর্তমানে এতো উন্নতি হয়েছে যে, শুধু মাত্র ছবিটি দেখা যাবে এবং পর্দায় ফুটে উঠা ছবিকে ভিত্তি করে ঘন কুয়াশার মধ্যে কিম্বা গাঢ় অন্ধকারে উড়োজাহাজ নিজে নিজেই সঠিক পথে চলতে পারে, মানুষ চালকের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই। অর্থাৎ বলা যেতে পারে– রাডার যন্ত্রটিই জায়গা নিয়েছে বিমান চালকের। তা হলে কি,রাডার নিয়ে চলার পদ্ধতিটি বাদুড়ের চলার পদ্ধতির নকল হলো না? কিন্তু রাডার আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৩৯-৪৫ সালের মহাযুদ্ধের সময়, আর বাদুড় তার এই আধুনিক পদ্ধতিতে চলছে হাজার হাজার বছর ধরে।

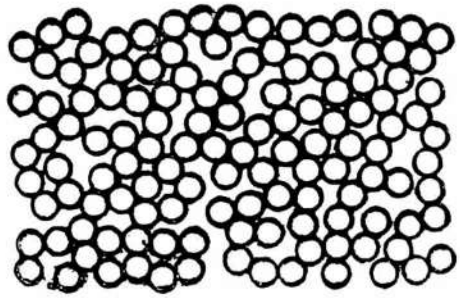

পারমাণবিক যুগের জন্মকথা

[নভেম্বর-৭৬]

স্বপন কুমার গায়েন

উনিশশ' উনচল্লিশ। সারা ইউরোপ জুড়ে থমথমে ভাব। বিপদের কাল মেঘ একটু একটু করে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলছে। শোনা যাচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী আবার দুর্বার শক্তি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত, মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত সেই বলদৃপ্ত জার্মানীতে তখন একনায়কের শাসন। আর সেই কঠোর, নির্মম একনায়ক এডলফ হিটলার। জার্মানির শাসন তখন নাৎসী বাহিনীর হাতে। হিটলার, ফুয়েরার হিটলার যার সর্বাধিনায়ক । বড় বেশী উচ্চাভিলাসী আর ক্ষমতা লিপ্সু হিটলার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের সব গ্লানি এরি মধ্যে মুছে ফেলেছে জার্মানী। তার শক্তি সারা ইউরোপের ত্রাসের কারণ। হিটলারের দৃষ্টি সারা ইউরোপের ওপর। জয় করে নিতে হবে ইউরোপের প্রতি ইঞ্চি জমি। তারপর হাত বাড়াতে হবে বাইরে। সারা পৃথিবীটাকে অধীনে এনে ফেলতে হবে। তারাই সারা দুনিয়াকে শাসন করবে। হিটলারের ভাবখানা এই। নিজের কতিপয় বন্ধুও সে জুটিয়ে ফেলেছে। এক নায়ক ফ্যাসিবাদী মুসোলিনির ইতালী আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপান।

ওদিকে চুপচাপ বসে নেই বৃটেন আর ফ্রান্সও। শুরু হয়েছে তলে তলে শক্তি সংগ্রহের পালা। সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব গড়ার চেষ্টা চলছে।....হিটলারের আগ্রাসী ক্ষুধা ওদিকে দিন দিন জোরদার হয়ে উঠছে। একের পর এক নাৎসী বাহিনী দখল করে চলছে বিভিন্ন এলাকা। ইউরোপের ক্ষুদে রাষ্ট্রগুলির ভয়, কখন কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নেকড়ের মত হিংস্র নাৎসী বাহিনী।

সারা ইউরোপে বিজ্ঞানীদের তখন ভীষণ খারাপ সময়। হিটলার ইতিমধ্যে ইহুদীদের দেশ থেকে তাড়ানো আর অত্যাচার, নির্যাতনের পালা শুরু করে দিয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে আমেরিকায়। ইউরোপ থেকে মহাসাগর দিয়ে বিচ্ছিন্ন আমেরিকাই তখন একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। যেসব রাষ্ট্র হিটলার এরি মধ্যে দখল করে নিয়েছেন বা যেসব রাষ্টের ওপর তার প্রভাব আছে সেখান থেকে বিজ্ঞানীরা একে একে পালিয়ে বাঁচছেন। ইতালী, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, ডেনমার্ক এমনকি খোদ জার্মানীর অনেক বিজ্ঞানীও (বিশেষ করে ইহুদী সম্প্রদায়ের) পালিয়ে ফিরছেন। সবাই জড় হচ্ছেন আমেরিকায়। কারণ ধনী আমেরিকাই তখন একমাত্র জায়গা যেখানে জীবন আর জীবিকার নিরাপত্তা আছে।

আমেরিকায় তখন বিজ্ঞান জগতের উজ্জ্বল সব জ্যোতিষ্কের সমাবেশ। বিশ্ববিখ্যাত আইনস্টাইন 'ত 'আগেই পৌছে গেছেন। ডেনমার্ক থেকে এসেছেন নীল বোর। পরমাণুর গঠন আবিষ্কার করে উনিশশ' বাইশেই নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন তিনি। এসেছেন ইতালী থেকে এনরিকো ফার্মি। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করে মাত্র এক বছর আগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়াও আছেন আমেরিকার নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী আর্থার কম্পটন। আছেন কালিফোর্নিয়ার নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ সাইক্লোট্রন যন্ত্রের আবিষ্কারক আর্ণেস্ট লরেন্স, হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানীদ্বয় লিও জীলার্ড আর ইউজীন উইগনার (উনিশশ' তেষট্টিতে পারমাণবিক ও নিউক্লিয় পদার্থ বিজ্ঞানে অবদানের জন্য তিনিও নোবেল পুরস্কার পান), আছেন হার্বার্ট এন্ডারসন, রবার্ট ওপেনহাইমার প্রমুখ। বেশ কিছুদিন পরে এসেছেন ইতালীয় পদার্থ বিজ্ঞানী, নীল বোরের বন্ধু এমিলিও জিনো সেগ্রেই (প্রতিপ্রোটন আবিষ্কার করে উনিশশ' উনষাটে তিনি নোবেল

পান)। এছাড়াও নিউট্রন আবিষ্কারক উনিশ শ' পয়ত্রিশে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী জেমস চাডউইকের নেতৃত্বে সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ড, অস্ট্রীয়ার বিজ্ঞানীদের একটি দলও মাঝে মাঝে আমেরিকায় আসতেন মতামত বিনিময়ের জন্য। এক কথায় আমেরিকায় তখন বিজ্ঞান প্রতিভা, মেধা আর অভিজ্ঞতার এক উজ্জল, বর্ণাঢ্য সমাবেশ।

বিশশতকের এই সময়েই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার শুরু। বিশ শতকের গোড়ার দিক ছিল সমস্যা উত্তরণের যুগ। তিনের দশকে পৌছে বিজ্ঞানের রথ ছুটেছে। উদ্দাম, সুন্দর তার সে গতি। নিত্য নতুন ধ্যান ধারণার উন্মেষ ঘটছে। একের পর এক সাফল্য এসে তাকে অভিনন্দিত করেছে। নিত্য নতুন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে বিজ্ঞান তখন।

ঠিক সেই সময়েই ঘনিয়ে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। রাষ্ট্রনায়কদের তখন একই চিন্তা। শক্তি চাই। চাই নিত্যনব শক্তিশালী সমরাস্ত্র, যা শত্রুকে শেষ করে দেবে। শক্তি চাই যা আকাশে বিমান ওড়াবে, সাগরে যুদ্ধ জাহাজ ভাসাবে, সাবমেরিন চালাবে। বিজ্ঞানীরাও তখন সেই শক্তিকেই খুঁজে ফিরছেন।

বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ তখন উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছেন পরমাণুর দিকে। পরমাণুর ভেতরে ঘুমিয়ে আছে যে শক্তি তাকে যদি জাগিয়ে তোলা যায়, ব্যবহার করা যায় নিজেদের কাজে, তবেই সব সমস্যার শেষ। বেশ কিছুদিন আগেই মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, হ্যাঁ পদার্থ থেকে শক্তি পাওয়া যেতে পারে। বিপুল পরিমাণ শক্তি। পদার্থ থেকে শক্তিতে রূপান্তরের সূত্রও বের করেছেন তিনি। কিন্তু কোন পথে পদার্থের বুক নিঙড়ে বের করে নেয়া যাবে সে শক্তি? উপায় কী। বিজ্ঞানীরা খুঁজে খুঁজে হয়রান।

এর মধ্যেই ইউরোপে ঘটে গেছে এক গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার। দেখা গেছে তেজস্ক্রিয় ধাতু ইউরেনিয়ামকে ধীর গতি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে সে ভেঙে যায়। একটি মাত্র ধীর গতি নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়ামের একটি পরমাণু ভেঙে তৈরী হয় বেরিয়ামের একটি,আর ক্রিপ্টনের একটি পরমাণু। সেই সাথে বেরিয়ে আসে প্রচুর পরিমাণ শক্তি আর দু থেকে তিনটি দ্রুত গতি নিউট্রন। তার মানে, ১ ইউরেনিয়াম +১ নিউট্রন (ধীর)– ১ বেরিয়াম + ১ ক্রিপ্টন+ শক্তি+ ২/৩ নিউট্রন(দ্রুত)। অস্ট্রীয়ান মহিলা বিজ্ঞানী লিজ মীটনার এই প্রক্রিয়ার নাম দিলেন 'ফিশন প্রক্রিয়া'। নীল বোর আমেরিকায় পৌছে বিজ্ঞানীদের বললেন 'ফিশন প্রক্রিয়া'র কথা। বিষয়টি বিজ্ঞানীদের নাড়া দিল প্রবলভাবে। এই পদ্ধতিতে পরমাণুকে ভেঙ্গে শক্তি সংগ্রহের সম্ভাবনা দেখলেন তাঁরা। বিশেষ করে ফিশন পদ্ধতিতে নিউট্রন বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলল তাঁদের, সম্ভাবনাকে উজ্জলতর করে তুলল।

প্রশ্ন হচ্ছে, নিউট্রন বেরিয়ে আসার মধ্যে বিজ্ঞানীরা সম্ভাবনার কি দেখতে পেলেন? নিউট্রন বেরিয়ে এলেই কি লাভ? না এলে ক্ষতিটা হচ্ছে কোথায়? নিউট্রন বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

ইউরেনিয়ামের একটি পরমাণুকে ভেঙে ফেলতে একটি নিউট্রন দরকার। আর সে নিউট্রনটি আমাদের বাইরে থেকে জোগার করতে হবে। কিন্তু একটি ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেঙে গেলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দু' দুটি নিউট্রন। এরা বেরিয়ে আসছে ইউরেনিয়ামের ভেতর থেকেই; বাইরে থেকে খুঁজে আনতে হচ্ছে না। এই নিউট্রন দুটি আবার অন্য ইউরেনিয়াম পরমাণুকে আঘাত করে ভেঙে ফেলছে, আর বেরিয়ে আসছে প্রতিটি পরমাণু থেকে দুটি করে মোট চারটি নিউট্রন। এবার আমাদের হাতে আছে চারটি নিউট্রন; যা দিয়ে আমরা চারটি ইউরেনিয়াম পরমাণু ভাঙতে পারি। এরা আবার চার দুগুণে আটটি নিউট্রন দেবে, যা দিয়ে আরো আটটি পরমাণু ভাঙ্গা যাবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে একটি শৃঙ্কল বিক্রিয়ার আকারে ইউরেনিয়ামের ফিশন চলতেই থাকবে। প্রত্যেক ধাপে ধাপে নিউট্রনের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আর খুব কম সময়ের মধ্যেই, প্রচুর পরিমাণ ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেঙে যাবে।

এই শৃঙ্কল বিক্রিয়া বা চেইন রিঅ্যাকশানের সুবিধার দিকটা হচ্ছে যে প্রতিটি পর্যায়ে ইউরেনিয়াম ভাঙার সাথে সাথেই শক্তি পাওয়া যাবে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা পরমাণু ভেঙে যে শক্তি তৈরী হবে তার পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু শৃঙ্কল বিক্রিয়ার বেলায় প্রত্যেক ধাপে বেশি ....আরো বেশি পরমাণু ভাঙতে থাকবে। বেরিয়ে আসা শক্তির পরিমাণও তাই খুব বেশী হবে। এক আউন্স পরিমাণ ইউরেনিয়াম পুরোপুরি ভেঙে গেলে যে শক্তি বেরিয়ে আসবে শুধু তা দিয়েই বিশ হাজার বৈদ্যুতিক বাতি বার বছর জ্বালান যাবে। এ থেকে খুব সহজেই বোঝা যায় কি বিপুল শক্তি বেরিয়ে আসে ফিশন প্রক্রিয়ায়।

এতো গেল তত্ত্বের দিক। বেরিয়ে আসা নিউট্রনকে কাজে লাগানো গেলে পরমাণুর ভেতরের বিরাট শক্তিকে বের করে আনা যেতে পারে। প্রশ্ন দেখা দিল কিভাবে এই নিউট্রনকে কাজে লাগানো যায়! বিজ্ঞানীরা এরি মধ্যে লক্ষ্য করেছেন গবেষণাগারে ফিশন প্রক্রিয়ায় যে নিউট্রন বেরিয়ে আসে, তারা কোনো শৃঙ্খল বিক্রিয়ার জন্ম দেয় না। হয় ইউরেনিয়াম পিন্ড ছেড়ে বেড়িয়ে যায়, নয়ত অন্য কোন কারণে হারিয়ে যায়। খুবকম নিউট্রনই অন্যান্য ইউরেনিয়াম

পরমাণুকে আঘাত করে ভেঙে দেয়। অনেকেই তাই মনে করলেন, বেরিয়ে আসা নিউট্রন দিয়ে কোন সময়েই বড় রকমের শৃঙ্খল বিক্রিয়া ঘটান যাবে না। তাই এক্ষেত্রে সময় ব্যয় করা তাঁরা ঠিক মনে করলেন না। কিন্তু কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা লেগে রইলেন।

ইউরোপ থেকে আমেরিকায় আসা বিজ্ঞানীরা কিন্তু ভাবনায় পড়লেন। কারণ 'ফিশন পদ্ধতি'র আবিষ্কার হয়েছিল জার্মানীতে। জার্মানী যদি কোন রকমে 'শৃঙ্খল বিক্রিয়া' ঘটানোর পথ আবিষ্কার করে ফেলে, তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই সে শক্তিশালী বোমা ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করে ফেলবে। পৃথিবীর জন্য তা এক বিরাট হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সত্যি সত্যিই পরমাণু থেকে শক্তি পাওয়া যাবে কিনা, 'শৃঙ্খল বিক্রিয়া'কে বাগে আনা সম্ভব হবে কিনা এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিজেরাও সংশয়ের দোলায় দুলছিলেন। তাই জোর দিয়ে মার্কিন সরকারকে তাঁরা কিছু বলতেও পারছিলেন না। পদার্থবিদ ফার্মি ওয়াশিংটনে এক এডমিরালের সাথে আলাপ করলেন। কিন্তু তিনি নিজেও ছিলেন অন্ধকারে, সংশয় ছিল তাঁর মধ্যে, তাই আলোচনায় কোন ফল হল না।

বিজ্ঞানীরা হাল ছাড়লেন না। হতাশ হওয়াত' বিজ্ঞানীর জন্য নয়, লেগে থাকাই তার ধর্ম। লিও জীলার্ড আর ইউজীন উইগনার, দুই হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানী বিশেষ তৎপর হয়ে উঠলেন। অনেক আলাপ আলোচনার পর তাঁরা ঠিক করলেন আইনস্টাইনের সাথে দেখা করবেন। কারণ আইনস্টাইন আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তাঁর কথা আমেরিকা সরকার নিশ্চয় শুনবেন। আইনস্টাইন তখন প্রিন্সটনে থাকেন। ফিশনের ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহ দেখালেন তিনি। ঠিক হল আইনস্টাইন একটি চিঠি লিখবেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে।

চিঠি লেখা হল। পুরো দু'পাতা টাইপ করা চিঠি। মহাবিজ্ঞানী বললেন, ফিশন প্রক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি পাওয়া যাবে তাঁর বিশ্বাস। সবশেষে লিখলেন ইতিহাসে প্রথমবারের মত মানুষ এমন শক্তি ব্যবহার করবে যা সূর্য থেকে আসে নি। এরপর নাম স্বাক্ষর করলেন আইনস্টাইন। তারিখ ২রা আগষ্ট উনিশ'শ উনচল্লিশ।

ঠিক হল গুরুত্বপূর্ণ এমনি এক চিঠি ডাকে পাঠান উচিৎ হবে না। জীলার্ডের এক বন্ধু প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠিটা পৌঁছে দিতে রাজী হলেন। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সুযোগ করে উঠতে পারলেন না তিনি। সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল বেজে উঠল সারা ইউরোপ জুড়ে। অক্টোবরের এগার তারিখে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আইনস্টাইনের চিঠি পেলেন। সাথে সাথে তিনি ইউরেনিয়াম বিষয়ক পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিলেন। যার কাজ হবে প্রেসিডেন্টের সাথে বিজ্ঞানীদের যোগাযোগ রক্ষা করা। জীলার্ড পরমাণু বিজ্ঞানীদের বললেন, ফিশন ও শৃঙ্খল বিক্রিয়ার ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করতে। শত্রু পক্ষ যাতে গবেষণার বিষয় জেনে ফেলতে না পারে।...এভাবেই আনবিক যুগের জন্মের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হল।

ভিনদেশী এক স্কুলে

[নভেম্বর-'৭৬]

জিয়াউল হক

কানাডার ছোট্ট একটি শহর কেলোনায় আমার স্কুলে বহু নতুন নতুন খবর জমছে। একটা জিনিস খেয়াল করছি এখানে সব কিছু বড় বেশী স্বয়ংক্রিয়। সুইচ টিপেই এরা অনেক কাজ সারতে চায়। আমরা কাউকে টেলিফোন করলে সঠিক লোকের সাথে কথা না বলতে পারলেও হয় অন্য কারো সাথে আলাপ করি,তাকেই দরকারী খবরটা জানাই। ঐ লোক কখন আসবে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু আমার গৃহকর্তা মিঃ ফাউলার যখনই বেরিয়ে যান। তখনই তাঁর টেলিফোনের কাছে একটা সুইচ টিপে যান। আর তাঁকে ফোন করলে যে কেউ শুনতে পারে তাঁর রেকর্ড করা গৎ বাঁধা কথা– "আমি বব ফাউলার বলছি, আমি এখন বাসায় নেই। আপনার কোন বক্তব্য থাকলে বলুন।" এরপর ও পক্ষ থেকে যা বলা হবে তা রেকর্ড হয়ে থাকবে, ফাউলার সাহেব ফিরলে শুনার জন্য।

কিন্তু এত সহজ জীবন হলে কি হবে এরা শরীরের বড় যত্ন নেয়। বাড়ীতেই দেখলাম রয়েছে ছোটখাট একটা জিমনেশিয়াম, রাত্রে সবাই খানিকটা ব্যায়াম যাতে করে নিতে পারে তার ব্যবস্থা।

এখানে এখন শুধু তুষার আর তুষার। চারিদিকে স্তূপ হয়ে বরফ জমে আছে। ন্যাড়া গাছগুলো, রাস্তা-ঘাট সবই সাদা হয়ে আছে। পথচলা বিশেষ করে গাড়ী চালানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। ব্রেইক কষলে গাড়ী থামে না। পিচ্ছিল বরফের উপর গড়িয়ে কোন দিকে যে ছুটবে তার কোন ঠিক নেই। খাঁজকাটা চাকা আর খসখসে রাস্তার প্রয়োজন যে কেন তা এখন টের পাচ্ছি। গাড়ীগুলোকে সচল রাখার জন্য নানা ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রায়ই ট্রাক এসে রাস্তায় বালি আর নুন ছিটিয়ে যায়। বালি দেয়ার ফলে পিচ্ছিলতা কিছু কমে। আর বরফ গলাতে সাহায্য করে। এসব সত্ত্বেও বরফের উপর গাড়ী চালানো ভারী বিপজ্জনক। অবশ্য বরফের মজার দিকও আছে। সেদিন স্কুলের সবার সাথে 'স্কি' করতে গেলাম। পায়ে দুটা মসৃণ সরু তক্তার মত জিনিস পরে বরফের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া। খুব সহজ কাজ নয়, এটা বহু প্রাকটিস করে আয়ত্ত করতে হলো কেমন করে পা না ভেঙ্গে স্কি করতে হয়। গতিকে নিয়ন্ত্রন করতে হয় এঁকে বেঁকে এদিক ওদিকে ঘুরে। তবে ভারী মজার এই কাজ।

আরো মজা হলো যখন আমরা স্কিডু নামে এক ধরনের ছোট গাড়ী চড়ে বরফের উপর দিয়ে বেড়ালাম। এই গাড়ীর সামনের চাকার বদলে রয়েছে স্কির মতো জিনিস। তরতর করে এটা বরফের উপর দিয়ে ছুটে। একসময় কেলোনাতে হলো তুষার উৎসব। এতে বরফ নিয়ে কত কি যে মজার কান্ড হলো তা বলে শেষ করা যাবে না। একটা খেলা হলো বিচিত্র পোষাক পরে বরফের উপর গড়াগড়ি খাওয়া। আরেকটা শুধুমাত্র হাফপ্যান্ট পরে তুষার গলা পানির মধ্যে নেমে পাঁচ মিনিট সেখানে থাকা। কেউ কেউ ওকানেগান হ্রদেই নেমে পড়ল, যেখানে পানির উত্তাপ হচ্ছে ৩৩° ফারেনহাইট অর্থাৎ বরফের মাত্র এক ডিগ্রী উপরে।

ইতিমধ্যে স্কুলে আমাকে নতুন নতুন কয়েকটা কোর্স নিতে হচ্ছে। একটা কোর্সের মধ্যে বেশ কিছু নতুনত্ব আছে। এটা ইংরেজী সাহিত্যের অষ্টম গ্রেডের বেশ কিছু ছাত্র যাদের ইংরেজীতে অসুবিধা হচ্ছে তাদেরকে সাহায্য করাই এই কোর্সের কাজ। এরা কেলোনার বিভিন্ন স্কুল থেকে এসেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বুদ্ধিগত দিক থেকে

একটু পিছিয়ে পড়া। এদের নিয়ে বেশ মুশকিল। শিক্ষকও অবশ্য আছেন একজন। তিনি এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেন। এই কোর্সের আরেকটা কাজ হলো উপন্যাস সজোরে পড়ে তা ক্রমাগত টেইপ করে রাখা। এসব টেইপ পরে নিকটবর্তী বয়োজ্যেষ্ঠ সদনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে থাকেন খুব বেশি বয়সের বুড়ো-বুড়ীরা। তাঁরা আমাদের পড়া সেই গল্পগুলো শুনে উপভোগ করেন, সময় কাটান।

যাঁর বাড়ীতে এখন আমি থাকছি তাঁর একটা ওষুধের দোকান আছে। বেশীরভাগ ওষুধ তাঁকে আনতে হয় দূরবর্তী ভ্যাঙ্কুবার থেকে। কিন্তু সে কাজটা তিনি করেন খুবই সহজে। কেমন করে জানো? কম্পিউটারের সাহায্যে। তাঁর রয়েছে বেশ কিছু কম্পিউটার কার্ড। যে যে জিনিস আনতে চান সেগুলোর সাঙ্কেতিক নম্বর, এর পরিমাণ ইত্যাদি কার্ডে ফুটো করে করে লিখে ফেলেন। তারপর একটা কম্পিউটারের ভেতর দিয়ে সে কার্ড চালালে বিশেষ এক টেলিফোন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভ্যাঙ্কুবারে সরবরাহকদের কাছে জিনিসপত্রের লিষ্টি পৌঁছে যায় সাথে সাথে। সেখানেও কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে তারা সব জিনিস সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী করে ফেলেন অল্প সময়ে। দু এক দিনের মধ্যে ওষুধের দোকানে ওষুধ এসে হাজির হয়।

স্কুল ছাত্রদের প্রতি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্ররায় (১৩৩৪) :

তোমরা যখন কলেজে যাবে একটি একটি ক্ষুদ্র নবাব হবে। খাসাটেরি, তাম্বুল রাগের রক্ত অধর, কি নধর দেহ খান। মা বাপ কত কষ্ট করে খরচ পাঠান, আর তোমরা শহরে সিনেমা ও থিয়েটারে গিয়ে –আর এখন পাড়ায় পাড়ায় রেস্তোরা হইতেছে সেখানে যাইয়া চপ-কাটলেট, অনেক সময় অর্দ্ধ পচামাংশ প্রভৃতি খাইয়া সেই অর্থের কি সদ্ব্যবহার কর?

গ্রীষ্মকালে আড্ডা, তাস, দিনের বেলায় ঘুম। দৈহিক পরিশ্রমে পাপ, হীনতা বোধ করা। তোমরা লেখাপড়া শিখছ ডিগ্রি পেলেই তোমাদের শিক্ষা ফুরাল কিন্তু তা না। লেখাপড়া শিখে কেন? দুনিয়াটা চক্ষু মেলে প্রকৃত ভাবে দেখার জন্য। প্রকৃতির সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হওয়ার জন্য। কি তা কি? চোখ ফুটলে তবে দেখতে পাবে তোমরা যা করছ সব ভুয়া। যাদের চাষা বল, তারা যে টুকু তৈয়ার করে দেয় তার উপর এক পয়সা যোগ কেউ করেনা। তোমরা কেবল খাওয়ার খাসি।

অনুসন্ধান

অনুসন্ধানী কারা? তারা কি করে?

[জানু-'৭৭]

অনুসন্ধানী বাংলাদেশের প্রথম বিজ্ঞান ক্লাব। ১৯৭৩ সনের ২৯শে জানুয়ারী ঢাকা গর্ভণমেন্ট ল্যাবোরেটরী স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র ছোটখাট যন্ত্রপাতি ও খেলনা বানাতে গিয়ে ইয়াং সীকার্স (অনুসন্ধানী) নামে একটা বিজ্ঞান ক্লাবে সংঘবদ্ধ হয়। সেটাই আমাদের শুরু। ক্রমে আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করি এবং আমাদের বয়সী ছেলেমেয়ের মধ্যে আমাদের উৎসাহকে সংক্রমিত করতে সমর্থ হই। এক পর্যায়ে অনুসন্ধানী একই লক্ষ্যের অভিসারী মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী'র সাথে যুক্ত হয়। বর্তমানে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় আমাদের ত্রিশটি সক্রিয় শাখা আছে। ঢাকার বাইরে আমাদের শাখা আছে। এ পর্যন্ত নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম,বরিশাল, মাদারীপুর, ও টাঙ্গাইলে। 'অনুসন্ধানী'র সদস্য সংখ্যা এখন পাঁচ শতাধিক। প্রায় সবাই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী।

আমাদের উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানকে শুধু পাঠ্য পুস্তকে বা পরীক্ষার কারণে করণীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে পরিবেশকে জানার কাজে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও উদ্ভাবনীতে শিশু -কিশোরদের আনন্দময় ও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণই আমাদের উদ্দেশ্য। অন্যান্য সবকিছুর মতো ছোটবেলা থেকে বৈজ্ঞানিক সৃজনীশক্তির বিকাশ দেশ গড়ার কাজে অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি। দেশের সবর্ত্র,সব পরিবেশে অনুসন্ধানী দল গড়ে উঠুক, এটি একটি আন্দোলনে পরিণত হোক, এই আমাদের আশা।

আমরা কি করেছি

আমাদের অত্যন্ত সীমিত সুযোগ নিয়েও আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেছি। প্রজেক্টগুলো প্রধানতঃ নিম্ন ধরনের :

(ক) খুব সাধারণ জিনিস পত্র ব্যবহার করে নিজেদের গড়ে তোলা ওয়ার্কশপে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বানিয়েছি। এরমধ্যে রয়েছে ডিমে তা দেবার ইনক্যুবেটর , সরল রেডিও, সম্পূর্ণ আবহাওয়া কেন্দ্র, সার্ভে যন্ত্রপাতি যেমন- দূরত্ব মাপক যন্ত্র, উন্নতি মাপক যন্ত্র; পানির লবণাক্ততা ও জলস্রোতের বেগ নির্ণয়ের যন্ত্র, সরল এনালগ কম্পিউটার এবং ল্যাবারেটরীর পরিমাপের যন্ত্রপাতি যেমন গ্যালভানোমিটার, নিক্তি, মাইক্রোমিটার ইত্যাদি। আমাদের বানানো প্রত্যেকটি যন্ত্রকে ক্রমাগত উন্নত করার জন্য আমরা চেষ্টা অব্যাহত রাখি।

(খ) নিজেদের আয়োজিত ব্যবস্থায়, প্রধানত নিজেদের তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আমরা পদার্থবিদ্যা,রসায়ন ও উদ্ভিদ বিদ্যার কিছু কিছু নিয়ম পরীক্ষা করে দেখেছি।

(গ) আমাদের আশে পাশের পরিবেশ থেকে আমরা গাছের পাতা, বিভিন্ন পোকা-মাকড় ও বিভিন্ন প্রজাপতির কয়েকটি সংগ্রহ গড়ে তুলেছি। এসব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তালিকাবদ্ধকরণের পদ্ধতিগত দিকে আমরা ক্রমেই অভিজ্ঞ হচ্ছি।

(ঘ) ১৯৭৪ এর শেষের দিকে বসন্ত নির্মূল অভিযানে আমরা স্থায়ী ভাবে কিছু অনুসন্ধান চালাই এবং নিজেরাই ৩০০ লোককে টিকা দেই।

১৯৭৫ এর প্রথমে ঢাকায় ভাইরাস ফিবার দেখা দিলে সে সম্বন্ধেও আমরা কিছু স্থানীয় অনুসন্ধান চালাই।

(ঙ) বিভিন্ন প্রজেক্টের উপর ভিত্তি করে আমরা কার্জন হলে দু'বার, নারায়ণগঞ্জ পৌর পাঠাগারে দু'বার, চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল স্কুলে একবার এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাড়ায় মোট ষোলটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও ক্ষুদে বিজ্ঞানী শিবির আয়োজন করেছি। এদের মাধ্যমে আমরা আমাদের কার্যক্রমকে আমাদের অন্যান্য ভাই বোনদের কাছে নিয়ে গিয়েছি।

(চ) অনুসন্ধানীর সদস্যদের জন্য আমরা কতগুলো বিজ্ঞান-ভিত্তিক পরিদর্শনের আয়োজন করেছি। তার মধ্যে ছিল বিজ্ঞান যাদুঘর, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র, কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত। বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের কর্মীদের সহায়তায় আমরা এর একটা সম্পূর্ণ মডেল এরপর তৈরি করেছিলাম।

(ছ) প্রায়ই আমরা আলোচনা সভায় মিলিত হই। নিজেদের সাম্প্রতিক প্রজেক্টগুলোর সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে এবং ভবিষ্যৎ প্রজেক্ট সম্বন্ধে আলোচনা করা এসব সভার নিয়মিত কাজ। তাছাড়া বিজ্ঞানের এক একটা বিশেষ দিক নিয়েও মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। এসব সভায় প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তিদেরকেও আমন্ত্রণ করা হয়।

আমাদের যা আছে

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের স্কলারশীপে পাওয়া টাকা নিয়মিত দান করার মাধ্যমেই 'অনুসন্ধানীর' প্রথম অর্থ সংস্থান হয়েছিল। এ ছাড়া ক্লাবের মাসিক সদস্য চাঁদা এক টাকা। বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিজ্ঞান বিষয়ক মোট পঁচিশটা প্রোগ্রাম নানা সময়ে করে সদস্যরা এতে প্রাপ্ত পুরো টাকা ক্লাব তহবিলে জমা দিয়েছে। রেডিও বাংলাদেশে কয়েকটি অনুষ্ঠান করেও কিছু অর্থ সংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে বন্ধু বান্ধব ও শুভানুধায়ীদের কাছে শুভেচ্ছা কার্ড বিক্রয়ের মাধ্যমেও কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। এই পর্যন্ত এই-ই আমাদের একমাত্র আর্থিক ব্যবস্থা। উত্তরা ব্যাংক লালবাগ শাখায় অনুসন্ধানীর একটি একাউন্ট আছে, যা পরিচালক ও সংগঠক যৌথভাবে পরিচালনা করে থাকেন।

অনুসন্ধানীর কার্যালয় ২৩, গৌর সুন্দর রায় লেন, লালবাগ ঢাকায় রয়েছে আমাদের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ। ঘরটি আমাদের জনৈক সদস্যের অভিভাবকের সৌজন্যে পাওয়া। সেখানে অল্প কিছু প্রয়োজনীয় আসবাব ছাড়া রয়েছে একটি অণুবীক্ষণ, সোলডারীং আইরন,একটি ছোট মোটর,কিছু কয়েলের তার, কাঁচের ফ্লাস্ক, উলফস বোতল, বেটারী, তাছাড়া হাতুড়ী, পেরেক স্ক্রু জাতীয় কিছু খুটিনাটি জিনিস; বিভিন্ন সময়ে আমাদের তৈরী যন্ত্রপাতি বা তার ভগ্নাবশেষ। এর বেশীর ভাগ জিনিস যোগার করা, কিছু উপহার হিসেবে পাওয়া, অল্প কিছু কেনা। কিছু কিছু কাজ করার জায়গা ও ব্যবস্থা আমাদের শাখাগুলোতেও রয়েছে।

'জগদীশ বসু গ্রন্থাগার' নামে আমাদের একটি ছোট লাইব্রেরী রয়েছে। এতে এখন বইয়ের সংখ্যা তিনশ।

'আনবিকের ফুল নামে' আমাদের একটি পত্রিকা অনিয়মিতভাবে কয়েক সংখ্যা বের হয়েছে। মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী' অনুসন্ধানীর সদস্যদের প্রধান যোগসুত্র। এর নিয়মিত ফিচার 'অনুসন্ধানীর' মাধ্যমে আমরা আমাদের কার্যক্রম ও পরিকল্পনার প্রকাশ এবং আমাদের দেশব্যাপী সংযোগ অব্যাহত রাখছি।

আমরা যা করতে চাই

এ পযর্ন্ত যে ধরনের কাজ আমরা করছি সেগুলো আরো অনেক ভালভাবে করতে চাই। বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আমাদের কর্মসূচিতে রয়েছে :

(ক) আমাদের ওয়ার্কশপের সুযোগ সুবিধা অনেকখানি বর্ধিত করা। কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, কাঁচের কাজ ও বৈদ্যুতিক কাজের উপযোগী করে একে গড়ে তোলা । এসব কাজের মৌলিক যন্ত্র যেমন করাত, ড্রিল বা প্লায়ারস এবং বার্ণার ইলেট্রিক মিটার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। এসব সুযোগ যতখানি সম্ভব বিভিন্ন শাখাসমুহে বিস্তৃত করা। এতে করে সদস্যরা আরো বিচিত্র রকম সৃজনশীল কাজে হাত দিতে পারবে; আমাদের প্রজেক্টে বৈচিত্র আনা সম্ভব হবে।

(খ) জরীপমূলক কাজের উপর আমরা আরো অনেক বেশী করে জোর দিতে চাই। আমাদের আশে পাশের প্রকৃতি ও পরিবেশকে সুশৃঙ্খলভাবে পর্যবেক্ষণ করাই হবে এর লক্ষ্য। নিজ নিজ এলাকার ম্যাপ তৈরী করা থেকে শুরু করে স্থানীয় উদ্ভিদ, পাখী, পোকামাকড় , নানা বিষয় আমাদের জরীপের অংশ হবে। শহরের বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও মফস্বল ও গ্রামীণ শাখাগুলোর উপর এই ব্যাপারে বিশেষভাবে জোর দেয়া হবে। আমরা বিশ্বাস করি শিশু কিশোরের আনন্দময় অথচ গুরুত্বপূর্ণ কৌতুহলের অংশ হতে পারে এমন অনেক জিনিস বাংলাদেশে তাদের মনোযোগের অপেক্ষা করছে। একই সাথে তারা জাতীয় জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৃষি, পুষ্টি, শিক্ষা প্রভৃতি সংক্রান্ত সম্প্রসারণ কাজে অংশ নিতে পারে।

(গ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হতে পারে এমন সব শিক্ষা উপকরণ যাতে খুবই সাধারণ জিনিসপত্র থেকে সহজে নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারি সে বিষয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা।

(ঘ) বিভিন্ন ব্যতিক্রমী এবং চমকপ্রদ জায়গায় বৈজ্ঞানিক অভিযান চালাবার ব্যবস্থা করা। খাল বিলে, সাগর-তীরে, বন জঙ্গলে– বিচিত্র সব জায়গায় এটা করা সম্ভব। এতে করে বেড়াবার আনন্দের সাথে বৈজ্ঞানিক কৌতুহলকে একত্র করা সম্ভব।

(ঙ) উল্লেখিত প্রজেক্ট, পরীক্ষা, জরীপ বা অভিযানের ভিত্তিতে এদের সম্বন্ধে যা জানা গেল তার আলোচনার ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা। তাছাড়া বিদেশের বিজ্ঞান ক্লাব সমুহের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং তাদের কার্যক্রম সম্বন্ধে জানার চেষ্টা।

(চ) বাংলাদেশের সর্বত্র গ্রামীণ ও শহুরে পরিবেশে যত ব্যাপক ভাবে সম্ভব সক্রিয় অনুসন্ধানী ক্লাব গড়ে তোলা। স্থানীয় ভাবে সংগঠিত হলেও এসব শাখাকে যত সম্ভব কেন্দ্রীয় ভাবে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা।

আমাদের সহায়তা প্রয়োজন :

আমাদের কাজ বিস্তৃত, সম্ভাবনা প্রচুর,অথচ আর্থিক সঙ্গতি এ পর্যন্ত যৎসামান্য। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে আমাদের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

আর প্রয়োজন যন্ত্রপাতির, বইপত্রের। কাজ করতে, প্রর্দশনী করতে জায়গার প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রজেক্টে, জরীপে ও অভিযানে নানা ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতার প্রয়োজন। সরকার ও বিভিন্ন সংস্থার কাছে এ সহায়তা আমরা আশা করব।

আমাদের সংগঠন

সাংগঠনিকভাবে 'অনুসন্ধানী' মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর সংযুক্ত বিজ্ঞান ক্লাব। এর যথাসম্ভব আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত সাংগঠনিক কাঠামো খুবই সরল। দুই টাকা ভর্তি চাঁদা ও মাসিক এক টাকা চাঁদা দিয়ে যে কেউ অনুসন্ধানীর কোন শাখার সদস্য হতে পারে। কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পরিচালনা পরিষদ অনুসন্ধানীকে বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে পরিচালিত করেন। এই পরিষদের সদস্যরা বিজ্ঞানী,শিক্ষক এবং বিজ্ঞানোৎসাহী ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে একজন 'পরিচালক' হিসেবে মূল দায়িত্ব পালন করেন। সবকিছু কার্যকরী করার ও ব্যবস্থাপনার ভার রয়েছে কার্যকরী পরিষদের ওপর যা কয়েকজন অগ্রণী সদস্য নিয়ে গঠিত। তাঁদের মধ্যে একজন 'সংগঠক' হিসেবে মূল দায়িত্ব পালন করেন।

প্রত্যেকটি শাখায়ও অনুরূপ দুটি পরিষদ এবং 'পরিচালক' ও 'সংগঠক' থাকেন।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পঞ্চাশ বছর

[ফেব্রু-মার্চ-'৭৭]

এ. এম. হারুন অর রশীদ

গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ আলোচনাচক্রে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন অধ্যাপক নীল্‌স বোর। ১৯২২ সালের জুন মাস। এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন অধ্যাপক হিলবার্ট। ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপক এসেছেন। অধ্যাপক বোর এই সময় কোয়ান্টামতত্ত্বের অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর প্রস্তাবিত অণুর নক্সা তখন সর্বজনবিদিত। অধ্যাপক বোর এই নক্সারই সর্বশেষ অগ্রগতির বিশদ বিবরণ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ মিউনিক থেকে আসা একজন তরুণ এমন একটি প্রশ্ন করে বসলেন যে অধ্যাপক বোর বেশ কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, "ওয়ার্নার, তুমি আর আমি আজ একসঙ্গে বেড়াতে যাব এবং তখন এই বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করা যাবে।"

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মৃদু পদধ্বনি এইভাবে গটিনজেনের বনবিথীকার মধ্যে প্রথম প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তা অবশ্য বলা যায় না। তবে অণুতত্ত্বের তখনকার নির্মেঘ আকাশে সেদিন যে অশনিসংকেত দেখা দিয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ১৯১৩ সালে বোর যে অণু-নক্সা দিয়েছিলেন ১৯২২ সাল পর্যন্ত এই নয় বৎসরে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে সর্বত্র কিন্তু প্রথম সাফল্যের রঙীন দিনগুলো পেরিয়ে ধীরে ধীরে একটা অসন্তোষের ছায়া নেমে এসেছে সর্বত্র। বোর তাঁর নক্সা দিয়ে অণুর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। যেমন হাইড্রোজেন বর্ণালীর সুন্দর সংখ্যার জন্য তিনি যে সূত্র আবিষ্কার করেন তা পরীক্ষাগারে বহুবার বহুভাবে সুপ্রমাণিত।

১৯১৩ সাল থেকে পরবর্তী এক দশকে বোরের এই নক্সা নিয়ে যেসব সুদক্ষ পদার্থবিজ্ঞানী কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ফ্রিডরিশ্ প্যাশেন, আর্ণল্ড সমারফেল্ড এবং অধ্যাপক বোর নিজে। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অণু গঠনের একটি সহজবোধ্য সুন্দর তাত্ত্বিক নক্সা গড়ে উঠেছে। এই নক্সা দিয়ে হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী ছাড়াও অন্যান্য কিছু জটিল পরমাণুর বর্ণালী মোটামুটি ব্যাখ্যা করা গিয়েছে। এই নক্সার ওপর ভিত্তি করেই রসায়ন শাস্ত্রের অতি পরিচিত মৌলিক পদার্থের পর্যায়ী ছকের অন্তর্নিহিত কারণগুলির উপর আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি এই বোর তত্ত্ব দিয়ে একটি নতুন মৌলিক পদার্থকে ঠিকমত সনাক্ত করা হয়েছে যার পারমাণবিক সংখ্যা ৭২। এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে হ্যাফনিয়াম কারণ কোপেনহেগেনে এইখানে তার জন্ম।

গটিনজেনের বক্তৃতামালায় অধ্যাপক বোর সানন্দে তাঁর সারা জীবনের সাধনালব্ধ পরমাণু গঠনের এই সুন্দর তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। এই তত্ত্বের মূল সূত্রটি হল এই যে, পরমাণুর ইলেকট্রনগুলির কক্ষপথ নির্ধারিত হয় একটি কোয়ান্টাম শর্ত অনুসারে। সে শর্ত হল, "ইলেকট্রনের কক্ষপথের অবস্থা সঙ্কল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের কোন গুনিতকের সমান।" ইলেকট্রনের ভরবেগের সঙ্গে তার অবস্থানের পরিবর্তন গুণ করে সমগ্র কক্ষপথের ওপর সঙ্কলন করলে আমরা অবস্থা সঙ্কল পাই। সুতরাং সমীকরণটি লেখা যায় :

অবস্থা – সঙ্কল = পূর্ণ সংখ্যা × প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এই সমীকরণের পূর্ণ সংখ্যাটিকে বলা হয় "মূল কোয়ান্টাম সংখ্যা।"

১৯৯৫ সাল থেকে আর্ণল্ড সমারফেল্ড এই কোয়াণ্টাম শর্ত সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করার পদ্ধতি দেখিয়ে এসেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইলেকট্রনের কক্ষপথ আসলে বৃত্তাকার নয়—উপবৃত্তাকার। সুতরাং কোয়াণ্টাম শর্তের প্রয়োজন হয় দুটির—একটি শর্তে থাকবে ভরবেগের রৈখিক অংশ এবং অন্য শর্তে থাকবে কৌণিক অংশ। এইভাবে কোয়াণ্টাম শর্ত ব্যবহার করলে দুটি কোয়াণ্টাম সংখ্যা পাওয়া যায় যাদের যোগফল মূল কোয়াণ্টাম সংখ্যার সমান। এই মূল কোয়াণ্টাম সংখ্যাই বোর তাঁর ১৯১৩ সালের নক্সায় ব্যবহার করেছেন। বোর দেখিয়েছেন যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রনের তেজের পরিমাণ হল :

তেজ =—(মূল কোয়াণ্টাম সংখ্যা)২। প্রতিটি কক্ষপথের মূল কোয়াণ্টাম সংখ্যা বিভিন্ন এবং ইলেকট্রন এক কক্ষপথ থেকে আরেক কক্ষপথে গেলে রশ্মি বিকীরিত হয়। এই রশ্মির তেজের পরিমাণ এই সমীকরণ দিয়ে নির্ধারণ করা যায়।

বোর ও সমারফেল্ডের এই কোয়াণ্টাম শর্ত ব্যবহার করে যথেষ্ট অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে কিন্তু অসুবিধাও হয়েছে প্রচুর। যেমন হাইড্রোজেন পরমাণু ছাড়া অন্য যেসব পরমাণুতে একটির বেশী ইলেকট্রন রয়েছে সেখানে এই শর্ত ব্যবহার করে কক্ষপথগুলির স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করা যায় না। কারণ বিভিন্ন ইলেকট্রনের পারস্পরিক বিকর্ষণ কক্ষপথগুলিকে বিচলিত করে দেয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য নতুন কোয়াণ্টাম সংখ্যা ব্যবহার করা যায় এবং এইভাবেই অধ্যাপক বোর অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসের পারস্পরিক প্রভাব, ইলেকট্রন আর ইলেকট্রনের পারস্পরিক শক্তি সব কিছু পর্যালোচনা করে তাঁর পারমাণবিক গঠনতন্ত্রে উপনীত হয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে জটিল পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি আসলে এক একটি গুচ্ছে থাকে। প্রথম গুচ্ছে থাকে ২টি ইলেকট্রন, তার পরের গুচ্ছে ৮টি, তারপরে আবার ৮টি এবং পরে ১৮, ১৮ এবং ৩২টি দিয়ে গুচ্ছ তৈরি হয়। এইভাবেই রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের পর্যায়ী ছকের ব্যাখ্যা পদার্থবিজ্ঞানের অবদান হিসেবে আজ সর্বজন স্বীকৃত।

গটিনজেনের এই বক্তৃতায় অধ্যাপক বোর দুটি নীতির উপর বিশেষ জোর দেন। একটি হল পল ইরেনফেষ্টের মন্থর পরিবর্তনের নীতি। এর অর্থ হল এই যে, একটি সম্ভাব্য গতিপথ থেকে অন্য একটি সম্ভাব্য গতিপথে মন্থর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং দ্বিতীয় নীতিটি হল বোরের নিজস্ব "সংযোগ রক্ষার নীতি' যার অর্থ হল এই যে যখন কোয়াণ্টাম সংখ্যার মান অত্যন্ত বেশী তখন কোয়াণ্টাম শর্ত থেকে চিরায়ত শর্তে যাওয়া সম্ভব। "মন্থর পরিবর্তনের নীতি" দিয়ে বোর এক গতিপথ থেকে অন্য গতিপথে যাওয়ার মধ্যে কোন বিপুল পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই বুঝাতে চেয়েছিলেন এবং "সংযোগ রক্ষার নীতি" দিয়ে তিনি চিরায়ত বলবিদ্যার সঙ্গে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই দুই ধারণা আজও নতুন পদার্থ বিজ্ঞানের দুটি মূলসূত্র। পদার্থ বিজ্ঞানের সব বিপ্লব শ্বাশত ধারণাবলীর সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

গটিনজেনে বোরের এই বক্তৃতামালা পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে "বোর উৎসব" নামে পরিচিত। এই উৎসবে গটিনজেনের সব পদার্থ বিজ্ঞানী এবং গণিতবেত্তারা উপস্থিত ছিলেন যেমন ম্যাক্স বর্ণ, জেম্স ফ্রাঙ্ক এবং ডেবিট হিলবার্ট। দূরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অনেকে এসেছিলেন যেমন লাইডেন থেকে পল ইরেনফেষ্ট এবং মিউনিক থেকে আর্ণল্ড সমারফেল্ড। পারমাণবিক বিজ্ঞানে তখন বোরের পরেই সমারফেল্ডের খ্যাতি। সমারফেল্ডের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর দুজন সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র—ওল্‌ফগ্যাঙ্গ পাউলি আর ওয়ার্ণার হাইসেনবার্গ।

বক্তৃতার মধ্যে এক জায়গায় অধ্যাপক বোর হেণ্ডরিক ক্র্যামার-এর দ্বিঘাত ষ্টার্ক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা আলোচনা করেন। ক্র্যামারস্ তাঁর ব্যাখ্যায় বোরের সংযোগ রক্ষার নীতি ব্যবহার করেছিলেন এবং ওয়ার্ণার হাইসেনবার্গ এই ব্যবহারের ওপরই নীতিগত গভীর আপত্তি তুলেছিলেন।

তরুণের এই আপত্তির সদুত্তর প্রবীণ বোর সেদিন দিতে পারেননি এবং বাস্তবিকপক্ষে এর জবাব ১৯২৫ সালের আগে দেয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ ষ্টার্ক প্রক্রিয়া একমাত্র কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব যা তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু অধ্যাপক বোর তরুণ হাইসেনবার্গের চিন্তাশক্তির গভীরতা দেখে তখনই মুগ্ধ হন এবং তাকে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে আমন্ত্রণ করেন।

১৯২০ সালে হাইসেনবার্গ মিউনিকে যখন পদার্থবিজ্ঞান পড়তে আসেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। সমারফেল্ডের বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্যে তিনি প্রথম থেকেই পারমাণবিক গবেষণায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। তাঁর কাজ ছিল বোরের নক্সা ব্যবহার করে বিষম জিম্যান প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা। হাইসেনবার্গ এই সমস্যা সমাধান করেন কিন্তু এই ব্যাখ্যার জন্য তাঁকে আধা কোয়াণ্টাম সংখ্যা ব্যবহার করতে হয়েছিল। পাউলি হাইসেনবার্গের এই সমাধানকে বিদ্রূপ

করে বলেছিলেন, "এই তুমি আধা কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যবহার করেছ, তারপরে তুমি চার ভাগের একভাগ নিয়ে আসবে, আট ভাগের এক ভাগ নিয়ে আসবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমার সুযোগ্য হাতে সমগ্র কোয়ান্টাম তত্ত্বই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়বে।"

ক্রমশঃ

১৯০৩ সালে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্র বসুর চিঠি থেকে :

তোমার স্কুলের কথা সর্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হয় তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। ...চীন ও জাপান হইতে পুঁথির কপি সংগ্রহ অতি সত্বরই করিতে হইবে। একজনকে চীন ভাষায় দিগ্‌গজ করা এখনও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু তাহার পূর্বে কতগুলি preliminary কাজ করিলে এ সম্বন্ধে একটা নতুন উৎসাহ হইবে। তাহার বলে কঠিনগুলো সহজ হইবে। আমার plan এই– এখন একজন সংস্কৃত ও ইংরেজীবিদ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ মাস Asiatic Society তে বুদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে Tibet এর Mss. ও অন্যান্য লিপি যাহা আছে তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তারপর তোমার Mr.Hory কে সঙ্গে করিয়া তিনি চীন দেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাঙ্গালী ও দেবনাগরী পুঁথির কপি করিবেন।

বিজ্ঞান ক্লাব : সমন্বয় [ফেব্রু-মার্চ '৭৭]

বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশ '৭৬

কার্জন হল, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬। উদ্বোধন হলো বাংলাদেশের বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের প্রথম সমাবেশের, এদেশে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন একটি নতুন উত্তরণ লাভ করলো। এই সমাবেশের উদ্যোগ নিয়েছিল মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী—যা গত দু'বছর ধরে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর মধ্যে একমাত্র সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে আসছে। বিজ্ঞান সাময়িকীর বিজ্ঞান ক্লাব সমন্বয় প্রচেষ্টা এভাবে এই সমাবেশের মধ্য দিয়ে নূতন পর্যায়ে উপনীত হলো।

উদ্বোধনী দিনের আগে থেকেই সমাগম শুরু হয়ে গিয়েছিল। সমাবেশের স্বাগতিক ক্লাব ছিল বিজ্ঞান সাময়িকীর সংযুক্ত বিজ্ঞান ক্লাব অনুসন্ধানী। এর আয়োজনে কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানীর কর্মতৎপরতা শুরু হয়েছিল বহু আগে থেকেই। ইতিমধ্যে অনুসন্ধানীর বাইরের শাখাগুলোও এসে গিয়েছিল—চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, জয়দেবপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। বিভিন্ন সুদূর অঞ্চল থেকে এসে যাচ্ছিল বিজ্ঞান ক্লাব সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ। এদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এ পর্যন্ত ছিল বিজ্ঞান সাময়িকীর 'ক্লাব : সমন্বয়' পৃষ্ঠাগুলো এবারই প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হলো। কাজেই অনেক কলকণ্ঠ আলাপ সবার জন্য জমা হয়েছিল।

কার্জন হলের প্রবেশদ্বারে বিশাল সুন্দর তোরণ। লেখা বিজ্ঞান সাময়িকীর উদ্যোগে বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশ '৭৬। অনুপম আল্পনার সাথে সেখানে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের প্রতীক একটি মাইক্রোস্কোপের প্রতিকৃতি। তোরণের অদূরে একের উপর এক বিন্যস্ত চারটি বড় বড় কার্ডবোর্ডের প্রিজম দিয়ে তৈরি একটি স্তম্ভ। প্রিজমগুলোর নানান তলে লেখা সমাবেশের এক একটি অনুষ্ঠান সূচী। কার্জন হল মূল হলঘরে হয়েছিল সমাবেশের আয়োজন। এতে ঢুকতেই বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের ডাক দিয়ে বহুবর্ণা পোষ্টার "বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন দেশকে জানার আন্দোলন।" প্রবেশ পথে একেবারে শুরুতে বিজ্ঞান সাময়িকীর ষ্টল—তের বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রচ্ছদপটে সুশোভিত। এটা ছিল বিজ্ঞান সাময়িকীর তথ্য কেন্দ্র। তারপরেই ছিল 'মুক্তধারা' প্রকাশনী এবং বাংলা একাডেমীর দু'টা বইয়ের প্রদর্শনী প্রবেশ পথের দু'পাশে। বিজ্ঞানের এবং শিশু-কিশোর পাঠ্য বই সেখানে বিক্রি হচ্ছিল শতকরা ২০ ভাগ কন্‌সেশনে। বিশাল হলঘরের এক প্রান্তে বিশাল ষ্টেজ-যার উপরে লেখা ছিল এবারকার সমাবেশের শ্লোগান "গ্রামেগঞ্জে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলুন।" হলের চারিদিকে দেয়াল ঘেঁষে ব্যবস্থা হয়েছিল প্রদর্শনীর আর মাঝখানে সেমিনার ঘরোয়া আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা। দেশের প্রথম বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশের জন্য একটি জমজমাট পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল কার্জন হলে।

স্বাগতিক ক্লাব অনুসন্ধানীর সদস্যরা তাদের গান গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করল — "বিজ্ঞানেরই সন্ধানে, আমরা অনুসন্ধানী"। সমাবেশের উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতির বিজ্ঞান উপদেষ্টা প্রফেসর ইন্নাস আলী। বিজ্ঞান ক্লাব দেশের শিশু-কিশোরদের মধ্যে যে নূতন উৎসাহের জন্ম দিয়েছে তাকে লালন করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বললেন। আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর ন্যূনতম প্রয়োজন যেন মেটানো যায় তিনি

সরকারী ও সংস্থাগত দিক থেকে সেই আশ্বাস দেন। আমাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত বিজ্ঞান ক্লাব যে কি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করতে পারে সে সম্ভাবনার কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। প্রফেসর ইন্নাস আলীর উদ্বোধন পর্বের পর পরই শুরু হয় সেমিনার— 'বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন'। এর শুরুতে বিজ্ঞান ক্লাব কী, বাংলাদেশে এই আন্দোলন কি পর্যায়ে আছে এ সম্বন্ধে বলেন বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদক ও অনুসন্ধানী বিজ্ঞান ক্লাবের পরিচালক ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম। এ পর্যন্ত যেসব ছোট বড় বিজ্ঞান ক্লাব দেশের নানা জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে তাদের কর্ম-তৎপরতার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করে তিনি দেশের শিশু-কিশোর এবং যুবকদের সৃজনমূলক ও উদ্ভাবনী প্রতিভার বিকাশে এবং দেশকে জানার কাজে এই আনন্দময় প্রয়াসের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনে মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর ভূমিকা এবং এর উদ্যোগে বর্তমান বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশের আয়োজন সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেন। সেমিনারে কয়েকটি স্থানীয় বিজ্ঞান ক্লাবের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ভিত্তিতে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর রফিকুল্লাহ। তিনি বলেন যে আগামী দিনের জন্য যে কার্যকরী বিজ্ঞান কারিকুলামের কথা চিন্তা করা হচ্ছে বিজ্ঞান ক্লাব সমূহের কর্মতৎপরতা তাতে একটা ছাপ রাখতে সক্ষম। এরা বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের বিশেষ করে শিশু-কিশোরের দৃষ্টিভঙ্গী বদলিয়ে দিচ্ছে, আরো দেবে। কচিকাঁচা আসরের পরিচালক জনাব রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই) আলোচনায় অংশ নিয়ে এই আসরে সাম্প্রতিক বিজ্ঞান ক্লাবধর্মী তৎপরতা শুরুর উল্লেখ করেন এবং সার্বিকভাবে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনকে স্বাগত জানান।

উদ্বোধনী সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের কৃষি বিষয়ক সদস্য জনাব আজিজুল হক। তাঁর সুন্দর আলাপী বক্তৃতায় তিনি স্কাউট আন্দোলনের মতো শিশু-কিশোর সংগঠনের সাথে তাঁর দীর্ঘ পরিচিতির আলোকে অনুসন্ধান ও উদ্ভাবনের দিকে তাদের স্বাভাবিক ঝোঁকের কথা উল্লেখ করেন। একটা কিছু যন্ত্র সে যতই সাধারণ হোক না কেন, তৈরি করতে পারলে শিশু মন যেভাবে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সে তার মুখের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়। অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে বিজ্ঞান ক্লাবের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা কিভাবে চাষের মাঠ, খেলনা তৈরী থেকে শুরু করে সভাকক্ষের শব্দগুণ উন্নয়নের মতো বিচিত্র কাজে তাদের হাত লাগাতে পারে সে সম্ভাবনাকে তিনি আবাহন করেন। তিনি বলেন বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন আর দশটি তৎপরতার চেয়ে স্বতন্ত্র এই কারণে যে এটা কর্মমুখী আন্দোলন। যত বিনীতভাবেই হোক না কেন নিজের হাতে কিছু করা, করার মাধ্যমে কিছু জানাতেই এর সার্থকতা। আপনাতেই আপনি এটা সার্থক। সার্বিকভাবে দেশের পক্ষে এই ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের আজ বড়ো প্রয়োজন। এরা যে সবাই বড় হয়ে সার্থক বিজ্ঞানী হবে তা নয়, কিন্তু সবাই বড় হয়ে দেশের সার্থক নাগরিক হবে।

সেমিনারের সভাপতি ড. আলমুতী শরফুদ্দীনের ভাষণটির শিরোনাম ছিল *বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞান আন্দোলন*। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির আয়ত্বকরণ বিজ্ঞান উন্নয়নের একটি প্রাথমিক শর্ত। যত ব্যাপকভাবে এটা ঘটবে বিজ্ঞান উন্নয়নের সম্ভাবনা ততই বেড়ে যায়। এমনিভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের একটি উপায় হলো দেশময় বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠন। তাঁর ভাষণে ড. শরফুদ্দীন বিজ্ঞান ক্লাবের সম্ভব্য রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিজ্ঞান ক্লাবের কার্যক্রমের অংশ হতে পারে এরকম বিভিন্নমুখী কাজের ব্যাপারে তিনি পরামর্শ দেন। তাঁর কামনা— "বিজ্ঞানমুখিতা কেবল শ্লোগান হিসেবে নয়, দেশময় সঞ্চারিত হোক সুসংবদ্ধ কর্মধারায়। অসংখ্য বিজ্ঞান ক্লাবের মাধ্যমে সংগঠিত হোক বিজ্ঞানমনা কিশোর-কিশোরীদের কর্মশক্তি।"

উল্লিখিত সেমিনারের একটি বিশেষ দিক ছিল সমবেত বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের প্রতিনিধিদের আলোচনায় অংশগ্রহণ। স্বাগতিক ক্লাব অনুসন্ধানীর তরফ থেকে বলেন এর সংগঠক মাহবুবুল আলম বাবু, খুলনা বেতাগা বিজ্ঞান ক্লাবের তরফ থেকে স্বপন কুমার দাশ, চট্টগ্রাম রাউজান বিজ্ঞান ক্লাবের তরফ থেকে মহিউদ্দিন ইসলাম। ফরিদপুর অনুসন্ধানীর তরফ থেকে এর পরিচালক অধ্যাপক গোলাম সোবহানী এবং ঢাকার জুভেনাইল সায়েন্স পাইওনিয়ার এসোসিয়েশনের তরফ থেকে মোহাম্মদ মুনিরুল আলম। বিভিন্ন পরিবেশে গড়ে ওঠা বিচিত্রমুখী এসব ক্লাবের কথা সমবেত শ্রোতারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শোনেন। দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের কর্ম প্রয়াসসমূহের একটি ছবি এই আলোচনা থেকে ভেসে উঠে। সময়াভাবে সমাবেশে যোগদানকারী সব ক্লাবের প্রতিনিধি সেমিনারে অংশ নিতে না পারলেও পরে ঘরোয়া আলোচনায় সবারই অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। বিজ্ঞান সাময়িকীর বিজ্ঞান ক্লাব ব্যবস্থাপক তারেক মঞ্জুর সমাবেশে আগত সব ক্লাব সদস্যদের ধন্যবাদ জানান সেমিনারের শেষ পর্বে।

সেমিনারের সমাপ্তির সাথে সাথে হয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন। রিমোট কন্ট্রোলে দূর থেকে একটা সুইচ টিপে ছোট্ট একটি রকেট উৎক্ষেপনের মাধ্যমে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন ড. আলমুতী শরফুদ্দীন। সেই উদ্বোধনীর পর থেকে পরবর্তী দু'দিন প্রদর্শনীটি কার্জন হলকে মাতিয়ে রাখে। ছোটখাট প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী ছিল এটি। তবে ব্যতিক্রমের

ছাপ ছিল এতে। জটিল যন্ত্রপাতি বা 'ম্যাজিক' জাতীয় জিনিসের পরিবর্তে এবার প্রাধান্য লাভ করেছিল বিজ্ঞান ক্লাব সদস্যদের নিজেদের উদ্ভাবনী মনের পরিচায়ক কতগুলি সহজ অথচ গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। পানির স্রোতের বেগ নির্ণয়ের, লবণাক্ততা নির্ণয়ের এবং উচ্চতা নির্ণয়ের যন্ত্র, গাছের বৃদ্ধি মাপক যন্ত্র, পাতলা জিনিসের পুরুত্ব মাপার যন্ত্র, ষ্টিম টারবাইন প্রভৃতি বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পোকা-মাকড়, উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়। প্রজাপতি, পাতা, ঝিনুক এবং দেশের বিভিন্ন শস্যের কয়েকটি সংগ্রহ প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। একটি ব্যতিক্রমী বিভাগের নাম ছিল 'প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ'। এতে অতি সাধারণ জিনিস যেমন নারকেলের মালা, প্লাষ্টিকের চামচ, বাঁশের কঞ্চি, বোতল প্রভৃতি দিয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তৈরির পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। যদিও স্বল্প উপকরণ ছিল এই বিভাগে তবু এর সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রদর্শনীর একদিকে নিজেদের তৈরী ইলেকট্রনিক অর্গানে সুর তুলছিল কয়েকজন বিজ্ঞান ক্লাব সদস্য, অন্যদিকে রাখা ছিল খড়ের তৈরী 'হে বক্স', গ্রামের চাষী যাতে রাত্রে সামান্য গরম করে রাখা চাল ভোরে ভাত হিসেবে তৈরি পেতে পারে।

বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিনিধিদের মধ্যে যথেচ্ছ মত বিনিময় ছিল বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এটি কতকটা সম্পন্ন হয়েছে বিভিন্ন কাজের ফাঁকে পারস্পরিক আলাপ আলোচনায়, কতকটা হয়েছে কয়েকটি ঘরোয়া বৈঠকের মাধ্যমে। এসব বৈঠকে যোগ দেয় কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানী, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, শ্রীপুর সহ অনুসন্ধানীর বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধি, খুলনার বেতাগা বিজ্ঞান সমিতি, চট্টগ্রামের রাউজানের কলকণ্ঠ, দ্যা জুভিনাইল সায়েন্স পাইওনিয়ার এসোসিয়েশন, কচি কাঁচার মেলা, বিজ্ঞান প্রকল্প ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাবের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ বিশেষ ক্লাবে কি ধরনের প্রজেক্ট নেয়া হয়েছে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেন এইসব ক্লাবের প্রতিনিধিরা। কোন কোন প্রকল্প এবং আনুষঙ্গিক সমস্যাবলী নিয়ে পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনার সূত্রপাত হয়। বিশেষ করে রাউজানের আমের পোকা ও ভেষজ উদ্ভিদ সংক্রান্ত কাজ এবং বেতাগার সুপারী গাছ ও বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ধানের উপর কাজ শহরের বিজ্ঞান ক্লাব সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে সঠিক পরামর্শ লাভ করা, এদের সম্বন্ধে কার্যরত বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ফলাফল সমূহের উপযুক্ত প্রকাশ সম্পর্কিত সমস্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিজ্ঞান সাময়িকীর 'বিজ্ঞান ক্লাব : সমন্বয় ' বিভাগে এইসব উদ্দেশ্যে কিভাবে আরো ভালভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিয়েও আলোচনা হয়। ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ক্লাবগুলো শুরু করতে পারে এই ধরনের কিছু প্রজেক্টের আইডিয়া নিয়েও আলোচনা হয় এইসব ঘরোয়া বৈঠকে।

সমাপ্তি দিনে সবশেষে একটি মনোজ্ঞ বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সমাবেশের স্বাগতিক ক্লাব অনুসন্ধানী। বিভিন্ন ক্লাব থেকে আগত প্রতিনিধিদের ফুল-পত্র যোগে সম্বর্ধনা জানান অনুসন্ধানীর সদস্যরা। ধন্যবাদ ও পুনর্মিলনের সংকল্প প্রকাশের পর গাওয়া হয় বিদায় সঙ্গীত।

বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশ ৭৬-এর কয়েকটি দিনে শিশু-কিশোর বিজ্ঞানোৎসাহীদের মনে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে তা এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উপযুক্ত বিকাশের ক্ষেত্রে নূতন দিনের আহ্বান জানাচ্ছে। দেশব্যাপী বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনকে জোরদার করার পথে এই সমাবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নভোচারীরা যখন চন্দ্রশিলা নিয়ে ফিরে এলেন তখন বিজ্ঞানীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ ও এর অভ্যন্তরের গঠন সম্বন্ধে তোলপাড় শুরু করলেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে রেখে আসা সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রের হিসাব কিন্তু সবাইকে চমকে দিল। এই হিসাব কোন সঠিক পদার্থকেই নির্দেশ করছিল না—শুধু একটিকে ছাড়া। তা হলো শুকিয়ে যাওয়া 'পনির'।

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞান আন্দোলন [ফেব্রুয়ারী-মার্চ-'৭৭]

আবদুল্লাহ আল মুতী

॥ ১ ॥

অভিধান খুললে বিজ্ঞানের যে অর্থ চোখে পড়ে সে হল 'বিশেষ জ্ঞান' বা বিশেষভাবে আহরিত বিস্তারিত সুশৃঙ্খল জ্ঞান। এই অর্থ এবং এই ধারণা আমাদের দেশে এমনভাবে বদ্ধমূল যে, আহরিত তথ্যের একটা বিশাল সমাহার ছাড়া বিজ্ঞানকে আর কিছু বলে মনে করা আমাদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই রীতিমত শক্ত।

তাহলে থরে থরে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো অজস্র মূল্যবান তথ্যের ভাণ্ডার ছাড়া বিজ্ঞান আর তবে কি?

অবশ্যই বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তথ্যাবলী বিজ্ঞানের একটা অংশ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বিজ্ঞান হল বিজ্ঞানীদের তথ্য-সন্ধানের, গবেষণার বিশেষ এক পদ্ধতি। যে পদ্ধতি গড়ে উঠেছে যুগ যুগ ধরে মানুষের সত্য-সন্ধানের প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। নানা অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ শিখেছে ঠিকমতো প্রশ্ন তুলতে, অনুসন্ধানের সমস্যাকে নির্দিষ্ট করতে; সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে; সমস্যার আনুমানিক সমাধান বা প্রকল্প স্থির করতে, এই প্রকল্প পরীক্ষার জন্য যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের আয়োজন করতে; ফলাফল বিশ্লেষণ করতে; এবং সব শেষে সিদ্ধান্তে পৌছতে।

এই অর্থে বিজ্ঞান শুধু জ্ঞান নয়, বিজ্ঞান এক পদ্ধতিরও নাম। এই পদ্ধতি হল অনুসন্ধান, গবেষণা। এই পদ্ধতির অঙ্গীভূত হল এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। তাকে বলতে পারি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মের ওপর বিশ্বাস। মানুষের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস। প্রকৃতিকে জানার, জয় করার সংগ্রামে হার না মানা। কল্পনায় নির্ভর না করে পরীক্ষিত সত্যের ওপর, তথ্য আর যুক্তির ওপর নির্ভর করা। এই পদ্ধতিকে আয়ত্ত না করে, এই দৃষ্টিভঙ্গীকে আত্মস্থ না করে, শুধু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করলে তাকে বিজ্ঞান চর্চা বলা যাবে না।

॥ ২ ॥

বিজ্ঞানের অর্থের মতোই আর একটি ধারণা আমাদের দেশে গেড়ে বসে আছে। সে হল বিজ্ঞানের অগ্রগতি নির্ভর করে শুধু গুটিকয়েক প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর সাধনার ওপর। কথাটা শুধু অংশতঃ গ্রহণযোগ্য।

এটা সত্যি যে গুটিকতক বিশেষ প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করেন। কখনো কখনো তাঁরা আমূল পালটে দেন মানুষের পুরনো দিনের ধ্যান-ধারণা। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, তাঁদের এসব আবিষ্কারও সম্ভব হয় আরো অসংখ্য বিজ্ঞানীর অজস্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে। বহু বিজ্ঞানী মিলে প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড নিয়ম উদঘাটন করার ফলেই সম্ভব হয় কোন বিশেষ ক্ষমতাশালী বিজ্ঞানীর পক্ষে এমনি সব নানা সিদ্ধান্তকে যুক্তির মালায় গেঁথে এক বড় অখণ্ড সিদ্ধান্তে পৌছনো।

আসলে আমাদের দেশ আজ যে অবস্থায় রয়েছে তাতে এ দেশের অগ্রগতির জন্যে বা অর্থনীতির বিকাশের জন্যে কোন অসাধারণ বড় রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োজন যতটা নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি প্রয়োজন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনার বিস্তার। কৃষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ যাবত যেসব আবিষ্কার ঘটেছে তার মূল নীতিগুলো আমাদের দেশের কৃষি সমস্যায় যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের ফসলের উৎপাদন বাড়তে পারে তিনচার গুণ। জীবাণুতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে, পরিবেশ সম্বন্ধে যেসব তথ্য মানুষের জানা সেগুলোকে ব্যক্তিগত ও সমাজ

জীবনে প্রয়োগ করলে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের চেহারা বদলে যেতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটতে পারে, বস্তুসম্পদের প্রাচুর্য, জীবনযাত্রার মান বাড়তে পারে যথেষ্ট পরিমাণে।

সারা দেশব্যাপী মানুষের জীবনে ব্যক্তিক ও সংগঠিত বিজ্ঞানের এই প্রয়োগ সম্ভব নয় শুধু প্রতিভাধর ক'টি মানুষের বিজ্ঞানচর্চায়। তার জন্যে প্রয়োজন সারা দেশকে বিজ্ঞানমনা করে তোলা। বিজ্ঞানের আন্দোলনে অঙ্গীভূত করা দেশের নানা স্তরের মানুষকে। সারা দেশে অনুসন্ধিৎসার, পরীক্ষণের বীজ বপন করা। অনুসন্ধানের পদ্ধতি অর্থাৎ বিজ্ঞানের পদ্ধতির চর্চা করা। জীবনের সকল স্তরে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের মাধ্যমে উৎপাদনের নানা সমস্যার বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাধান খোঁজা।

বলাই বাহুল্য, এ আন্দোলন প্রথমে ছড়াতে হবে তরুণ সমাজের মধ্যে। এককালে এদেশের ছাত্র-তরুণরা ভাষার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল দেশের সর্বস্তরের মানুষকে। আজ তেমনি প্রয়োজন বিজ্ঞানের আন্দোলন। বিজ্ঞানমনস্কতার আন্দোলন। বিজ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন। বৈজ্ঞানিক জীবনবোধের আন্দোলন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই আন্দোলন আর জাতি গঠন বা দেশ গঠনের আন্দোলনে কোন ভেদ নেই। ছাত্র তরুণ সমাজের মাধ্যমে এই আন্দোলনে অংশীদার করতে হবে দেশের সকল কৃষক, শ্রমিক, উৎপাদনশীল মানুষকে। সারা দেশের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানবোধের বিকাশ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, প্রশ্নশীলতা ও বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার উৎকর্ষ ছাড়া দেশ গঠনের দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

এমনি বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার একটি উপায় হল দেশময় বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠন। এসব বিজ্ঞান ক্লাব হল মোটামুটি একমনা অনুসিন্ধৎসু কিশোর-কিশোরীদের বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা পাঠক্রমের বাইরে স্বচ্ছন্দ আনন্দময় বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। এমনি ক্লাব হতে পারে স্কুলকে কেন্দ্র করে। অথবা শহর, পাড়া বা গ্রামকে কেন্দ্র করে। ক্লাব গড়ে উঠতে পারে বিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক— যেমন, রেডিও ক্লাব, পদার্থবিদদের ক্লাব বা প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্লাব। অথবা হতে পারে বিজ্ঞানের নানা দিক উৎসাহীদের সমাবেশে বহুমুখী বিজ্ঞানের ক্লাব।

সচরাচর এমনি ক্লাবের কাজে সহায়তার জন্যে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান শিক্ষক যুক্ত থাকলে ক্লাবের কাজে সহায়তা ঘটে। বিদেশে পরীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে এমনি ক্লাবের সদস্য ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ স্কুলের বিজ্ঞান পাঠেও ভাল ফল করে। এছাড়া তাদের মধ্যে দেখা যায় উদ্যোগ ও সংগঠনমুখিতা, অনুসন্ধান ও উদ্ভাবনের প্রবণতা। এর ফলে নিজ নিজ উৎসাহের ক্ষেত্রে তাদের গভীরতর চর্চার সুযোগ ঘটে। তাছাড়া এতে ভবিষ্যতে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশেরও ক্ষেত্র তৈরি হয়।

বিজ্ঞান ক্লাব তার সদস্যদের প্রবণতা বা উৎসাহ অনুযায়ী হতে পারে নানা ধরনের। বিভিন্ন ধরনের শখের নেশা যাদের তাদের নিয়ে হতে পারে শৌখিন কাজের কেন্দ্র, যেমন, ফটোগ্রাফী, বেতার বা ভ্রমণ হতে পারে তাদের প্রধান কর্মসূচী। আবার পড়ুয়া ধরনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে হতে পারে পড়ুয়া বিজ্ঞানীদের ক্লাব। তাদের কাজ হতে পারে স্কুলের বাইরে প্রধানতঃ স্কুলের পড়া বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের চর্চা। আবার হতে পারে আলোচনা চক্র জাতীয় ক্লাব যেখানে প্রধানতঃ নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ডেকে এনে তাঁদের কাছে শোনা যায় বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের বিস্ময়কর অগ্রগতির খবর, আর তা থেকে উদ্দীপ্ত হয় তরুণ বিজ্ঞানীদের মন। এছাড়া হতে পারে কারিগরী ধরনের ক্লাব, যেখানে প্রধান জোরটা থাকে হাতে-কলমে কাজের ওপরে আর বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে জানার এবং সে বিষয়ে প্রস্তুতির ওপরে।

অবশ্যই বহুমুখী বিজ্ঞান ক্লাবে ঘটতে পারে এ সবকিছুরই সমন্বয়। তার কর্মসূচীতে সব ধরনের ছেলেমেয়েই নিজ নিজ উৎসাহ অনুযায়ী অংশগ্রহণ করতে পারে। যারা নিজেরা হাতে কলমে কাজে উৎসাহী নয় তারাও অন্যদের কাজের জন্যে 'আইডিয়া' দিতে পারে, তাদের কাজের ওপর আলোচনা-সমালোচনা করতে পারে। আদতে তো বিজ্ঞান ক্লাব শুধু তথাকথিত 'ভাল ছাত্র'দের জন্য নয়। বিজ্ঞান ছুঁয়ে যায় আজকের সমাজের সব মানুষের জীবনকে। কাজেই বিজ্ঞান ক্লাবে বিজ্ঞানে উৎসাহী সব ছেলেমেয়েদেরই সমাবেশ ঘটা দরকার। তার অর্থ এই নয় যে, তাদের সবাইকে বড় হয়ে বিজ্ঞানী হতে হবে।

তাছাড়া এক ব্যাপক বিজ্ঞান আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখলে বিজ্ঞান ক্লাবকে দেখতে হবে বিজ্ঞানমনা উৎসাহী কিশোর-কিশোরী এবং সমগ্র জনসমাজের মধ্যে একটা মূল্যবান যোগসূত্র হিসেবে। এদের মাধ্যমে সমগ্র জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান, গড়ে উঠতে পারে বিজ্ঞানের পরিপোষক দৃষ্টিভঙ্গী, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানকে প্রয়োগের কুশলতা। আর আগেই আমরা বলেছি, সমগ্র জনসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ও প্রয়োগ ছাড়া আজকের দিনে জাতীয় অগ্রগতির প্রত্যাশা কল্পনা বিলাসিতা বই কিছু নয়।

॥ ৪ ॥

বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মধারা নির্ভর করবে স্বভাবতই তার উদ্দেশ্যের ওপরে। বহুমুখী বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্দেশ্যের মধ্যে আসতে পারে (ক) দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা; (খ) বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা গবেষণামূলক কাজের অভিজ্ঞতা; (গ) যুক্তিবাদী চিন্তা, পদ্ধতি অভ্যাস করা; (ঘ) বিজ্ঞানভিত্তিক শৌখিন কার্যকলাপ এবং (ঙ) প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের প্রতিভার বিকাশে সহায়তা।

এসব লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে, তার মধ্যে পড়ে :

১। বিজ্ঞানের নানা বিভাগে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করা।

২। আমাদের দেশের নানা বাস্তব সমস্যা নিয়ে ছেলেমেয়েদের কৌতূহল ও আগ্রহ অনুযায়ী বিজ্ঞানের প্রজেক্ট বা গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা। এ জন্য অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান শিক্ষকদের সহায়তা বিশেষ কাজে আসতে পারে।

৩। গবেষণার ফলাফল বর্ণনা করে গবেষণাপত্র পাঠ ও তার ওপর আলোচনা।

৪। বিজ্ঞান মেলা বা প্রদর্শনী। এগুলি স্কুলভিত্তিক, শহরভিত্তিক, ক্লাবভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক বা জাতীয়ভিত্তিক হতে পারে।

৫। ক্লাবের দেয়াল পত্রিকা বা অন্য ধরনের বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ।

৬। অ্যাকোয়ারিয়াম, পক্ষীশালা বা পশুশালা রক্ষণাবেক্ষণ।

৭। ছবি বা শৌখিন ক্রিয়াকলাপ—যেমন, পোকামাকড় সংগ্রহ, ফুলপাতা সংগ্রহ, যন্ত্রপাতি তৈরি ইত্যাদি নানা ধরনের হাতের কাজ।

৮। বিজ্ঞপ্তি ফলক বা সংবাদ ফলকের মাধ্যমে নিয়মিত বিজ্ঞান বিষয়ক খবরাখবর ইত্যাদি প্রচার।

৯। স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম।

১০। বিজ্ঞান বিষয়ক ছায়াছবির প্রদর্শনী।

বলাই বাহুল্য, একটি ক্লাব গড়ে উঠলে সেটা যে এর সবগুলো কার্যক্রম একই সঙ্গে শুরু করবে এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া কোন্ কোন্ কার্যক্রম শুরু করা হবে তা অনেকটাই নির্ভর করবে সদস্যদের বয়স, অভিজ্ঞতা, অনুরাগ এবং পারিপার্শ্বিক সুযোগ-সুবিধার ওপরে।

॥ ৫ ॥

আমাদের দেশে বিজ্ঞান আজ যেমন শৈশবাবস্থায়, বলাই বাহুল্য, বিজ্ঞান ক্লাবের তেমনি কেবল শুরু। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য যেমন দেশের মাত্র গুটিকতক মানুষের সামগ্রী নয়, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও রয়েছে প্রচ্ছন্ন গভীর শিল্পচেতনা তেমনি বিজ্ঞানও শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, শহরবাসী মানুষের চর্চার উপকরণ নয়। সাধারণ মানুষের জীবনে চিন্তায় ও কর্মে যেদিন বিজ্ঞানের দৃঢ় অধিষ্ঠান ঘটবে সেদিন দেশের প্রবল, সুনিশ্চিত অগ্রগতি কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।

বিজ্ঞানমুখিতা কেবল শ্লোগান হিসেবে নয়, দেশময় সঞ্চারিত হোক সুসংবদ্ধ কর্মধারায়। অসংখ্য বিজ্ঞান ক্লাবের মাধ্যমে সংগঠিত হোক বিজ্ঞানমনা কিশোর-কিশোরীদের কর্মশক্তি। আর তা সঞ্জীবিত করুক এদেশের মানুষের আত্মবিকাশের, নতুন সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের বিশাল সম্ভাবনাকে।

[বিজ্ঞান সাময়িকী আয়োজিত বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশ '৭৬ এর সেমিনারে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ]

দার্শনিক হেগেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর থিসিসে দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করেছিলন যে, সৌরজগতে সাতটির বেশী গ্রহ থাকা সম্ভব নয়। তখন পর্যন্ত অবশ্য সাতটি গ্রহের কথাই জানা ছিল। কিন্তু যেদিন হেগেল তাঁর থিসিসটি জমা দেবেন, ১৮০১ সালের জানুয়ারী মাসের ঠিক সেই দিনটিতেই ইতালীয় জ্যোতির্বিদ পিয়াৎসি মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানের নূতন গ্রহাণু সেরীস আবিষ্কার করেন। বিধি এমনই বাম!

আকাশ দেখা

[ফেব্রুয়ারি–মার্চ '৭৭]

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

আকাশ দেখার নেশা বড় সাংঘাতিক। এ নেশায় যাদের পেয়ে বসে, রাত্রিতে রাস্তায় বেরোলেই তাঁরা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটেন, আর তার অব্যর্থ পরিণতি হয় খানায় পড়া এবং কোন কোন সময় পা ভাঙ্গাও। শহরের মধ্যে এ নেশায় ধরলে, অবস্থা আরো শোচনীয় হতে পারে। দার্শনিকদের আদি গুরু থালেস সম্বন্ধে এরকম একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি একদিন রাত্রিতে তার এক বন্ধুর বাড়ী থেকে খেয়ে ফিরছিলেন; আর পথে বেরিয়েই তাঁর চোখ চলে যায় আকাশের দিকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে চলতে গিয়ে তিনি একটা গর্তে পড়ে যান, এবং তাঁর বন্ধুর বাড়ীর একটা ঝি তাঁকে সেই গর্ত থেকে টেনে তোলেন। প্লেটো বেশ রসিয়ে রসিয়ে এ গল্প করেছেন।

অথচ সে সময়ে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে আকাশের তারা সম্বন্ধে এমন কিই বা জানা ছিল। কতকগুলি তারা দিয়ে নানারকম ছবির কল্পনা ছাড়া আর কিছুই তখন কেউ জানতো না। তাতেই যদি থালেসের মত লোকও খানায় পড়ে পা ভাঙ্গেন, তা হলে, বর্তমান যুগে যখন আকাশের প্রতিটি তারা সম্বন্ধে নানারকম তথ্য জানা আছে, যাঁরা আকাশ দেখার নেশাগ্রস্ত, তাঁদের দশা আরো সাংঘাতিক হওয়ার কথা। তবে আজকাল মানুষ অনেক চালাক হয়েছে তাঁরা বেশ সতর্কতার সঙ্গে আকাশ দেখে থাকেন।

আজ একটা তারামণ্ডল সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। শীতকালের আকাশে এ তারা মণ্ডলটিকে স্পষ্ট দেখা যায়। রাত্রিতে হেঁটে যাওয়ার দরকার নাই। একটা খোলা জায়গায় বসে বসেই মণ্ডলটিকে দেখা যেতে পারে। ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেলে, ইচ্ছা করলে একটা মাদুর পেতে শুয়ে শুয়েও মণ্ডলটিকে দেখা যেতে পারে। মণ্ডলটির নাম কালপুরুষমণ্ডল; অনেকে একে আদম ছুরতও বলে থাকেন। পাশ্চাত্য নাম অরায়ণ। মধ্য আকাশের একটু দক্ষিণে এই মণ্ডলটি অবস্থিত। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের সামান্য উত্তর পশ্চিমে প্রায় এক প্রকার সমান উজ্জ্বল তিনটি তারাকে একই সরল রেখায় দেখতে পাওয়া যায়। এই তিনটি তারা হলো কালপুরুষের কোমরের বেল্ট। এই তিন তারার সামান্য উত্তর পূর্বে বেশ একটা বড় তারা দেখতে পাওয়া যায়। তারাটি একটু লালচে ধরনের। এটি কালপুরুষের ডান কাঁধের তারা। তিন তারার সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে আর একটা বড় তারা দেখা যায়। এটি বেশ সাদা। এই তারাটি কালপুরুষের বাম পায়ের তারা। তিন তারার নীচে ছোট ছোট কয়েকটি তারা দেখা যায়। এই তারা কয়টি কালপুরুষের বেল্টে ঝুলানো তরবারী। উপরে ডান কাধের তারার পশ্চিমে ত্রিভুজ আকৃতির ছোট ছোট তিনটি তারা দেখা যায়। এগুলো কালপুরুষের মাথা। পশ্চিমে কতকগুলি তারা একটা বৃত্তচাপ তৈরি করেছে। এ হলো কালপুরুষের হাতের ধনুক। কালপুরুষ মণ্ডলের দক্ষিণ-পশ্চিমে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধক, বড় একটা শিকার কুকুরের চোখ। কাল পুরুষের সামনে, অর্থাৎ পশ্চিমে বিরাট একটা ষাঁড় (বৃষ) শিং নীচু করে তেড়ে আসছে। হাতে ধনুক, কোমরে তরবারি, সঙ্গে শিকারী কুকুর নিয়ে কালপুরুষ ষাঁড়ের সঙ্গে মরণ যুদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছে। এহেন পরিবেশে তার পায়ের নীচে একটা নিরীহ খরগোস নেহায়েৎই বেমানান।

এই কালপুরুষকে নিয়ে দেশে দেশে কত গল্প, কত কাহিনী রচিত হয়েছে। একে প্রাচীন মিশরে পাতালের দেবতা অসিরিস, বেবিলনিয়াতে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা মারদুক, প্রাচীন ভারতে রুদ্র, আর গ্রীসে একজন শিকারী বলে কল্পনা করা হতো। কিন্তু হিব্রুতে একে বলা হতো নির্বোধ। কারণ ষাঁড়ের কুঁজের ছয়টি তারাকে ছয়টি পায়রা কল্পনা করে বলা হতো যে, ঐ লোকটা পায়ের তলায় একটা নিরীহ খরগোসকে পিষ্ট করে, তরবারি, ধনুক আর শিকারী কুকুর নিয়ে যাচ্ছে পায়রা শিকার করতে। এমন লোককে নির্বোধ ছাড়া আর কি বলা যায়। গ্রীসের গল্প হলো : এই লোকটা একদিন গর্ব করে বলেছিল, পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাই, যাকে সে শিকার করতে পারে না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মাটির নীচে থেকে একটা বিরাট বিষধর বৃশ্চিক উঠে তাকে কামড় দেয়, আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। আর সে জন্যই এখনও বৃশ্চিককে পূর্ব আকাশের মাথা বের করতে দেখলেই, সে পশ্চিম আকাশে দিগন্তের নীচে লুকিয়ে পড়ে। পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশে এই মণ্ডলটিকে একজন মানুষ রূপে কল্পনা করা হলেও, চীনে কিন্তু কল্পনা করা হয় যে, এখানে দুইটি রাখাল বালক ঝগড়া করছে।

কালপুরুষমণ্ডল সম্বন্ধে গল্প কাহিনীর মতই তার তারা সমূহের তথ্যও অত্যন্ত বিস্ময়কর। এ সমস্ত তথ্যের কিছুটা এখানে পরিবেশন করা গেল।

কালপুরুষের বাম পায়ের তারাটি এ মণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এটি সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হলেও, একে এই মণ্ডলের দ্বিতীয় তারা, বিটা অরায়নিস বলা হয়। পায়ের তারা, এজন্য পায়ের আরবী প্রতিশব্দ রেজেল থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে রিগেল। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় এর নাম বাণরাজা। এই বাণরাজা সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বেশ সুন্দর একটা উপাখ্যান আছে। এ তারাটি অত্যন্ত উজ্জ্বল, দেখতে নীলাভ সাদা। এর পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ১৩০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই তারাটি অবিশ্বাস্যভাবে সূর্যের চেয়ে ২৩০০০ গুণ বেশী আলো বিকীরণ করে। এর ব্যাস, সূর্যের ব্যাস অপেক্ষা ৩৩ গুণ বেশী; অর্থাৎ এই তারাটির ভিতরে আমাদের সূর্যের মত প্রায় ৩৬০০০ সূর্য ভরে রাখা যেতে পারে। খালি চোখে যদিও রিগেলকে একটি তারা বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি তিনটি পৃথক পৃথক তারার একটি যুক্ত তারা। মাত্র ৯ সেকেণ্ড দূরে থেকে এর দুইটি তারা প্রধান তারাটিকে প্রতি ১০ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই যুক্ত রিগেল তারাটি আমাদের থেকে প্রায় ৬৫০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

কালপুরুষের ডান কাঁধের তারাটি এ মণ্ডলের প্রথম তারা, আলফা অরায়নিস। এ তারাটি দেখতে কিছু লাল। এর পাশ্চাত্য নাম বেতেল গয়েস। এটিও আরবী বাত্তোল-জাওজা শব্দের বিকৃত রূপ। আরবী শব্দটির অর্থ পুরুষের বগল। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় একে আর্দ্রা বলা হয়। এ আর্দ্রা নামের উৎপত্তি নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয়েছে এবং বেশ মজার কাহিনী তৈরি করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা প্রায় ২০০০ ডিগ্রী। যদিও এর তাপমাত্রা রিগেলের তাপমাত্রার চেয়ে অনেক কম, তবু এ তারাটি রিগেলের চেয়ে অনেক বড়। এর ব্যাস সূর্যের ব্যাসের ৪৫০ গুণ বেশী; অর্থাৎ আমাদের সূর্যের মত প্রায় ৯ কোটি সূর্য এর ভিতরে ভরে রাখা যায়।

কালপুরুষের বামকাঁধের তারাটি, এ মণ্ডলের তৃতীয় তারা গামা অরায়নিস। এর পাশ্চাত্য নাম বেলট্রিক্স অর্থাৎ মহিলা যোদ্ধা। এর ভারতীয় নাম কার্তিকেয়। এ সম্বন্ধে বেশ সুন্দর কাহিনী আছে। এ তারাটির পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ২০,০০০ ডিগ্রী; রিগেলের তাপমাত্রার চেয়েও বেশী।

কালপুরুষের ডান পায়ের তারাটির নাম ক্যাপ্পা অরায়নিস; এর পাশ্চাত্য নাম সায়েফ; এটি একটি আরবী শব্দ, অর্থ তরবারী। এর ভারতীয় নাম কার্তবীর্য। এ সম্বন্ধেও গল্প আছে। এর পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ২৫,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। বেল্টের তিনটি তারা উপর থেকে যথাক্রমে ডেল্টা, এপসিলন এবং জিটা অরায়নিস এদের ভারতীয় নামগুলো বড় সুন্দর, যথাক্রমে চিত্রলেখা, অনিরুদ্ধ এবং উষা। এদের প্রত্যেকের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ২৫,০০০ ডিগ্রীর কাছাকাছি। কালপুরুষের মাথার সবচেয়ে উত্তরের তারাটির পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশী, ৩০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এটির নাম ল্যামডা অরায়নিস। এর পাশ্চাত্য নাম হেকা, ভারতীয় নাম এনক। বিষ্ণুপুরাণে চিত্রলেখা, অনিরুদ্ধ, উষা, বানরাজা ইত্যাদি নিয়ে বেশ সুন্দর একটা গল্প আছে।

কালপুরুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তার তরবারী; এ তরবারীর তিনটি তারার মধ্যেরটি আবার তার মধ্যে সর্বপ্রধান। এই তারাটিকে থিটা অরায়নিস বলা হয়। এই তারাটির কোন পাশ্চাত্য বা ভারতীয় নাম নাই। তার কারণ হয়তো এ যে এ তারাটি তেমন স্পষ্ট নয়। খালি চোখে এখানে সাদা ছোট একটু দাগের মত দেখা যায়। বাইনোকুলার দিয়ে দেখলে উজ্জ্বল, এবড়ো-থেবড়ো একটা জায়গা বলে মনে হয়। এটাই কালপুরুষের বিখ্যাত নীহারিকা। এর ব্যাস প্রায় ১৬ আলোকবর্ষ। এই নীহারিকাটি অত্যন্ত পাতলা গ্যাস, প্রধানতঃ হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা গঠিত। সমুদ্র পৃষ্ঠের বাতাসের ঘনত্ব, এই গ্যাসীয় নীহারিকার ঘনত্ব অপেক্ষা ১০১৭, অর্থাৎ এক হাজার কোটি কোটি

গুণ বেশী। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, এই নীহারিকাটির ১০০ ঘন কিলোমিটার পরিমিত জায়গায় মাত্র ১ মিলিগ্রাম পরিমাণ পদার্থ আছে। পৃথিবীর গবেষণাগারসমূহে বৈজ্ঞানিকগণ যে শূন্যতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, তার ঘনত্ব এই নীহারিকার ঘনত্ব অপেক্ষা কোটি গুণ বেশী। এই যে প্রকৃতপক্ষে 'কিছু নয়'কে আমাদের চোখের সামনে দেখা যায়, এর ভর কিন্তু অত্যন্ত বিরাট। আমাদের সূর্যের ভর অপেক্ষা এই নীহারিকার ভর প্রায় ১০০০ গুণ বেশী। এই নীহারিকার পদার্থ দিয়ে আমাদের পৃথিবীর মত প্রায় ৩০ লক্ষ পৃথিবী গঠন করা যেতে পারে।

কালপুরুষের নীহারিকাটি যে উজ্জ্বল দেখায়, এটি তার নিজস্ব আলোর জন্য নয়। নিকটবর্তী তারার আলোকেই নীহারিকাটি আলোকিত হয়। থিটা অরায়নিস তারাটিকে দূরবীন দিয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এটি একটিমাত্র তারা নয়, বরং ছয়টি তারা নিয়ে এটি গঠিত। এদের চারটি তারা একটা অস্পষ্ট ট্রাপিজিয়াম গঠন করে।

দেখা যাচ্ছে যে, কালপুরুষমণ্ডলে অনেকগুলি অতি উত্তপ্ত ও অত্যন্ত বিরাট, এক কথায় 'অত্যুপ্ত দানব' তারা আছে। এটা কি কোন আকস্মিক ঘটনা, না এর বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে?

উত্তপ্ত দানব তারাগুলো সাধারণতঃ অত্যন্ত অমিতব্যয়ী হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, রিগেল তারাটি প্রতি সেকেণ্ডে, এর পদার্থের প্রায় ৮০০০ (আট হাজার) কোটি টন পদার্থ ভস্মীভূত করে আতসবাজীর মত আলো তাপ বিকিরণে ব্যয় করছে। এভাবে চললে, মাত্র এক কোটি বৎসরেই তারাটি দেউলিয়া হয়ে যাবে। কিন্তু রিগেল এখনও যে হারে তার পদার্থ দিয়ে আতস বাজী পুড়িয়ে যাচ্ছে, তাতে মনে হয়,এখনও তার পুঁজিতে টান পড়ে নাই। মোটের উপর, তারাটির বয়স এক কোটি বৎসর হওয়ার এখনও অনেক দেরী আছে। এক কোটি বৎসর সাধারণভাবে অনেক সময় বলে মনে হলেও বিবর্তনের মানদণ্ডে এ সময় অত্যন্ত স্বল্প। প্রায় এক কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবী থেকে ডাইনোসেরাস লুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং ডাইনোসেরাসের সময় রিগেল তারাটি ছিল না। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে, এ তারাটিকে শিশু তারা বলা যেতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে, ট্রাপিজিয়ামের তারাগুলোর বয়স কয়েক লক্ষ বৎসরের বেশী নয়। এ ছাড়া এই নীহারিকাতে তারার ভ্রূণ থেকে আরম্ভ করে তারা গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের তারা দেখতে পাওয়া যায়।

কালপুরুষ মণ্ডলে আমাদের চোখের সামনে বিশ্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

পানি : একটি বিশিষ্ট পদার্থ

[মে-১৯৭৭]

আলী আসগর

পানি আমাদের পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। আছে আকাশে কুণ্ডলিত ঘন কাল মেঘ হয়ে, অজস্র নদীনালা ও জলাশয় প্লাবিত করে, আছে ভূপৃষ্ঠের তিন চতুর্থাংশ ডুবিয়ে নদী-নালা-সমুদ্র হয়ে। এমনকি গাছপালা, জীবজগৎ আমাদের দেহের জীবকোষ ও রক্ত কণিকার অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে পানি। পানির এই সার্বিক ব্যাপ্তিই হয়ত প্রাচীনতম গ্রীক দার্শনিক থালেচকে এই মতবাদে নিয়ে গিয়েছিল যে পানিই হচ্ছে মূল পদার্থ, পানি থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে তার ধারণা ছিল— পৃথিবী একটি ঢেউতোলা থালা পানির মধ্যে ভাসছে, উপরে নক্ষত্র খঁচিত অর্ধগোলকটি একে ঢেকে রেখেছে এবং গোলকটি নিজেও ভাসছে সীমাহীন অথৈ পানির মধ্যে। আধুনিক বিজ্ঞান থালেচের ধারণা বদলে দিয়েছে সত্য কিন্তু তবু পানিই আমাদের জীবনে প্রধানতম উপাদান। যেমন প্রতি মণ শষ্যকণা উৎপাদনে প্রায় দশ টন পানি ব্যবহৃত হচ্ছে; এক সের মাংস তৈরি হতে তিরিশ টন পানি খরচ হচ্ছে। এক টন কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে হাজার টন বাষ্প করতে হচ্ছে। শুধু ফসলের ক্ষেতেই আমেরিকা ব্যবহার করছে দশ হাজার কোটি গ্যালন জল এবং শিল্প-কারখানায় প্রায় তৎপরিমাণ। এত ব্যাপ্ত হয়ে এত সার্বিক হয়ে পানি আমাদের জীবনকে ঘিরে রাখা সত্ত্বেও, হয়ত বা সেই জন্যেই পানি সম্পর্কে কতকগুলো ভুল ধারণা আমরা পোষণ করে থাকি। যেমন পানিকে খুব সহজ, খুব স্বাভাবিক বস্তু বলে ধরে নিই। এমনকি কোন জিনিসকে সরল ও সাধারণ বলে বুঝাতে চাইলে পানির সঙ্গে তুলনা করি। কিন্তু যে অর্থে সহজ বলতে সহজবোধ্য গুণাগুণ সম্পন্ন—এবং সাধারণ বলতে নির্বিশেষ অর্থাৎ অন্য সবকিছুর মত বুঝায় সে অর্থে পানি মোটেই সহজবোধ্য নয়— সাধারণও নয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখব পানির কতকগুলো বিশেষ গুণ আছে— যা সমগ্র জৈব ও অজৈব পদার্থসমূহের বিচারে অত্যন্ত দুর্লভ। এই দুর্লভ বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যেই পানি এত কার্যকরভাবে সহায়ক আমাদের জীবনে। এবং আমরা দেখব পানির এই বিচিত্র গুণাগুণগুলোর জন্যে এর গঠন—এর পরমাণুগুলোর বিশেষ সন্ধান প্রক্রিয়া কেমনভাবে দায়ী।

আমরা জানি পানি একটি যৌগিক পদার্থ। প্রতিটি পানির অণুতে দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু আছে। অক্সিজেনের পরিবর্তে টেলুরিয়াম, সেলেনিয়াম বা সালফার পরমাণু সংযুক্ত করে রাসায়নিকভাবে পানির অণুর মত দেখতে যেসব যৌগিক পদার্থ পাই তাদের মধ্যে একটি মিল লক্ষ্য করা যায় তা হলো যে অণুর ওজন যত কম তার গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক তত নিচুতে। এই হিসাবে পানির গলনাঙ্ক হওয়া উচিত ছিল ০ ডিগ্রীর চেয়ে ৯৫° নিচে এবং স্ফুটনাঙ্ক ০ ডিগ্রীর চেয়ে ৮০° ডিগ্রী নিচে। অথচ পানি ফোটে ১০০° সেন্টিগ্রেডে। এর কারণ আমরা পরে লক্ষ্য করব কিন্তু এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে পানি যদি ০ ডিগ্রীর ৮০° নিচে ফুটত তাহলে পৃথিবীর কোথাও পানি থাকত না এমন কি মেরু প্রদেশেও না। ফলে জীবনের লেশ থাকত না কোথাও।

পানির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো অসম্ভব তাপ ধারণ করার ক্ষমতা। পানিকে গরম করতে পারদের তুলনায় প্রায় তেত্রিশ গুণ তাপ লাগে। আমরা লক্ষ্য করেছি কেটলীতে পানি যখন ফুটতে থাকে তখন তাপ দিলেও পানি আর গরম হয় না শুধু বেশী পরিমাণ পানি বাষ্প হতে থাকে। পানি থেকে বাষ্প হবার সময় যে তাপটা পানির কণিকাগুলো নিয়ে

নেয় তাকে লীন তাপ বলা হয়। পানির ক্ষেত্রে এই বাষ্পীভবনের লীন তাপ পারদের তুলনায় প্রায় সাড়ে সাত গুণ এবং কঠিন বরফ গলিয়ে তরল পানি বানাবার বেলায় এই লীন তাপ পারদের তুলনায় প্রায় তিরিশ গুণ। ভূপৃষ্ঠের বিপুল পরিমাণ পানি তার এই তাপ ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েই পৃথিবীর উষ্ণতার তারতম্য ঘটাতে দিচ্ছে না। বস্তুত সূর্য ও পৃথিবী মিলে একটি তাপীয় ইঞ্জিনের মত। সূর্য এখানে ফার্নেসের কাজ করছে। পানির সাহায্যেই এই ফার্নেসের তাপকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি। সমুদ্র থেকে বাষ্প হয়ে উপরে উঠে এবং বৃষ্টি হয়ে নেমে পড়ার মধ্যেই এই ইঞ্জিনের চক্রটি কাজ করছে।

পানির অন্যতম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে প্রায় সবকিছুই দ্রবণ করার বা গলাবার ক্ষমতা। এই জন্যেই পানিকে বলা হয় সর্বদ্রাবক এবং সব রকম রাসায়নিক দ্রব্য দ্রবণ করে সমুদ্র হয়েছে ম্যাগনাম্যাটার বা মহামাতা সব জীবনের জন্যে। পানির পৃষ্ঠটান এর আর একটি বৈশিষ্ট্য। সে জন্যে একটি লোহার সূঁচকে পানিতে ভাসান সম্ভব। একই কারণে কোন নলের মাথা থেকে ধীরে ধীরে পানি পড়বার সময় ফোটা ফোটা হয়ে পড়ে। মনে হয় ফোটাকে আবৃত করে একটি পর্দা যেন ক্রমাগত বড় হতে থাকে এবং এক সময় পৃথিবীর টানে ফোটাটি লম্বা হয়ে ঝরে পড়ে। এর উৎস পানির অণুগুলোর মধ্যেকার পারস্পরিক আকর্ষণ বা পৃষ্ঠটান। অন্যান্য তরল পদার্থে এই পৃষ্ঠটান থাকলেও পানির ক্ষেত্রে এটা অস্বাভাবিক বেশী। এবং গাছের চিকন শিকড় বেয়ে পানি যে উপরে উঠে আসে তার পেছনে পানির এই বৈশিষ্ট্য কাজ করছে।

পানির আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে পানির ঘনত্ব সবচাইতে বেশী ৪° সেন্টিগ্রেডে। পানির উত্তাপ আরো কমালে এর আয়তন বাড়তে থাকে। শূন্য ডিগ্রী উষ্ণতায় পানি যখন বরফ হয় তখন এর আয়তন বেড়ে যায়। আমরা সাধারণতঃ জানি কোন বস্তুর ঘনত্ব তার তরল অবস্থার চাইতে বেশী। কিন্তু পানির ক্ষেত্রে দেখতে পাই বরফ পানির চেয়ে হালকা সে জন্যে বরফ পানির উপরে ভাসে। পানির এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য না থাকলে, সমুদ্রের নীচ থেকে বরফ জমে সমুদ্রের সব জীবকে মেরে ফেলত। পানি ছাড়া বিসমাথের ক্ষেত্রেও উষ্ণতা কমার সঙ্গে ঘনত্ব কমার ব্যাপারটি ঘটে।

পানির এইসব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্যে দায়ী পানির বিশেষ অনুবন্ধন যাকে বলা হয় 'হাইড্রোজেন বণ্ড'। ব্যাপারটি স্বভাবতঃই একটু জটিল কিন্তু সোজা কথায় ব্যাপারটি এইভাবে বুঝতে পারি :

হাইড্রোজেন পরমাণুর একটিমাত্র ইলেকট্রন সাধারণ অবস্থায় প্রটোনের চারপাশে বৃত্তাকার পথে ঘুরে। পানির অণুর মধ্যে অক্সিজেন পরমাণুর উপস্থিতিতে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন প্রটোনের চারপাশে সমভাবে না ঘুরে যে দিকটায় অক্সিজেন পরমাণু সেই দিকটায় গড়পরতায় বেশিক্ষণ থাকে। অর্থাৎ বলা যায় পানি অণুর হাইড্রোজেন পরমাণু দুটি অক্সিজেন পরমাণুর কাছে তাদের ইলেকট্রন হারিয়ে প্রটোনে রূপান্তরিত হচ্ছে মাঝে মাঝে। ইলেকট্রন যা হাইড্রোজেন পরমাণু—অর্থাৎ প্রটোন পার্শ্ববর্তী পানির অণুর সঙ্গে একটি বিশেষ কম্পন সৃষ্টি করছে এর ধনাত্মক চার্জ ও অক্সিজেনের ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণের ফলে। হাইড্রোজেন পরমাণু এমনি করে পানির অণুর মধ্যে যে কম্পন সৃষ্টি করছে তাকে আমরা হাইড্রোজেন কম্পন বলি। অন্যান্য তরল পদার্থের অণুদের মধ্যে যে কম্পন তার তুলনায় পানির অণুদের মধ্যেকার এই হাইড্রোজেন বন্ধন অনেক বেশী শক্ত। প্রটোন আকারে খুব ছোট বলে দুটো পরমাণু দুদিক থেকে এর খুব কাছে আসতে পারে এবং জায়গা থাকে না বলে দুটোর বেশী পরমাণু প্রটোনের কাছে আসতে পারে না।

হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে পানির অণুগুলো এই যে হাত ধরাধরি করে একটি পারস্পরিক বন্ধন গড়ে তুলছে তা পানিকে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। যেমন পানিকে বাষ্প করতে হলে এই বন্ধনকে ছিন্ন করতে হয় বলে পানিকে বাষ্প করতে বেশী তাপ শক্তি লাগে। একই কারণে বরফ গলাতে অনেক লীন তাপ খরচ হয়ে যায়।

বরফ যে পানির চেয়ে হালকা তার কারণ বরফ অবস্থায় পানির অণুগুলো হাত ধরাধরি করে বেশ স্থির হয়ে যায় এবং পানির অণুর এই বিন্যস্থ অবস্থায় তাদের মধ্যে বেশ ফাঁক থেকে যায়। তরল অবস্থায় বরং ছুটাছুটিতে ফাঁকগুলো ভরে যাচ্ছিল ফলে ঘনত্ব যাচ্ছিল বেড়ে। পানির যে অসম্ভব পৃষ্ঠটান অথবা একটি ক্রটিহীন একটি সরু পানির টিউব ছিন্ন করতে যে অনেক বল প্রয়োগ করতে হয় সেও এই শক্ত হাইড্রোজেন বন্ধনের জন্যেই।

পানি যে সবকিছুকে সহজে দ্রবণ করে অথবা ভিজাতে পারে তার কারণ এর উলঙ্গ হাইড্রোজেন পরমাণু বা প্রটোন যা সহজেই ইলেকট্রন দিতে পারে এমন সকল পরমাণুকে আকর্ষণ করে। কাচ, কাগজ, কাপড়, পাথর সবকিছুতেই অক্সিজেন পরমাণু আছে সেজন্যে পানিতে সহজেই এদের উপরিতল ভিজিয়ে দেয়া যায়। পানির অন্যান্য বিশিষ্ট গুণগুলোও আমরা এমনি করে ব্যাখ্যা করতে পারি। পানি নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে অন্য কোন একক বস্তু নিয়ে তা হয়নি, কারণ পানি মোটেই সহজ নয়, নির্বিশেষও নয়।

টপোলজী কি?

[সংখ্যা মে-৭৭]

নাদিরা মজুমদার

টপোলজী আধুনিক অংকশাস্ত্রের একটা সক্রিয় শাখা। টপোলজী আসলে জ্যামিতিরই আরেকটা ভিন্নরূপ। সাধারণ জ্যামিতির জনক ইউক্লিড। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে দৈর্ঘ্য, কোণ, আকার সুনির্দিষ্ট। এদের কোন পরিবর্তন নেই। টপোলজী ঠিক এর উল্টো। আয়তন (SIZE) নিয়ে মাথাব্যথা নেই টপোলজীর। এর সমস্যা হল আকৃতি (SHAPE) নিয়ে। টপোলজীতে এই আকৃতিকে ভাঁজ করা, টেনে লম্বা করা, বাঁকানো, দুমড়ে-মুচড়ে বিকৃত করা সবই চলবে; চলবে না কেটে-ছিঁড়ে আকৃতির পরিবর্তন করা।

ম্যাপ আঁকতে কয়টা রং লাগে?

শুনতে খুব সহজ মনে হচ্ছে। কম করে কয়টা রং লাগে একটা ম্যাপ আঁকতে? পাশাপাশি দুটা দেশের এক রং কিছুতেই দেখানো চলবে না। দেশসমূহের সীমারেখাও যাচ্ছে তাই হতে পারে। এ- ও একটা টপোলজীর সমস্যা।

ম্যাপ যত জটিলই হোক না কেন, এবং যত দেশই থাকুক না কেন, তাছাড়া দেশগুলোর অবস্থান যেমনই হোক না কেন, মোট চারটি রং হলেই একটা ম্যাপ আঁকা চলে। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, অংকশাস্ত্রের মূল প্রাণ যে 'প্রমাণ', আজ পর্যন্ত কোন গণিতবিদই এই সত্যতার কোন প্রমাণ দিতে পারেননি।

মবিয়াস ষ্ট্রিপ

মবিয়াস ষ্ট্রিপ টপোলজীর সরল উদাহরণ একটা। মবিয়াস ষ্ট্রিপের পরীক্ষাটা নিজেরাও করতে পারেন। ইঞ্চিখানেক চওড়া এবং ১০ কি ১২ ইঞ্চি লম্বা দুটো কাগজের টুকরো হলেই চলবে। টুকরো দুটোর মাঝ বরাবর একটা সরল রেখা আঁকুন। এবারে একটা টুকরো নিয়ে, এর প্রান্ত দুটো আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিন। এরপর মাঝখানের সরল রেখা বরাবর কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলুন। পাবেন কি? দুটো রিং।

এবারে দ্বিতীয় টুকরোটা নিয়ে মুচড়ে ফেলুন এবং প্রান্ত দুটো আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিন। এবারে পাওয়া যাবে বিরাট একটা বৃত্ত। এটাই হল মবিয়াস ষ্ট্রিপ। নামটা এসেছে উনিশ শতকের জার্মান জ্যোতির্বিদ অগাষ্টাস ফার্ডিনান্দ মবিয়াস থেকে। মবিয়াসই প্রথম টপোলজীর মজার মজার সব ধর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। মবিয়াস ষ্ট্রিপ টপোলজীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটা সুন্দর সমস্যা।

সরল রেখাও সরল নয়!

গণিতবিদদের ভাষায়, 'দুটি বিন্দু সংযোজক সংক্ষিপ্ত দূরত্বই হল সরল রেখা।' কিন্তু ম্যাপে দুটি স্থানের দূরত্ব মাপতে গেলে ভীষণ গোলমেলে লাগে। নিউইয়র্ক এবং কোলকাতার মধ্যে গণিতের ভাষায় সংক্ষিপ্ত দূরত্ব মাপতে হলে দেখা যাবে সরল রেখা আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে মরক্কো এবং এরপর আরব সাগর অতিক্রম করে ভারতের কোলকাতায় এসেছে। কিন্তু পৃথিবী তো চ্যাপ্টা নয়। তাই গ্লোবে যখন দূরত্ব মাপতে যাব দেখা যাবে সরল রেখাটা কানাডার উত্তরাংশ, গ্রীণল্যাণ্ড, আর্কটিক সাগর, সোভিয়েত সাইবেরিয়া, তিব্বত এবং নেপাল হয়ে ভারতে পড়ছে। এ ভারী অদ্ভুত সরলরেখা। পৃথিবীর বক্রতার জন্য এও বেঁকে গেছে। তাই একে বলে গ্রেট সার্কেল রুট।

বোটানিক্যাল গার্ডেন : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

[মে-১৯৭৭]

এম. এ. রহমান

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেসব বোটানিক্যাল গার্ডেন রয়েছে তার মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানটি একটি ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা। এর পরিবেশ, পরিসর, উদ্যান রচনাভঙ্গী এবং পরিকল্পনা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। অর্থকরী নতুন কি কি উদ্ভিদ-সম্পদ এই অঞ্চলের উপযোগী করে গড়ে তোলা যায় তা এই বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটি প্রধান লক্ষ্য। তাই স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বহু অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈচিত্রে এই উদ্যান ভরপুর।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনটি পাহাড়, টিলা ও নিম্নভূমি সহ ৩০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ প্রান্তে বালুছড়া নামক পাহাড়ী খালের পাড়ে অবস্থিত। ১৯৭৪-৭৫ সালে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক স্থানটি উদ্যানের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং সেই বছরই নিচু টিলা পাহাড় কেটে ভূমি সমতল করার মাধ্যমে এর উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হয়। এর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রয়েছে একজন উদ্যান অধ্যক্ষ ও উদ্যান সহাকারী। সর্বোপরি তদারক ব্যবস্থায় আছেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. আব্দুল আজিজ খান। কাজ-কর্ম করার জন্য ৯ জন উদ্যানকর্মী রয়েছেন।

উন্নয়নের প্রথম বছর উদ্যানকর্মীদের থাকার জন্য একটি ঘর তৈরী করা হয় এবং আওতাভুক্ত এলাকায় উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। বাগানের পূর্বদিকে ৩ হাজার ফুট কাঁটা তারের ঘেরা দেয়া হয়। ১৯৭৫/৭৬ সালে ৬ একর উঁচু ও টিলা ভূমি কেটে সমতল করা হয়। উদ্যান কর্মীদের থাকার জন্য ঘর, পানি রাখার জন্য উঁচু জলাধার ও দুইটি চৌবাচ্চা নির্মাণ করা হয়। বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে কাঁটা তার দ্বারা ঘেরার কাজ সমাধা করা হয়। পরিকল্পনা মাফিক সমস্ত উদ্যানটিকে বিভিন্ন ছকে বিভক্ত করা হয়েছে।

১। **কমলা বাগান** : পাহাড়ের বিভিন্ন দিকে ঢালে ও সমতল ভূমিতে এই এলাকায় কমলা লেবুর চাষ কেমন হয় তা দেখার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটি পাহাড়ের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ঢালে ও দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত সমভূমিতে যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশ হতে সংগ্রহকৃত ২০টি জাতের কমলা, মালটা, কিনু, মোজাম্বী চারা ও কলম রোপণ করা হয়েছে। আগামী মৌসুমে কতগুলি গাছে ফল আসতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই বাগানের মোট গাছের সংখ্যা ১০০০টি।

২। **লেবু বাগান** : এই বাগানে বীজহীন লেবু, কাগজী, এলাচি ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের ৬০০টি লেবুর চারা ও কলম লাগানো হয়েছে। আগামী মৌসুমে এতে ফল আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩। **পেয়ারা বাগান** : একটি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে এই বাগানে ১২৫টি উন্নত জাতের পেয়ারার চারা রোপণ করা হয়েছে।

৪। **কাঁঠাল বাগান** : একটি পাহাড়ের পূর্ব ঢালে ও অন্য একটি পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে কাঁঠালের বীজ সরাসরি বপন করা হয়েছে। বর্তমানে চারার অবস্থা বেশ সন্তোষজনক।

৫। **আম বাগান** : একটি পাহাড়ের পূর্ব ঢালে আমের চারা রোপন করা হয়েছে। আগামী মৌসুমে এতে কলম করে উন্নত জাতে রূপান্তরিত করা হবে।

৬। **কুল বাগান :** অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমি ও পাহাড়ের পূর্ব-দক্ষিণ ঢালে ২০০টি জংলী কুলের চারা রোপণ করা হয়েছে। আগামী মৌসুমে এতে বিভিন্ন জাতের উন্নত কুলের কলম করে দেয়া হবে।

৭। **চা ও কফি :** পাহাড়ের উত্তর ঢালে ও পূর্ব ঢালে কিছু পরিমাণ পরীক্ষামূলকভাবে চা ও কফি গাছ রোপণ করা হয়েছে।

৮। **সেগুন বাগান :** এই বাগানে প্রায় ৪০০০টিরও অধিক গাছ রোপন করা হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে যে গাছ রোপন করা হয়েছিল সে সমস্ত গাছ ২০-২৫ ফুট উঁচু হয়েছে। এই বাগানের নিচের দিকে জারুল, উপরে অন্য পার্শ্বে শাল ও গর্জন গাছ রোপন করা হয়েছে।

৯। **এক বীজপত্রী বৃক্ষ :** বাগানের পূর্ব পার্শ্বস্ত একটি পাহাড়ে এক বীজপত্রী বৃক্ষের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এতে কয়েক জাতের পাম গাছ রোপন করা হয়েছে। অন্তবর্তী ফসল হিসাবে আনারস চাষ করা হয়েছে।

১০। অন্য একটি ব্লককে ৪টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) মশলার ও মৌসুমী শস্যের চাষ।

(খ) ঔষধী বৃক্ষ– কিছু পরিমাণ ঔষধীর গাছ রোপণ করা হয়েছে।

(গ) ফল বাগান : এই বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফল বৃক্ষ রোপন করা হবে। বর্তমানে আম, জাম, লিচু, আতা, ছেউ ফল, জামরুল, গোলাব জাম, কাউ গোলা, বিলাতী গাব, আমড়া, সরিফা, সফেদা প্রভৃতি রোপন করা হয়েছে।

(ঘ) সুদৃশ্য বৃক্ষ : এর জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। এতে কিছু গাছ লাগানোও হয়েছে।

১১। ভেজিটেবল প্লট ঃ এই প্লটে বিভিন্ন প্রকারের রবি, খরিফ ও বর্ষতি শাকসব্জী করা হয়। ছাত্রগণ এতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

১২। হ্রদ খনন : উদ্যানে পাহাড়ের পাদদেশে নিম্ন জলাভূমিতে দুইটি হ্রদ খনন করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং এই আর্থিক সালেই তা সম্পন্ন করা হবে। এই হ্রদে জলজ উদ্ভিদ এবং মাছের চাষ করা হবে।

গবেষণা খামার : ১২০০ ফুট ঘেরা বিশিষ্ট একটি ৬ ফুট উচ্চ নেট হাউজ তৈরি করা হয়েছে। এটা গবেষণা কাজের জন্য ব্যবহার হচ্ছে।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ নিম্নলিখিত গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন :

(ক) পাট ও পাটের বৈজ্ঞানিক রোপনের উপর মিউটেশন প্রজননের কাজ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো ভাল জাতের পাট বের করা। তাছাড়া পাটের উপর কনভেনসন প্রজননের কাজ করা হচ্ছে। টমেটো গাছে যে গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে ফল ধরার ব্যাঘাত ঘটে তার কারণ উদঘাটনের উপর কাজ করা হচ্ছে। এ যাবৎ এসব গবেষণার কিছু কিছু ফলও পাওয়া গেছে। তাছাড়া বুনো জাতের দেশী পাট খুঁজে বের করা হয়েছে।

(খ) চীনা বাদামের রোগ ও তার প্রতিকার, তুলার রোগ ও তার প্রতিকার এবং পাটের প্রধান রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুগুলি দিয়ে বিভিন্ন জাতের পাটের রোগ উৎপাদন ক্ষমতা পরীক্ষা। বনজ উদ্ভিদের চারা গাছের রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নেবার জন্য চেষ্টা চলেছে।

(গ) ভাইরাস রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু উৎপাদন কম এরূপ সোয়াবিনের জাত হতে অধিক উৎপাদনশীল কিন্তু সহজেই ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হয় এরূপ জাতের মধ্যে ভাইরাস রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা চরিত্রটি প্রদান করা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন আবহাওয়ার সংগে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে এরূপ সোয়াবিনের জাত বের করা।

(ঘ) সংরক্ষণের মাধ্যমে পোকা আক্রমণ করতে পারে না এরূপ বেগুনের জাত খুঁজে বের করা।

জার্মান পদার্থবিদ কারশফ তাঁর শিক্ষকতা জীবনে শুধু একটিমাত্র ক্লাশ নিতে পারেননি। সেটি এক শনিবারে, যে দিনটি স্থায়ী ছিল তাঁর বিয়ের দিন। পরদিন রোববার তাঁর একদিন স্থায়ী মধুচন্দ্রিমা যাপন করে সোমবার তিনি যথারীতি ক্লাশ নিয়েছেন। ব্যস, তারপর আর কোন দিন ক্লাস বাদ যায়নি।

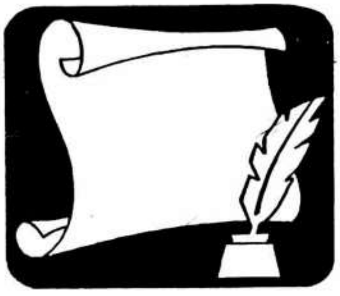

জল পড়ে পাতা পড়ে [মে- ১৯৭৭]

নদী চলে বাঁকে বাঁকে

বরফ গলা পানি আর বৃষ্টির পানির অনেকখানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, কিছুটা মাটির ভেতরে ঢুকে গিয়ে ভূগর্ভের পানি হিসেবে সঞ্চিত হয়, আর বাকীটা মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়– যতক্ষণ পর্যন্ত সাগর বা অন্য কোন বড় জলাশয় না পাওয়া যাচ্ছে। এই শেষেরটাই নদী। স্বাভাবিকভাবেই গড়ানোর কাজটা ভাল হতে পারে পাহাড়ী অঞ্চলে। সেখানে ঢালের উপর গড়িয়ে আসা ছোট ছোট জলধারা মিলিত হয়ে সহজেই নদীর রূপ লাভ করতে পারে।

পাহাড়ী ঢালে নদীর গতি যেখানে খুব বেশি সেখানে এটা সামনের দিকে যেতে যেতে এর তলাটাও যথেষ্ট খুঁড়ে ফেলতে পারে। তলার অনেক খনিজ পদার্থ পানিতে গলে যেতে পারে। আসলে কিন্তু খোঁড়ার ব্যাপারে তার ভূমিকা অল্প। পানির প্রচণ্ড শক্তিতে বড় বড় পাথর লাফাতে লাফাতে, গড়াগড়ি খেতে খেতে স্রোতের সাথে চলে। এরাই হাতুড়ির মত কাজ করে নদীর তলাকে ক্ষয়ে ফেলে। এভাবে পরস্পরের সাথে ধাক্কাধাক্কিতে পাথরগুলোও ছোট হতে হতে শেষ পর্যন্ত গুড়িয়ে নিয়ে মিহি মাটির আকারে নদীর পানিতে মিশে যায়, এরাই নদীর পলি। তাছাড়া পানির সাথে থাকে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থগুলোও। এভাবে একটা নদী বিপুল পরিমাণ মাটি ও খনিজ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

একটা কাল্পনিক নদীর জীবন ইতিহাস ভেবে দেখা যাক। পাহাড়ী এলাকায় তার জন্ম। দূরন্ত তরুণ নদী বেশ তাড়াতাড়ি তার তলা ক্ষয় করে গভীর, খরস্রোতা নদী হিসেবে চলে। বৃষ্টির পানি, ধ্বংস প্রভৃতির কারণে দুই পাড়ও কিছু কিছু ক্ষয় হয়েছে বলে এর খাদটা হলো অনেকটা ইংরেজি V অক্ষরের মতো। এ পর্যন্ত সে তলা ক্ষয় করতেই ব্যস্ত, দুপাশের দিকে তার বিশেষ মনোযোগ নেই। ইতিমধ্যে তলা ক্ষয় করতে করতে তলায় নদীর ঢাল কমে এসেছে। শেষ পর্যন্ত সাগর সমতলের কাছাকাছি একটা তলে যখন তার তলা এসে ঠেকেছে তখন নীচের ক্ষয় ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এখন থেকে দু'পাশের ক্ষয় ক্রিয়াটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ালো। এদ্দিন পর্যন্ত নদী অপেক্ষাকৃত সোজা পথে চলেছে, এবার তার এঁকে বেঁকে চলার পালা। কোন একটা বাধা সামনে আসলে নদী সেখানে বাঁক নেয়। বাঁকের বাইরের দিকটাতেই তার আঘাত সবচেয়ে বেশী। কাজেই সেখানে পার ভাঙ্গে, ক্ষয় হয়। বাঁকের ভেতরের দিকটায় আঘাত কম, কাজেই বয়ে আনা কিছুটা মাটি ওখানে জমা হলো। এভাবে বাঁকের পরিসর বড় হলো। এতদিন যা ছিল সরু, গভীর জলধারা এখন তা দু'পাশে ক্রমবর্ধমান জায়গা জুড়ে 'নদীর উপত্যকার' সৃষ্টি করলো, নদীর বানের পানির সেখানে অবাধ বিচরণ। নদীর এপার ভেঙ্গে ওপার গড়ার মধ্য দিয়ে জায়গাটাও বেশ সমতল হয়ে এল। আবার উপনদী, শাখানদীগুলো মিলে বেশ বড় একটা ভূখণ্ডকে নদী এভাবে সমতল করে নিতে পারে। এই অবস্থায় আমরা বলতে পারি নদী বয়প্রাপ্ত হয়েছে। এবার এর উপত্যাকা যতই প্রশস্ত হবে আর যত বড় সমতল সৃষ্টি হবে, ততই নদী বুড়ো হতে থাকবে।

নদীর শৈশবে ক্ষয়টাই প্রধান কাজ, সঞ্চয় নয়। কিন্তু বয়প্রাপ্তির পর থেকে বাহিত পলি সুযোগ মত নদীর তলে সঞ্চয় করাটাও ধীরে ধীরে গুরুত্ব পেতে থাকে। যেখানেই নদীর গতি একটু কম হবে সেখানেই পলি পড়ে চরার মত বাধা সৃষ্টি হতে পারে। একটা বোতলে পানির মধ্যে বালি, মাটি প্রভৃতি মিশিয়ে যতক্ষণ পানি নাড়তে থাকবে ততক্ষণ তলায় কিছু পড়বে না, কিন্তু যেই পানি শান্ত হবে ঠিক তেমনি তলায় তলানি পড়বে। এভাবেই পলি পড়ে। বাঁকের

ভেতরের দিকটাতেও এমনি করে চড়া পড়ে। বন্যার সময় নদীর পানি দু'পাশে অনেকখানি জায়গাতে গড়ায়। হঠাৎ করে নদীর পরিসর বেড়ে যাওয়াতে এ সময় এর গতিবেগও কমে যায়, ফলে সর্বত্র পলি পড়ে, অনেক জায়গা জুড়ে। অপেক্ষাকৃত মোটা, বেলে পলিগুলো পড়ে নদী-খাতের কাছাকাছি আর মিহি পলিগুলো পড়ে খাত থেকে দূরে। এই মিহি এঁটেল খনিজ মেশানো ও জৈব পলির কারণে নদী উপত্যকার এই অঞ্চল খুবই উর্বরা হয়। এখন বুঝতে পারছ নদী বিধৌত অঞ্চল মাত্রই কেন কৃষির জন্য এত উপযোগী হয়, সে আমাদের দেশে যেমনি, পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড় নদীগুলোর উপত্যকার জন্যও তেমনি।

পলি সঞ্চয়ের সর্বশেষ রূপ হচ্ছে মোহনার কাছে বদ্বীপের সৃষ্টি। নদী যখন সাগরে পড়ার পর ওখানে তার গতি হারাল তখন বাদবাকী পলি মোহনার কাছে সাগর বুকে সঞ্চিত হয়। এর একটা বাড়তি কারণ হলো সাগরের নোনতা পানিতে কাদার কণাগুলো জড়াজড়ি করে থাকতে চায় এবং ফলে ভারী হয়ে তাড়াতাড়ি সঞ্চিত হয়। মোহনার দু' পাশে ত্রিভুজাকারে পলি সঞ্চিত হতে থাকে, ধীরে ধীরে চরা জেগে উঠে। এই চরার উপর দিয়ে ভূমির ঢাল অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়াতে কোন এক বন্যার সময় এর উপর দিয়ে নদীর নতুন খাত সৃষ্টি হয়। ফলে 'ব'-এর আকারের একটা চরা আলাদা হয়ে সৃষ্টি হয় বদ্বীপ। এভাবে বহু বদ্বীপ ও বহু নদী খাতের সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশের মানচিত্রে দক্ষিণ উপকূলের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে সেটা কি রকম। পলি দিয়ে গঠিত এই সব বদ্বীপ যে খুবই উর্বর হয় তা বেশ বুঝতে পারছ। আর একটা জিনিস ইতিমধ্যে বেশ বুঝতে পারছ, নদী শুধু একটা জায়গার উপর দিয়ে বয়ে যায় না, এই নদীই সেই জায়গাটিকে গড়ে, পিটে, ক্ষয়ে বর্তমান অবস্থায় এনেছে। পৃথিবী পৃষ্ঠের ভাঙ্গাগড়ায় নদীর অবদান অনেকখানি।

উপরে নদী সম্বন্ধে যত কথা বলা হলো পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পারের ছেলেমেয়ে হিসেবে তোমরা এসবের সাথে অপরিচিত নও। নদীর ভাঙ্গা, গতি পরিবর্তন, বন্যা মানুষের জন্য কি অবর্ণনীয় দুঃখ বয়ে আনে সে তোমরা দেখেছ। আবার এই নদীই কিভাবে আমাদের বাংলাদেশকে সুজলা-সুফলা করেছে তাও তোমরা দেখছ। আমাদের দেশটাই তো নদীর পলিতে সৃষ্ট, সুখে-দুঃখে নদী নিয়েই তো এই দেশ। নদীর আনা দুঃখ ঘুচাতে হলে, নদীকে আরো উপকারে লাগাতে হলে তাকে বুঝতে হবে ভাল করে, একে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। প্রয়োজনে সবাই মিলে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে একে বদলাতে হবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের অনেকখানি জড়িয়ে আছে এর সাথে।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

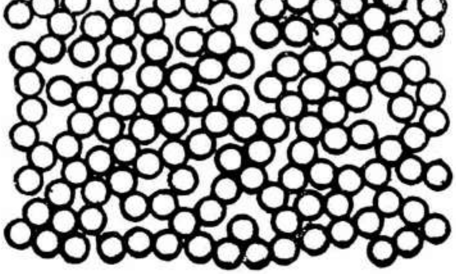

ইতিহাসের পাতা থেকে

বিদ্যুৎ যুগের জন্মদিনে

[জুন-জুলাই-'৭৭]

বিদ্যুৎ যুগের একজন মূল স্রষ্টা যিনি, সেই মাইকেল ফ্যারাডেকে আমরা প্রথমে দেখি এক দপ্তরীর দোকানে শিক্ষানবীশ বালক হিসেবে। কিন্তু দপ্তরীর শিক্ষানবীশ হলে কি হবে এই বালকের মতিগতি ছিল একটু অন্য রকমের। পরবর্তীকালে নিজেই বলেছেন :

"শিক্ষানবীশ হিসেবে যেসব বই আমাকে বাধতে হতো আমি তার মধ্য থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলো পড়তে খুব ভালবাসতাম। বিশেষ করে মার্সেটের 'রসায়নে নিত্যতা' এবং 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার' (বিশ্বকোষ) বিদ্যুৎ বিষয়ক প্রবন্ধগুলো আমাকে চমৎকৃত করেছে। সপ্তায় দু'-এক পেন্স খরচ করেই করা সম্ভব এমনি ছোটখাট এক্সপেরিমেন্টও আমি করতাম। একটা বিদ্যুৎ মেশিনও আমি বানিয়েছিলাম— প্রথমে একটা কাঁচের শিশি দিয়ে, পরে একটা সত্যিকারের সিলিন্ডার দিয়ে। এমনিতরো আরো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সে সময় আমি বানিয়েছি।"

দপ্তরীর দোকানের কাজ ফ্যারাডের প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাঁর বয়স তখন বিশ বছর। মাত্র কিছুদিন আগে গ্যালভানী ব্যাঙ নাচিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ আবিষ্কার করেছেন আর ভোল্টা তাঁর স্তূপাকৃতি বিদ্যুৎ-কোষ থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সেই দপ্তরী বালকও বসে নেই। এ সময় তিনি তাঁর এক পুরানো বন্ধুকে লিখলেন :

"সম্প্রতি আমি বিদ্যুৎ-প্রবাহ সংক্রান্ত কয়েকটি পরীক্ষা করেছি শুধু এই বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলোর সাথে পরিচিত হবার জন্য। কিছু নিকেল আনার জন্য আমি নাইটের দোকানে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হলো এখানে কিছু নমনীয় দস্তাও পেতে পারি। খোঁজ নিয়ে আমি কিছু কিনলাম– তুমি কি এ জিনিস এখনো দেখেছো? প্রথম যেগুলো পেলাম সেটা সত্যি অত্যন্ত পাতলা টুকরা– চিন্তা করে দেখ, একেবারে চেপ্টা হালতের। তারা বলল এটা বৈদ্যুতিক দণ্ডের উপযুক্ত পরিমাণই পাতলা, যাকে আমি আগে দ্যলুক-এর বৈদ্যুতিক স্তম্ভ বলে উল্লেখ করেছি। আমি এগুলো আনলাম কয়েকটি পাত বানাবার জন্য; তামার পাতের সাথে মিলিয়ে ছোট্ট একটা ব্যাটারী বানাবার জন্য। প্রথমে যেটা বানালাম তাতে ছিল বিপুল সংখ্যক পাত- সাত সাত জোড়া!!! আর এর আকার তাও বিশাল– প্রত্যেকটি আধা পেন্স আকারের।

"তারপর বুঝলে সাহেব, আমি, এই আমিই নিজ হাতে আধাপেনি আকারের সাতটা পাত কেটেছি, সাতটা আধ পেনি পয়সা নিয়ে এইসব পাতকে ঢেকেছি, আর সাত, মানে ছয় টুকরা কাগজ মিউরেট অব সোডাতে ভিজিয়ে তা এদের মাঝে মাঝে দিয়েছি! না, বন্ধু আর হেসো না, একবার ভেবে দেখো এই সামান্য শক্তি উৎসের ক্রিয়াটি কি হয়েছে। এই শক্তিটুকু দিয়ে ম্যাগনেশিয়ার সালফেটকে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে– যা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আমার ধারণাই ছিল না যে এটা এমনিতরো কাজের যোগ্যতা রাখে। এখানে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, তোমাকে সেটা বলবো। আমার স্তূপটির সবার উপরের এবং সবার নিচের পাত দুটো আমি তামার তারের সাহায্যে দ্রবণের সাথে যোগ করে দিলাম। তুমি কি বুঝতে পারছ যে তামাই গিয়ে দ্রবণের ভেতরের সালফেটকে বিশ্লিষ্ট করে দিচ্ছিল? আমি নিশ্চিন্ত যে বিদ্যুৎ প্রবাহের একটা ব্যাপার এর মধ্যে ঘটছিল– কারণ দুটা তারই অল্পক্ষণের মধ্যে গ্যাসের

ছোট ছোট বুদবুদ দিয়ে ঢেকে যাচ্ছিল, আর কণিকার মতো দেখতে খুব ক্ষুদ্র বুদবুদগুলো নেগেটিভ তার থেকে দ্রবণের ভেতর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল। সালফেট যে বিশ্লিষ্ট হচ্ছিল তার প্রমাণ হলো এভাবে প্রায় দু'ঘণ্টা পরই স্বচ্ছ দ্রবণ ঘোলা হয়ে যাচ্ছিল যাতে ম্যাগনেশিয়া কণা ভাসছিল।"

বিশ বছর বয়স্ক দপ্তরী ফ্যারাডের এই সৌখীন আবিষ্কার কিন্তু বিদ্যুতের সাহায্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এই তড়িৎ বিশ্লেষণের মূল নিয়মগুলো পরবর্তী সময়ে ফ্যারাডে নিজেই দিয়ে গেছেন যাদেরকে ফ্যারাডের প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়ম বলা হয়। দপ্তরী জীবনের পরে বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রি ডেভীর সহকারী হিসেবে ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক জীবন শুরু হয়। অসংখ্য চমকপ্রদ আবিষ্কার তাঁর এই জীবনে তিনি সম্পন্ন করেছেন। দৈনন্দিন বৈজ্ঞানিক কাজের বহু ঘটনাই তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখে গিয়েছেন। এই ডায়েরীর একটি পাতা থেকে কোন একটি দিনের বিবরণ দেখা যাক!

"২১শে আগষ্ট, ১৮৩১

১। চুম্বকত্ব থেকে বিদ্যুৎ তৈরী নিয়ে পরীক্ষা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

২। লোহার একটা রিং তৈরি করলাম (কাঁচা লোহা), লোহাটা গোলাকার ৭/৮ ইঞ্চি মোটা আর রিং এর বহিস্থঃ ব্যাস ৬ ইঞ্চি। এর অর্ধেকের উপর অনেক প্যাঁচ তামার তার জড়িয়ে নিলাম। প্যাঁচগুলো সুতা ও কালিকো কাপড়ের দ্বারা পৃথক করা ছিল। প্রত্যেকটা ২৪ ফুট লম্বা তিন প্রস্থ তার ছিল, তাদের এক সাথে একই দৈর্ঘ্যের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা যেত অথবা আলাদা আলাদা দৈর্ঘ্য হিসেবে। একটা বাটি দিয়ে এরা পরস্পর থেকে অন্তরিত ছিল। রিং-এর এই দিকটাকে আমি বলব A। কিছুটা ব্যবধানে অন্য দিকে দুই প্রস্থে মোট ৬০ ফুট লম্বা তার জড়ালাম। জড়ানোর প্যাঁচ আগের মতই রইল; এই দিকটিকে বলব B।

৩। চার বর্গ ইঞ্চি আয়তনের ১০ জোড়া পাত সম্পন্ন একটি ব্যাটারীকে চার্জ করলাম। B দিকের কুণ্ডলীকে এক কুণ্ডলী করে নিয়ে এর দুই প্রান্তের তারকে একটু দূরে একটা চুম্বক শলাকার উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে সংযুক্ত করলাম। (লোহার রিং থেকে ৩ ফুট দূরে) এর পর A দিকের এক প্রস্থ তারকে ব্যাটারীর সাথে যোগ করলাম, সাথে সাথেই শলাকায় একটা সংবেদী ক্রিয়া হলো। এটা কেঁপে ওঠল এবং শেষে আগের জায়গায় স্থির হলো। A দিকের তারের ব্যাটারীর সাথে সংযোগ কেটে দিলে আবার শলাকা নড়ে-চড়ে ওঠল।"

ডায়েরীর এই জায়গায় ফ্যারাডে এমন কিছু পরীক্ষার কথা বলেছেন যা তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার বৈদ্যুতিক আবেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই আবিষ্কার ছাড়া আজকের দিনের বৈদ্যুতিক কারিগরী সম্ভব হতো না। অথচ কি সাধারণভাবে, কি স্বাভাবিক ভঙ্গীতে মানুষের জ্ঞান রাজ্যে এইসব সংযোজন ঘটিয়ে চলেছিলেন নিজের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা বিস্ময়কর এই প্রতিভা। বিদ্যুৎ যুগের জন্ম এভাবেই হচ্ছিল ধীরে ধীরে। বই বাঁধতে গিয়ে যেই বালকের মতিগতি এদিক ওদিক ধাবিত হতো সেই বালকটির কৌতূহলের কাছে আমরা কতই না ঋণী।

ইথনোবোটানী গবেষণার নতুন দিগন্ত

[আগষ্ট-'৭৭]

আজিম উদ্দিন মল্লিক

নামটা অনেকের কাছে নতুন ঠেকতে পারে। তবে বিষয়টি যে সহজেই সবার বোধগম্য হবে এতে সন্দেহ নেই। অতএব বিষয়টির পরিচিত প্রকাশের এবং গুরুত্ব উপলব্ধির সময় এসেছে। ইথ্নোবোটানী উদ্ভিদ বিজ্ঞানেরই একটি শাখা। এতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের অগতানুগতিক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়। খোলাসা করে বলা যাক। পাহাড়ী অরণ্যে নানা স্রোতের উপজাতীয় লোকের বাস। তারা আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। সুগভীর অরণ্যে তাদের বাস। অরণ্যের গাছপালা, জীব-জন্তু তাদের আহার-বাসস্থান, পোশাক-আচ্ছাদনের উপকরণ। অরণ্যের এই অধিবাসীগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে বিভিন্নভাবে নানা প্রকার উদ্ভিদকে ব্যবহার করে থাকে। এই জঙ্গলা উদ্ভিদকূলই তাদের খাদ্য, চিকিৎসা, পরিধান, বাসস্থান প্রভৃতির একমাত্র উপকরণ। কোন মিল ফ্যাক্টরী তাদের জন্য টেট্রন, ক্যারলিনের কাপড় তৈরি করে না। জ্যামজেলীর জন্য নেই কোন রাসায়নিক কারখানা। রোগ নিরাময়ে তারা ব্যবহার করে না কোন এ্যান্টিবায়োটিক, ইঞ্জেকশান অথবা কোন অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-বিষুধ। এসব ব্যাপারে তারা পুরুষানুক্রমে বন্য গাছপালাকেই ব্যবহার করে আসছে। বন্য উপজাতীয় লোক কর্তৃক ব্যবহৃত এই সকল উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার প্রণালী সম্পর্কে যে বিষয় আলোচনা ও অনুসন্ধান করে থাকে তাকেই বলা হয় ইথানোবোটানী (Ethnobotany)। এ সকল অরণ্যবাসীদের স্বাস্থ্য ও দেহের গঠন কিন্তু আমাদের সভ্য সমাজের সদস্যের তুলনায় ভাল বই মন্দ নয়। তাদের অসুখ-বিসুখ কম। তারা অত্যধিক পরিশ্রমী। তাদের মনও যেমন সহজ সরল, জীবন যাত্রা প্রণালীও তেমনি বড্ড সাধারণ। পুরুষানুক্রমে জীবন প্রণালীতে যে গতানুগতিকতা চলে আসছে, তাতে এতটুকু হেরফের নেই। এতটুকু বৈচিত্র্য নেই।

বন্য উপজাতীয়গণ পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে এক বিশেষ প্রণালীতে ধান চাষ করে। একে বলে ঝুম চাষ। এতে তারা পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গর্ত করে তার মধ্যে ধান, মরিচ, কাউন, তুলা প্রভৃতির বীজ এক সাথে মিশিয়ে রোপণ করে। সাধারণতঃ মৌসুমী বৃষ্টির আগে এই চাষ শুরু করা হয়। বৃষ্টির পানিতে ওগুলো এক সাথে গজায়, বড় হয়। পরে ধানের দিনে ধান পাকে। মরিচের মৌসুমে মরিচ। কাউনের সময় কাউন। তুলার দিনে তুলা। এক একটা ফসল যখন পাকে, ঝুমিয়ারা তা সংগ্রহ করে ঘরে তোলে, সুতরাং যদিও তারা চাষাবাদ করছে তথাপি সে আবাদ প্রণালী আমাদের থেকে ভিন্নতর। এই ঝুমের ধানেই তাদের সারা বছরের খোরাক। ঝুম ধানের ভাত দিয়ে তারা বানায় চমৎকার পানীয়।

কৃষির উপকরণ থেকে শুরু করে পরনের কাপড় পর্যন্ত এমনকি প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজনে উদ্ভিদের ব্যবহার অনস্বীকার্য। রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিদ নির্ভর। এক প্রকার রোগের জন্য এক এক প্রকার ঔষধী উদ্ভিদের ব্যবহার তাদের জানা আছে। কোনটার পাতার রস, কোনটার শিকড়ের রস, কোনটার ফুল, আবার কোনটার ফল ঔষধ হিসেবে তারা কোন রোগ নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করে তা তাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে জানা। এরা খুব প্রাচীন প্রক্রিয়ায় এই সকল রোগের চিকিৎসা করে থাকে। অনেক সময় কোন কোন উদ্ভিদকে দেবতা হিসেবে গণ্য করে তার কাছে পুজো অর্পণ করে ও রোগ নিরাময় কামনা করে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শারীরিক সুস্থতার সাথে সাথে মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্যও অরণ্যাধিবাসীগণ উদ্ভিদের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। গভীর অরণ্যাঞ্চলে এমন অনেক উপকারী ঔষধী উদ্ভিদ আছে যা অনেক জটিল রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা রাখে। এর ব্যবহার হয়তো সেই অরণ্য অধিবাসীদেরই জানা আছে। সভ্য জগতের মানুষেরা তার কোন খোঁজই জানে না। তাই প্রয়োজন ঐ সকল অঞ্চলের উদ্ভিদ সংগ্রহের। অরণ্যাঞ্চলের উদ্ভিদের ঔষুধী উপকরণ যেমন উপক্ষার (Alkaloid) ষ্টেরোয়েড (Steroid) প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখার আগে ভাল করে জানতে হবে অরণ্যের প্রাচীন অধিবাসীগণ কোন রোগের চিকিৎসার জন্য কোন উদ্ভিদের বিশেষ অংশ কিভাবে ব্যবহার করে থাকে। এ কাজ যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য হলেও অনেক জটিল রোগের চিকিৎসায় বিস্ময়কর অবদান রাখতে সক্ষম হয়। অত্যন্ত ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও পরিশ্রমসাধ্য এ ধরনের গবেষণার কাজ। এজন্য অরণাঞ্চলের দুর্গম এলাকায় চলতে হবে। অরণ্য অধিবাসীদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করতে হবে, তাদের ভাষা বুঝতে হবে, বলতে হবে এবং তাদের খাবার অভ্যাস করতে হবে। সর্বোপরি অরণ্য অধিবাসীদেরই একজন বনে যেতে হবে। তবেই সব ব্যাপারে অরণ্যবাসীগণ সাহায্য-সহযোগিতা করবে। ওদের সহযোগিতা ছাড়া বনে-জঙ্গলে কাজ করা একেবারে অসম্ভব। স্মিথ, বিলন ও ফ্রান্স নামে আমেরিকার এই তিনজন ঔষধবিজ্ঞানী প্রতি বছর গড়ে প্রায় চার হাজার রকমের গাছ সংগ্রহ করেছেন। দেখা গেছে এর এক তৃতীয়াংশ গাছেই নানা প্রকার ঔষধীয় গুণাবলী বিদ্যমান। এই সংগ্রহ অভিযানের নেশায় তাঁরা গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে, বন্ধুর থেকে বন্ধুরতর পর্বতে ছুটে বেড়াচ্ছেন। চার্লস্ ইভান নামক এক মার্কিন বৈজ্ঞানিকের কথা জানি, শুধু ঔষধী গাছ সংগ্রহের জন্য তিনি সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর আফ্রিকার বিশাল অরণ্যে দিনাতিপাত করেছেন। ঘর বেঁধেছেন অরণ্য উপজাতিদের সাথে। লক্ষ্য করেছেন ঐ উপজাতীয় জংলী মানুষগুলো কি অসুখের জন্য কোন গাছের কোন অংশ কি কি ভাবে ব্যবহার করে। একটানা চৌদ্দ বছর আফ্রিকার জঙ্গল থেকে জ্ঞানাহরণের পর বিশ্ববাসীর জন্য তিনি উপহার দিয়েছেন কতগুলো জটিল রোগের মহৌষধ।

আমাদের দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় আঠারো ভাগ ভূমি অরণ্যে আবৃত। সুন্দরবন বাদে আর সকল অরণ্যেই অনেক উপজাতীয় লোকের বসতি আছে। এরা প্রাচীন অধিবাসী। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসরমান আধুনিক সভ্যতার সাথে তাদের কোন যোগাযোগ নাই। তারা জঙ্গলেরই কোন কুঁড়েঘরে জন্ম লাভ করে। জঙ্গলেই বড় হয়। পাহাড়ে-জঙ্গলে কাজ করে। শিকার করে। তাদের ক্ষুধার অন্ন ও পরনের কাজে, অসুখের ঔষধ সকলই অরণ্যের ফসল।

গভীর অরণ্যের অনেক উদ্ভিদ আমাদের অজানা। অনেক জটিল রোগের মহৌষধ হিসেবে সেগুলোর ব্যবহারও আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এমন অনেক জঙ্গলা ফল-মূল আছে সেগুলোতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ বিদ্যমান, অথচ তারা জঙ্গলে অবহেলায় জন্মাচ্ছে, বাড়ছে, আমাদের অজান্তে। এগুলো যে কত উপকারে আসতে পারে তা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগেকার ক'জন চীনা বিজ্ঞানীর একটি আবিষ্কারের কথা উল্লেখযোগ্য। ওসাকা ও কিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল মেডিসিন রিচার্স ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ চীনদেশের কিছু গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ থেকে ক্যান্সার ব্যাধির মহৌষধ আবিষ্কার করেছেন বলে দাবী করেন। টোকিও থেকে ২৪ শে অক্টোবর, ১৯৭৬ তারিখে এ, এফ, পির খবরে উল্লেখ করা হয় যে, ত্রিশ প্রকারের গুল্ম থেকে এই ঔষুধ তৈরি করা হয়েছে এবং তার একটিতে খুবই সামান্য পরিমাণ ক্ষতিকর উপাদান আছে। সাধারণতঃ বর্তমানে ক্যান্সারের যে সকল ঔষুধ আছে তাতে এ ক্ষতিকর দ্রব্যের পরিমাণ অধিক। নতুন আবিষ্কার এই ঔষুধ স্তন, তলপেট, মলদ্বার এবং ইউটেরিন ক্যান্সারে বিশেষ উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে চীনের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি বইয়ের তালিকা অবলম্বনে এই ধরনের আরও একটি ঔষুধ তৈরি করা হয় যা স্তন এবং ফুসফুসের ক্যানসারের জন্য সর্বোত্তম। প্রথমে এই আবিষ্কারের নিরীক্ষা চালানো হয় প্রাণীদের উপর দীর্ঘ তিন বছর ধরে। অতঃপর ১৯৭৪ সাল থেকে ওসাকা এবং কিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন হাসপাতালে ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের উপর এই পরীক্ষা চালানো হয়। এতে দশ ব্যক্তির মধ্যে নয় জনই বেশ ভাল ফল লাভ করে। এদের মধ্যকার একজন রেক্টাল ক্যান্সার থেকে আরোগ্যলাভ করে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সুস্থ জীবন ফিরে পায়। এই গুল্মের নির্য্যাস স্বাস্থ্যের জন্য একটুও ক্ষতি করে না বরং বলা হয় শরীরে শক্তি আনয়ন করে। এটি বড়ি বানিয়ে গিলে খাওয়া যায়। ঐ সকল গুল্মের নির্য্যাসের কোন বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যটি ক্যান্সার উপশমে কাজ করে তা সঠিক করে এখনও আলাদা করা সম্ভব হয়নি বিধায় ঔষুধটি বাজারে ছাড়তে আরও কিছুদিন বিলম্ব হবে বলে সংবাদে প্রকাশ করা হয়েছে।

তাই বলছিলাম কোন উদ্ভিদের মধ্যে কি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানটি বিদ্যমান তা আমরা এখনও জানি না। উন্নত দেশগুলোতে কি জঙ্গলা, কি পরিচিত সকল উদ্ভিদের মধ্যকার রাসায়নিক উপাদানের বাছাই (Phytochemical screening) কাজ অনেক আগেই শুরু হয়েছে। সময় এসেছে আমাদের দেশেও এ ধরনের কাজ আরম্ভ করার। আমাদেরও অনেক মূল্যবান উদ্ভিদ অরণ্য জনপদে অবহেলিত অপরিচিত রয়ে গেছে। প্রয়োজন এখন এগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া। এর ব্যবহার সম্পর্কে উপজাতীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

এই বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমাদের সরকার এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো এদিকে নজর দিলে অনেক লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করে আমরা অনেক লাভবান হতে পারি। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উপজাতীয়দের ইথনোবোটানির উপর একটি ছোট্ট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। অরণ্যবেষ্টিত পার্বত্য এলাকা ভ্রমণ, উপজাতিদের ভাষা প্রভৃতি সমস্যা হল এই কাজের বড় ঝুঁকি। পরিশেষে বলবো বিষয়টি নতুন হলেও যথেষ্ট গুরুত্বের দাবী রাখে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণার জন্য আর্থিক আনুকুল্য প্রদানের সংস্থাগুলো এ বিষয়টির উপর একটু বুঝতে চেষ্টা করলে হয়তো একদিন সমাজের উপকার হতো।

রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রখ্যাত গণিতবিদ মার্ক কাক দীর্ঘদিন ধরে পদার্থবিদদের সাথে কাজ করে আসছেন। বছর কয়েক আগে তিনি যখন ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজীতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ রিচার্ড পি. ফাইনম্যান তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'আমাদের অনেকে মনে করেন গণিত না থাকলে পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি সপ্তাহখানেক পিছিয়ে যেত।'

সূক্ষ্ম ও শোভন এ বিদ্রূপটুকু কাক খেলোয়াড়সুলভ মনোভঙ্গীতেই গ্রহণ করলেন। তিনি জবাব দিলেন, 'তা ঠিক। তবে ঠিক সেই সপ্তাহই পিছিয়ে যেতো, যে সপ্তাহে ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন।'

সম্পাদকীয় [আগষ্ট -'৭৮]

শিক্ষার মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতি

বাংলাদেশ মানে গ্রাম বাংলা। বিজ্ঞানের বাণী ও ক্রিয়াকলাপ যদি গ্রামকে স্পর্শ না করে, তাকে আলোড়িত করার চেষ্টা না করে তাহলে এদেশের জন্য বিজ্ঞানের বেশী কিছু প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। অথচ সেটা সম্ভব কিভাবে? নিরক্ষরতা এখানে প্রাথমিক বাধা। দারিদ্র এখানে সকল প্রযুক্তিগত উদ্যোগের বিপক্ষে। কিন্তু এই উদ্যোগের অভাবই কি আবার দারিদ্র্য ও অভিজ্ঞতার কারণ নয়? এই দুষ্ট বৃত্ত ভাঙ্গতে হলে একটা শুরু কোথাও না কোথাও হতে হবে। শিক্ষা, প্রযুক্তি, দারিদ্র্যমোচন—এগুলো পরস্পর অসংযুক্ত বিষয় নয়। গ্রামীন অর্থনীতিতে একটা প্রগতি, একটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতেই হবে। প্রথমে অন্তবর্তী প্রযুক্তির আকারে বিনীতভাবে হলেও বিজ্ঞানের ছোঁয়া গ্রামীণ অর্থনীতিতে এবং চিন্তা ভাবনায় আসাটা তার একটি প্রাথমিক শর্ত। দেশের নেতৃস্থানীয় এবং বিজ্ঞানীরা যেমন এদিক থেকে উদ্যোগী হবেন, তেমনি গ্রামের ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতীরা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোড়িত হবেন এবং আলোড়ন সৃষ্টি করবেন।

যে অর্থনীতি পুরো দেশকে পোষণ করছে তার সাথে সম্পর্কিত হলেই শিক্ষার আদর হবে। নিজের গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে সহায়ক হলেই একটি কৃষক পরিবার তার নিরক্ষরতা মোচনে উৎসাহিত হবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরামর্শ গ্রহণ করতে এগিয়ে যাবে।

তার দীর্ঘদিনের প্রকাশনায় বিজ্ঞান সাময়িকী এসব পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। আজ যখন এই পত্রিকা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, গ্রামের তরুনদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে, তাদের অনেকেই যখন এটা সংগ্রহ করে পড়ছে তখন এদিকে এর দায়িত্ব বেড়ে গেছে অনেকখানি। গ্রাম বাংলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সংযুক্ত করতে, এ সম্পর্কিত আলোড়ন সৃষ্টি কাজে শরীক হতে বিজ্ঞান সাময়িকী আরো সচেষ্ট হবে। যে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের সূচনা ও প্রসারের সাথে এই পত্রিকা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাকেও এটা প্রধানত গ্রামভিত্তিক আন্দোলন হিসেবে দেখতে চায়। এ আন্দোলনের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করে এটি যেন দেশের জ্ঞানের দারিদ্র্য ও আর্থিক দারিদ্র্য মোচনে বিজ্ঞানোৎসাহী তরুণদের উদ্দীপনা ও সৃষ্টিশীলতাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে পারে সেটিই এর লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে বিজ্ঞান সাময়িকী যথাসাধ্য করে যাবে।

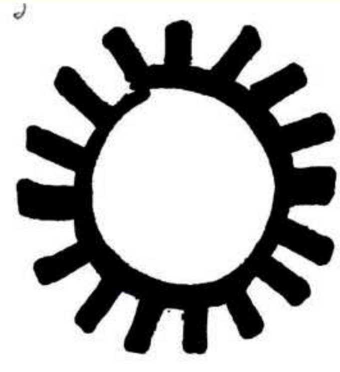

একটি ঐতিহাসিক সংলাপ

[সেপ্টেম্বর -'৭৮]

স্থান :	মহাশূন্য, চন্দ্রপৃষ্ঠ ও ভূ-পৃষ্ঠ
কাল :	রোববার, জুলাই ২০, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
পাত্র-পাত্রী :	ঈগল-মানুষের প্রথম চন্দ্র অবতরণকারী যান।
কথক :	অধিনায়ক নীল আর্মষ্ট্রং
	কলাম্বিয়া—চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী যান।
কথক :	মাইকেল কলিন্স
	হিউষ্টন—টেক্সাসে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র
	এপোলো কন্ট্রোল—ভূ-পৃষ্ঠে এপলোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
	ড. পেন—মার্কিন মহাশূন্য অভিযান সংস্থা নাসার পরিচালক
	অলড্রিন—ঈগলের অন্য আরোহী
	ঈগল (১২ : ৫৭ পি. এম) : আলাদা হলো।
হিউষ্টন :	রজার। দেখতে কেমন?
ঈগল :	ঈগলের ডানা রয়েছে।
হিউষ্টন :	রজার।
ঈগল :	দেখতে ভালই।
হিউষ্টন :	রজার, মাইক, অগ্নিসংযোগে সাত মিনিট রয়েছে। সাত মিনিট।
কলাম্বিয়া :	রজার।
হিউষ্টন :	পৃথকীকরণের মুহূর্তে দেখতে ভালই লাগছে। পৃথক হয়ে যাচ্ছ, কলাম্বিয়া। ওভার,
কলাম্বিয়া! ও,কে কে।	ঈগলের আর মাত্র মিনিটখানেক বাকী রয়েছে। সাবধান।
ঈগল :	পরে দেখা হবে।
কলাম্বিয়া :	ঈগল তোমার উড়বার মেশিনটা চমৎকার, যদিও উল্টে রয়েছে।
ঈগল :	কেউ একজন উল্টে রয়েছে।
ঈগল :	(২.১৪ পি, এম) : মাইক, আমরা ঠিকই যাচ্ছি।
এপোলো কন্ট্রোল :	আমরা শেষ ধাপের অপেক্ষায় রয়েছি। সবকিছুই চমৎকার। উচ্চতা ৫.২০০ ফুট।
ঈগল :	হিসাবমাফিক নিয়ন্ত্রণ ভালই।

এপোলো কন্ট্রোল : উচ্চতা ৪, ২০০ ফুট।

হিউষ্টন : অবতরণের সময় ঘনিয়ে আসছে। ওভার।

ঈগল : রজার অবতরণের ব্যবস্থা কর, ৩,০০০ ফুট। আমরা যাচ্ছি। দুই হাজার ফুট। Λ89 ΛGS ডিগ্রীতে।

হিউষ্টন : রজার।

হিউষ্টন : ঈগল, দেখতে দারুণ। তুমি যাচ্ছ।

এপোলো কন্ট্রোল : উচ্চতা ১, ৬০০....১,৪০০ ফুট, এখনো দেখতে খুবই ভাল।

ঈগল : ৩৫ ডিগ্রী। ৩৫ ডিগ্রী ধরে ৭৫০ ফুট নীচে নেমে ২৩-এ, ৭০০ ফুট নীচের দিকে ২১-এ,

৩৩

ডিগ্রী, ৬০০ ফুট নীচে ১৯; ৫৪০ ফুট নীচে ১৫; ৪০০ ফুট নীচে ৯-এ...

হিউষ্টন : ৬০ সেকেণ্ড।—নো

ঈগল : বাতি জ্বালাও।

হিউষ্টন : তিরিশ সেকেণ্ড।

ঈগল : বাতি মিলানো। ও কে, ইঞ্জিন বন্ধ।

হিউষ্টন : আমরা দেখেছি। তুমি নেমেছ ঈগল।

ঈগল : হিউষ্টন। ট্রানকুইলিটি বেস এখানে। ঈগল অবতরণ করেছে।

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে

হিউষ্টন : রজার, ট্রানকুইলিটি, আমরা পৃথিবী থেকে তোমাদের দেখছি। আবার নি:শ্বাস নিতে পেরেছি আমরা। অশেষ ধন্যবাদ।

ট্রানকুইলিটি বেস : ধন্যবাদ।

হিউষ্টন : এখান থেকে তোমাদের ভালই দেখাচ্ছে।

ট্রানকুইলিটি : খুব নির্বিঘ্নে স্পর্শ করেছি।

হিউষ্টন : ঈগল, প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করেছে। ওভার।

ট্রানকুইলিটি বেস : রজার। প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করেছি।

হিউষ্টন : রজার এবং আমরা দেখছি, একটা নতুন পথ খুলে দিয়েছ তোমরা।

ট্রানকুইলিটি : রজার।

কলাম্বিয়া : আমাদের কেমন দেখছ?

হিউষ্টন : কলাম্বিয়া, ট্রানকুইলিটি বেসে সে অবতরণ করেছে। ঈগল এখন ট্রানকুইলিটি বেসে।

তোমাকে দেখছি। ওভার।

কলম্বিয়া : হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি।

হিউষ্টন : ভাল, আগাগোড়া ব্যাপারটাই চমৎকার।

কলাম্বিয়া : অদ্ভুত!

ট্রানকুইলিটি বেস : আমিও তাই বলব।

এপোলো কন্ট্রোল : মাননীয় সুধীবৃন্দ, এই মুহূর্তে আমি নাসার পরিচালক ড. টমাস ও পেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়েদিতে চাই। ড. পেন, প্রশ্নাবলীর আগে আমাদের ছোট্ট একটা বিবৃতি রয়েছে।

ড: পেন : চন্দ্র পৃষ্ঠ স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই আমি মিশন কন্ট্রোল থেকে সরাসরি হোয়াইট হাউসে যোগাযোগ করেছি এবং প্রেসিডেন্টকে নিম্নোক্ত রিপোর্টটি জানিয়েছি।

মি: প্রেসিডেন্ট, নাসার তরফ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি যে, ঈগল চন্দ্র পৃষ্ঠে ট্রানকুইলিটি বেসে অবতরণ করেছে। নভোচারীরা নিরাপদ এবং পরবর্তী পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের এই এ্যাপলো-১১ মিশনকে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তবে বড় কথা হোল যে, আমরা একটা বিরাট পদক্ষেপ অতিক্রম করেছি সাফল্যের সঙ্গে।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন নাসা এবং এর সঙ্গে যুক্ত সকল ইণ্ডাষ্ট্রিজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিদের তাঁর ব্যক্তিগত অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এপলো কন্ট্রোল : নীল আর্মষ্ট্রং-এর সামগ্রিক লাইফ সার্পোট সিস্টেমের নিরাপত্তার জন্য কন্ট্রোল সেনটারে একটা ঘড়ি বসানো হয়েছে। কার্যক্রম শুরু থেকে EVA গুনতে শুরু করবে।

ট্রানুকুইলিটি বেস : কেবিনের চাপ শূন্যের দিকে করে আসছে। LM স্যুট সার্কিট ৩৬ থেকে ৪৩-এ এসেছে। FITGA চাপ ৪-৫, ৪.৭৫ থেকে ক্রমে কমে আসছে। চাপ শূন্যে এলেই কেবিনের হুড়কা খুলব। মুখোশ রেখে যাব নাকি সঙ্গে কমে নামব? মুখোশ নীচেও রাখতে পারি। দরকারে কাজে লাগবে।

এপলো কন্ট্রোল : নীল আর্মষ্ট্রং-এর বহনযোগ্য লাইফ সার্পোট সিস্টেমটা চালু হয়েছে।

হিউষ্টন : নীল, হিউস্টন থেকে বলছি। কেবিনের হুড়কা খুলতে কতক্ষণ?

ঈগল : সব কিছু ঠিক ঠিক চলছে। চাপ যথেষ্ট কমে এলেই হুড়কা খুলবো।

অলড্রিন : খোলার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করছি।

হিউষ্টন : নীল, হিউষ্টন থেকে বলছি। ওভার।

ঈগল : আমরা চেষ্টা করেছি।

হিউষ্টন : রজার।

ঈগল : হুড়কা প্রায় খুলে ফেলেছি।

অল্‌ড্রিন : যেদিক থেকে বন্ধ করা হয়, সেদিক থেকে টেনে ধর।

আর্মস্টিং : ও, কে, হিউষ্টন, বারান্দায় এসে গেছি আমি।

হিউষ্টন : রজার, নীল।

অলড্রিন : নীল, তুমি যেখানটায় রয়েছ একটু দাঁড়াও।

আর্মষ্ট্রং : ও, কে,।

এপোলো কন্টোল : ১০৯ ঘন্টা ১৯ মিনিট ১৬ সেকেন্ড সময় নীল আর্মষ্ট্রং বারান্দায়!

হিউষ্টন : রজার। টিভিতে সুন্দর ছবি আসছে।

অলড্রিন : খুব ভাল ছবি যাচ্ছে, হাহা: ?

হিউষ্টন : কনট্রাস্টের প্রভাবটা বেশী বটে,
এবং মনিটরেও উল্টো ছবি আসছে। তবে আমরা মোটামুটি ঠিকঠাক করে নিচ্ছি।

ঈগল : ও, কে, অবস্থানটা পরীক্ষা করে নিও।

হিউষ্টন : কি? ও, কে, নীল। আমরা দেখতে পাচ্ছি,
তুমি সিড়ি বেয়ে নেমে আসছ।

আর্মষ্ট্রং : ও, কে,। সিড়ি বেয়ে উঠবার ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখলাম। কোন অসুবিধে নেই। স্বচ্ছন্দে ওঠা যাবে।

হিউষ্টন : রজার আমরা দেখছি।

আর্মষ্ট্রং : ভারী চমৎকার এই ছোট্র লাফটা।

হিউষ্টন : হিউষ্টন থেকে বলছি। ক্যামেরায় ঝাপসা ছবি
এসেছে F২৬০ সেকেন্ড।

আর্মষ্ট্রং সিড়ির গোড়ায় এখন আমি।

সিড়ির গোড়াটা দু'এক ইঞ্চি দেবে বসেছে মাটিতে। চন্দ্রপৃষ্ঠটা দেখতে মনে হচ্ছে খুব মসৃণ ধূলার পাউডারে ঢাকা। খুব চমৎকার দেখতে। আমি এবার চাঁদের বুকে নামব। মানুষের ছোট্ট একটা পদক্ষেপ : মানবজাতির জন্য বৃহত্তম লাফ। পৃষ্ঠদেশ মসৃণ এবং পাউডারে ঢাকা। পায়ের আঙ্গুল দিয়ে অনায়াসে তুলতে পারছি। কয়লার মসৃণ গুড়ার মত ধূলা আমার জুতার দু পাশ ঘিরে রয়েছে। ধূলায় আমার বুটের ছাপ পড়েছে।

অনুবাদ : নাদিরা মজুমদার

উনিশ শতকে বাংলাদেশ

১৮১০ সনে যশোর শহরে ছিল মাত্র দুটি গরুর গাড়ী। ১৮৪০ সন পর্যন্ত ঢাকা জেলার গ্রামাঞ্চলের লোকজন চাকাঅলা গাড়ী দেখেনি। উনিশ শতকের সত্তরের দশকেও ঢাকায় বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হত হাতী। ষাটের দশকে ঢাকা শহরে চালু করা হয়েছিল ঘোড়ার গাড়ী। ঐ একই সময়ে সিলেট শহরে ছিল মাত্র দুখানা ঘোড়ার গাড়ী। ঢাকা শহরে ১৮৬৯ সনে ঝামা বিছানো প্রধান রাস্তা ছিল চারটি এবং তার সম্মিলিত দৈর্ঘ ছিল মাত্র কয়েক মাইল। উনিশ শতকের শেষের দিকে জলপথ বা স্টিমার সার্ভিস চালু হয়েছিল। এটাই ছিল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা।

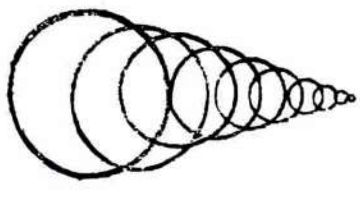

গণশিক্ষা [মার্চ-এপ্রিল ৭৯]

ম্যাচ বক্স সাক্ষরতা

বিজ্ঞান গণ-শিক্ষা কেন্দ্রের প্রস্তাব

দেশের সমস্ত জনগণকে অক্ষরের সাথে পরিচিত করে সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জন করতে হলে এর জন্য ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কেও চিন্তা–ভাবনা করা দরকার। বিজ্ঞান গণ-শিক্ষা কেন্দ্র এই নিয়ে খানিকটা কাজ করেছে। সাক্ষরতার এই উপকরণের খোঁজ করতে গিয়ে বেশীরভাগ নির্ভর করেছেন স্বাভাবিকভাবে শ্লেট-পেন্সিল, এবং বড় অক্ষরের বইয়ের উপর। কিন্তু তার চেয়ে ভাল ও ব্যাপকতর ফল পেয়েছে রংপুরের সাদুল্লাপুরে নলডাঙ্গা ইউনিয়ন-সরকারের শিক্ষা প্রকল্প-যেখানে মাটির উপব কাঠি দিয়ে লিখে অক্ষরের কার্ড বানিয়ে সেগুলো দিয়ে খেলতে দিয়ে অথবা বড় বড় এরকম কার্ড লটকিয়ে কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে। তাতেও অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞান গণ-শিক্ষা কেন্দ্র সম্প্রতি চট্রগ্রামের জোবরা ভূমিহীন সমিতির পরীক্ষামূলক স্কুলে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্লাষ্টিকের ত্রিমাত্রিক অক্ষরের কার্যকারিতা পরীক্ষা করেছে– প্রধানত শিশুদের উপর। এতে অভাবনীয় ফল পাওয়া গেছে। রং-বেরং এর এসব অক্ষরকে শিশুরা একটা খেলা হিসেবেই নিয়েছে। প্রথম কয়েক দিনেই তারা এদের বেশ ক'টা অক্ষর চিনে নিয়ে এগুলো নানাভাবে সাজিয়ে দেখেছে। এভাবে অর্থপূর্ণ বা অর্থহীন যে নানারকম শব্দ বানানো যায় এতে তাদের ভীষণ মজা। এটা প্রায় স্পষ্ট যে অন্তত শিশুদের জন্য এ ধরনের অক্ষর নিয়ে খেলার এবং নানা সমন্বয় সৃষ্টির সুযোগ থাকলে অক্ষর পরিচিতি অনেক সহজ হবে। প্লাষ্টিকের অক্ষর এখন বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হলো স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ মিলিয়ে এর দাম পড়ে তিরিশ টাকার মতো। তাও এর মধ্যে শুধু অক্ষরগুলোই আছে, স্বরচিহ্ন তৈরীই হচ্ছে না। স্বরচিহ্ন ছাড়া বেশী শব্দ সৃষ্টি করা যায় না। তাছাড়া উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য একসাথে অন্তত কয়েক সেট অক্ষর প্রয়োজন বলে এটা ব্যয়সাধ্য। আরো সস্তা এবং ব্যাপকভাবে এ ধরণের অক্ষর উৎপাদন সম্ভব হলে উপকরণের দিক থেকে একটি সত্যিকার উন্নতি হতো বলে আমাদের ধারণা।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞান গণ-শিক্ষা কেন্দ্র সাক্ষরতার উপকরণ হিসেবে একটা নতুন জিনিস প্রস্তাব করছে যাতে উপরোক্ত ত্রিমাত্রিক উপকরণের সব গুণ আছে, তদুপরি এর ব্যবহার এত সস্তা হবে এবং দেশ ব্যাপী তত সহজে একে ছড়িয়ে দেয়া যাবে যে তা অকল্পনীয়। এটা হলো ম্যাচ বক্সকে সাক্ষরতার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা। ম্যাচ বক্সের উল্টো দিকটা খালি থাকে, বড়জোর একটা বিজ্ঞাপন থাকে। সেখানে তার বদলে রঙীন একটা বড় হরফ ছাপানো যেতে পারে–হয়তোবা বিজ্ঞাপন দাতারই সৌজন্যে, যাঁর নাম ছোট্ট অক্ষরে কোণায় চলে যেতে পারে। দেশের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ব্যাপারে, ব্যাপক সাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণ করতে পারাটাও তো কম গৌরবের কথা নয়।

আসলে ম্যাচের উপর ঠিক একটা হরফ থাকবে না – থাকবে এক একটা হরফের সাথে স্বরচিহ্ন যুক্ত সবরকম রূপ। যেমন কোনটার উপর 'ক', কোনটার উপর 'কা', আবার কোনটার 'কি' ইত্যাদি।

খালি ম্যাচের ভেতরের অংশকে যোজক হিসেবে ব্যবহার করে এরকম দুটা হরফ পরস্পর গেঁথে ফেলা যায়– খুব সহজে সুন্দরভাবে। এভাবে কয়েকটা পর পর গেঁথে যে কোন যুক্তাক্ষর বর্জিত শব্দ তৈরী করা যাবে।

ম্যাচ এমন একটা জিনিস যা দরিদ্রতম লোকটিরও দরকার নিয়মিতভাবে। এই একটা শিল্পজাত দ্রব্য যা দেশের আনাচে কানাচে প্রত্যেকটি বাড়ীতে পৌঁছে যাচ্ছে দিনের পর দিন। উপরোক্ত পদ্ধতি চালু হলে বিনি পয়সায় সবাই পেয়ে যাচ্ছেন একটা সুন্দর শিক্ষা উপকরণ–যার সরবরাহ প্রায় অফুরন্ত। বাচ্চারা এগুলো দিয়ে খেলবে, এগুলো সংগ্রহ করবে। বড়রাও অনেকে করবে। দোকানে যেসব বড় প্যাকেটে ম্যাচ আসবে তার প্রতিটিতে নানা রকম অক্ষরযুক্ত ম্যাচ মেশানো থাকবে। ফলে বাড়ীতে যেসব ম্যাচ বাক্স জমবে শিগ্‌গির তাতে সব অক্ষরই থাকবে। এমনো হয়তো হবে যে লোকে প্রয়োজন মতো বিশেষ অক্ষর চেয়ে নেবেন দোকান থেকে। বিভিন্ন স্কুল, সাক্ষরতা-গোষ্ঠি একটু চেষ্টা করলেই তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত ম্যাচ বক্স হরফ যোগাড় করে নিতে পারবে বিনা খরচে। এক সময় হয়তো দেখা যাবে মানুষ ম্যাচ বক্স হরফ গেঁথেই বাড়ীর নম্বর, নেম প্লেট, অন্যান্য নানা জিনিস লাগিয়ে রাখছেন।

এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করতে কতখানি আয়োজন প্রয়োজন? বলতে গেলে খুব বেশী নয়। স্বরচিহ্নযুক্ত সবগুলো হরফ আলাদা করে দিতে মোট সাড়ে চারশ' মতো বিভিন্ন রকম লেবেল প্রয়োজন । কিন্তু এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। একটা অফসেট প্লেটের সাইজ হলো ৩$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{২}$" । ফলে এক সাথে অনেক ক'টি ম্যাচের লেবেলের প্রতিকৃতি একটি প্লেটেই থাকে। সাধারণত লেবেলের একই ডিজাইন প্লেটে বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়। তা না করে বিভিন্ন নেগেটিভ সংযোজিত করলে একই প্লেটে বেশ কিছু বিভিন্ন হরফ ছাপানো সম্ভব এক সাথে। এ রকম কয়েকটা প্লেট হলেই সাড়ে চার'শ সব হরফের কাজ সারা। সেদিক থেকে বাড়তি খরচ বড় একটা নেই। আজকাল কোন কোন ম্যাচ কাঠের পরিবর্তে বোর্ডের বাক্স ব্যবহার করছে– এতে তো সবচেয়ে সুবিধা. বিজ্ঞাপনের জায়গায় হরফ দিলেই হলো। বাক্স কাঠের হলে পেছনে একটা অতিরিক্ত লেবেল ছাপাতে হবে– সেটা বিজ্ঞাপনদাতার সৌজন্যে হতে পারে। সেটা না করতে চাইলে ম্যাচের আসল লেবেলটাই অক্ষরে পরিণত করতে হয়– প্রজাপতি, ঘোড়া বা অন্য মার্কা ছোট করে কোণায় দিলেই হলো। বাড়তি খরচ আর হবে না।

বিজ্ঞান গণ শিক্ষা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে উপরোক্ত প্রস্তাবটি প্রণয়ন করেছেন জনাব মাহবুব চৌধুরী ও ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম। যে-কোন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান এটি বাস্তবায়িত করতে চাইলে প্রয়োজনে কেন্দ্র সব রকমের সহযোগিতা দেবে।

বিদেশে ম্যাচ বাক্সের লেবেলে নানা শিল্পকর্ম হয়, মানুষ সেগুলো সংগ্রহ করে। আমাদের দেশের বিশেষ প্রয়োজনে, সবচেয়ে বড়ো একটা প্রয়োজনে এটি যদি বিশেষ রূপ ধারণ করে সেটি আমাদের গৌরব হবে, আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টার সুন্দর নমুনা হবে।

সম্পাদকীয় [মে -'৭৯]

আইনষ্টাইন জন্ম-শতবার্ষিকী

গত ১৪ই মার্চ ছিল আলবার্ট আইনষ্টাইনের এক শততম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে বিজ্ঞান সাময়িকীর বর্তমান সংখ্যা আইনষ্টাইন জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যারূপে প্রকাশিত হলো। নানা কারণে বিশ্বের জনমানসে আইনষ্টাইন নামটি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই শতাব্দীর শুরুতে পদার্থবিজ্ঞানে তথা মানুষের বিশ্ব–ছবিতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে আইনষ্টাইন তার মুখ্য স্থপতি। সেই নামটি, অবাধ্য চুল নিয়ে সেই চেহারাটি, প্রতিভাদীপ্ত সাদামাটা জীবনের সেই অসংখ্য গল্প যেন আমাদের বিজ্ঞান চেতনার সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে। আধুনিক ইতিহাসের বড় বড় ঘাত-প্রতিঘাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই বিজ্ঞানী স্থান-কাল আর মহাবিশ্বের সমস্যা নিয়ে ডুবে থেকেও মাটির মানুষের সুখ-শান্তির আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন দেখতে চেয়েছিলেন। তাই সারা জীবন মাথা সমুন্নত রেখে তার অধিকারের জন্য লড়েছেন; বিজ্ঞানীদের জন্য, সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের জন্য আদর্শ রেখে গেছেন সক্রিয় সমাজ চেতনার। বিজ্ঞানে এত বড়ো বড়ো কীর্তি রেখে গিয়েও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অতৃপ্তি ভরে খুঁজে গিয়েছেন বিশ্ব-নিয়মগুলোর মধ্যে সেই ঐক্যবদ্ধকারী সূত্রের যাকে তিনি মনে করতেন, থাকতেই হবে। তিনি ছিলেন মহতের সন্ধানী, তারই স্থপতি।

আইনষ্টাইন স্মরণে এই জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যায় কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং অন্যান্য মুখ্য আবিষ্কার সমূহের উপর সহজবোধ্য ভাষায় আলোকপাত করেছেন। তাছাড়া এই অবিস্মরণীয় জীবনের নানান দিক এবং আমাদের সমাজে এবং চিন্তায় তার অবদান নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এর পনেরো বছরের প্রকাশনা কালে বিজ্ঞান সাময়িকী বিভিন্ন সময় যেভাবে আইনষ্টাইনচর্চা করেছে তারও খানিকটা বাছাইকৃত পুনরাবৃত্তি এতে স্থান পেয়েছে।

আইনষ্টাইনের আলোচনায় অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে– আর একজনের কথা যিনি বিশ্ব-বিজ্ঞানে অনেক বড় হয়েও আমাদের কাছের মানুষটি ছিলেন। আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে আর এক এপ্রিলে বিজ্ঞান সাময়িকীর আর একটি বিশেষ সংখ্যা বের হয়েছিল সত্যেন বসুর প্রয়াণের কিছু দিন পর। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেদিন আমরা স্মরণ করছিলাম আমাদের এই মহান পথিকৃৎকে। আর একটি কারণে কথাটি মনে বাজছে তা হলো কলকাতা থেকে প্রকাশিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' একটি সাম্প্রতিক সংখ্যা উলটাতেই চোখে পড়লো পাঁচ বছর আগের একটি স্মৃতিবিধুর চিঠির পুনর্মুদ্রণ। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে বিজ্ঞান সাময়িকীর কাছে লেখা আচার্য বসুর সেই অন্তরঙ্গ উপদেশ ভরা চিঠিখানি। আইনষ্টাইন মহীরুহ ছিলেন। বৈজ্ঞানিকভাবে এই মহীরুহের কাছাকাছি এসে বোস-আইনষ্টাইন পরিসংখ্যানের সৃষ্টি করে ছিলেন সত্যেন বসু। গর্ব হয় যখন ভাবি আমাদের চিন্তাকে, আমাদের হাতকে আইনষ্টাইন ছোঁয়া করেছিলেন তিনি এই আমাদেরই একজন হিসেবে।

বিজ্ঞান সাময়িকী থেকে পুনরাবৃত্তি

[মে-'৭৯]

[বিশ্ব বিজ্ঞানে আইনষ্টাইন নামটি এত বড় জায়গা দখল করে আছে যে তার পনরো বছরের প্রকাশনা কালে মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীকে বহুবার তাঁর প্রসঙ্গে আসতে হয়েছে। ছাপানো হয়েছে তাঁর বিভিন্ন লেখার অনুবাদ অথবা তাঁর জীবনের ও কাজের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা। আজ তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীতে ওসব লেখার কিছু কিছু বাছাই করা অংশ গ্রথিত করে পুনরায় পাঠকদের উপহার দেয়া হলো। —সম্পাদক]

আইনষ্টাইনের লেখা

যে অনন্ত উর্ধতন আত্মা, আমাদের ভঙ্গুর এবং দুর্বল মনের কাছে নিজেকে অতি সামান্য বিকশিত করেন, তাঁর প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভয় মিশ্রিত প্রশংসাই আমার ধর্ম। একটা উচ্চতর বিচার শক্তি, যা অবোধ্য বিশ্বে প্রকাশিত, তার অস্তিত্বে গভীর আবেগপূর্ণ বিশ্বাসই সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে আমার ধারণা ...

সেপ্টেম্বর ১৯৬০
অনুবাদ : মুহাম্মদ ইব্রাহীম

কালিফোর্ণিয়া ইনস্টিউট অব টেকনলজির ছাত্রদের উদ্দেশ্যে

চমকপ্রদ এই ফলিত বিজ্ঞান, আমাদের নানা কাজ করে দিয়ে জীবন যাত্রাকে সহজতর করে তোলে। তবে কেন তা আমাদের সুখী করে তুলতে পারে না? এর উত্তরটা অত্যন্ত সরল—যেহেতু আমরা এখনো তার বিবেকসম্মত ব্যবহারটা শিখে উঠতে পারিনি। আমরা যুদ্ধের সময় একে অপরকে যাতে পঙ্গু বা ধ্বংস করে দিতে পারি এটা সেই ব্যবস্থাই করে। আর শান্তির সময় এটা আমাদের জীবনকে অভিযাত্রায় দ্রুত ও অনিশ্চিত করে তোলে। যে শ্রম আমাদেরকে আধ্যাত্মিক ভাবে দুর্বল করে ফেলে তার থেকে মুক্তি এটা দেইই না, বরং এটা আমাদেরকে যন্ত্রের দাস করে ফেলেছে। ......

তোমরা ফলিত বিজ্ঞান শিখবে, তোমাদের সাধনা যাতে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে দেয় শুধু তার জন্যই নয়। মানুষের কথা, তার সুখ-দু:খের কথা, শ্রম ব্যবস্থা ও ধন বন্টনের যেসব সমস্যাবলী রয়ে গেছে তাদের কথাও প্রত্যেক কারিগরী প্রচেষ্টার বিষয়বস্তু করা উচিত। যাতে করে আমাদের মনের সৃষ্টিগুলো মানব জাতির পক্ষে আর্শীবাদ হয়ে দেখা দেয়। অভিশাপ হিসেবে নয়। তোমাদের ডায়াগ্রাম আর ইকোয়েশনগুলোর মধ্যে এই কথাটি যেন হারিয়ে না যায়।

আগষ্ট ১৯৬৪ সংখ্যা
অনুবাদ : স্বাতী

পদার্থবিদ্যার মূল কথা

আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ নানা রকমের এলোমেলো অনুভূতিগুলোকে একটা যুক্তি নির্ভর ঐক্যবদ্ধ চিন্তা ব্যবস্থার সাথে মিলিয়ে দেবার চেষ্টাই হলো বিজ্ঞান। এই চিন্তা ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি আলাদা অভিজ্ঞতাকে মূল তাত্ত্বিক গঠনের সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত করতে হবে যেন তার ফলে একটা একক ও নির্ভরযোগ্য সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়।

অভিজ্ঞতাগুলো বহিলব্ধ। কিন্তু যে তত্ত্বের মাধ্যমে এগুলোকে ব্যাখ্যা করা হবে তা মানুষের তৈরী। খুবই পরিশ্রম-সাপেক্ষ খাপ খাইয়ে নেবার একটি পদ্ধতির মাধ্যমেই এই তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। এটা কল্পনার আশ্রয়ী, এর কোন চূড়ান্ত রূপ নেই এবং কোন সময়ে এটা প্রশ্ন বা সন্দেহের অতীত নয়।

.....যাকে আমরা পদার্থবিদ্যা বলি তা হলো প্রকৃতি বিজ্ঞানের সেই শাখা যার ধারণাগুলো পরিমাপের উপর নির্ভরশীল এবং গাণিতিক সূত্রে রূপ লাভে সক্ষম। কাজেই এর আওতাভুক্ত জগতকে এক কথায় বলা যেতে পারে এটা আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞানের সেই অংশ যাকে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা চলে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে পদার্থ বিদ্যার আওতা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এর সীমা এখন শুধু পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা দ্বারাই নির্ধারিত হচ্ছে।

পদার্থ বিদ্যার বেশীরভাগ গবেষণাই এর বিভিন্ন শাখার উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত। প্রত্যেকটি শাখার উদ্দেশ্য হলো কম বেশী একটা সীমিত ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাগুলোকে তত্ত্বগতভাবে বোঝার চেষ্টা, ধারণা ও সিদ্ধান্তগুলো যথাসম্ভব অভিজ্ঞতার কাছাকাছি রেখে। বিজ্ঞানের এই বিভাগই ক্রমাগত সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর বিষয়ে অধিক থেকে অধিকতর গবেষণার মাধ্যমে গত এক শতাব্দীতে ব্যবহারিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আর এটাই অবশেষে মানুষকে শারীরিক পরিশ্রমের গুরুভার থেকে মুক্তি দেবার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে।

অন্যদিকে একেবারে গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের সব শাখাগুলোর মধ্যে একটা ঐক্যবদ্ধকারী তাত্ত্বিক ভিত্তি চেষ্টা চলে আসছে; সেই ভিত্তি হবে যথাসম্ভব অল্প কয়েকটি ধারণা ও মূল সম্পর্ক দিয়ে গড়া। যার থেকে আলাদা আলাদা শাখাগুলোর সমস্ত ধারণা ও সম্পর্ক যৌক্তিক পদ্ধতিতে বিকাশ লাভ করতে পারে। পুরো পদার্থবিদ্যার মূল ভিত্তি আবিস্কারের চেষ্টা বলতে আমরা এটাই বুঝি। এই পরম লক্ষ্যে পৌছানোর দৃঢ় আস্থাই সবসময় গবেষণাকারীর সাধনার পেছনে উৎসাহ যুগিয়ে এসেছে।

গত শতাব্দীর শেষে এসে পদার্থবিদ্যার যে ভিত্তি দাঁড়ায় তাকে আরো কম সংখ্যক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা থেকেই আপেক্ষিক তত্ত্বের জন্ম। ম্যাক্সওয়েল সমীকরণগুলোর (অর্থাৎ শুন্যস্থানের মধ্য দিয়ে আলোর গতির নিয়মের) উপর লরেন্‌ৎস রূপান্তর ঘটালে আবার একই ধরনের সমীকরণ পাওয়া যায়। এই সত্য থেকেই আপেক্ষিকতার তথাকথিত বিশেষ ও সাধারণ তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। ম্যাক্সওয়েল সমীকরণের উপরোক্ত বিশেষ ধর্মটি ছাড়াও সাধারণভাবে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা নিশ্চিত জানি, যে কোন জড় ব্যবস্থাই নেয়া যাক না কেন পদার্থ বিদ্যার নিয়মগুলো সর্বত্র সত্য। ফলে এক জড় ব্যবস্থা থেকে আরেক জড় ব্যবস্থায় যেতে হলে স্থান ও কালের উপর লরেন্‌ৎস রূপান্তর খাটাবার প্রয়োজন হয়। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বকে এভাবে একটি বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব: প্রকৃতির সবগুলো নিয়মকে এমন হতে হবে যেন তারা লরেন্‌ৎস রূপান্তরের পরেও একই থাকে।

এটা জানতে গিয়ে দেখা যায়, পরস্পর থেকে দূরে ঘটিত দুটি ঘটনা এক সাথে ঘটল কিনা সে সিদ্ধান্ত পরীক্ষকের অবস্থার উপর নির্ভরশীল; কঠিন বস্তুর আয়তন আর ঘড়ির সময়, বস্তুটি বা ঘড়িটি গতিবেগের উপর নির্ভলশীল। আরেকটা ফল হল কোন বস্তুর গতিবেগ যদি আলোর বেগের তুলনায় খুব কম না হয়, তবে তার ক্ষেত্রে নিউটনের গতির নিয়ম হুবহু খাটে না। তাছাড়া দেখা যায় পদার্থ ও তেজ একই জিনিস, পর্দাথের অবিনাশিতা ও তেজের অবিনাশিতা আসলে একটাই নিয়ম। দুটি ঘটনা এক সাথে ঘটল কি ঘটল না এটা যদি আপেক্ষিক হয়, তা হলে পদার্থবিদ্যার ভিত্তির মধ্য থেকে দূর থেকে ক্রিয়ার শেষ চিহ্নটুকুও মিলিয়ে যেতে বাধ্য। কারণ ঘটনা দুটি এক সাথে ঘটার নিশ্চয়তার সাথে এই ধারণা সম্পর্কিত (দূর থেকে ক্রিয়ার জন্য পরস্পরের উপর ক্রিয়ারত দুই ভর-বিন্দুর অবস্থান সম্বন্ধে "একই সময়ে" নিশ্চিত হতে হবে)।

......আপাতত স্বীকার করতে হবে যে আমাদের কাছে এখন পদার্থ বিদ্যার কোন সর্বপ্রসারী মূলভিত্তি নেই। আণবিক জগতে গিয়ে ক্ষেত্র তত্ত্ব এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। সর্বজনমান্য যে একটি মাত্র পদ্ধতি কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূলে কাজ করতে পারে তা হলো কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্বে রূপান্তরিত ক্ষেত্র তত্ত্ব। শেষ পর্যন্ত এটা সন্তোষজনক হবে কিনা তা এখন কেউ বলতে পারে না।

কিছুসংখ্যক পদার্থবিদ বাস্তব সত্যকে স্থান ও কালে সরাসরি রূপ দেয়ার চেষ্টাকে চিরতরে বিসর্জন দিতে বা প্রকৃতির ঘটনাবলীকে এক ধরনের পাশা খেলার মত বলে মেনে নিতে রাজী নন। আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। এই

ব্যাপারে প্রত্যেকে প্রত্যেকের গবেষণার দিকটি বেছে নিতে পারেন। আর লেসিং এর সুন্দর বাণী থেকে সবাই উৎসাহ পেতে পারেন: সত্যের প্রাপ্তি থেকে সত্যের অনুসন্ধানই অধিক মূল্যবান।

অক্টোবর ১৯৭২ সংখ্যা
অনুবাদ : মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সমাজ ও বিজ্ঞান

সমাজের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব পড়ে দুরকমভাবে। তার মধ্যে একটা দিকের কথা সবারই জানা আছে; প্রত্যক্ষ এবং তারও বেশী পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান এমন সব জিনিসের উদ্ভাবন ঘটায়, যা মানুষের জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে আমূল রূপান্তর আনে। প্রভাবের দ্বিতীয় দিকটা হচ্ছে শিক্ষামূলক-তার কাজ মানুষের মনের ওপরে। আপাদতদৃষ্টিতে এ দিকটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না হলেও আসলে প্রথম দিকের চেয়ে এই দ্বিতীয় প্রভাবের গভীরতা কিছুমাত্র কম নয়।

--- অসংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির ফল দাঁড়িয়েছে এই যে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ আজ উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং তার ফলে অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থার ক্ষেত্র থেকে বাতিল হয়ে পড়েছে। আর এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে দেখা দিয়েছে ক্রয় ক্ষমতার অধোগতি, অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমের মূল্য হ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান দ্রুততায় উৎপাদন ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক সংকট ও বিপর্যয়।

অথচ উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার সঙ্গে এমন ধরনের ক্ষমতা রয়েছে, যার বিরুদ্ধে আমাদের প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্থাগুলো এঁটে উঠতে পারছে না। সমগ্র মানব জাতির সামনে আজ সংগ্রাম দেখা দিয়েছে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার; বর্তমান যুগের মানুষ যদি নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে তাহলে এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই হয়তো সত্যিকার মুক্তি আসবে।

----বিজ্ঞানের এটা এক অবিস্মরণীয় কীর্তি বলতে হবে যে, মানুষের মনের ওপর বিজ্ঞানের প্রভাবের ফলেই আজ সে তার নিজের বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে ভয় ও অসারতার ভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। জনসাধারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ হয়তো সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারেন না। কিন্তু যেটুকু পারেন তারও বিরাট মূল্য রয়েছে, তা থেকে তাঁরা এই বিশ্বাস লাভ করতে পারেন যে, মানুষের চিন্তা-সম্পদ নির্ভরযোগ্য এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সর্বগত।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ সংখ্যা
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল মুতী

আইনষ্টাইনের কাজ ও জীবন

আপেক্ষিক তত্ব : সবার জন্যে/ মোহাম্মদ আহসান

সব কিছুই আপেক্ষিক, একথা বলেই আইনষ্টাইন চুপ থাকতে পারলেন না। নিউটনের মাধ্যাকর্ষন তত্ত্ব থেকে তিনি তাঁর 'সাধারণতত্ত্ব' গড়ে তুললেন, তাকে আর এক নতুন চেহারা দিতে চাইলেন। কোন বস্তু অন্য কোন বস্তুকে দূর থেকে আকর্ষণ করে এই যান্ত্রিক মতবাদ তিনি বিশ্বাস করলেন না। প্রথমেই তিনি "দূরে শক্তি বিস্তার" এই ধারণা সম্পূর্ণ মুছে ফেললেন! আর তার বদলে মাধ্যাকর্ষণের এক নতুন ধারণা আমাদের দিয়ে গেলেন।

তাঁর ধারণায় আসতে হলে প্রথমেই আমাদের বিদ্যুৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বকক্ষেত্র সম্বন্ধে জানতে হবে। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে এটা আমরা সবাই জানি। দূর থেকে লোহাকে কোন কিছু টেনে আনছে এই ধরনের ধারণা ঠিক নয়। চুম্বক তার চারপাশে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যার ফলে লোহার টুকরাটা আসতে বাধ্য হয়। চারপাশের এই যে অবস্থা তাকেই বলে ক্ষেত্র। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ব্যাপারও ঠিক তাই।

আইনষ্টাইন মাধ্যাকর্ষণের বেলায়ও এই অযান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করলেন। প্রথমত অনুভূতি দিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে, যান্ত্রিক মনোভাব এখানে অচল। দ্বিতীয়ত তিনি বুঝতে পারলেন যে প্রাকৃতিক নিয়মের সব জায়গাতেই একটা শৃঙ্ক্ষলা রয়েছে। বিদ্যুৎ ও চুম্বকের বেলায় যদি অযান্ত্রিক ধারনা সত্যি হয় তবে মাধ্যাকর্ষণের বেলায়ও তাই হবে। স্থান কাল বিস্তৃতির বিকৃতির ফলে বস্তুর চারপাশে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই আমরা বলব ক্ষেত্র। অন্য যে কোন বস্তু এই ক্ষেত্রের মধ্যে আসলেই বিস্তৃতির বিকৃতির ফলে একটা নির্দিষ্ট দিকে চলতে বাধ্য হয়। একেই আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণ।

মে, ১৯৬১ সংখ্যা

মহাকর্ষ তত্ত্ব / জে, ভি, নরলিকার

এতক্ষণ আমি স্থানকাল জ্যামিতির কথাই বলছি। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে কালের জ্যামিতি বলে কি কিছু থাকা সম্ভব? স্থান পরিমাপে আমরা মাপকাঠি ব্যবহার করি, কাল পরিমাপে ব্যবহার করি ঘড়ি। মহাকর্ষ যে রকম কোন দূরত্বের পরিমাপে বিকৃতি ঘটায়।

তেমনি ঘড়ির উপরও তার প্রভাব পড়বে। আইনষ্টাইনের মতে প্রবল মহাকর্ষের ক্ষেত্রে ঘড়ি অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে চলবে। ----এই বিস্ময়কর ফলাফল পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যদিও এর জন্য সাধারণ ঘড়ির পরিবর্তে পারমাণবিক ঘড়ি ব্যবহার করতে হয়েছে।

আগষ্ট ১৯৬৫ সংখ্যা
অনুবাদ : স্বাতী

আমার চেনা আইনষ্টাইন/ টমাস লী বাকি

----পরদিন স্কুল শেষে আমি দোকানে গিয়ে আইনষ্টাইনের জন্য একটা ক্রীষ্টমাসের উপহার কিনলাম। দোকানদারকে ব্যতিব্যস্ত করে দোকানের সবগুলো ইয়ো ইয়ো খেলনা পরীক্ষা করে সবচেয়ে ভাল ভারসাম্যেরটি বেছে নিয়ে আইনষ্টাইনকে পাঠিয়ে দিলাম। বিনিময় কার্ডের উপর তার নিজের হাতে লেখা একটা পদ্য আমি পরের ডাকেই পেলাম। পদ্যটার শুরু ছিল :

রোগাপটকা মেয়ের আর
বুড়ো ধাড়ির বাড়ী
রথে চড়ে সান্টা ক্লজ
দেয়নাকো পাড়ি.....।

ক্রমে আমরা জানতে পারলাম যে আইনষ্টাইন নানা ধরণের চালাকীর খেলনার বড় ভক্ত। বাজারে এ ধরনের নতুন কোন খেলনা বেরুলেই আমি আর আমার ভাই মিলে তাঁকে অবশ্যই পাঠাতাম।

আমার ভাই একবার প্রফেসরকে একটা মজার খেলনা দিয়েছিল। জলভর্তি একটা পাত্রের কানায় একটা খেলনা পাখী বসানো আছে। পাখীটার মাথা কাৎ হয়ে জলে একবার ডুবে আবার জল থেকে উঠে আসে –এমনি বিরামহীন ভাবে। পরের দিন ভোরে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি বল্লেন, দেখ, বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমি এই পাখীটা নিয়ে চিন্তা করেছি। অবশেষে ভেবে দেখলাম ব্যাপারটা এই রকম –এই বলে তিনি এক লম্বা ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। এভাবে একের পর এক থিওরী তিনি পরবর্তী কয়েকদিন ধরে খাড়া করলেন আর বাতিল করলেন। অবশেষে আমি পরামর্শ দিলাম কি দরকার আর এত মাথা ঘামিয়ে। খেলনাটা খুলে দেখলেই হয় আসলে এর ভেতর কি আছে। কিন্তু আইনষ্টাইনের মুখ দেখেই বুঝলাম পরামর্শটা তাঁর পছন্দ হয়নি। হাতে-কলমে পরীক্ষা করে কিছু বের করা যেন তাঁর নীতি বিরুদ্ধ ছিল। বলাবাহুল্য সমস্যাটির সমাধান শেষ পর্যন্ত তিনি করতে পারেন নি।

জুন ১৯৬৭ সংখ্যা
অনুবাদ : মুহাম্মদ ইব্রাহীম

আইনষ্টাইন/ চার্লি চ্যাপলিন

কালিফোর্নিয়ায় ১৯২৬ সালে আইনষ্টাইন বক্তৃতা দিতে এলেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা আমার মতে মহিমান্বিত রোমান্টিক যাঁরা নিজ আবেগ ভিন্ন পথে পরিচালনে সক্ষম। ('সিটিলাইট' ছবির প্রথম দৃশ্যে দেখলাম আইনষ্টাইন চোখ মুছ্ছেন। বিজ্ঞানীরা যে দুরারোগ্য ভাবপ্রবণতাগ্রস্ত তার আরও একটি প্রমাণ...... তারপর আমি বার্লিনে পৌছে তাঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম। সাধারণ ফ্লাট। বসার ও খাবার ঘর একটি। মেঝের কার্পেট পুরানো, ছেঁড়া। ঘরের সবচেয়ে দামী আসবাব বলতে একটি কালো পিয়ানো, যার উপর তিনি চতুর্থ মাত্রার খসড়া করেছিলেন। তারপর বহুকাল এই পিয়ানোটির কথা মনে পড়েছে। কী হয়েছে ওটার? হয়তো এটি স্মিথ সোনিয়ান ইনষ্টিটিউট অথবা মেট্রোপলিটান যাদুঘরে রয়েছে, কিংবা এমনো হতে পারে যে ওটি নাৎসীদের চুল্লিতে পুড়েছে।

জুন ১৯৭৭ সংখ্যা
অনুবাদ : দ্বিজেন শর্মা

আইনষ্টাইন/ ভ. স্মিলগা

শিশু আইনষ্টাইন ছিলেন শিষ্ট প্রকৃতির। আত্মীয়দের মনে পড়ে, অন্যরা তাঁকে মায়ের ন্যাওটা বলে ক্ষেপাত শুধুমাত্র তাঁর সত্যপ্রিয়তার জন্যে। তখনকার আরেকটা জিনিস লক্ষ্যনীয়, তিনি সৈনিক পছন্দ করতেন না–চকচকে ইউনিফর্ম আর হেলমেট পরে তাঁর শহরের শান্ত রাস্তার উপর দিয়ে কদম কদম মার্চ করে যেত যে সৈনিক তাদেরকেও নয়। -------- স্কুলকে তিনি পছন্দ করেননি। স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ তাঁর স্মৃতিতে আর্মী সার্জেন্টের মতো। বিজ্ঞানকে কেন তিনি বেছে নিয়েছিলেন?

জনৈক মেডিক্যাল ছাত্র তাঁকে পপুলার সায়েন্সের বই পড়ার পরামর্শ না দিলে তিনি হয়ত পদার্থবিদ না হয়ে ভাল সঙ্গীতকার হতেন। ছয় বছর বয়স থেকে তিনি বেহালা বাজিয়েছেন আর সারা জীবন নিষ্ঠা ও গুরুত্ব সহকারে সঙ্গীতকে ভালবেসেছেন। সে যাই হোক তৎকালীন সমস্ত পপুলার সায়েন্স বইয়ের সার্থকতা এই একটিমাত্র কারণেই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে যে সেগুলো ১৮৯৯ সালের দিকে সোয়াবিয়ার উলম নামক মফস্বল শহরে বার বছরের একটি ভাবুক বালককে কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিল।

----খ্যাতির পরীক্ষায় আইনষ্টাইন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন অবহেলাভরে, একে প্রায় লক্ষ্য না করেই। যেমন তিনি লক্ষ্য করেননি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষায় তাঁর ফেল করার ব্যাপারটি।

----একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ । সেটি হলো হিংসা এবং যুদ্ধ সম্পর্কে আইনষ্টাইনের মনোভঙ্গী। ১৯২০ সন থেকে বিশ্বখ্যাত হওয়ার সাথে সাথে জার্মানীর ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী তাঁকে তাঁর কাজকে দমন করতে আরম্ভ করেছিল। তখন থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত সাধারণভাবে তিনি রাজনৈতিক বিষয় সমূহের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে সবকিছু মেনে নেবার লোক ছিলেন না। তা তিনি কোন দিন করেননি। জনৈক মার্কিন শিক্ষকের উত্তরে তিনি লিখেছেন "খোলাখুলি বলতে গেলে আমি অসহযোগের বৈপ্লবিক পন্থার কথাই বলতে পারি, গান্ধীর অর্থে অসহযোগ। প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীকে জেল ও আর্থিক সর্বনাশ মেনে নিতে, এক কথায় ব্যক্তিগত কল্যাণকে দেশের সাংস্কৃতিক কল্যাণের খ্যাতিরে বিসর্জন দিতে তৈরী থাকতে হবে। যদি যথেষ্ট সংখ্যক লোক এইরকম পদক্ষেপ নিতে পারে তবেই তারা সফল হবে। যদি তা না পারে এই দেশের বুদ্ধিজীবীদের উপর যে দাসত্ব চাপিয়ে দিতে চাওয়া হচ্ছে তারা তারই উপযুক্ত।

জুন ১৯৭৮ সংখ্যা

অনুবাদ : মুহাম্মদ ইব্রাহীম

কথা প্রসঙ্গে

তরুণ বন্ধুরা তাঁকে কিছু উপহার দিলে আইনষ্টাইন বলেছেন, "তোমাদের এই উপহার ভবিষ্যতে আমাকে আর একটু কেতা দুরস্ত হয়ে চলতে মনে করিয়ে দেবে। কারণ নেকটাই আর আস্তিনের কাফ আমার কাছে শুধু সুদূর স্মৃতি হিসেবেই বিরাজ করে।"

জনৈক তরুণ স্নেহাস্পদকে তিনি লিখেছেন, "শুনছি কাকা আইনষ্টাইনকে না দেখে তুমি বিমর্ষ রয়েছো। তাই তোমাকে জানাচ্ছি আমি এখন দেখতে কি রকম : ফ্যাকাশে মুখ, লম্বা চুল, ছোটখাট একটা ভুঁড়ি দেখা দিয়েছে। তদপুরি বেঢক চলন, মুখে চুরুট— যদি সে সময় চুরুট তাঁর কাছে থাকে, পকেটে বা হাতে একটা কলম। তবে বাঁকা পা বা মুখে আঁচিল তাঁর নেই, কাজেই তিনি যথেষ্ট সুদর্শন -----অবশ্যই আমাকে না দেখতে পাওয়া তোমার পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক।"

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান সাময়িকীর অন্য স্কুল

[জুলাই- '৭৯]

বিজ্ঞানের সাথে আমাদের দেশের শিশুর প্রথম পরিচয় ঘটে স্কুলে। র্দুভাগ্যের কথা হলো অসংখ্য শিশুর ক্ষেত্রে পরিচয়ের পরিসমাপ্তিও ঘটে স্কুলেই। স্কুলের পর, এমনকি স্কুলেই শেষের দিকে যেহেতু বিজ্ঞান আর তাদের পাঠ্য থাকে না কাজেই এর সঙ্গে তাদের সম্পর্কেরও আর কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। এটি আমাদের স্কুল ব্যবস্থার একটি দু:খজনক ফলশ্রুতি। এর মানে শিশু বয়সে স্কুলের বিজ্ঞান পড়া এমন কোন ছাপ রাখতে পারে না যাতে শিক্ষার্থী এর সাথে কোন রকমের ঘনিষ্টতা অনুভব করতে পারে। তাই শিশু কিছুদিনের জন্য বইয়ের ভেতর বিজ্ঞানের সাক্ষাত পেলেও নিজের জীবনের বা বাইরের পরিবেশের সাথে এর কোন স্থায়ী যোগসূত্র স্থাপনে ব্যর্থ হয়। পাঠ্যের শেষ মানে বিজ্ঞানেরও শেষ। এই ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন স্পষ্টত খুব সীমিত।

স্কুল ব্যবস্থার এই দৈন্য একদিনের সৃষ্টি নয়, এককভাবে কাউকে এর জন্য দায়ীও করা যায় না। তবে এর পরিবর্তন প্রয়োজন। সে পরিবর্তন ধীরে ধীরে নানা দিক থেকে হতে হবে। কিছু কিছু যে হচ্ছে না তাও নয়। স্কুল-ব্যবস্থার ভেতর থেকে এই পরিবর্তন যেমন আসতে হবে তেমনি বাইরে অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে কিছু কিছু সম্পূরক শিক্ষার ব্যবস্থা করে স্কুল ব্যবস্থার জন্য উদাহরণ এবং চাপ সৃষ্টির প্রয়োজনও রয়েছে। শিশুতোষ বিজ্ঞান সাহিত্যও ধীরে ধীরে এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। স্বত:প্রণোদিত হয়ে আনন্দ মিশ্রিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশু এসবের সংস্পর্শে আসে বলে এখানে বিজ্ঞানের সাথে আত্মিক সম্পর্কটা সহজতর হয়। এর কিছু কিছু উপাদান স্কুল ব্যবস্থার ভেতরেও ক্রমান্বয়ে অনুপ্রবেশ করছে, করবে। এটাই আশার কথা।

বিজ্ঞান সাময়িকী দীর্ঘদিন ধরে উল্লিখিত ধীর কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় নিজের অবদানটুকু যোগ করে এসেছে। বিশেষ করে এর ছোটদের পাতাগুলোতে, এবং বিজ্ঞান ক্লাব সংক্রান্ত তৎপরতায়। এবার একটি নতুন বিভাগের মাধ্যমে সাময়িকীর এই প্রচেষ্টাকে আমরা স্কুল-ব্যবস্থার আরো একটু কাছাকাছি নিয়ে যেতে চাই। এই নতুন বিভাগ "আপন স্কুল" যদিও শিশুর খেয়াল খুশীর একটি নিজস্ব জগত সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দেবে তবুও এর মূল উদ্দেশ্যে স্কুলের পাঠ্যকে, স্কুলের শিক্ষাকে আর একটু প্রাণবন্ত করা: যে পাঠ্যসূচী স্কুলের জন্য রয়েছে তার মধ্যেই স্বত:স্ফূর্ত কৌতুহল, কাজ ও চর্চার উপাদানটুকু যোগ করা। এই সম্পূরক চেষ্টাগুলো স্কুলের মূল চেষ্টাকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে কিছুটা সহায়ক হবে, এটাই আমাদের আশা।

আপন স্কুল

স্কুল খুইলাছে ...

[জুলাই-'৭৯]

হ্যাঁ খুলেছে বৈ কি। তবে অন্য কেউ খুলেনি, তুমিই খুলেছ, কারণ স্কুলটা তোমার একান্ত নিজের– আপন স্কুল। কোথায় বসবে তোমার স্কুলটা? কোথায় নয়? বাড়ীতে, মাঠে, ঝোপে-ঝাড়ে এবং তোমার আসল স্কুলে যেখানে তুমি সকাল-বিকেল স্যারদের কাছে নানা জিনিস শেখ। আপন স্কুলের শেখার জিনিসগুলোও একেবারে নতুন কিছু হবে না। স্কুলে নানা ক্লাসে তোমার যা পড়তে হয়েছে, হচ্ছে বা হবে মোটের উপর, সেসব জিনিসই। তবে এখানে গায়ে পড়ে কেউ কিছু শেখাবে না। তোমাকে তুমিই পড়াবে, ইচ্ছেমত জায়গায় ক্লাস বসাবে, আর শিখবে সবার কাছ থেকে। সাহায্য করার জন্য গুরুজনরা আর শিক্ষকরা তো আছেনই, কিন্তু আসল শেখাটা হবে এটা-সেটা দেখে, কৌতুহল নিয়ে এটা-সেটা করে। ভারী মজা হবে সে স্কুলে। কখন কি শিখবে তারও কোন ঠিকানা নেই। ভাল লাগলে উৎসাহের চোটে না হয় একটু উপরে ক্লাসের জিনিসই শিখে ফেললে, অথবা শিশু ক্লাসে যা পড়েছিলে তাই না হয় আবার নতুন করে দেখলে। কেউ কিছু বলবে না, কারণ এতো তোমার আপন স্কুল আপন বলে নিজের থেকে বেশ কিছু উদ্যোগও তোমার নিতে হবে এর জন্য।

আমরা? হ্যাঁ আমরা এই পাতায় একটু বুদ্ধি শুদ্ধি যোগাব। সেগুলো তোমার স্কুলে কি ভাবে কাজে লাগবে সে তুমিই বুঝবে ভাল। 'আপন স্কুল' বিভাগটি শুধু প্ররোচকের কাজ করে যাবে, বিষয়গুলো ধরিয়ে দেবে, আর এটা সেটা দেখতে, করতে উসকিয়ে দেবে তোমাকে। তাছাড়া নানা রকম বইপত্রে, এই বিজ্ঞান সাময়িকীরই নানা লেখায়, ফিচারে তুমি অনেক মালমশলা পাবে তোমার স্কুলের জন্য। তোমার আপন স্কুল চালাতে গিয়ে যদি কোন সুন্দর সমস্যায় পড়ো এই আপন স্কুল বিভাগে আমাদের লিখো। সমাধান করতে না পারি, অন্তত সবাইকে জানিয়ে দিতে পারবো তোমার সমস্যার কথা। সবারই 'ক্লাসে' তখন হয়ত বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। কি বলো?

জ্যান্ত জগৎ

জড় জিনিসের চেয়ে জ্যান্ত জিনিস ইন্টেরেষ্টিং বেশী। কেন বলতো? এটা নড়ে-চড়ে, অবস্থা ভেদে নানা রকম আচরণ করে, খায়-দায় বাড়ে, বাচ্চা -কাচ্চা দেয় – কি সুন্দর ছোট্ট বাচ্চারা! বাঁচার জন্য এদের এটা সেটা চাই, বুড়ো হলে বা কিছু গড়বড় হলে মারাও যায়। আর এসব দেখেই জড় জিনিসের থেকে জ্যান্ত জিনিস আলাদাও করা যায়। করতো দেখি আলাদা। তোমার আশে-পাশের যাবতীয় জ্যান্ত জিনিসের একটা লিষ্টি তৈরী করো। কেন জ্যান্ত বলছো তাকে পাশে তাও লিখে রাখো।

লিষ্টি থেকে পোকা-মাকড়, পশু-পাখী, গাছপালা কিছুই বাদ দাও নি আশা করি। এর মধ্যে উদ্ভিদ কোনগুলোকে বল্‌বে, প্রাণী কোনগুলোকে বলবে? তুমি দেখছো না অথচ তোমার আশেপাশেই জ্যান্ত জিনিস রয়েছে অসংখ্য। জেনে থাকলে সেগুলোও নিশ্চয়ই তোমার লিষ্টিতে এসেছে। বিশেষ করে সেগুলোর ক্ষেত্রে উদ্ভিদ আর প্রাণী আলাদা করা কষ্ট হতে পারে। তাই দুটি সহজ প্রশ্ন রাখতে হবে (১) এটা কি নিজের শক্তিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সম্পূর্ণ চলে যেতে পারে? (২) ওটা কি কোন বস্তুকে গোটা অবস্থায় খাদ্য হিসেবে নিজের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে? এই দুই

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তোমার লিষ্টিটাকে দু'ভাগ করে ফেলতে পার। যাদের জন্য দুটি প্রশ্নই 'হ্যাঁ'– তারা প্রাণী, আর যাদের জন্য 'না' তারা উদ্ভিদ।

কোথায় করছো লিষ্টিটা? আমরা প্রস্তাব হলো একটা মোটা 'স্ক্র্যাপ বুক' তৈরী করো–অর্থাৎ কিনা 'খামখেয়ালী খাতা'। আপন স্কুলের মজার মজার কাজগুলোর অনেক কিছুই তুমি ওর মধ্যে লিখবে, সাঁটবে, কিছু একটা করে দেখার পর ফলাফল টুকে রাখবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভারী সুন্দর জিনিস হবে তোমার খাতাটা।

নিজের বুদ্ধিতে আর একটা কাজ করো। তুমি এ পর্যন্ত যা জান তার ভিত্তিতে তোমার উদ্ভিদ ও প্রাণীর লিস্টির সবকিছুকে কতগুলো শ্রেনীতে ভাগ করে ফেল। যদি কিছু না পড়া থাকে এ বিষয়ে তাহলেও তোমার কাছে যেটা স্বাভাবিক মনে হয় সেভাবেই ওদের কতগুলো শ্রেনীতে ভাগ করে ফেল। বিজ্ঞানীরা কিভাবে করেন সেটি পরে জানিয়ে দেব, মিলিয়ে নিও। তোমার নিজের শ্রেণী বিভাগও বেশ কাজে আসবে।

উদ্ভিদ প্রাণী, তারপরেও কত কিসিমের শ্রেণী ভাগ জ্যান্ত জগতের। কিন্তু একের সাথে অন্যের অনেক তফাত থাকা সত্ত্বেও কতগুলো ব্যাপার কিন্তু সব জ্যান্ত জিনিসেরই অনেক মিল। যেমন ধরো বাতাস। বাতাস নিজে একটা জড় জিনিস। কিন্তু বাতাস ছাড়া কোন জ্যান্ত জিনিস বেশীক্ষণ জ্যান্ত থাকতে পারে না। এ নিয়ে খোঁজ খবর নেয়া যাক।

বাতাস ও জীবন

প্রাণীদের মধ্যে কারা কারা বাতাসের মধ্যে থাকে? তোমার লিষ্টির একটা শ্রেণীভাগ ওভাবে হতে পারত। যারা বাতাসের মধ্যে থাকে তাদের অনেকেই বাতাস নেয় 'ফুসফুসের' সাহায্যে। আসলে বাতাসের পুরোটা প্রাণীর দরকার হয় না, দরকার হয় এর যে অংশ অক্সিজেন গ্যাস শুধু সেটুকুই। ফুসফুসের কাছে বুক আর পেট আলাদা করে থাকে ড্যায়াফ্রাম বলে একটা পর্দা। পর্দা পেটের দিকে ঠেললে বুক ফুলে বড় হয় ওখানে বাতাসের চাপ ফলে কমে যায় বলে বেশী চাপের বাইরের বাতাস নাক মুখ দিয়ে ঢুকে ফুসফুস ফুলিয়ে দেয়। পরে ডায়াফ্রাম বুকের দিকে টেনে নিলে বুকের গহব্বর ছোট হয়ে সেখানকার বাতাস ফুসফুসের উপর চাপ দিয়ে বাতাস বের করে দেয়। বুঝলে তো, বাতাস গিয়ে বুক ফুলায় না, বরং ঠিক উল্টো। বুক ফুলালেই বাতাস ঢুকে ফুসফুসে। এবার আপন স্কুলের জন্য বানিয়ে ফেল শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের মডেল।

একটা তলা কাটা বোতল যার তলা ছেয়ে নেয়া হবে রাবার দিয়ে। ভেতরে দুটা চুপসানো বেলুনই তোমার ফুসফুস। রাবারের ছাউনিটা ডায়ফ্রাম। নাকটা বের হয়ে আছে বোতল রূপী বুক থেকে। দেখো রাবারটা টেনে বুক বড়ো করলে বেলুন ফুলছে। আর ছোট করলেই চুপসিয়ে ফুসফুসের মতোই দেখাবে। চলুক তোমর মডেলে শ্বাস প্রশ্বাস। চমৎকার বোঝা যায়, তাই না? আমরা নিজেরা, গরু, ছাগল, কুকুর, পাখী সবারই এই ব্যবস্থা।

কিন্তু যারা বাতাসের মধ্যে থাকে না তাদের কি উপায়? ধরো কেঁচোর কথা। সে বেচারা মাটির ভেতর থাকে। মাটিতে কি বাতাস আছে। চট করে দেখে নাও। একটা বয়োমের মধ্যে বেশ কিছু মাটি রাখ। এবার সাবধানে পানি ঢেলে বয়োম ভর্তি করো। কি বুদবুদ উঠতে দেখেছো পানি থেকে? বাতাস মাটির ফাঁকে ফাঁকে ছিল, পানি গিয়ে বাতাসকে বের করে দিচ্ছে। মাটির ফাঁকে ফাঁকের এই বাতাস তার চামড়ার ভেতর দিয়েই কেঁচো টেনে নেয়, তার ফুসফুস নেই। এবার বলতো খুব বৃষ্টি হলে কেঁচোগুলো এমন ধড় ফড় করে সব মাটির উপর উঠে আসে কেন? বাতাসের সন্ধানে নয় কি?

মাছ থাকে পানিতে। মাটির ভেতর পানি গেলে কেঁচো বাতাস নিতে নাচার। কিন্তু মাছের তা হলে চলবে কেন? পানি থেকেই তাকে অক্সিজেন নিতে হয়। পানির মধ্যেই কিছু বাতাস মেশানো থাকে। মাছ সেটা নেয় ফুলকার সাহায্যে। মাছ তাজা আছে কিনা দেখার জন্য লাল ফুলকা পরীক্ষা করো–সেটাই। মুখ দিয়ে পানি দিয়ে ওটা কানকোর উপর দিয়ে চালিয়ে দিলে ফুলকা এখান থেকে বাতাস নিয়ে নেয়। ব্যাঙ যখন ছোট বেলায় ব্যাঙাচি হিসেবে পানিতে থাকে তখন তারো ফুলকা থাকে। কিন্তু বড় হয়ে ব্যাঙ হলে তার ফুসফুস গজায়। কিন্তু ফুসফুসও সে বড় একটা ব্যবহার করে না, গায়ের চামড়ার ভেতর দিয়েই বাতাস নিতে পারে। অনেক ব্যাঙ শীতকালে মাটির ভেতর যখন চুপসে বসে থাকে তখনো কেঁচোর মত মাটির বাতাসই নেয় চামড়া দিয়ে। সব রকম ব্যবস্থাই রয়েছে।

পানিতে যে বাতাস আছে তারো প্রমাণ নাও হাতে নাতে। ঠান্ডা পানি একটা গ্লাসে নাও। কয়েক ঘন্টা ঘরের গরমে পানিটা রেখে দিলে দেখো গ্লাসের ভেতরে বুদবুদ জমেছে। কোথা থেকে এলো বুদবুদের বাতাস? পানির মধ্যেই ছিল, গরমে বের হয়ে এসেছে।

তোমার লিষ্টির একটা বড় অংশ নিশ্চয়ই উদ্ভিদ জগত নিয়ে। ওদেরও বাতাস দরকার। তবে ওদের দরকার বাতাসের অন্য অংশ –কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। প্রাণী বাতাসের অক্সিজেন নেয় আর কার্বনডাই অক্সাইড ছাড়ে,

উদ্ভিদ নেয় কার্বন ডাই অক্সাইড আর ছাড়ে অক্সিজেন। বেশ মজা, পাশাপাশি দুই দলই আছে বলে কারুরই দরকারী জিনিস ফুরিয়ে যেতে পারছে না। মাটিতে যেসব উদ্ভিদ হয় তার কান্ড পাতা বাতাসে থাকে। পাতার মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে এসব গাছ বাতাস নেয়। পানির ভেতর যেসব উদ্ভিদ জন্মে ওরা মাছের মতো পানির সাথে মেশানো বাতাস নিতে পারে। ওদের গায়ের খুব পাতলা চামড়ার ভেতর দিয়ে পানির বাতাস ঢুকে।

প্রাণী আর উদ্ভিদ উভয়কেই বাতাস নিতে দেখলাম। বাতাস নিয়ে কে কি করে সেটাও একদিন দেখতে হবে। তাছাড়া এদের আরো জিনিস প্রয়োজন। চাই পানি, চাই নানা রকম পুষ্টির ব্যবস্থা। শরীরটা ঠিক রাখার, বেড়ে ওঠার মালমশলা, কাজকর্ম, নড়াচড়া করার জন্য শক্তি, শরীরে অবয়বটা ঠিক রাখার ব্যবস্থা সবই দরকার। এগুলো নিয়েও তোমাকে জানতে হবে।

খামখেয়ালী খাতার উপর আর একটা কাজ করো। তোমার লিষ্টির জীবগুলোর কে কোন পরিবেশে থাকে পাশে পাশে নোট করো। দেখতো ঐ পরিবেশে তার বাতাস, পানি আর খাবার পাবার সুযোগ ও যোগাড়যন্তর কি আছে। যেটুকু মনে আসে লিখে রাখো। লিষ্টি থেকে নিজেকে বাদ দিওনা কিন্তু—তুমি জ্যান্ত জিনিস; অতএব। পরের মাসে আরো কিছু যুক্ত করা যাবে। এর মধ্যে দরকারী কথা জমলে চিঠি লিখো। ভাল কথা, খামখেয়ালী খাতাটা বেশ যত্ন করেই তৈরী করো, কারণ কিছুদিন পর পর আমরা ভাল খামখেয়ালী খাতার জন্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করবো। তখন বুঝা যাবে আপন স্কুল কারটা ভাল চলছে।

খেয়ালী

বর্ণালী

অলৌকিক প্রুফ-রীডার

[আগস্ট '৭৯]

প্রুফ-রীডার সাহেবের সাথে পরিচয় আছে? যিনি চোখ আর পেন্সিল বুলিয়ে যান লাইনে লাইনে। ভুল অক্ষর একটি চোখে পড়েছে কি অমনি খস্ করে বাতিল। একবার নয়। বার বার শুদ্ধ হয়ে আসে, আবার চলে প্রুফ রিডিং—যদি বা থেকে যায় আরো কিছু ভুল। তাই তো আমরা পেতে পারি এমন সংস্কৃত, নির্ভুল নিঃসংশয় মুদ্রণ।

বই কম্পোজ করতে ভুল থাকা খারাপ। কিন্তু যদি আমাদের দেহটাকে কম্পোজ করতে ভুল হয়? সেটা তো মারাত্মক। অণু-জীববিদ্যায় খুবই চমকপ্রদ একটি ব্যাপার হলো কেমন করে বংশ পরম্পরায় DNA অণুগুলো সঠিক দেহ-বৈশিষ্ট্যের সংকেতগুলো বহন করে আসছে, আর সেই সংকেত ধরে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে প্রোটিন, গড়ে উঠছে দেহের নানা অংশ ঠিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তিলে তিলে ঘটা এই পুরো ব্যাপারটিতে ভুল-চুক যে প্রায় হয়ই না এটা একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। ভুল হলে কি ঘটতে পারে তা ভাবলেই গা শিউরে উঠে, ক্যান্সারের মতো মারাত্মক অঘটন ঘটতে পারে এর ফলে। এখন এই নির্ভুল কাজটি হয় কি করে তা ব্যাখ্যা করতে একটা থিওরী হলো 'প্রুফ রিডিং থিওরী।' ১৯৭৪ সালে নিনিও এবং হোপফিল্ড নামক দু'জন বিজ্ঞানী প্রথম থিওরীটি প্রস্তাব করেন।

এতে বলা হচ্ছে যে, প্রোটিনগুলোকে সংশ্লেষণ আর 'কম্পোজ' করেই (DNA থেকে কোডবদ্ধ তথ্য সংগ্রহ করে ঠিক জায়গায় ঠিক প্রোটিন তৈরি DNA'র কাজ) দায়িত্ব শেষ হয় না। যেখানে প্রোটিন সংশ্লেষিত হলো তার উপর আর একবার সন্ধানী প্রক্রিয়া চালানো হয় যাতে করে ভুল-চুকগুলো এবার ধরা পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাতিল করা হয়। এজন্যই বলা হচ্ছে 'প্রুফ রিডিং থিওরী।' ঠিক কি কৌশলে এই কাজটি হয়? এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত রয়েছে—সবকটাই কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক মনে হচ্ছে। একটা মত হচ্ছে সংশ্লেষণের ভুল মাধ্যম বাছাইয়ের ফলে প্রচুর পরিমাণে অবাঞ্ছিত বস্তুর উৎপাদন হতে পারে। 'প্রুফ রিডিং'-এর সময় বাতিল করতে হয়। আরেকটা মত হলো ভুলের ফলে ও জায়গার যে রাসায়নিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার ফলেই 'প্রুফ রিডিং'-এ ভুল ধরা সম্ভব হয় (রাসায়নিক প্রুফ রিডিং)। আরেকটা তত্ত্ব হলো 'ডবল ছাকনির' তত্ত্ব। এতে প্রথমে একবার সংশ্লেষণের ভূমিতে প্রতিযোগিতারত এমাইনো এসিডগুলোকে যেন একটা ছাঁকনির মাধ্যমে বাছাই করা হয়। নির্ভুল ভূমির (Substrate) থেকে আকারে বড় সবগুলো এমাইনো এসিড বাদ পড়ে, কিন্তু এর চেয়ে ছোট সবকটিই গৃহীত হয়। দ্বিতীয়বার এরা যায় আরেকটি জায়গায়, বাছাই হতে। এবার সঠিক মাপের ভূমিগুলোর কিছু হয় না, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট এমাইনো এসিডের সৃষ্ট সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে ডবল ছাকনির মাধ্যমে নির্ভুল সংশ্লেষণটিই শুধু টিকে থাকে।

প্রুফ রিডিং তত্ত্ব যদি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় তবে এই বিষয়ে পরবর্তী অনুসন্ধান হবে : এই অলৌকিক প্রুফ-রীডার মাঝে মাঝে শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে কেন দেখা। এই প্রুফ রিডিং ব্যবস্থার সম্পূর্ণ আণবিক ছবিটা পাওয়া প্রয়োজন। বিশ্বে জীবনের প্রবাহ টিকিয়ে রাখতে প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবর্তনের একেবারে গোড়াতেই নিশ্চয়ই জীবদেহ প্রুফ রিডিং-এর এই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা লাভ করেছে।

সম্পাদকীয় [সেপ্টেম্বর '৭৯]

শিশু-বর্ষ কার জন্য?

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের আয়োজনে অনুসন্ধানীর একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী যেন সব এলোমেলো করে দিতে চাইছিল। প্রদর্শনীটির শিরোনাম "জীবন সংগ্রামে শিশু।" অনুসন্ধানীর কিশোর ফটোগ্রাফারদের তোলা এ সব আলোকচিত্রের মুখোমুখি হওয়া যেন রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া, যে বাস্তবতা আমরা শিশুবর্ষের উৎসব আয়োজনে ভুলে থাকতেই ভালবাসি। বিশেষ করে একটি ছবির বক্তব্য এই ভুলে থাকা প্রশ্নকে যেন নির্মমভাবে ছুঁড়ে দিয়েছে। সদরঘাটের লঞ্চ টার্মিনালের মেঝেতে সাত আট বছরের দুটি শিশু হাত-পা ছেড়ে পড়ে আছে। যেন এক একটা জীবন্ত কঙ্কাল, চোখে মুখে সারা দুনিয়ার বিষাদ। পাশে লেখা আছে "এরা দুজন কি আবার কোনদিন উঠে দাঁড়াবে? এটা নাকি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। সেই সুবাদে তো এটা ওদেরও বর্ষ হবার কথা ছিল।"

আমাদের বিশ্বাস আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষের মতো একটা কিছুকে যখন সারা দুনিয়া মিলে চিহ্নিত করে তখন তার মনে থাকে এমনিতরো দৃশ্যের চির বিলোপের প্রয়াস। কিন্তু আমাদের দেশে, যেখানে এই দৃশ্য ব্যতিক্রম নয়, বলা চলে এটাই নিয়ম, সেখানে এই কথাটি কি মনে রাখা হয়েছে? আর তা যদি না রাখি, সেদিক থেকে যদি কিছু না করি, তবে আমাদের কি অধিকার আছে গুটিকতেক সৌভাগ্যবান শিশুর জন্য বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী করার, সুন্দর সুন্দর ছড়া গানের ফুল ঝুরি সৃষ্টির। এই চিহ্নিত বছরটি শেষ হতে আর খুব বেশি বাকী নেই। পেছনে এটা রেখে যাবে অসংখ্য সমাবেশ, আনন্দ মিছিল, সেমিনার ইত্যাদির রেশ। অবশ্য শিশুপার্কের মতো দু'একটা জিনিস থেকে যাবে স্থায়ীভাবে। কিন্তু এইসব কিছুর মধ্যে এমন কিছু আমরা করলাম কি যার সাথে সদরঘাট টার্মিনালের সেই কপাল-ঠোকা শিশু দুটোর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক আছে? এই শিশু বর্ষটাই হয়তো তাদের জীবনের শেষ বর্ষ। তবে এসব কার জন্য?

অথচ আয়োজনের তো কমতি ছিল না। শিশুর বিষয় এখন দেশে সর্বোচ্চ স্তরে গুরুত্ব পাচ্ছে শুনি, এটা এখন মন্ত্রণালয়ের বিবেচ্য বিষয়, রয়েছে শিশু একাডেমী এবং তার বিভিন্ন শাখা। রয়েছে বহু বেসরকারী শিশু সংগঠন। কেউ কিছু উদ্যোগ নিলেন না এটাই তো অবাক কথা। শিশু একাডেমীকে এ প্রশ্ন আমরা অতীতে রেখেছি। তাঁদের বক্তব্য– তাঁদের কাজ ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নেয়া–শিশু-স্বাস্থ্য, শিশু-শ্রম এসব বাঁচা-মরার কথা নিয়ে ভাবা নয়। এর জন্য অন্য লোক আছে। কিন্তু সেই অন্য লোক কারা?

নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অমানসিক শ্রম দিয়ে নিজেই জীবন সংগ্রামে নেমেছে ছয় বছরের যে শিশু-তার জন্য কি আমাদের কিছুই করার নেই?

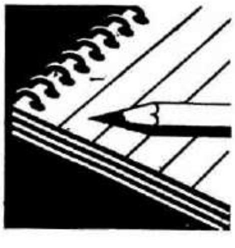

সম্পাদকীয়

[অক্টোবর-'৭৯]

আবদুস সালামের সেই ডাক

অধ্যাপক আবদুস সালাম নোবেল পুরস্কার লাভের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। নোবেল কমিটির একটি সাম্প্রতিক ঘোষণায় দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানীর সাথে পদার্থবিদ্যায় এ বছরের নোবেল পুরস্কার এই প্রতিথযশা পাকিস্তানী বিজ্ঞানীকে দানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কণিকা-বিদ্যায় 'দুর্বল বিক্রিয়া' এবং 'বিদ্যুৎ চৌম্বক বিক্রিয়ার মধ্যে একটি একীভূত তত্ত্ব দেয়ার লক্ষ্যে তাঁর এবং ভাইনবার্গের সাফল্যের জন্যই এই পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে আইনষ্টাইন তাঁর জীবনের শেষ দিকে বিভিন্ন বিক্রিয়া বলের মধ্যে যে একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের সন্ধান করে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সালাম ও ভাইনবার্গের আবিষ্কার সেই লক্ষ্যে একটি সফল পদক্ষেপ।

অধ্যাপক সালামের নোবেল পুরস্কার অপ্রত্যাশিত ছিল না। আধুনিক পদার্থবিদ্যাকে গত দুই দশকের অধিক কাল ধরে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ করেছেন। বহু দিন পর উপমহাদেশের একজন সন্তান বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন, প্রথম একজন মুসলিম বিশ্ব বিদ্বৎসমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মানে ভূষিত হলেন– এই সবই আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। কিন্তু আমাদের কাছে সালাম তার চেয়েও কাছের মানুষ; বরাবর ছিলেন, এখনো আছেন। এই কাছের মানুষ হবার প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিলো বহুদিন আগে থেকে। ১৯৬১ সনে ঢাকায় জাতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে এদেশের দারিদ্র দূরীকরণে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা সম্বন্ধে যা তিনি বলেছিলেন তা আজও এই বিষয়ে একটি ক্লাসিক বক্তব্য হয়ে আছে। তরুণ ছাত্রদেরকে সরাসরি তিনি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে জোরালো তর্ক তোলার পরামর্শ দেন– রেঁস্তোরার কাব্য বিলাস বাদ দিয়ে। তিনি ডাক দিয়েছিলেন দেশকে কারিগরী-সংস্কৃতির দিকে নিয়ে যেতে, নিজের হাতে দারিদ্র্যের কলঙ্ক মুছে ফেলতে। ভীষণ নাড়া দিয়েছিল আমাদেরকে সেই ডাক। সেই থেকে অধ্যাপক সালাম গবেষণা করেছেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার উচ্চ মার্গে, কিন্তু বরাবর তাঁর পা ছিল মাটিতে। নিজের দেশের এবং তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্রপীড়িত মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন, এখানকার সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের জন্য সঠিক দিকদর্শন ও সুযোগ সৃষ্টি তাঁর চিন্তা ও কাজকে অনেকখানি দখল করে ছিল। আজ ত্রিয়েস্তের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে তাঁর প্রচেষ্টা এরই ফলশ্রুতি। তিনি যে নিজ দেশের সুযোগবঞ্চিতদের শিক্ষার জন্য নোবেল পুরস্কারের টাকাটা দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটাও তাঁর পক্ষে অতি স্বাভাবিক কাজ।

বিজ্ঞান সাময়িকীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল সালামের একষট্টির সেই আহ্বানের প্রায় একই সময়ে। যাত্রাপথে তা এই নতুন পত্রিকাকে সেদিন প্রচুর অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে আরো সরাসরি যোগাযোগ হয়েছে এই পত্রিকার। অল্প কিছুদিন আগেও ত্রিয়েস্তে সালামের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার নেয়া হয় বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য। তাতে নানা বিষয়ে তাঁর আজকের চিন্তা-ভাবনা সবিস্তারে তিনি আলোচনা করেছেন।

সুখবরটি তাই আমাদের কাছে একেবারে নিজেদের সুখবর বলে মনে হচ্ছে। বিজ্ঞান সাময়িকী অধ্যাপক সালামকে তাঁর বিশ্বনন্দিত পুরস্কারের জন্য প্রাণ-ঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছে।

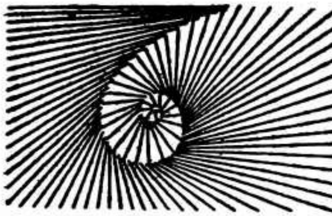

অবশেষে বিশ্ব বসন্তমুক্ত

[অক্টোবর-'৭৯]

ডোনাল্ড হেণ্ডারসন

এপ্রিল ১৭.১৯৭৮। নাইরোবী, কেনিয়া থেকে আসা একটা টেলিগ্রাম আমার টেবিলে।

"অনুসন্ধান সমাপ্ত হয়েছে। আর একটিও ঘটনা আবিষ্কৃত হয়নি। আলী মায়াও মালিনই বিশ্বে সর্বশেষ জানা বসন্ত রুগী।"

দশটি শ্রমসাধ্য বছর আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) বসন্ত নির্মূল অভিযান পরিচালনা করেছি। এই অভিযানে বিশ্বের ৫৫টি দেশের প্রায় ৭০০ উপদেষ্টা এবং দুই লক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী অংশ নিয়েছে, বসন্ত রোগকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য। এখন মনে হচ্ছে আমরা লক্ষ্যে পৌছে গেছিঃ ভয়াবহ আতঙ্করূপী এই রোগ আর নেই– মানুষের নিজের চেষ্টায় নির্মূলকৃত প্রথম রোগ এটি। অবশেষে বিজয় অর্জিত। মানসিকভাবে আমি নিথর হয়ে পড়েছিলাম।

আলি মালিন ছিল হাসপাতালের বাবুর্চী। উচ্চ জ্বরের সঙ্গে সে এই রোগে আক্রান্ত হয়। পাঁচ দিন পর আসল রোগের হদিশ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ ব্যবস্থা নেয়া হয়। মালিনের সরাসরি সংস্পর্শে এসেছিল এমন ১৬১ জনকে খুঁজে WHO- এর কর্মচারীরা জীবাণুরোধক ইঞ্জেকশন দিয়ে দেয়। ব্যস, এতেই কাজ হলো। আর কারো রোগটি হলো না। এছাড়াও বাড়ী বাড়ী ঘুরে, ওয়াডেনের মরু অঞ্চল, কেনিয়া, ইথিয়োপিয়া, জিবুতি সর্বত্র হাজার হাজার শহর চষে রোগের সন্ধান করা হয়। জল বসন্ত এবং হরেক রকম চর্মরোগের রোগীর সন্ধান এ সময় পাওয়া যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে এগুলো গুটি বসন্ত নয়।

মালিনই যে পৃথিবীর শেষতম গুটি বসন্ত রোগী-সরকারীভাবে তা ঘোষণার জন্যই উপরোক্ত অঞ্চলগুলো সূচ খোঁজার মত করে তন্নতন্ন করে খোঁজা হয় এবং অবশেষে স্থির করা হয় যে, ১৯৭৯-সালের অক্টোবর নাগাদ পৃথিবী গুটি বসন্তমুক্ত– এই সরকারী ঘোষণাটি দেয়া হবে। আমরা অবশ্য আগেই নিশ্চিত ছিলাম আলি মালিনই ছিল পৃথিবীর শেষতম বসন্ত রোগী, যেই রোগ শুরু হয়েছে বিশ্বের লিখিত ইতিহাস শুরু হবারও অনেক আগে। ১৯৭৮ এর আগষ্টের শেষের দিকে বার্মিংহামের বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগার থেকে একজন মহিলা মেডিকেল ফটোগ্রাফার গুটি বসন্তে আক্রান্ত হন ও মারা যান। তাঁর মা-ও আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে এই আক্রমণ স্বাভাবিক নয়। গবেষণাগারে রক্ষিত জীবাণুই এর কারণ।

এই দুর্ঘটনা একটা জিনিস বুঝিয়ে দেয় যে, পৃথিবী গুটি বসন্তমুক্ত হলেও, পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে রক্ষিত জীবাণু যে-কোন সময় আবার পৃথিবীকে সংক্রমিত করতে পারে। তাই WHO বর্তমানে জীবাণু সংরক্ষণের কেন্দ্রের সংখ্যা ৭৬ থেকে ১২ এবং কালক্রমে শূন্যে নিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছে।

গুটি বসন্তের জীবাণু সাংঘাতিক রকম সংক্রামক। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে তা একজন সুস্থ লোককে অনায়াসে সংক্রামিত করতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জীবাণু শরীরে ঢোকার ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে প্রচণ্ড জ্বরের সঙ্গে ছোট ছোট গুটি বেরিয়ে আসে। গুটিগুলো থাকে পুঁজে পূর্ণ। অবশ্য শৈশবেই যদি প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন

দেয়া থাকে– তবে ভয়ের কারণ থাকে না খুব একটা। এই মারাত্মক রোগে মৃত্যুই স্বাভাবিক এবং যারা বেঁচে যায়, শরীরে চিরকালীন চিহ্ন থেকে যায় ও সময়ে সময়ে অন্ধও হয়ে যায়। এর কোন চিকিৎসা ও নেই; একমাত্র প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন ছাড়া – যা শৈশবে দেয়া হয়।

প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেয়া না থাকলে, শরীর সব সময়ই গুটিবসন্ত জীবাণুর প্রতি দারুণ সংবেদনশীল থাকে ; এই জীবাণু যে কোন জলবায়ুতে অনায়াসে বেঁচে থাকতে ও ছড়াতে সক্ষম। কর্টেস প্রথম আমেরিকায় এই জীবাণুটি নিয়ে যায় এবং ফলস্বরূপ, সাড়ে তিন মিলিয়ন রেড ইণ্ডিয়ানের মৃত্যু ঘটে, এমনকি ইনকা ও আস্তেক সভ্যতা ধ্বংসের কারণও গুটি বসন্ত। বলা যায় যে, উত্তর আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের এভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়।

ইউরোপের অবস্থা যে খুব একটা ভাল ছিল বলা যায় না। লর্ড মেকলের লেখায় দেখা যায়, সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের গীর্জার চত্বর গুটি বসন্তে মৃত লাশের স্তূপে ভরে গেছে। প্রেমিকার চোখে মৃত প্রেমিকের জন্য দুঃখের বদলে ভীতি খেলা করেছে।

১৭৯৬ সালে বিলাতের একজন দেশীয় চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার প্রথম লক্ষ্য করেন যে, "কাউপক্স" বা গরুর যে গুটি বসন্ত হয়– তা থেকে মানুষের প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন তৈরি করা সম্ভব এবং এরপর থেকে প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন "কাউপক্স" থেকেই তৈরি হচ্ছে।

১৯৪০-এর মধ্যেই আমেরিকা এবং ইউরোপ গুটিবসন্তমুক্ত হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তা মহামারীর আকারেই রয়ে যায় এবং সময়ে সময়ে মুক্ত এলাকায় সংক্রমণে সহায়তা করে। সঙ্গত কারণেই স্বাস্থ্য দফতরের তা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর কোন রোগ সম্বন্ধে বোধ হয় তাঁরা এত ভাবিত নন। তাই দেশ থেকে দেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রতিষেধকের ব্যাপারে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেয়া হয়।

১৯৫৯ সালে WHO বসন্ত নির্মূলের প্রচেষ্টা নেয়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। কারণ, অধিকাংশ দেশেরই সামর্থ ছিল সামান্য এবং WHO-এর সাহায্যেরও পরিমাণ বেশি ছিল না। আমি কাজ করছিলাম ১৮টি পশ্চিম আফ্রিকার দেশের জন্য এজেন্সী ফর ইন্টান্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের কার্যক্রমে। আটলান্টার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল হাম ও বসন্ত নিয়ন্ত্রণের এই কর্মসূচীর উদ্যোক্তা। (আমি প্রত্যক্ষভাবে সপ্তায় সাতদিন এই কার্যক্রমের পরিকল্পনা, কৌশল এবং কর্মীদের সমস্যার মধ্যে ডুবে ছিলাম।) এর মধ্যে WHO ১৯৬৬ সালের মে মাসে বিশ্বকে গুটিবসন্তমুক্ত করার উদ্যোগ শুরু করে।

দশ বছরের মধ্যে গুটি বসন্ত নির্মূলের লক্ষ্য স্থির হয়। অনেকে অবশ্য সন্দিহান ছিলেন। কারণ, ম্যালেরিয়া এবং পীতজ্বর নির্মূল অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। তাই এটাও ব্যর্থ হওয়া স্বাভাবিক। বসন্ত সহজেই দেশের সীমানা অতিক্রম করে। পৃথিবীর পঞ্চাশটি আক্রান্ত দেশে একই সাথে অভিযান চালানো দুঃসাধ্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে যখন এদের মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলো, বিশাল, অগম্য এলাকা বিশিষ্ট দেশ, যেখানে লোকে একজন স্বাস্থ্যকর্মীও জীবনে দেখেনি।

হঠাৎ করে WHO-এর ডিরেক্টর জেনারেলের তলব পেয়ে অবাক হলাম: আমাকে অভিযানের নেতৃত্ব দিতে হবে। আমার দ্বিধা ছিল। দ্বিধা ঘনীভূত হলো যখন একজন সম্মানিত সহকর্মী বললেন "দেখো যদি তুমি মনে করো আমলাতন্ত্রের সাথে যুঝে তুমি কষ্টে আছ, তবে সেই কষ্টকে জাতিসংঘের সদস্য-দেশের সংখ্যা দিয়ে এবার গুণ করে দিতে পার। তোমার সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই নেই।"

এটা সময়ের অপচয়মাত্র হবে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আমি আমার উপরিওয়ালাকে তা বলে পাঠালাম। তিনি জানালেন এটা হুকুম–অন্ততঃ নয় মাসের জন্য এ দায়িত্ব আমাকে নিতেই হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সপরিবারে WHO-এর সদর দফতর জেনেভা রওয়ানা হয়ে গেলাম। তখন ভাবতেই পারিনি কি কাহিনী সামনে অপেক্ষা করছে : পাকা এগারটি বছর এই আবাসে আর ফিরে আসা হবে না তা কি তখন জানতাম!

কাজের বিরাটত্ব সত্ত্বেও বসন্তের প্রকৃতিটা কিছুটা আশার সঞ্চার করলো। অন্য অনেক রোগের মতো বসন্তের জীবাণুর মানুষ ছাড়া অন্য কোন আধার নেই। মুখামুখি স্পর্শ না ঘটলে সংক্রমণ সাধারণতঃ হয় না, একজন রোগী তাই জনা পাঁচেককে বড়জোর সংক্রমিত করতে পারে। রোগ ছড়াবার গতি ধীর। শরীরের দাগের কারণে রুগী কখনো ব্যাপারটি লুকাতে পারে না। শুধু বিস্তৃতি বন্ধ করার জন্যই আমাদের জানতে হয়েছে রোগ কোথায় কোথায় রয়েছে।

ও সময় বসন্ত রোগ প্রাদুর্ভাবের খবর রিপোর্ট করার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত বাজে। কোন কোন দেশ অনিয়মিতভাবে রিপোর্ট করতো। কেউ কেউ বলতো তাদের দেশে বসন্ত নেই। ১৯৬৭ সালে ১৩১,০০০টি কেইসের খবর আসে। এখন আমাদের ধারণা আসলে তখন ৪৪টি দেশে এক কোটি থেকে দেড় কোটি লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ভ্রাম্যমান স্বেচ্ছাসেবী পাঠিয়ে সত্যিকার চিত্র সংগ্রহের অভিযান চালানো হয়। ধীরে ধীরে কার্যক্রমের বিশালত্বটা আমাদের কাছে ধরা পড়লো। এতে যে চিত্র ধরা পড়ল, হিসেব-নিকেশে দেখা গেল, এরজন্য বছরে ২০০ থেকে ২৫০ মিলিয়ন প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন ডোজ দরকার। তাই দানখয়রাতের পথ ধরতে হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন– যে প্রাথমিক কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল এবং আমেরিকা–এরাই হল সবচে বড় দাতা দেশ এবং আরো চল্লিশটি দেশের দানও WHO-এর ফাণ্ড—সব মিলিয়ে প্রতিষেধক তৈরির ল্যাবোরেটরী বসানো হয়। এদের অধিকাংশই বসানো হয় সংক্রামিত দেশগুলোতে। প্রতিষেধক টিকার জন্য ওয়াইথ ল্যাবোরেটরী উন্নতমানের সূঁচ ডিজাইন করে দেয় এবং প্যাটেন্টের দাবীও ছেড়ে দেয়।

নতুন সূঁচের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিষেধক ঔষধ লোকের শরীরে ঢোকানো যায় এবং যারা ইঞ্জেকশন দেবে তাদের ট্রেনিং দিতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগে না। আগে এক শিশি ওষুধে যেখানে মাত্র ২৫ জনকে টিকা দেয়া যেত, নতুন পদ্ধতিতে তাতে ১০০ জনকে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এভাবে অপচয় রোধ করা হয়। অভিযানের বন্দুক আর বুলেট অর্থাৎ সূঁচ ও প্রতিষেধকের সরবরাহ নিশ্চিত করে আমরা দেশের পর দেশে কাজে নামলাম। ১৯৬৯ সাল থেকে অধিকাংশ দেশে এবং ১৯৭১-এ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে জোর অভিযান চালানো হয়। ১৯৬৭ পর্যন্ত গণ-টিকা দান মোটামুটি নিয়মিত কাজ ছিল। কিন্তু শতকরা ৯৫ জনকে টিকা দিয়েও দেখা গেছে রোগ বিস্তার সবসময় বন্ধ হয়নি।

আমরা একটা নূতন কৌশল যোগ করলাম– যাকে বলা হলো পাহারাদারীর মাধ্যমে সীমাবদ্ধকরণ। খবর পাবার এবং প্রাদুর্ভাব আবিষ্কার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অগ্নি-নির্বাপক দলের মতো দল গঠন করা হলো। এসব দল তড়িৎ সংক্রামিত এলাকায় ছুটে গিয়ে রুগীদেরকে আলাদা করে এবং পুরো গ্রামকে গ্রাম টিকা দিয়ে দেয়। এই সংক্রমণের উৎস আবিষ্কার করে তারা অন্যান্য সংক্রমণ এলাকা বের করে এবং তাও সীমাবদ্ধ করে ফেলে। এভাবে একের পর এক সংক্রমণের চেইনগুলো তারা ভাঙ্গতে সক্ষম হয়।

নাইজেরিয়াতে বিল ফয়েজের অভিজ্ঞতায় দেখা গেলো এই নতুন পদ্ধতি আশাতিরিক্ত ফলপ্রসূ। তাই একে আমরা গণ-টিকা দানের চাইতে প্রাধান্য দিলাম। বিল এখানে এসেই একটা রেডিও নেটওয়ার্কের সৃষ্টি করলেন রিপোর্টিং-এর জন্য। তারপর জানা প্রাদুর্ভাবগুলো থেকে তিনি টিকাদান ও সীমাবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। পরে তাঁর পুরো সরঞ্জামাদি যখন এলো দেখা গেল বসন্ত আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না– অথচ টিকা দেয়া হয়েছে জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম অংশকে।

১৯৭০ সালের মধ্যে বসন্ত অধ্যুষিত দেশের সংখ্যা ৩৩ থেকে ১৭-তে নেমে এলো। আর ১৯৭৩-এর মধ্যে এ সংখ্যা নেমে এলো মাত্র ছয়তে। কিন্তু হলে কি হবে এর মধ্যে ছিল ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং নেপাল– সত্তর কোটিরও বেশি লোকের বাসস্থান। জনৈক ইংরেজ প্রফেসর আমাকে বলেছিলেন 'মনে রেখো এশিয়া হলো বসন্তের আদি নিবাস। দক্ষিণ আমেরিকা আর আফ্রিকা থেকে একে তাড়ানো এক কথা, এশিয়া থেকে, কখ্খোনো সম্ভব নয়।'

আমারও এই ভীতি ছিল, কিন্তু ১৯৭৩ সালে ঘটনার মোড় ফিরে গেল। সেই বছরের অত্যন্ত গ্রীষ্মকাতর দিনগুলো আমরা কাটাচ্ছিলাম আমাদের ভারতীয় সহকর্মীদের সাথে মিলে নূতন কর্মধারা, ট্রেনিং প্রোগ্রাম আর রিপোর্টিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে। আক্রমণ শুরু হলো শরৎকালে। হাজার হাজার বসন্তের ঘটনা পাওয়া গেল। কিন্তু সীমাবদ্ধকরণের কড়াকড়ির ফলে বিস্তৃতি মন্থর করে আনলো। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেবার জন্য চৌকিদার নিযুক্ত করা হলো যেন রোগী ঘরের বাইরে যেতে না পারে এবং আগন্তুকদের সবাই টিকা নেয়। ওখানকার পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের বৃত্ত ঘিরে সবাইকে টিকা দেয়া হতো। লিপিবদ্ধ ঘটনার সংখ্যা বাড়তে লাগলো, রিপোটিং পদ্ধতি উন্নয়নের ফলে সংবাদপত্রগুলো এবার দুর্যোগ ঘোষণা করতে লাগলো।

অবশেষে মনে হলো সমাপ্তি সন্নিকট। আমাদের পাহারাদারী আরো কড়া হলো। ১৯৭৪ সালে শেষ কেইস পাওয়া গেল পাকিস্তানে। ১৯৭৫-এ নেপালে এবং ভারতে। ১৯৭৫ সালের ১৬ই অক্টোবর রহিমা বানু নামে তিন বছর বয়সী একটি বাংলাদেশী মেয়ের রোগ দেখা দিলে সেটাই ভয়াবহ এশিয় বসন্ত রোগের শেষ ঘটনা বলে প্রমাণিত হলো। মেয়েটি বেঁচে গিয়েছিল।

১৯৭৬-এর শুরুতে শুধু ইথিওপিয়া রইলো বসন্তের আওতায়, অবশ্য সেটা অপেক্ষাকৃত অনেক মৃদু ধরনের বসন্ত। সে দেশে কাজ করা তখন প্রায় অসাধ্য—গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং মুষলধারে বৃষ্টিতে সেই দেশ তখন বিপর্যস্ত।

গৃহযুদ্ধের সাথে যুক্ত হলো সোমালিয়ার সাথে যুদ্ধ। আমাদের তদারকী দলগুলো গেরিলাদের দ্বারা ছিনতাই হলো, এক এক সময় সপ্তাহ কি মাসের জন্য গায়েব হয়ে গেল। তাদের হেলিকপটারে রাইফেলের গুলী নিক্ষিপ্ত হলো– একটাতো গ্রেনেড দিয়ে উড়িয়েই দেয়া হলো। কয়েকজন কর্মী নিহত হলো, বেশ কজন আহত হলো।

১৯৭৬-এর আগষ্টে শেষ জানা রুগী পাওয়া গেল ওগাডেন মরুভূমির এক যাযাবর তাঁবুতে।

মনে হলো অবশেষে জয় বোধ হয় হাতের মুঠোয়। কিন্তু ইথিওপিয়ার শেষ রুগী যখন পাওয়া গেল, ইতিমধ্যে রোগ পূর্বে অনাক্রান্ত সোমালিয়ায় আমদানী হয়ে গেছে। অনিবার্য দুর্ভাগ্যজনক বিলম্বের শিকার হতে লাগলো আমাদের প্রচেষ্টা। তিন হাজারের বেশি লোক এখানে আক্রান্ত হলো। কিন্তু অক্টোবর ১৯৭৭-এর মধ্যে এর মাত্র দুটি ঘটনা রইলো। ওদের একজন থেকেই আলী মালিন আক্রান্ত হয়েছিল।

বসন্ত আর মানব সমাজকে আক্রমণ করছে না। এর অবশিষ্ট জীবাণু পাওয়া যাবে শুধু গুটিকতেক ল্যাবোরেটরীতে অত্যন্ত সতর্ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে।

নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দেয়াও সর্বত্র বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা কি আমাদের প্রথম আদি প্রতিষেধককে একেবারে ত্যাগ করতে পারি? অন্য প্রাণীর মধ্যে জীবাণুর আধার যে নেই সেটা কি নিশ্চিত? গত দশ বছর ধরে বসন্তের প্রত্যেকটি প্রাদুর্ভাবের তদন্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটিরই কোন না কোন পূর্ব উৎস পাওয়া গেছে। কোনটাই আপনা থেকে শুরু হয়নি।

বসন্তের জীবাণুকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু সেটার সুযোগ কম, কারণ এর বিস্তৃতি মন্থরগতি এবং টিকা দিয়ে প্রতিরোধ সম্ভব।

সাবধানতার জন্য WHO এবং বিভিন্ন সরকার প্রতিষেধক জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে। আরেকটা প্রাদুর্ভাব দেখা দেবার সম্ভাবনা খুব কম, তবুও আমরা প্রস্তুত। প্রথমবারের মতো শিশুরা একটি বসন্তমুক্ত বিশ্বে জন্ম নিচ্ছে। আমার দৃঢ় আস্থা আছে, তাদের সন্তান ও নাতিনাতকুররাও এই মুক্তি উপভোগ করবে।

এরজন্য অভিনন্দন জানাতে হয় লক্ষ লক্ষ স্বাস্থ্য-কর্মী এবং WHO কর্মীদের যাঁরা অসাধ্য সব সমস্যার সমাধানে একের পর এক কৌশল প্রয়োগ করে গেছেন। আমার মনে পড়ে বাংলাদেশের এক ছোট্ট গ্রামে এক ভ্যাপসা গরম রাতের কথা। ময়লা শরীরে, খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি নিয়ে আমাদের অদ্ভুত দলটি একটা টেবিলের চারপাশে নিবিড় আলাপে ব্যস্ত-কয়েকজন বাংলাদেশী, একজন সোভিয়েট নাগরিক, একজন ইন্দোনেশিয়ান, একজন ব্রাজিলিয়ান এবং একজন সুইস। ভীষণ তর্ক হচ্ছিল। কিন্তু তর্কের বিষয়ের সাথে জাতীয়তার কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের সবার দৃষ্টি সবার সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভাল কৌশল প্রয়োগের উপর।

আর এর বিরুদ্ধে বিজয় আমাদের হয়েছে– সব জায়গার আমাদের সকলের।

অনুবাদ : বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র

বঙ্গোপসাগরের ট্রলারে

[ডিসেম্বর–১৯৭৯]

বিষ্ণু দাশ

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র হিসেবে স্নাতকোত্তর গবেষণা করতে গিয়ে লেখক কয়েক মাস বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন ট্রলারে কাটান। তাঁর গবেষণার কাজ ছিল সামুদ্রিক মাছগুলোর সংগ্রহ ও শ্রেণী বিন্যাস সংক্রান্ত। এই উপলক্ষে সাগর-বুকে মাছ ধরা নিয়ে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাই নিয়ে এই লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। [সম্পাদক]

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। নভেম্বর মাসের শেষ দিন। পরপর দুটো ট্রলবোট ছিঁড়ে চলে যাওয়ায় সকলের মনেই একটা নৈরাশ্যের ভাব জেগেছিল শুরুতেই। "আপনার ভাগ্য খারাপ" এ ধরনের কথা মুখে মুখে বেশ কিছুক্ষণ চলছিল। ক্যাপটেন বললেন ৭/৮ টন মাছ পেলেই হারবারে ফিরে যাব। আকাশটাও ছিল বেশ মেঘলা, তৎসঙ্গে ২০/২৫ মাইল বেগে ঝড়ো হাওয়াও বইছিল। স্রোতের গতিবেগের সাথে সম্ভবতঃ ঝড়ে পড়ে যাওয়া কোন ভেসে যাওয়া ছোট-খাট নৌকা হঠাৎ ট্রলে আটকে যাওয়াই ছিল ট্রল বোট সহ জাল ছিঁড়ে চলে যাওয়ার কারণ। সকলের মনে এই সন্দেহ। তবুও ক্যাপটেনের আদেশে আবার একটা নতুন জাল ফেলা হলো সাগরের বুকে। একধারে বিশাল সমুদ্রের বিশাল ঢেউ অপরদিকে সেই ঢেউয়ের তালে- তালে হেলেদুলে মাছ ধরে চলছে 'টুনা'। যেদিকে তাকাই সেদিকেই শুধু পানি আর পানি। মনে হয় যেন চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে মেঘলা আকাশ। তবে নৈরাশ্যের অবসান ঘটিয়েছিল ট্রলারের রেডিওটা। আজও মনে পড়ছে– একটানা গানের তালে তালে সাগরে মাছ ধরার দৃশ্য। জীবনে এবারেই প্রথমবারের মত দেখলাম কি করে ট্রলারে করে মাছ ধরে, কিভাবে স্বয়ংক্রিয় অত্যাধুনিক মাছ ধরার যন্ত্র কুড়িয়ে নেয় সমুদ্রের রূপালী সম্পদকে।

সমুদ্র-ঝড়ের কথা পড়েছিলাম– এখন সত্যি সত্যি শিকার হলাম ছোটখাট একটার। প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা ধরে একটানা রোলিং চলছে। রোলিং এর গতিও আগের চেয়ে বেশী। শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। Sea Sickness-এর কথা শুনেছি। মাথা ধরেই আছে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই শুধু ছোট বড় ঢেউয়ের মেলা। কিন্তু কি আশ্চর্য। এই ঝড়ের মাঝে গাঙচিল পাখিগুলো একটানা মাছ ধরেই চলছে। মনে হল ঝড় যেন ওদের সৌভাগ্য। কেননা ছোট বড় ঢেউয়ের শীর্ষে ছোট ছোট মাছগুলোর সাথেই ওদের কতটুকু শত্রুতা। একটার পর একটা ছোবল মেরে ধরেই চলছে। কখনো বা ট্রলারের পিছনে কখনো বা ট্রলারের সামনে, কখনো ট্রলারের পাশে, মনে হয় কি যেন অনুসন্ধান করে চলছে ওরা। কোন বিরাম নেই ওদের, ছোট ছোট মাছ ধরে জীবনযাপন করাই এদের অভ্যাস। সূর্যোদয়ের আগে থেকেই শুরু হয় এদের মাছ ধরা, চলতে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। যতটুকু বিশ্রাম করে ঢেউয়ের দোলায় ভেসে ভেসে। সমুদ্রে আমাদের প্রায় নিত্য সঙ্গী ছিল এই গাঙচিলগুলো। ভাবতে অবাক লাগতো কোথায় যায় এরা রাতের বেলায়। কোথায় এদের বাসাবাড়ী। কিভাবে নির্দেশ করে এদের গন্তব্য পথ– এই সীমাহীন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, কি করে বা চিনত এদের গন্তব্য স্থান-ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাণিবিদ্যার শ্রেণী বিন্যাসে এরা ল্যারাস (Larus) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। দিনের বেলায় এই গোত্রের প্রাণীগুলো মাছ ধরে খায় রাতের বেলায় সাগরের কিনারায় বা সাগরের তীরে বালু-মাটিতে গর্ত করে রাত কাটায়। এরা শীতের বা শরতের সকালে একত্রে খাবার সংগ্রহ করে ও চলাফেরা করে. শত্রুর সন্ধান পেলে দলবদ্ধভাবে স্থান ত্যাগ করা থেকে শুরু করে এমন কি একত্রে রাত্রি যাপন পর্যন্ত করে থাকে। বসন্ত কালে এরা দলবদ্ধভাবে প্রজননের জন্য নদীর তীরে বা সাগরের তীরে বাসা বাঁধার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজতে বের হয়। স্থান নির্বাচনের পর এই পাখিগুলির মধ্যে এক রকম সয়ম্ভর সভা হয়ে থাকে। স্ত্রী-পাখি যে তার দৈহিক নানান ভঙ্গিমা দেখিয়ে তার ইচ্ছামত বা সুনির্দিষ্ট কোন পুরুষ পাখিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। তদ্রুপ পুরুষ পাখিটি তার লেজ খাড়া করে স্ত্রী-পাখির চারিদিকে ঘুরতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ, উভয়ের মত বিনিময়ের পরে তারা একত্রে প্রজনন স্থানে বাসা বাঁধার জন্য উড়ে যায়। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে বাচ্চাদের-লালন পালন করার মধ্যেও পিতা-মাতা উভয়েই পর্যায়ক্রমে করে থাকে।

বেশ একটা আনন্দ লাগছিল ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাঙচিল পাখিগুলোর মাছ ধরার কৌশল দেখতে। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার দীর্ঘস্থায়ী হল না। ডেক ছেড়ে ক্যাপটেন ব্রিজে এসে একটা আরাম কেদারায় বসে পড়লাম, কেমন যেন মাথা খাড়া করতে পারছিলাম না. ক্যাপটেন মিত্র আমার অবস্থা দেখে আমাকে একটা মাথা ধরার টেবলেট দিয়ে বললেন "Young man Don't worry. Look at the sea and enjoy it. This is also a part of your Thesis" চেয়ারটায় বসে বসে ভাবছি কি অদ্ভুত এদের জীবন। কোন বিশ্রাম নেই এদের। মাছ ধরা আর মাছ ধরা। মাছ ধরাই এদের যেন একটা স্বভাব। দিন-রাত সংগ্রাম করে চলছে জাহাজ নিয়ে সাগরের বুকে, রোদ-বৃষ্টি ঝড় ঝাপটের সাথে এদের মিতালী। হাওয়ার তালে জাহাজ দুলতে শুরু হলে এদের মনে যেন আনন্দ আর ধরে না। একদল হয়তো বা তাস, দাবা, না হয় প্রোজেকটারের সাহায্যে ছবি দেখতে আর একদল জাহাজ চালানোর কাজে ব্যস্ত থাকে। এভাবে চলতে থাকে দিনের পর দিন রাতের পর রাত।

ভাবছিলাম কেবিনে গিয়ে শুয়ে থাকব কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু ক্যাপটেন মিত্র সে সুযোগ আমাকে দিলেন না।

ট্রলির অপারেটিং যন্ত্রের শব্দ শুনে ক্যাপটেন-ব্রিজ থেকে ফিশিং ডেকে নেমে এসে দেখলাম সুবোধদা জাল তোলার জন্য সবকিছু প্রস্তুত করে নিচ্ছে। নাবিকরা যে যার পোষাক পরে নিচ্ছে জাল তোলার জন্য। সুবোধদার সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল দুদিন পূর্বেই। প্রায় ৮ বছর যাবৎ 'উদয়ন' নামক ট্রলারে ট্রল মাষ্টার হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। যেমনি তার স্বভাব প্রকৃতি তেমনি দক্ষতার দিক থেকেও অতুলনীয়। বিন্দুমাত্র রাগ নেই শরীরে। খুঁটিনাটি অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করছিলাম বেশ কিছুক্ষণ ধরে, স্বহাস্যে সবকিছুই বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করছিলেন যতটা সম্ভব। এতটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ট্রলার দেখিনি কোনদিন। তাই ট্রলারের অনেক জিনিসই আমার কাছে নতুন লাগছিল। যেমন কি করে জাল ফেলা হয়, কি করে আবার জাল তোলা হয়, কি করে ধৃত মাছগুলো পরিষ্কার করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছিলেন ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুবোধ দা।

সবকিছু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। জাল ফেলা থেকে শুরু করে জাল তোলা পর্যন্ত সবকিছুই যন্ত্রের সাহায্যে চলছে। এই জালগুলো নানা রকমের হয়ে থাকে। যেমন গেলনেট, ট্রলিংনেট, অটার ট্রল ইত্যাদি ইত্যাদি। ট্রলিং নেটগুলোই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। এই ট্রলিং নেটগুলো সাধারণতঃ ১৫০ ফুট থেকে ৯৫০ ফুট পর্যন্ত বা তার চেয়ে বেশি বড় হয়ে থাকে। এই জালগুলোর একটিমাত্র মুখ ও পিছনের দিকে বেশ বড় ধরনের একটি থলের মত থাকে। এই থলের জালের খোপ (মেশ) খুলো জালের দেহের খোপ বা মেশগুলো অপেক্ষা অনেক ছোট। সাধারণতঃ ২ ১/২ থেকে ৪ ১/২ ইঞ্চি হয়ে থাকে। এই ফাঁকের মধ্য দিয়ে এমনকি ছোট ছোট মাছগুলোও যেতে পারে না। মাছ ধরার সময় এই জালগুলোর মুখ প্রশস্ত রাখার জন্য জালের সাথে সংযুক্ত চেইনের সাথে দুইটি ট্রলিং বোট থাকে। এই ট্রলিং বোটগুলো নির্ভর করে ট্রলের আকার, গতিবেগ, জালের মুখের দৈর্ঘ্য ও জালের সাথে সংযুক্ত চেইনের ক্ষমতার উপর। ট্রলিং-এর সময় ট্রলারগুলো ৩/৪ মাইল বেগে চলতে থাকে এবং প্রায় তিন/চার ঘণ্টা পর পর জাল তোলা হয়। এমনিভাবে চলতে থাকে সমুদ্রে মাছ ধরা দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন।

জাল তোলা দেখতে দেখতে জাহাজের গতিবেগ একেবারেই কমে এলো। এদিকে সুবোধদার ট্রল অপারেশনও প্রায় শেষ। দূর থেকেই জালে আটককৃত মাছের থলিটা দেখা যাচ্ছিল, আনুমানিক পাঁচ টনের মত হবে। সকলেই জাল তোলার জন্য ব্যতিব্যস্ত। ক্যাপটেন সাহেবও জাহাজের গতিবেগ বন্ধ করে ডেকে চলে এলেন মাছ দেখতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাছের থলিটা ডেকের উপরে চলে এলো। সকলের মনেই আনন্দ আর ধরে না। থলির তলদেশের বন্ধনীটা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ডেকটাই পরিপূর্ণ হয়ে গেল মাছে। ছোট বড়, লাল, সাদা, কালো কত রকমের মাছ। মনে হল যেন মাছের মেলা বসেছে।

সকলেই ভেবেছিল এবারে বোধ হয় শুন্য জাহাজ নিয়ে ফিরে যেতে হবে। সে আশংকা কেটে গেল। চেয়ে চেয়ে শুধু দেখলাম মাছ আর মাছ। জীবনে এত মাছ এক সঙ্গে কোনদিন দেখিনি, তাই একটু আশ্চর্যও লেগেছিল বটে। মনে হল এই বিশাল সমুদ্র শুধু মাছেই ভরা।

সমুদ্রের এই মাছগুলোকে প্রাণিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) প্লাজিক (২) ডেমার্সাল। প্লাজিক শ্রেণীর মাছের মধ্যে হাঙ্গর, শঙ্খচীল, ডিওমাছ, ইলিশ, রাঙ্গাচৌক্কা, চান্দা নইলা, কড়াতি চেলা, টুইটা, বাড়া, উড়িলিয়া, বাটা ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এরা গভীর সমুদ্রের মাছ, দিনের বেলায় এই শ্রেণীর মাছগুলো সমুদ্রের তলদেশে থাকে এবং রাতে এরা পানির উপরিভাগে চলে আসে। তাই দিনের বেলার চেয়ে রাতের বেলায় সাধারণতঃ অধিক মাছ ধরা পড়ে, মানুষের খাদ্য হিসাবে এই শ্রেণীর মাছের সংখ্যাই বেশী।

এদিকে ডেনার্সাল শ্রেণীর মাছের মধ্যে শারগ্রাই, ছুরি মাছ, নিলিমা, পানদুয়া, পাথারি, প্রজাপতি, রাজা, দুঃক্ষমল, কালোদাঁতিনা, পোয়া, রূপা পোঁয়া, লাম্বুয়া, টাকা চান্দা, রাঙ্গা চৌই, দুধিয়া, ভোল, ভেটকি প্রভৃতি মাছের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল মাছগুলো সমুদ্রের গভীর পানিতে অবস্থান করে। কিন্তু প্লাজিক শ্রেণীর মত এরা পানির উপরের স্তরে আসে না।

এ ছাড়াও আরো কতগুলো মাছ সমুদ্রের একেবারে তলদেশে বাস করে। এরা বটম শ্রেণীর অর্ন্তগত। এই শ্রেণীর মাছের মধ্যে বাঘা হাঙ্গর, মইশা হাঙ্গর, তিতা মরমরি, মাটিয়া বাইল্লা, মেট্কা সমুদ্র মোড়া, লাখুয়া, সোনা থলিয়া, সোনালী বাট, রাজা চেউয়া, সাদা চেউয়া সব রয়েছে। এই শ্রেণীর মাছের মধ্যে আবার একদল মাছ তলদেশের মাটি খুঁড়ে গর্তের মধ্যে বাস করে। তন্মধ্যে রাজা চেউয়া ও সাদা চেউয়া বিশেষভাবে পরিচিত।

মাছ দেখতে দেখতে বেশ কিছু সময় কেটে গেল ডেকের উপর ক্যাপটেন সাহেবের সাথে। ট্রলারের দুই চারজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছাড়া সকলেই বলাবলি করছে মাছের ডাক্তার আসছে। কেউ কেউ বলাবলি করছেন "উনি সমুদ্রের মাছগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন।" ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকমের কথা। নানা রকমের প্রশ্ন করা শুরু হয়েছিল জাল তোলার পর থেকেই। কিন্তু কি আশ্চর্য– ওরা জানে না যে আমি ডেকের উপরের অনেক মাছই চিনিনে। এমনকি নামও জানি না। তাই একটু বুদ্ধি খাটিয়ে সেইলরদের প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছিলাম অনেক মাছেরই বাংলা নাম, স্থানীয় নামগুলো। কেননা এবার-ই ছিল আমার প্রথমবারের মত, সাগরের মাছের নাম ও মাছের সাথে পরিচিতি। যদিও অনেক মাছেরই বৈশিষ্ট্য পড়েছিলাম কিন্তু বাস্তবে তাদেরকে চিনে নেয়া যে কতটা কঠিন ব্যাপার–তা আগে কোনদিন বুঝিনি।

খুব অল্পক্ষণের মধ্যে মাছগুলোর নাচানাচি বন্ধ হলো। প্রাণিবিদ্যার থিওরি ক্লাসের একটা প্রশ্নের কথা মনে পড়ছিল। ডেকের উপর মৃত মাছগুলোকে দেখে। ঠিক একই প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন মিত্র সমুদ্রের মাছ পানির উপরে এলেই মারা যায় কেন? উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম। ক্লাসেরটা ছিল তাত্ত্বিক কথা। আজ ট্রলারে ডেক ভর্তি মাছের সামনে দাঁড়িয়ে এসব প্রশ্নকে অনেক জীবন্ত প্রশ্ন মনে হচ্ছিল।

সাময়িকীর সংযুক্ত বিজ্ঞান ক্লাব [ফেব্রুয়ারি- '৮০]

সূর্যগ্রহণ দেখাতে অনুসন্ধানীর আয়োজন

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার আমাদের দেশের জন্য ঘটে গেল শতাব্দীর স্মরণীয়তম জ্যোতির্মণ্ডলীয় ঘটনা—পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। এই শতাব্দীতে তো নয়ই, এ রকম আর একটি গ্রহণ দেখার জন্য বহু বছর আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। ঢাকায় সার্বজনীনভাবে, চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক পন্থায় এই সূর্যগ্রহণ দেখার বিরাট আয়োজন করেছিল কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানী। শুধু দেখানোর আয়োজনই নয়, সূর্যগ্রহণের গুরুত্ব এবং এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সাবধানতাসমূহ সম্বন্ধে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে অনুসন্ধানী—ব্যাপক বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে এবং "সূর্য ও সূর্যগ্রহণ" নামক চমৎকার একটি পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে।

আয়োজনটা ছিল খুব ব্যাপক আর এটা সম্ভব হয়েছিল বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিজ্ঞানীর প্রাণঢালা সহযোগিতার ফলে। অনুসন্ধানী সবাইকে সেদিন আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আণবিক শক্তি কমিশনের আঙ্গিনায়। সেখানে কয়েকদিন ধরে আয়োজন চলছিল বিভিন্ন পন্থায় আপামর জনসাধারণকে গ্রহণ দেখতে দেয়ার। উল্লিখিত বিজ্ঞানীরা এবং অনুসন্ধানীর সদস্যরা সেখানে খাড়া করেছিলেন বেশ কিছু দূরবীণ, দূরবীণের পেছনে ছোট পর্দা লাগিয়ে একসাথে কয়েকজনের গ্রহণ দেখার ব্যবস্থা, পিনহোল ক্যামেরা, সুদৃশ্য চৌবাচ্চার পানিতে নীল রং গুলে তাকে অস্বচ্ছ করে দেয়ার ব্যবস্থা, বহুসংখ্যক মাটির পাত্রে রঙীন পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি। সবচেয়ে চমকপ্রদ ও অভাবনীয় জিনিসটি ছিল বড় টেলিস্কোপ, ক্যামেরা, কাঠের চোঙ, কাগজের পর্দা—এসবের সুকৌশল সমন্বয়ে তৈরি একটা প্রজেকশান ব্যবস্থা। এতে পর্দার উপর বেশ বড় আকারে ভেসে উঠেছে সূর্যগ্রহণের ইমেজ। শত শত দর্শক এর সামনে বসে সিনেমা দেখার মতো করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ দেখে নিয়েছেন অবাক বিস্ময়ে। টেলিভিশনের ক্যামেরাও তাক করা ছিল এর পর্দার উপর। বিরাট আকারের এ জিনিসটি উঁচুতে সূর্যের দিকে তাক করার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল দেয়াল রং করতে ব্যবহৃত একটি উঁচু লোহার ফ্রেমের উপর। এই বিশেষ কৌশল ও অন্যান্য প্রদর্শন ব্যবস্থার পেছনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ. আর. খান এবং ড. সিদ্দিক-ই রাব্বানীর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া আণবিক শক্তি কেন্দ্রের ড. এ. এম. চৌধুরী বিশেষভাবে সহায়তা দিয়েছেন পুরো আয়োজনে।

গ্রহণের দিন আণবিক শক্তি কেন্দ্রের আঙ্গিনায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। হাজারো ছেলে-বুড়ো, অনেকে পুরো পরিবার হাজির হয়েছিলেন এখানে। প্রত্যেকটি টেলিস্কোপের সামনে ভীড়। মহিলাদের জন্য আলাদা টেলিস্কোপ। আর প্রজেকশানটির সামনে তো বিরাট জনতা সার্বক্ষণিক। তারপর কেউ দেখছেন মাটিতে, পানির বাটিতে, কেউ বা চৌবাচ্চায়, কেউ বা এক্সপোজ করা ফিল্ম বা ধোয়াটে কাচের ভেতর দিয়ে— যা অনুসন্ধানী প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করেছিল। ওদিক মাইক থেকে সর্বক্ষণ দেয়া হচ্ছিল অনুসন্ধানীর ধারাবিবরণী। মাঝে মাঝে উপস্থিত বিজ্ঞানীরা সূর্যগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে মন্তব্য রাখছিলেন। একটি জ্যোতির্মণ্ডলীয় ঘটনার সাথে জনসাধারণের এরকম ঔৎসুক্য এবং একাত্মতা এদেশে এই প্রথম। দর্শকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. আর.

এ. গনি। তিনি সবার সাথে ভীড়ের মধ্যে নানাভাবে সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন। এক পর্যায়ে মাইকে তিনি অনুসন্ধানীকে এই আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও রাখেন।

সূর্যগ্রহণ যখন প্রায় শেষের দিকে, তখন শুরু হয় অনুসন্ধানীর আয়োজনের পরবর্তী পর্যায়। কথা ছিল আলোচনা অনুষ্ঠান হবে আণবিক শক্তি কমিশনের অডিটোরিয়ামে। বিশাল জনতার সবাইকে সেখানে জায়গা দেয়া যাবে না বলে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেই শুরু হলো আলোচনা। 'সূর্য কি?' 'সূর্যের প্রভাবে আবহাওয়া', 'সূর্যগ্রহণের নানা দিক', সৌরশক্তির ব্যবহার' এসব নানা বিষয় আলোচিত হলো। আলোচনায় অংশ নিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. অর. খান, আণবিক শক্তি কমিশনের মহাকাশ বিভাগের প্রধান ড. এ. এম. খান, আণবিক শক্তি কমিশনের মহাকাশ বিভাগের প্রধান ডঃ এ. এম. চৌধুরী, ড. আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন, ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম প্রমুখ। আলোচনাটি ছিল অনেকটা অনানুষ্ঠানিক। শ্রোতা সাধারণ নানা ধরনের প্রশ্ন তুলে নিজেরাই নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করছিলেন। কিছুক্ষণ আগে প্রায় পূর্ণগ্রহণের অবাক দৃশ্যে তাঁরা বিমোহিত ছিলেন। এবার অনেক কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটালেন তাঁরা। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছিলো। এবার আর সূর্যগ্রহণের ফলে অকাল সন্ধ্যা নয়, সত্যি সত্যি সন্ধ্যা। সমাপ্তি ঘটলো একটি অবিস্মরণীয় দিনের। অনুসন্ধানী বিজ্ঞান ক্লাব এ দিনটিতে কিছু কার্যকর ভূমিকা নিতে পারার জন্য আনন্দিত।

সৈয়দ মুর্তাজা আলীর স্মৃতি কথা থেকে

(বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে)

সিম, লাউ, পেঁপে,ঝিংগা, আলু, বরবটি ইত্যাদি তরকারী গ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যেত। ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, গাজর, বিলাতি বেগুন ইত্যাদি সজী তখনকার দিনে গ্রামে দেখা যেত না। আমাদের ছেলে বেলায় প্রথম বিলাতী বেগুনের চাষ আরম্ভ হয়। সাহেবরা এই সজী আমাদের সংগে গ্রহণ করতেন। দেশীয় লোক তখনও বিলাতী বেগুনের কদর করতে শেখেনি। ....Huntley and Palmers কোম্পানির বিস্কুট সুন্দর সুন্দর ছবিওয়ালা টিনে বিক্রী হত। বিস্কুটের নাম ছিল Milk, Nice, Petit Beurte ইত্যাদি। এই বিস্কুট ইংল্যান্ডের Reading শহর থেকে আমাদের দেশে বিক্রীর জন্য আসত।

গ্রাম বাংলায়

গভীর পানির ধান

[জুন-১৯৮০]

গভীর পানির ধান নীচু এলাকায় আবাদ করা হয়। এই ধানের বিশেষত্ব হলো যে বর্ষার মৌসুমে নীচু এলাকায় যখন পানির নীচে যায় বা সে সব অঞ্চলে বন্যা আসে তাড়াতাড়ি—এই জাতের ধানগাছগুলো দিব্যি টিকে যায়। পানি বাড়তে থাকলে ধান গাছগুলোও বড় হতে থাকে এবং পানির উপরে গাছের পাতাগুলো হাওয়ায় হেলতে দুলতে থাকে। অর্থাৎ পানি এই জাতের ধান গাছকে কাবু করতে পারে না।

আমাদের দেশের নীচু এলাকাগুলোতে বর্ষার প্রারম্ভে গভীর পানির ধানের আবাদ হতে পারে। বর্তমানে এই জাতের ধানের কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। শীতের শেষাশেষি যে সব নীচু এলাকার পানি বেশ শুকিয়ে জলাভূমির সৃষ্টি করে সেখানে এতকাল ধরে শুধু বোরোর চাষই হয়ে আসছিল। এখন বোনাস হিসেবে ঐ একই জমিতে বোরো ধানের আবাদ শেষ হওয়ার পর গভীর পানির ধানের চাষ হতে পারে।

গভীর পানির ধান হলো আমনেরই একটি জাত। এর আবাদের জন্য জমিতে লাঙ্গল দেয়া শুরু করতে হয় জানুয়ারী থেকে এপ্রিলের শেষাশেষি পর্যন্ত। পাঁচ বা আরো বেশী বার লাঙ্গল চালানো হয়। এরপর মই চালিয়ে জমি মসৃণ করে নেয়া হয়। এক একর জমিতে মই দিতে প্রতিদিন ১৬—১৮ জন লোক লাগে।

সাধারণতঃ বেশীর ভাগ কৃষকই প্রথম লাঙ্গল চালানোর পর মাটির বড় বড় ঢেলা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে নেয়। এভাবে লাঙ্গল মই চালানোর পর কাঠের হাতুড়ির সাহায্যে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে ভেঙ্গে মসৃণ করা হয়। এর ফলে বীজ ছড়ানো ও অঙ্কুরোদগমনের কাজটি ভালভাবে করা যাবে।

জমিতে শেষ লাঙ্গল চালানোর আগেই বীজ ছিটিয়ে দেয়া হয়। এরপর লাঙ্গল চালিয়ে হাতুড়ির সাহায্যে মাটি ভেঙ্গে বীজগুলোকে মাটির নীচে ঢেকে দেয়া হয়। এক একর জমিতে এক মন বীজ ছিটানো উচিত হলেও কৃষকরা আধ মন আউশ আমনের মিশ্র বীজ ও এক মন আউশের বীজ ছিটিয়ে থাকে।

চারার সঙ্গে অনেক আগাছাও গজায়। এদের অনেকগুলোই দেখতে ধানগাছের মতো। তবে অভিজ্ঞ কৃষক বুঝতে পারে— কোনটি আগাছা ও কোনটি ধানগাছ। আগাছা বাছাই করা হয় নিড়ানি, আচড়া বা শুধু মাত্র হাত দিয়ে। বর্ষার পানিতে জমি তলিয়ে গেলে ধানগাছ পানির লেভেলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। এ সময়ও অনেক জলজ-আগাছা জন্মায়। সেগুলো হাত দিয়ে উপড়ে ফেলা হয়।

মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে অকটোবরের মধ্যে ফুল বেরোয়। ফসল কাটা শুরু হয় অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম দিক পর্যন্ত। বর্ষার পানি সরে গেলেই বড় বড় গাছগুলো মাটিতে পড়ে যায়। তবে যদি বর্ষার পানি সরার আগেই ফসল কাটা দরকার হয় কৃষকরা নৌকায় চড়ে তা করে থাকে।

কিন্তু জমিতে কৃষকরা গভীর পানির ধানের সঙ্গে আউশেরও মিশ্র চাষ করে। ঐ আউশ ধান জুলাইয়ের মধ্যেই কেটে ফেলা হয়। নৌকায় চড়ে ধান কাটা এড়াবার জন্য কৃষকরা গভীর পানির ধানের জাত এমনভাবে নির্বাচন করে যাতে— বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধান কাটা যায়।

এছাড়া জাত নির্বাচনে পানির গভীরতার ব্যাপারটিও চিন্তা করে দেখা হয়। যেখানে বর্ষা বা বন্যার পানির গভীরতা কয়েক ইঞ্চি হবে— সেখানে এক রকম জাতের আবার যেখানে পানির গভীরতা ২০—৩০ ফুট হবে সেখানে অন্য জাতের গভীর পানির ধানের আবাদ করতে হবে। পানির গভীরতা ভেদে ধানের জাত বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

যাই হোক, কৃষক যদি বর্ষায় পানি সরে যাওয়ার পরপরই ধান কাটতে চায়, তবে কাজটি খুবই তাড়াতাড়ি করতে হবে। নইলে ইঁদুর পাকা ফসলের বিস্তর ক্ষতি করবে।

চমকপ্রদ

মাকড়সার টরেটক্কা

[জুলাই-১৯৮০]

জাল পেতে তার উপর বসে আছে একটা মাকড়সা। যেইনা, একটা মাছি, কি ফড়িং এর উপর গিয়ে পড়লো, জাল নড়ে উঠল, অমনি মাকড়সা ছুটে গিয়ে তার দফারফা করে দেয়। আগন্তুক পোকাটি যদি আরেকটা মাকড়সাও হয় তা হলেও তার নিস্তার নেই, কারণ স্বজাতিকে খেতে বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা নেই মাকড়সার। মুশকিল হয় বেচারা প্রেমিক পুরুষ মাকড়সার। জাল পেতে বসে আছে যে স্ত্রী তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে যাওয়া রীতিমতো বিপজ্জনক। তাই বহু প্রজাতির পুরুষ মাকড়সা সুতার কাঁপুনিতে টরেটক্কার ভাষায় প্রেম নিবেদনের কৌশল রপ্ত করেছে। জালের সূতায় বিশেষ ধরনের কাঁপুনী তুলে সে জানিয়ে দেয় যে তার উদ্দেশ্য নিতান্তই প্রেমময়। আগে এভাবে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে, তবেই সে এগোয় স্ত্রী মাকড়সার দিকে।

ব্যতিক্রমী এক রকম মাকড়সা আছে যারা ব্যক্তিগত জাল না পেতে, সমবায় পদ্ধতিতে জাল পাতে। হয়তো কয়েক হাজার মাকড়সা একত্রে কাজ করে গড়ে তুললো এক রেশম-বেড়াজালের দুর্ভেদ্য নগরী। তার কোথাও একটা মাছি পড়লো তো অমনি গোটা তিরিশেক মাকড়সা এক যোগে ছুটে একে কামড়িয়ে ছিন্ন ভিন্ন করবে। এখন প্রশ্ন হলো মাকড়সার মতো প্রাণীর পক্ষে এমন সুশৃঙ্খল দলবদ্ধ আক্রমণ সম্ভব হয় কিভাবে? কত কারণেই তো জাল নড়ে উঠছে, কই তখন তো এতগুলো মাকড়সা ছুটে আসে না। তা ছাড়া যখন আসে তখন পরস্পরকে আক্রমণ করার কোন প্রবণতাও তাদের মধ্যে দেখা দেয় না। একের সৃষ্ট কাঁপুনিতেও আরেকটা ছুটে আসে না। ব্যাপারটা বোঝা গেল জালের কাঁপুনির বিস্তারিত পরীক্ষার পর। কম্পন উদ্‌ঘাটক যন্ত্র দিয়ে এবং বিভিন্ন কম্পন হারের ঢেউ তুলে জালের নানা কাঁপুনিকে পরীক্ষা করা হলো। দেখা গেল তিরিশ থেকে সাতশ সাইকেলের কম্পন ছাড়া বাকী কম্পন জালের ভেতর দিয়ে যেতেই চায় না। সাধারণতঃ মাছি যে গুঞ্জন তোলে তাঁর কাঁপুনি এই সীমার মধ্যেই পড়ে। দেখাও গেল যে ধরা পড়া মাছির গুঞ্জনের কম্পনটাই জালের মধ্য দিয়ে মাকড়সার কাছে পৌছে। ধরা পড়ার সাথে সাথে মাছিকে ওষুধ দিয়ে অসাড় করলে মাকড়সা আর এগোয় না। যতক্ষণ গুঞ্জন ততক্ষণ এগোনো, গুঞ্জন থামলে এগোনোও বন্ধ। মজার ব্যাপার হলো মাকড়সার কম্পন বুঝতে পারার যে ক্ষমতা তাও এই বিশেষ গুঞ্জনের কম্পন সংখ্যাতে টিউন করা, অন্য কম্পন তাতে কোন সাড়া জাগায় না।

যেহেতু অন্য মাকড়সার পদ-সঞ্চারের কম্পন জাল বহন করে না, এবং যেহেতু মাকড়সার ত্বড়িৎ সাড়া দেবার কৌশলটি এই কম্পনের সাথে টিউন করা নয়, সেহেতু অন্য মাকড়সার পদ-চারণা তার মধ্যে হিংসাত্মক ভাব জাগায় না। দল বেঁধে দিব্যি সমবায়ী হতে পেরেছে ওরা সে কারণেই।

গণশিক্ষা [জুলাই-১৯৮০]

ম্যাচবক্স সাক্ষরতা

বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়

বিজ্ঞান সাময়িকীর মার্চ '৭৯ সংখ্যায় গণশিক্ষা ফিচারে প্রস্তাবিত হয়েছিল সার্বজনীন গণশিক্ষার একটি সুন্দর উপকরণ। এটি ছিল ম্যাচবক্সের ওপর স্বরচিহ্নসমেত এক একটা অক্ষর মুদ্রিত করা। তার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করে একটা ম্যাচবক্স যখন খালি বাক্সে পরিণত হবে তখন শুরু হবে তার অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার। ভেতরের স্লাইডটাকে যোজক হিসেবে ব্যবহার করে এ রকম দুই বা আরো বেশি হরফ গেঁথে তৈরি হতে পারে শব্দ। নিমিষে এটা ভেঙ্গে ফেলে আবার তৈরি হতে পারে নূতন শব্দ। একটি অক্ষর ব্লকের চেয়েও এর উপযোগিতা ও চমকপ্রদতা যথেষ্ট বেশী।

অথচ এর দাম কি? মুদ্রণে সামান্য বাড়তি খরচ ছাড়া কিছুই না, কারণ ম্যাচ সবাইকে সব সময় কিনতে হচ্ছে এমনিতেই। এর সরবরাহ ব্যবস্থাও শিক্ষা উপকরণ হিসেবে নূতন কিছু নয়, সেটা দেশের সর্বত্র এমনিতেই চলে যায় ম্যাচ হিসেবে। অক্ষর-জ্ঞানের দিকে স্কুলের বাইরেও যদি সর্বসাধারণকে আকৃষ্ট করতে হয়, বিশেষ করে ছোটদের তবে এখানে একটা চমৎকার উপকরণ রয়েছে বৈ কি, যাকে কাজে লাগিয়ে দেখা যেতে পারে।

বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রস্তাবটা সবিস্তারে, সমস্ত খুঁটিনাটি সহ রেখেছিলো বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র। তারপর এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহের সৃষ্টি হয়। উৎসাহ প্রদর্শন করেন, বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট হন বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি, বাংলাদেশ সার ও রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরী। প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরী নিজের খরচে তাঁদের প্রজাপতি ব্যান্ডের কিছু সংখ্যক ম্যাচের উলটো দিকে প্রস্তাবিত উপায়ে অক্ষরসমূহ মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নেয়। এর জন্য ব্যবহারের ফ্রিকোয়েন্সি অনুসারে স্বরচিহ্নযুক্ত অক্ষরের তালিকা, এর টাইপ, প্রিন্টিং ইত্যাদির ব্যাপারে ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরী ও তাদের মুদ্রণকারী ঈগলবক্স কোম্পানির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র ও বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি।

অবশেষে এ বছরের একুশে ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবটি সত্যি বাস্তবায়িত হলো। 'প্রজাপতি' ম্যাচের উলটো দিকে হলুদ পটভূমিতে লাল রঙে মুদ্রিত হয়ে এলো এক এক রকমের বহু অক্ষর। কোনটায় 'ক', কোনটায় 'কা', কোনটা 'কি' ইত্যাদি। একটা ম্যাচ তুলে নিন, একটা অক্ষর পাবেন। তুলে নিন আরেকটা—হয়তো বা দুয়ে মিলে একটা শব্দ হতে পারে।

বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতির সাথে পরামর্শক্রমে ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরী চট্টগ্রাম ও ঢাকার দুটা সীমিত অঞ্চলে এই ম্যাচগুলো সরবরাহ করেছে, যাতে করে সেখানে এগুলোর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, সাক্ষরতার কাজে নিয়োজিত কর্মীরা ঘনিষ্ঠভাবে তাদের ব্যবহার করতে পারে। কাজ শুরু হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের রাউজানে এবং ঢাকার কালিয়াকৈরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই উপকরণের পরীক্ষামূলক ব্যবহার উদ্বোধন করা হয়েছে— গণশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে। দেশের সমস্ত জনসাধারণকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার যে প্রচেষ্টা, এই উপকরণ হয়তো তাতে একদিন ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আজকের সীমিত ব্যবহার ও পরীক্ষা থেকে সে পথ প্রশস্ত হবে আশা করা যায়।

সাময়িকীর পৃষ্ঠায় এ রকম একটি প্রস্তাব যে এক বছরের মধ্যে সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হলো তা শুধু সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক আগ্রহ থেকেই সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান সাময়িকী ও বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র এর জন্য আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা বোধ করছে।

সম্পাদকীয় [আগস্ট -সেপ্টেম্বর-১৯৮০]

বিলাসিতার অনুকরণ নাকি দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই

বাংলাদেশ বিমানের বক্তব্য পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। অত্যন্ত খাঁটি কথা। শুধু বিমানের কারণে না হলেও, উপগ্রহ যোগাযোগ, টেলিভিশনের পর্দা, দুনিয়ার নানা দেশে আমাদের ক্রমবর্ধমান আসা যাওয়া সব মিলিয়ে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে বৈকি। আর এটা সবচেয়ে বেশী বোঝা যায় আমাদের বাজার আর আমাদের আচরণ লক্ষ্য করলে। আমাদের বাজারে আমরা আধুনিক স্বাচ্ছন্দের, এমনকি বিলাসিতার যাবতীয় উপকরণ ক্রয় করতে পারি নিজের টাকা থাকলে। অবশ্য নিজের টাকার অভাবে সময় সময় এর ব্যয়ভার পরের ওপর চাপাতেও অনেকের অসুবিধা হয় না— যেমন সরকারের ওপর অর্থাৎ প্রকারান্তে জনগণের ওপর। অন্যেরা যা করে, উন্নত দেশে যা যা হয় তা হুবহু করার জন্য পাওয়ার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা যেমন আছে, তেমনি আমাদের একটা শ্রেণীর জন্য সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির যথেষ্ট ব্যবস্থাও আছে। রঙীন টেলিভিশন, ভিসিআর, উত্তম মোটরগাড়ী কোন স্বাদ অপূর্ণ থাকছে না।

পৃথিবী ছোট হয়ে আসা, মানব গোষ্ঠির পরস্পর ঘনিষ্ঠ হওয়ার মহৎ ব্যাপারটিকে আমরা ক্রমশঃ নিজেদের জনগোষ্ঠির স্বার্থের বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছি না কি? আমাদের দেশ নানা দিক থেকে উন্নত বিশ্বের এমন কি স্বল্পোন্নত বিশ্বের অনেক দেশের সাথে তুলনীয় অবস্থায় নেই, অন্ততঃ এই মুহূর্তে নেই। বিশ্বের সব চাইতে ভীতিপ্রদ দারিদ্র এই মুহূর্তে আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, মস্ত বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। যে বিশাল ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা আমাদের রয়েছে সেটিকে দায়ের পরিবর্তে সম্পদে কিভাবে রূপান্তরিত করবো সে প্রশ্নের সমাধান এখনো বহুদূর। এটা কি আমাদের আর দশটা স্বচ্ছল দেশের যাবতীয় বিষয় অনুকরণ করার সময়, না নিজের সীমাবদ্ধতাগুলো মেনে নিয়ে, সর্বশক্তি দিয়ে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময়? নিজের যেটুকু সম্পদ তার সর্বোত্তম ব্যবহার না করতে পারলে আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে দারিদ্রসীমার ওপরে টেনে তোলার জন্য অনেক স্বাচ্ছন্দ্য, অনেক পরিপূর্ণতা আমাদের একটা শ্রেণীকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ কাঁচা টাকার বিনিময়ে দেশের গ্যাস বিক্রয় করলে আমাদের আর্থিক জীবনে আপাততঃ এক ধরনের স্বচ্ছলতা আসবে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য। কিন্তু তার সুফল কদ্দূর পৌছাবে? দুদিন পর আমাদেরকে হাতের পাঁচটুকু হারিয়ে পথে বসাতে তা সহায়ক হবে না তো? সম্প্রতি দেশের নয়জন বিজ্ঞানী এই বিষয়গুলোর প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা তাঁদের সাথে আমাদের কণ্ঠটিও যোগ করে দিচ্ছি।

সাম্প্রতিক

প্রযুক্তি : লাগসই জায়গায়!

[নভেম্বর-১৯৮০]

কামালের মার ক্যাসেট এসে গেছে

ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। চট্টগ্রামের এমন একটা গ্রাম সেটা; যেখানে বয়স্ক জনসংখ্যার বড় অংশটাই আপাতত রোজগারের ধান্ধায় দুবাই প্রভৃতি অঞ্চলে রয়েছে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়া বৃদ্ধা কামালের মা'র কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেই তাঁর খুশী ডগমগ চোখ দুটা চক চক করে উঠলো। গেল সপ্তায় ছেলে টাকা পাঠিয়েছে— তাছাড়া লোক মারফত ক্যাসেটও পাঠিয়েছে। অনেক দিন বেচারা অপেক্ষা করেছিলো ক্যাসেটের জন্য— প্রাণটা পড়েছিলো ছেলের জন্য। অবশেষে...। উনি অনর্গল বলে গেলেও এই ক্যাসেট আসার ব্যাপারটা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। আমার ইতস্ততঃ ভাব দেখে কামালের মা দৌড়ে গিয়ে একটা হাল-ফ্যাশনের ক্যাসেট রেকর্ডার বের করে আনলেন বাড়ির ভেতর থেকে। আর তাতে বেশ দক্ষ হাতেই ফিট করে নিলেন একখানা ক্যাসেট। এটাই ছেলে পাঠিয়েছে সম্প্রতি। বিশুদ্ধ চাটগেঁয়ে ভাষায় অতি ঘরোয়া স্বরে ছেলে মাকে নানান কথা বলছে— খাওয়া-দাওয়ার কথা, শারীরিক কুশল সংবাদ, পাড়াপড়শীর কথা, টাকাটা পাঠাবার পর কাকে কি দিতে হবে তার নানা অনুরোধ; ছোট বোনের বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ। কে বলবে কামালের মার ছেলে রয়ে গেছে সুদূর দুবাইতে।

জানলাম ক্যাসেটের আসা যাওয়া এ অঞ্চলে নিত্য ঘটনা—চিঠি আসা যাওয়ার মতই। অশিক্ষিত, নিরক্ষর প্রবাসী ও তাদের পরিবারের কাছে চিঠির চেয়ে এই ক্যাসেট অনেক বেশী সহজ, অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। তাছাড়া দুবাই পরিবারগুলোর প্রত্যেকটিতে ক্যাসেট রেকর্ডার যখন রয়েছেই। হায় চিঠি! ক্যাসেট এসে তোমার আদর কমিয়ে দিলো না তো?

বিচার-বিবেচনায় ক্যাসেট

এমনি আর এক কাকতালীয় ঘটনায় জানতে পারলাম ক্যাসেটের লাগসই ব্যবহারের আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। ঢাকায় উচ্চ দায়িত্বে নিযুক্ত একজন সরকারী কর্মকর্তার দফতরে অপেক্ষা করছিলাম। দেখলাম সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকে কিছু অধস্তন কর্মচারী এসেছেন। তাঁদের কিছু অভাব-অভিযোগ আছে, বিশেষ করে অনুপস্থিত সহকর্মীর বিরুদ্ধে। কেইসটা ঊর্ধ্বতন মহলে উপস্থাপিত করার সুবিধার জন্য তাঁরা একটা বৈঠক, কিছু কথা কাটাকাটি এবং কিছু জবানবন্দীর হুবহু টেপ করে নিয়ে এসেছেন ক্যাসেটে। অনুমতি পাওয়া মাত্র সেটা বাজিয়ে শোনালেন, জায়গায় জায়গায় ব্যাখ্যাও দিলেন।

এতে কেউ কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না, বরং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মনোযোগ দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাসেটটা শুনলেন। মনে হলো ব্যাপার আর ব্যতিক্রমী নয় মোটেই। বিচার-বিবেচনায় ক্যাসেটের ব্যবহার মোটামুটি রেওয়াজ হয়ে আসছে।

রেডিও ফিট করা রিক্সা

কোন ভাগ্যবান গাড়ি কিনতে চাইলে তাঁকে একটা সিদ্ধান্ত দিতে হয় রেডিও ফিট করা কিনবেন, না এমনিতে। অতি সম্প্রতি ঢাকার রিক্সাওয়ালাদেরকেও রিক্সা নেবার সময় ঠিক এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। কারণ বেশ কিছু রিক্সা রয়েছে যাতে রেডিও ফিট করা রয়েছে।

দর-দস্তুর করে রিক্সায় উঠেছেন। হয়তো অবাক হয়ে লক্ষ্য করবেন সঙ্গীতের মৃদু তানে পরিবেশ ভরে উঠেছে। হ্যাঁ, আপনার রিক্সাটা একটা আধুনিক রেডিও ফিট করা রিক্সা। আপনার সীটের ঠিক নীচে একটা খোপের মধ্যে রয়েছে তিন ব্যান্ডের সুন্দর রেডিওটা। বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় একে। রিক্সাওয়ালা যখন 'খেপের' অপেক্ষায় বসে আছেন তখন তাঁর বিশ্রামকেও ভরিয়ে তুলছে এই রেডিওর গান।

এমনি একজন রিক্সাওয়ালার সাথে আলাপ করছিলাম। এরকম রিক্সার জন্য মালিককে দৈনিক তিন টাকা বেশী 'জমা' দিতে হয়। সেটা এমন কিছু না। তাছাড়া ব্যাটারীর খরচা মালিকের। রেডিওর আওয়াজে রিক্সা চালাতে মনোযোগ দিতে অসুবিধা হয় না তো? না, তা হয় না, যদি খুব উচ্চ স্বরে চালানো না হয়। আরোহীরা কিভাবে নেন একে? বেশীর ভাগ আরোহী পছন্দই করেন। এখনো এরকম রিক্সার সংখ্যা বেশী নয়। তাই এদের নিয়ে রিক্সাওয়ালাদের মধ্যে কিছু কাড়াকাড়ি আছে।

মানুষের আবিষ্কৃত বহু জিনিসের পূর্বসুরী খুঁজে পাওয়া যায় নানা জীবজন্তুর মধ্যে। বাদুড় রেডারের কৌশল ব্যবহার করছে চিরকাল। মানুষের শ্রবণাতীত শব্দ তরঙ্গ পাঠিয়ে এবং প্রতিফলিত তরঙ্গ উদঘাটন করে বাদুড় বুঝতে পারে তার চলার পথে কোথায় কি রয়েছে। কচ্ছপ আর আর্মাডিল্লোর গঠনটা ট্যাঙ্কের মতো নয় কি? কোন কোন মাছ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং ব্যবহার করে আত্মরক্ষা বা চলাফেরার কাজে। উড়ন্ত কাঠবেড়ালী চার পা ছড়িয়ে দিয়ে পায়ের সাথের চামড়াকে প্যারাসুটের মতো ব্যবহার করে গাছ থেকে গাছে লাফ দেয়ার সময়। হামিংবার্ড প্রভৃতির ক্ষুদে হেলিকপ্টার–উড়ন্ত অবস্থায় এক জায়গায় থাকতে পারে পেছনের দিকে যেতে পারে। কোন কোন সাপ কামড় দিয়ে শিকারকে অসাড় করে এনেসথেটিকের ব্যবহার করে। বরফের ওপর হাঁটার জন্য মানুষের যে বিশেষ ধরনের জুতো রয়েছে, কারিবো আর খরগোসের তা বরাবরই আছে।

চমকপ্রদ

এক অনন্য পাহারাদারী

[জুলাই-১৯৮০]

ফারজানা নাজনীন

দুজন পাহারাদার এলেন। হাতে বন্দুক, লাঠি কিছুই নেই, তবে কিছু যন্ত্রপাতি আছে। ঘুরে ঘুরেই পাহারা দেন তাঁরা। অবশ্য এবাড়ী-ওবাড়ী বা এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরলেই চলে না তাঁদের। তাঁদের ঘুরতে হয় দেশ থেকে দেশে— যেখানে যেখানে রয়েছে পারমাণবিক চুল্লী, পাহারা দেবার মতো। পাহারার প্রয়োজনটা কেন? প্রয়োজনটা অতি গুরুতর। এই যে সব পারমাণবিক চুল্লী, এদের কোনটা তৈরি হয়েছে গবেষণার কাজে, কোনটা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কাজে। সে কাজ ছাড়া অন্য কিছুর মতলব যদি কারো মাথায় না থাকতো তাহলে পাহারার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এর থেকে ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানী বের করে নিয়ে তার থেকে প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায়। আর এই প্লুটোনিয়াম থেকে তৈরি হতে পারে ভয়াবহ মারণাস্ত্র। এটা যাতে না হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যই এই পাহারাদারী।

দুনিয়া জুড়ে শান্তির কাজে পরমাণুর ব্যবহার যত বিস্তৃত হয়েছে, অশান্তির কাজে তাকে ব্যবহারের আশঙ্কাও তত বেড়ে যাচ্ছে। এটি যাতে যথাসম্ভব ঠেকানো যায় তাই দুনিয়া জোড়া এক ধরনের পাহারাদারীর আয়োজন করেছে জাতিসংঘের একটি সংস্থা আন্তর্জাতিক এটমিক এনার্জী এজেন্সী (IAEA)। এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ পর্যন্ত ৬৫টি দেশ এর পাহারাদারী মেনে নিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। আরো বেশ কটি দেশের সাথে আলোচনা চলছে এ নিয়ে। এই সমস্ত দেশ হলো যারা পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তৃতি রোধের চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছে। স্বাক্ষরকারী দেশগুলো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করতে এবং যোগাড় না করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যদি না অবশ্য গোড়া থেকেই তাদের এই অস্ত্র থেকে থাকে। এই চুক্তির বাইরেও দেশ আছে, তারা পাহারাদারী মেনে নেয়নি। পারমাণবিক চুল্লী নিয়ে তাঁরা কি করছে এ খবর কাউকে জানতে দিতে এরা নারাজ। এদের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, ইসরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশের ভাবসাব অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে বৈকি! ভারত তো সেই ১৯৭৪ সনেই রাজস্থানের মরুভূমিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে— তাঁর মতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে। মনে করা হচ্ছে যে এর জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী এসেছে কানাডার দেয়া একটি গবেষণামূলক চুল্লী থেকে। এসব কারণে পাহারাদারীর গুরুত্ব আরো অনেক বেড়ে গেছে।

বলছিলাম, দুজন পাহারাদার এলেন। ধরা যাক তাঁরা এসেছেন নরওয়ের হালডেন পরীক্ষামূলক চুল্লীতে খবরদারী করতে। দু'জন পাহারাদার দু'দেশের মানুষ—IAEA তাঁদের নিযুক্ত করেছে এ কাজে। উত্তর ইউরোপে তাঁদের নিয়মিত পাহারাদারী টহলে এখন হালডেনের পালা। এখানে দুদিনের কাজ শেষে যাবেন পরের জায়গায়— মোট সাড়ে চার শ' পারমাণবিক কেন্দ্রের খবরদারী IAEA এর হাতে। হালডেন কেন্দ্রে এসে হাজির হওয়ার পর বেশ ক'টা জিনিস নিরিখ করতে হচ্ছে আমাদের পাহারাদার দুজনের। হালডেনে যে কোন একটি সময়ে প্রায় দশ টন পারমাণবিক জ্বালানী বস্তু ব্যবহৃত বা জমা হয়ে থাকতে পারে। প্রতি সপ্তায় ইউরেনিয়াম আসছে আর ব্যবহৃত জ্বালানী পরীক্ষার জন্য চলে যাচ্ছে অন্যত্র। এর প্রত্যেকটি আনাগোনার খবর ভিয়েনাতে IAEA সদর দফতরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পাহারাদারদের কাজ সেটার সত্যতা যাচাই করা।

পাহাড়ের গুহার ১০০ গজ গভীরে চারিদিকে শক্ত শিলা পরিবেষ্টিত জায়গায় হালডেন পারমাণবিক চুল্লী। গত তিনদিন ধরে চুল্লী বন্ধ রাখা হয়েছে। তৈরি হয়ে নিলেন আমাদের পাহারাদার দু'জন—মাথায় হেলমেট, বিশেষ

পোষাকে তেজস্ক্রিয়তা নির্দেশক যন্ত্র লাগানো। তিন প্রস্থ ভারী লোহার দরজা পার হয়ে তাঁরা এলেন— চুল্লীর জায়গায়। চুল্লীর আবরণের ওপর সাজানো হলো গামা-রশ্মি নির্দেশক যন্ত্র। এর দ্বারা বোঝা যাবে চুল্লীর ভেতর কি আছে, কতখানি আছে। যে জ্বালানী সেখানে থাকার কথা, তা সেখানে আছে কিনা।

ব্যবহৃত জ্বালানী কোথায়, কতখানি রাখা আছে তা দেখে এবার মিলিয়ে নেবার পালা। 'সংরক্ষণ পুকুরে' পানির তলায় এই ব্যবহৃত জ্বালানীকে 'ঠাণ্ডা' করা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাচে বিভক্ত করে। এর মধ্যে ইতস্ততঃ কয়েকটা ব্যাচ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে এদের যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে; অন্যত্র, অন্য কাজে পাচার করা হয়নি। তাঁদের অনুরোধে এক একটা ব্যাচ পানি থেকে তোলা হলো— দেখতে যেন ছোট খাট এক একটা ব্যালাষ্টিক মিসাইল। এর ভেতরে কঠিন আবরণের মধ্যে ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানী। তিন প্রস্থ পুরু বিশেষ কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে এর আলোকিত অভ্যন্তরের দিকে তাকালেন আমাদের পাহারাদার। তাঁর হাতে দুটো হ্যান্ডেল যা নাড়াচাড়া করে রিপোর্ট কন্ট্রোলে এর ভেতরের জিনিস নাড়াচাড়া করা যায়। এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি দেখে নিলেন জ্বালানীর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর, মিলিয়ে নিলেন তা। তারপর চায়ের কেতলীর মতো একটা যন্ত্রের মুখটা ঢুকিয়ে দিলেন জ্বালানীর আধারে।

ঐ কেতলী আসলে গামা-রশ্মি নির্দেশক। পর্দায় ফুটে ওঠে গামা রশ্মি নির্দেশক রেখা— এই রেখা দেখে বোঝা যায় ওতে কি কি ধাতু আছে: বেরিয়াম, সিজিয়াম, কোবাল্ট, ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম— কোনটা কতখানি। তালিকায় যেমনটি আছে— কোনটা খোয়া গেল কিনা, পাচার হলো কিনা, বদলানো হলো কিনা সব ধরা পড়ে।

চুল্লীর কামরার এক প্রান্তে রাখা আছে একটা স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা। আধ ঘন্টা পর পর ফটো তুলে নেয় এটা। চুল্লী থেকে জ্বালানী সরাতে এর চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগে— ফটোতে তা ধরা না পড়ে পারে না। ছয় মাস চলার মতো ফিল্ম এক সাথে ক্যামেরটাতে দিয়ে দেয়া যায়। আমাদের পাহারাদার তখন তোলা ফটোগুলো পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। ওসব তিনি নিয়ে যাবেন।

নূতন জ্বালানী যেখানে সংরক্ষিত আছে তাও মিলিয়ে নেয়া হলো। মৌচাকের মতো সব গর্তের মধ্যে, চারদিকে পুরো কংক্রিটের আবরণে রাখা আছে এসব। প্রত্যেকটার মুখে লোহার টুপী লাগানো, আর সেখানে আছে IAEA-এর নম্বর দেয়া নিরাপত্তা সীল। ইতস্ততঃ কয়েকটা সীল তাঁরা কেটে নিলেন— তার জায়গায় নূতন সীল লাগালেন। পুরানোগুলো ভিয়েনাতে নিয়ে যাবেন ওদের উপর কোন জারিজুরি করে বাক্স খুলে জ্বালানী বের করার চেষ্টা চলেছে কিনা দেখতে।

বুঝতেই পারছেন, অন্য যে কোন সন্দেহপ্রবণ পাহরাদারের চেয়ে কোন অংশে কমই যান না আমাদের পারমাণবিক পাহারাদাররা। এই হালডেন কেন্দ্রেই প্রতি বছর চারবার তাঁরা ঘুরে ঘুরে আসছেন। প্রতিবার একই রুটিন মাফিক কাজ— প্রত্যেকটা জিনিস খুঁটিয়ে দেখা। যতই বিশ্বাসযোগ্য জায়গা হোক, সাবধানের মার নেই। পাহারাদার নিজেরাও পরমাণু-পদার্থবিদ, প্রকৌশলী। IAEA-এর অধীনে এরকম পাকা পাহারাদার আছেন আশি জনের মতো আটত্রিশটি দেশ থেকে তাঁরা এসেছেন। তাঁদের অনেকে মাসের বেশীর ভাগ থাকেন পথের উপর, পাহারাদারীর কাজে ঘোরাফেরায়। বড় গুরুত্বপূর্ণ এই পাহারাদারী। এতে করে মারণাস্ত্রের খেলা কিছুটাও যদি সীমিত হয় তাও কম কি!

পাহারাদারীটা কিন্তু আন্তর্জাতিক এটমিক এনার্জী এজেন্সীর একমাত্র কাজ নয়। এই সংস্থা দুনিয়ার পারমাণবিক গবেষণাসমূহকে সমন্বিত করছে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শক্তি উৎপাদন, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান— সব বিষয়ে পারমাণবিক গবেষণা এই সমন্বয় ব্যবস্থার আওতায় রয়েছে। পারমাণবিক কেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, দুর্ঘটনা এড়াবার কৌশল ইত্যাদি দেখাশোনা করা, এ সম্পর্কে উপায় উপকরণের সমতা আনা এর দায়িত্ব। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ ধরনের গবেষণায় সহায়তাও দিয়ে থাকে এই সংস্থা। মানুষ পরমাণুর শক্তিকে উদঘাটন করেছে। এর নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে মানুষের সুবুদ্ধিকে যেন কার্যকরী রাখা যায় তার জন্যই এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন।

মানুষের হৃদপিণ্ড কোনদিন থেকে কাজ করতে আরম্ভ করে? মায়ের গর্ভে ভ্রূণের বয়স যখন মাত্র আঠারদিন, ভ্রূণটা যখন একটা মটরদানার সমান মাত্র, তখন থেকেই তার ভেতরে অতি ছোট্ট হৃদপিণ্ডটি কাজ করতে আরম্ভ করে। সেদিন তাকে রক্ত বলতে তেমন কিছু অবশ্য পাম্প করতে হয় না। তবুও সেই যে শুরু জীবনের শেষক্ষণটি পর্যন্ত অবিরামভাবে কাজ করে যায় হৃদপিণ্ড।

যেদিন তুমি মহাকাশে যাবে

[ফেব্রুয়ারি-১৯৮১]

সাব্বির আনোয়ার

এ পর্যন্ত মহাকাশে যারা গেছেন তাঁরা মাত্র গুটিকয়েক ভাগ্যবান। তবে এমনটি বেশিদিন থাকবে না। তোমরা যখন বড় হবে তখন আরো অনেক মানুষ আকাশে যাবে— নিয়মিতই যাবে। হয়তো বা তোমাদেরও কেউ কেউ সেদিন মহাকাশে পাড়ি দেবে নানান কাজে। এমনি দিনের শুরু হিসেবে মহাকাশে একটা পাকাপোক্ত ল্যাবোরেটরী বানাবার কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওটা মহাকাশে থাকবে আর পৃথিবী থেকে নানান বিজ্ঞানীরা দরকার মতো সেখানে গিয়ে কিছুদিন থেকে কাজ করে আবার ফিরে আসবেন। যেমন করে দেশের বিজ্ঞানী বিদেশের ল্যাবোরেটরীতে কিছুদিন কাটিয়ে আসেন, অনেকটা তেমনি। একদিন যেতে যখন হতে পারে, কেমন হবে সে যাওয়া আগে ভাগে একটু জেনে নিতে দোষ কি?

তোমার যাত্রা শুরু হবে এক ধরনের ফেরী রকেটে। পুরো সফরের তুলনায় এটা তোমাকে নিয়ে যাবে সামান্য পথ— পৃথিবী থেকে কাছেই একটা মহাকাশ ষ্টেশনে। ষ্টেশনটা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে চাঁদের মতো। তবে ফেরী রকেটটিকে অবশ্য খুব শক্তিশালী হতে হবে, পৃথিবীর টানটুকু কাটানো চাইতো। এতে এসে বসতেই আসনের সাথে বেল্ট দিয়ে তোমাকে ভাল করে বাঁধা হবে, যাতে কিছুতেই না ছিটকিয়ে যেতে পারো। এবার রকেটের দরজা বন্ধ হতেই, মহাগর্জনে প্রচন্ড বেগে ওঠার পালা।

ওঠার শক্তিটা এমন বেশী হবে যে তা তোমাকে আসনের ওপর একদম চেপে রাখতে চাইবে। অবশ্য বেগ একবার বেড়ে যাবার পর আর ততো খারাপ লাগবে না। মহাকাশ ষ্টেশনের কাছাকাছি আসলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বেশ মজার জিনিস দেখবে। ওমা ঐ বিরাট বলের মতো ওটা কি? চিনতে মোটেই ভুল হবে না নীল-সবুজ রঙের এই বলটিকে— আমাদের পৃথিবীই তো। মহাদেশ আর মহাসাগরগুলো যেখানে বেশ আলাদা চোখে পড়বে— ঠিক স্কুলের বড় গ্লোবটির মতো। অবশ্য এর ওপরের মেঘগুলো কিছু গোলমাল করতে পারে।

ঘাটে লঞ্চ ভিড়বার মতোই একটু কায়দা-কানুন কসরৎ করে তোমার ফেরী রকেট গিয়ে লাগবে মহাকাশ ষ্টেশনের সাথে। তুমি যদি আরো দূরের যাত্রী হও তবে ষ্টেশনে তোমাকে গাড়ী বদলাতে হবে। চড়তে হবে আর একটা দূর-পাল্লার রকেট-জাহাজে। কত বড় সেই জাহাজ? তা নির্ভর করবে কত দূরে তুমি যাচ্ছো তার ওপর। যদি কাছেই চাঁদে যেতে হয় তাহলে জাহাজটি ছোটই হবে। তবে অন্যান্য গ্রহ যদি হয় তোমার গন্তব্য, তা হলে রকেট জাহাজটিকে হতে হবে যথেষ্ট বড়।

যেখানেই যাও, মহাকাশ ষ্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করায় আগুনের ছটা আর তর্জন-গর্জন তেমন কিছুই হবে না। যেমনটি হয়েছিল পৃথিবী ছাড়ার সময়। কারণ পৃথিবীর মতো বিরাট টানটুকু না থাকাতে ওটা কাটাবার ঝামেলাও সেখানে নেই। তাই অনায়াসে প্রচণ্ড গতিতে পৌছে যাবে তোমার জাহাজ-হয়তো বা ঘণ্টায় লক্ষ মাইল বেগে। তুমি অবশ্য এই প্রচণ্ড বেগের কিছুই টের পাবে না, শুধু বেগ বাড়া বা কমার সময়টিতে ছাড়া। অবাক হচ্ছো? না, অবাক হবার কিছু নেই। আমাদের পৃথিবী যে আমাদেরকে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে সূর্যের চারদিকে ছুটছে তা কি আমরা টের পাই?

রকেট জাহাজের ভেতরে তোমার কেবিনের অবস্থাটা কি দেখা যাক। যদিও বাইরে জোরালো রকেট ইঞ্জিন চলছে তার শব্দ কিন্তু তোমার কানে আসবে না। কারণ ওখানে শব্দ বয়ে আনার বাতাস যে নেই। শুধু জাহাজের ভেতরের ছোটখাট যন্ত্রগুলোর শব্দ তুমি পাবে। ওখানে একটা বড় অসুবিধা তুমি যেটা বোধ করবে তা হলো তোমার ওজন

বলতে কিছুই থাকবেনা। আসনের বেল্ট থেকে নিজকে মুক্ত করলেই দেখবে তুমি পালকের মতো ভাসতে চাইছ। একটু ঠেলা খেলে তো চললে ক্যাবিনের ছাদের দিকে, কি দেয়ালের দিকে খেলে ধাক্কা। বড় বিচ্ছিরি অভিজ্ঞতা এটা। বিশেষ ধরনের জুতো তোমাকে পরতে হবে হাঁটাচলার জন্য। চুম্বকের টানে হয়তো জুতাটা মেঝের সাথে লেগে থাকতে চাইবে— অথবা চটচটে কোন আঠার টানে।

খাবার-দাবারের কি হবে? বিমানে ভ্রমণের সময় যেমন ট্রেতে খাবার তোমার সামনে দিয়ে যাওয়া হয় ওখানে কিন্তু তেমনটি হবার যো নেই। তা হলে খাবারগুলো ট্রে থেকে উঠে এদিক ওদিক চলে যাবার আশঙ্কা আছে। পানিটাও যে গ্লাসে থাকবে এমন নিশ্চয়তা নেই। তুমি তো আর সারা ঘর তাড়িয়ে বেড়িয়ে খাবার খেতে চাইবে না। তাই বিশেষভাবে তৈরি খাবার টুথপেষ্টের টিউবের মতো জিনিসের মধ্যে পরিবেশন করা হবে। ওটা টিপে টিপে খাবার বের করে তুমি মুখে পুরবে।

আরো অসুবিধার ব্যাপার ঘটবে কিছু একটা ঘোরাতে গেলে। যেমন ধরো দরজার হাতলটা ডান দিকে ঘোরাতে চাইলে আর অমনি ওর প্রতিক্রিয়ায় তোমার পুরো শরীরটা বামদিকে ঘুরতে শুরু করে দিল চাকার মতো। ওখানে তো আর পৃথিবীর টান নেই তোমাকে খাড়া রাখার জন্য। ঐ টান চট্-চট্ জুতা ছাড়া তোমার কোন গতি নেই।

এতসব হাঙ্গামার মধ্যেই তোমাকে মহাকাশ জাহাজে কাটাবার অভ্যাস করে নিতে হবে। গন্তব্যস্থানে এই জাহাজ তোমাকে সরাসরি পৌঁছিয়ে দেবেনা। চাঁদ বা অন্য গ্রহের কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেলে তোমাকে আবার জাহাজ বদল করে আরেকটা ফেরী রকেট ধরতে হবে। এই বদলাবদলির জন্য খুব সম্ভব ওখানেও থাকবে একটা মহাকাশ ষ্টেশন। ফেরী রকেট তোমাকে নিয়ে আস্তে গিয়ে নামবে চাঁদের বুকে, কি গ্রহের বুকে কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায়। ও জায়গায় তখন হয়তো থাকবে কিছু মানুষের বসত, অন্ততঃ কিছু বিজ্ঞানীর। অদ্ভুত এক সফরের পর ওখানে শুরু হবে তোমার আরো বহু মজার মজার অভিজ্ঞতার। এই সফরের শেষে গিয়ে দেখবে আমাদের পৃথিবী তখন তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে। আকাশে রোজ এটা তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে সুন্দর একখানি গোলকের আকারে।

তুমি দেখবে আর বলবে ওই তো ঐ খানে আমার বাড়ী— ঐ সুন্দর আলো বাতাস পানিতে ভরা গ্রহটি আমারই গ্রহ।

○

কনফারেন্সের বুলি!

[ফেব্রুয়ারি-১৯৮১।

রেখে ঢেকে কথা বলতে বিজ্ঞানীরা কম ওস্তাদ নন। বিশেষ করে তাঁরা যখন কনফারেন্সের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে পরস্পরের সাথে মিলিত হন– তখন বোঝাতে চান এক আর বলেন আর এক। কিন্তু সবাই ঠিকই বুঝে নেয়। অপরের সমালোচনা ও নিজের জাহিরের রাখা ঢাকা উপায় আর কি।

প্রবন্ধ পেশ করার সময়

তাঁরা যা বলেন	তাঁরা যা বোঝাতে চান
(১) সুন্দর কাজ	এমন একজনের কাজ যাকে শিগ্‌গির সমালোচনায় জর্জরিত করা হবে।
(২) প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে...	একবার ব্যাপারটা আমরা দেখেছিলাম, কিন্তু আর এর পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয়নি।
(৩) অদ্ভুত একটা ফল পাওয়া গেছে	সার-সংক্ষেপটা বদলাবার তখন আর সময় ছিল না। অবশ্য টেকনিশিয়ানের চাকরি তখনই খতম হয়েছে।
(৪) পূর্ববর্তী কাজের জরীপে দেখা যায়...	আমি এমনকি গত বছরেরও কিছু জার্নাল পড়ে দেখেছি।
(৫) সযত্নে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে...	ডজন খানিক বই ঘাঁটার পর অবশেষে লাগসই একটা যেনতেন টেষ্ট খুঁজে পাওয়া গেছে।
(৬) এই ফলাফলে আমরা খুবই উৎফুল্ল বোধ করছি।	মনে হচ্ছে এটা পাবলিশ করা সম্ভব হবে।
(৭) আমাদের আপাতঃ ব্যাখ্যা হলো...	গত রাতের আসরে একটা কিছু ভেবে বের করা গেছে।
(৮) দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষাকার্য আমরা চালাইনি।	আমরা ঠিক পাঁচটায় ঘরে ফিরতে ভালবাসি। কি পেয়েছো আমাদের? ক্রীতদাস তো আর নই?
(৯) এর প্রক্রিয়াটা এখনো পরিষ্কার নয়।	এ সম্পর্কীয় দ্বিতীয় পরীক্ষাটা আমরা বাড়ী ফিরেই করে ফেলতে চাই।

অপরের প্রবন্ধ আলোচনার সময়

(১) আপনার ফলাফলগুলো আলোচনা করবেন কি?	এখনি ঝটপট খবরগুলো ছাড়ো দেখি। জার্নালের ফাঁকে-ফুঁকে লুকিয়ে রাখা চলবে না।
(২) আপনি কি এই সম্ভাবনাটা চিন্তা করে দেখেছেন?	আপনি কি আমার প্রবন্ধখানা পড়েছেন?

(৩) এ বিষয়ে আপনার কি কোন রকমের কোন মতামত আছে?	কি লুকোচ্ছ বাছাধন?
(৪) এ রকমটি বিশ্বাস করার পেছনে আপনার কারণটি কি?	মাথা কি আপনার খারাপ হয়ে গেছে?
(৫) এর ওপর আমি সামান্য মন্তব্য রাখতে চাই।	এটা একেবারেই অ-খাদ্য
(৬) এই তথ্যগুলো ঠিক সুসামঞ্জস্য মনে হচ্ছে না।	সত্য কথা বলছো তো?
(৭) আপনার পরীক্ষাগুলো আমরা আমাদের ল্যাবে পুনরাবৃত্তি করে দেখেছি।	না, হে ভায়া, আমরা ঘাবড়ে যাইনি!
(৮) আপনার লেখাটি কি আমি ঠিক পড়তে পেরেছি?	তুমি কি সেটা ঠিক লিখেছ? জানইতো এই শর্মা, ভুল করে না।

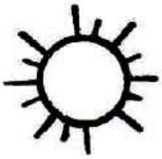

জি পি থমসন বলতেন, গবেষণায় সরকারী সাহায্য পেতে হলে সব সময় এর বাস্তব ব্যবহারের কথা জিজ্ঞেস করা হয়। যদি প্রস্তর যুগে সরকারী গবেষণাগার থাকতো তা হলে হয়তো আমরা আজ চমৎকার সব পাথরের কুড়াল পেতাম, কিন্তু ধাতুর আবিষ্কার কেউ করতো না। কারণ এমন ছন্নছাড়া প্রোগ্রাম ওতে স্থান পেত না।

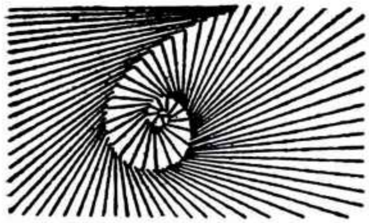

অন্য রকম একটি স্কুল

[আগস্ট-১৯৮১]

স্কুলটা দেখতে হলে তোমাদেরকে যেতে হবে টাঙ্গাইল শহর। সেখান থেকে ভাঙ্গা পথে মাইল চারেক গেলে সুরুজ গ্রাম। ঐ খানে গড়ে উঠেছে অন্যরকম সেই স্কুলটি। আছে না বলে গড়ে উঠছে বললাম। কারণ ক'দিন আগেও স্কুলটি ছিল না আর দু'মাস আগেও স্কুলে ছাদ ছিল, মাস্টার ছিল কিন্তু তেমন কোন ঘর ছিল না। ওখানে যারা পড়ছে ওদের সাহায্যে, ওদেরকে নিয়ে গড়ে উঠছে স্কুলের দরকারি এটা সেটা।

ওখানে যারা পড়ছে স্কুলটা তাদের জন্য দরকার ছিল নানা কারণে। তোমাদের যারা ভাগ্যবান, মা বাবা তোমাদের পাঠাতে পারছেন প্রাইমারী স্কুলে, তারপর হাইস্কুলে, তারপর হয়তো কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই ছেলেমেয়েরা কিন্তু সেভাবে ভাগ্যবান নয়। ওদের বাবা মার অবস্থা এমন যে অতো দিন ধরে স্কুলে পাঠানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ওরা অন্য রকম এই স্কুলটাতে এসেছে এমন কিছু পড়া লেখা করতে আর কাজ শিখতে যা দু'তিন বছরের মধ্যেই তাদেরকে মা-বাবার পাশে দাঁড়িয়ে সংসারে সাহায্য করার সুযোগ দেবে। শুধু তাই নয় এর ফলে নিজের এবং বাড়ীর সবার জীবনটাও ওরা ইচ্ছে করলে আরো সুন্দর, স্বাস্থ্যকর করে তুলতে পারবে।

স্কুলে অল্প কয়েক বছর থাকবে বলে ওদেরকে লেখাপড়াটা তাড়াতাড়ি জীবনের সাথে মিলিয়ে নিতে হচ্ছে। এটা করতে অবশ্য ওরা মজাও পাচ্ছে খুব। পড়তে লিখতে পারার সাথে সাথে ওরা নানান কাজের জিনিস পড়ছে— গাছ লাগানোর কথা, মাছ চাষের কথা এমনি সব জিনিস; আর নিজেদের কাজের সম্বন্ধে নানা কিছু লিখছেও। স্কুলের জায়গাটা তো আগে একদম ফাঁকা ছিল। ওরা উদ্ভিদের কথা পড়লো আর ওখানে নানারকম চারা লাগালো, বীজ অঙ্কুরিত হতে দেখলো, চারার যত্ন নিতে শিখলো। ওদের এই ক্লাসের অনেকখানি ঐ মাঠেই হলো। ফলে স্কুলের চারদিকে এখন সুন্দর বড় গাছের চারা বড় হচ্ছে ওদের যত্নে-নারকেল, কাঁঠাল, ইপিল ইপিল আরো কত কি; আবার বেশ কিছু সবজী বাগানও সুন্দর সবুজ হয়ে উঠছে। এদিকে ওরা উদ্ভিদের বীজ, মূল, কাণ্ড, ফুল-ফল সবকিছু সম্বন্ধে খুব ভাল করে জেনে গেল।

ঐ স্কুলে যারা পড়ছে তাদের অধিকাংশই কোন না কোন রকমের কারিগর হতে চায়। তাই অংক শেখার সাথে সাথে ওরা এটা সেটা মাপ ঝোকের কাজে লাগলো। স্কুলের আশেপাশের নানা জিনিষের নক্সা আঁকলো স্কেল অনুসারে। আবার টেবিল-চেয়ার যন্ত্রপাতির ড্রইং করাটা, ডিজাইন করাটা ওরা খুব উৎসাহের সাথে শিখছে। এসব ওদের শিগ্‌গির খুব কাজে লাগবে যে।

বিজ্ঞানের নানা জিনিস ওদের কাছে খুব মজার ব্যাপার হিসেবে আসছে। এই ধরো না সেদিন বিদ্যুতের কথা পড়ছিলো ওরা। ড্রাইসেল, ষ্টোরেজ ব্যাটারী এসব— দেখে, ছুঁয়ে তো নিলোই, ডাইনামো কেমন করে কাজ করে তাও দেখলো সাইকেলের পেছনে ছোট্ট ডাইনামো থেকে। পেরেক আর তার দিয়ে একটা মোটর নিজেরাই বানিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিলো তারা। এসব কিছুর মধ্যেই বিদ্যুতের কথা খুব ভাল করে বোঝা হয়ে যাচ্ছিল তাদের।

দেশের কথা, সমাজের কথাও তাদের পড়তে হয়। সাথে সাথে অবশ্য সেগুলো তাদের দেখতে হয়, আলোচনা করতে হয়। ওরা বেশী গুরুত্ব দেয় ওদের নিজেদের গ্রাম আর আশে পাশের ব্যাপারগুলোতে। বানের পানি কোথায় ওঠে, কোন কোন জায়গা ডোবে, ফসল কেমন হয়, বাজারে কোথা থেকে কি আসে, কি যায়, ইউনিয়ন পরিষদ, কাছের

সরকারী অফিস কোনটা কি করে— ওসব। স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা, পুষ্টির ব্যাপারটা ওদেরকে সব চাইতে জরুরী জিনিসের মতো পড়ানো হয়। শুধু জেনে বা পড়েই কিন্তু ওরা খালাস পায় না। এই ব্যাপারে ওরা বাড়িতে কি করছে, সবকিছু নিত্য তাদের জানাতে হয়; শুধু নিজেদের ব্যাপারে নয়, বাড়ির সবার ব্যাপারে।

বইপত্রের কথা বলছো? হ্যাঁ বই ওদের নানা রকম রয়েছে স্কুলে। তোমরা যেগুলো পড় প্রাইমারী স্কুলে সেগুলো আছে— আবার রংবেরঙের বাইরের বই রয়েছে প্রধানতঃ বিজ্ঞানের। বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের যে পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজ— সেই উদ্ভিদ, ধান, পানি, আবহাওয়া, যানবাহন মাটি ইত্যাদি নিয়ে— সেসব তো ওরা ভারী আনন্দে পড়ে ছবি দেখে আর নিজেদের চেনা জিনিসের সাথে মিলিয়ে। তাছাড়া ঐ যে বলছিলাম কাজের সব লেখা— নানা রকম পুস্তিকা—গাছ লাগানো, চাষের নিয়ম, পশু পালন, মাছের চাষ ঐসব নানান জিনিস নিয়ে ওগুলোও তারা পড়ে। ওরা উৎসাহ নিয়ে পড়ে, কারণ না পড়লে স্কুলের কাজগুলো করবে কি করে? স্কুলের সামনের নলকূপটার পাশে যে মিনি পুকুরটা কেটেছে এখানে মাছের চাষ করতে মাছের পুস্তিকাতো পড়তে হচ্ছেই। আরো মজার কথা হলো ওরা নিজেরাই এক ধরনের বই তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। নিজেদের গ্রামের পরিবেশের, মানুষের নানান তথ্য জেনে নিয়ে দেখে এসে ওরা একটা গ্রাম বই তৈরি করছে। তাছাড়া খবরের কাগজও এদের পাঠ্য!

তোমরা হয়তো ভাবছো এত সব লায়েক কাজ যখন করছে ছেলেমেয়েগুলো বোধ হয় সব ঢ্যাঙ্গা ঢ্যাঙ্গা বড় হয়ে স্কুলে এসেছে। তা কিন্তু মোটেই নয়— আট থেকে বারো বছরের মধ্যেই প্রায় সবাই। এর চেয়ে বাচ্চা ছেলেও আছে অনেক—ওরা প্রধানতঃ লিখতে, পড়তে এবং অংক কষতে শিখছে এখন। শিক্ষক বেশী নেই বলে স্কুলের বড় ছাত্ররাই ওদের মাষ্টারী করছে! এই কাজটা বড় ছাত্রদের পড়ালেখার অংশ। ঐ স্কুলটির ছাত্র-ছাত্রীদের কিন্তু তেমন কিছু ছাত্র-ছাত্র ভাব নেই। ওরা তো আর অতো ভাগ্যবান নয় যে স্কুলে আসার সময় অনেক তৈরি হয়ে সেজে গুজে আসবে। বাড়িতে যে যেমনটি থাকে সেভাবেই চলে আসে— আসার পথে হয়তো গরু বাছুরের কাজটা সেরে আসে। অনেক সময় ছুটি নিয়ে কাজ-কর্মেও চলে যেতে হয়, তবে আবার বিকেলে এসে নিজেই খানিকক্ষণ পড়ার কাজ করে যায়। আর হৈচৈ খেলাধুলাতে এই স্কুলের কিন্তু কোন কমতি নেই। ইঙ্গিত পেলেই ছেলেরা জামাকাপড় খুলে ঝাপিয়ে পড়ে সামনের পুকুরে।

ওদের মধ্যে যারা বড় এবং পড়াশুনায় কিছু এগিয়েছে তাদের এখন একই সঙ্গে কারিগরি শেখার আয়োজন চলছে— যে সব বিদ্যা তার বাড়ীর আশেপাশে কাজে লাগাতে পারে। কেউ শিখবে মেকানিকের কাজ— পাম্প সারাবে, কি সাইকেল, রিক্সা, বেবী ট্যাক্সী সারাবে। পল্লী বিদ্যুতের আওতায় আছে বলে কেউ কেউ ইলেকট্রিশিয়ান হবে; আবার কেউ কেউ ছুতার হবে বা ধাতুর কারিগর হবে। মেয়েরা বেশীর ভাগ সেলাই শিখতে চায়, আর চায় হাতের কাজ শিখতে।

ওদের মধ্যে যারা বড়, পড়াশুনায় কিছু এগিয়েছে, তাদের এখন একই সঙ্গে কারিগরি শেখার আয়োজন চলছে— যে সব বিদ্যা তার বাড়ীর আশেপাশে কাজে লাগাতে পারে। কেউ শিখবে মেকানিকের কাজ— পাম্প সারাবে, কি সাইকেল, রিক্সা, বেবী ট্যাক্সী সারাবে। পল্লী বিদ্যুতের আওতায় আছে বলে কেউ কেউ ইলেকট্রিশিয়ান হবে; আবার কেউ কেউ ছুতার হবে বা ধাতুর কারিগর হবে। মেয়েরা বেশিরভাগই সেলাই শিখতে চায়, আর চায় হাতের কাজ শিখতে। এসবেরও আয়োজন করা হচ্ছে।

স্কুলটা কারা শুরু করছে জান? ঐ যে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের নাম বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রথম পাতায় সব সময় লেখা থাকে সেই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। স্কুলটারো একটা পোষাকী নাম আছে— 'গ্রামীণ কারিগরি বিদ্যালয়'। গ্রামের মধ্যে টিনের বেড়ার ঘরে, গ্রামের প্রয়োজনের উপযুক্ত করে স্কুল, তাই ঐ নাম।

তোমরা হয়তো ভাবছো ঐ একটা স্কুলে কি হবে? তাইতো, প্রয়োজন তো অনেক অনেক স্কুলের! কিন্তু ঠিক কি রকম স্কুল হলে পাড়া গাঁয়ের গরীব ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে বেশী কাজে আসবে সে ব্যাপারে বুঝতে পারার জন্যই স্কুলটি করা হয়েছে। হয়তো একদিন ওরকম আরো অনেক হবে। স্কুল যত এগোবে এর কথা, এর ছেলেমেয়েদের কথা তোমাদেরকে আরো জানাবো।

বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিবেদন

আপনার ব্যাটারীকে চিনে নিন

[আগষ্ট-১৯৮১]

মাত্র দশ-পনরো বছর আগের কথা চিন্তা করুন। ঘরে আপনার ব্যাটারীর প্রসঙ্গ আসতো টর্চ লাইটের প্রসঙ্গে, বড়জোর তখন নবাগত ট্রানজিস্‌টর রেডিও যদি থাকতো, তার প্রসঙ্গে। টর্চ লাইটের ব্যাটারীর চিরন্তন রূপ সবার পরিচিত ছিল। আর এখন? রেডিওর মধ্যেই তো কত রকমারি— বিচিত্র আকার আকৃতির ব্যাটারী তার চাই। এছাড়া ক্যাসেট প্লেয়ার রয়েছে, তারো যুৎসই ব্যাটারী চাই। আগে ব্যাটারী দিয়ে শুধু টর্চের আলো জ্বলতো, এখন বেশ হাতে নিয়ে বেড়ানোর মতো ফ্লোরোসেন্ট বাতিও জ্বলে। আরো আছে পকেট ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি। এদের কেনার সময় ব্যাটারী প্রসঙ্গটা ভাবতে হয়। ক্যামেরা যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের আবার অন্য সমস্যা— ফ্ল্যাশ বালবে কি ব্যাট্যারী চলবে? লাইট মীটারের জন্যও বা ক্যামেরায় কি ভরতে হবে? আর কানে শোনার অসুবিধার জন্য হিয়ারিং এইড ব্যবহার যাঁরা করেন তাঁদেরো ব্যাটারী সমস্যা আছে। একই সমস্যা চিন্তিত করে অনেক ছোটদেরও, ব্যাটারী চালিত খেলনা ব্যবহারের সৌভাগ্য যাদের হয়; আজকাল বাজার কিন্তু এসবে ভরতি।

কাজেই দশ বছর আগের তুলনায় ব্যাটারীর বাজার এখন যথেষ্ট জটিল। ঘরে ব্যাটারী চালিত সামগ্রী বেড়েছে, আর তাই নিত্য ব্যাটারীর খরচও টানতে হবে। কোন ব্যাটারী কত দামে পাওয়া যাবে, আদৌ পাওয়া যাবে কিনা, এতে ক'দিন যাবে, ব্যবহার না হলে এমনি পড়ে থেকেই ক'দিনে নষ্ট হয়ে যাবে ইত্যাদি চিন্তা আর এড়ানো যাচ্ছে না। চিন্তা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে 'লং লাইফ' 'হেভী ডিউটি', 'আলকেলাইন' প্রভৃতি নানা ধরনের নূতন কথা ব্যাটারীর গায়ে লেখা থেকে তার দামের তারতম্য ঘটিয়ে। দামের তারতম্যটা উপকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, আর হলেও সেই উপকারটি আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা এসব জানা দরকার হয়ে পড়ছে। ব্যাটারী সম্বন্ধে কিছু খবর জানা থাকলে বেশ কিছু হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, খরচের দিক থেকেও কিছু সুবিধে হতে পারে।

বিদেশের বাজারে প্রায় ৪০০ কিসিমের ব্যাটারী পাওয়া যায়; আর এই জটিলতার খানিকটা আমাদের এখানেও দেখা যায়। তবে আশার কথা হলো এর মধ্যে শুধু পরিচিত চারটি সাইজের ব্যাটারীই শতকরা ৮৫ ভাগ অংশ দখল করে আছে দুনিয়ার বাজারে। এরা আমাদের পরিচিত D টাইপ অর্থাৎ টর্চের বড় সাইজের ব্যাটারী, C টাইপ অর্থাৎ মাঝারী সাইজের ব্যাটারী, AA টাইপ অর্থাৎ পেন্সিল সাইজের ব্যাটারী এবং ৯ ভোল্টের ছোট চেপ্টা ব্যাটারী। প্রথমোক্ত তিনটা আকারে ভিন্ন হলেও এদের প্রত্যেকটারই ভোল্টেজ দেড় ভোল্ট। নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে আজকাল নিম্নলিখিত কয়েক ধরনের ব্যাটারীই কমবেশী চালু রয়েছে।

কার্বন-জিংক্ ব্যাটারী

এটা আমাদের চির-পরিচিত সাধারণ ব্যাটারী—গত নব্বই বছর ধরেই এরকম ব্যাটারী তৈরি হচ্ছে। আর আজও এতো সব রকমারির পরও এটাই সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ব্যাটারী। দামেও অন্য সব কিছুর চেয়ে সস্তা। কখনো পুরোনো এরকম একটা ব্যাটারী ভেঙ্গে যদি দেখে থাকেন তাহলে হয়তো লক্ষ্য করেছেন এর বাইরের কাগজে পলিথিনের জ্যাকেটের ভেতর একটা ময়দার মতো প্যাস্টের ভেতরে রয়েছে জিংক অর্থাৎ দস্তার একটি কৌটো। কৌটোটা ভর্তি

থাকে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড গুঁড়ায় এবং এর মাঝখানটায় রয়েছে কালো কার্বনের একটা দণ্ড। ঐ কার্বনই ওপরে ধাতুর টুপির মধ্য দিয়ে ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্ত, আর দস্তার কৌটোর তলাটাই আবার টিনের আবরণের মধ্য দিয়ে ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্ত তৈরি করেছে। এজন্যই একে বলা হয় কার্বন-জিংক ব্যাটারী।

কার্বন-জিংক ব্যাটারী কিন্তু সে ক্ষেত্রেই চমৎকার যেখানে এর থেকে কারেন্ট নেয়া হয় খুব অল্প। এর থেকে যদি খুব ধীরে ধীরে অল্প অল্প কাজ নেয়া হয় তা হলে এটা মোট কাজ দিতে পারবে সবচেয়ে ভাল। উদাহরণ স্বরূপ একটা ট্রানজিস্টর রেডিও চালাবার জন্য এটা খুবই ভাল। কিন্তু যদি এমন কিছু এর দ্বারা চালাতে চান যা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অধিক কারেন্ট নেবে অর্থাৎ ভারী কাজ করবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাটারীর দক্ষতা বেশী নয়। ক্রমাগত ভারী কাজ করালে সব ব্যাটারীর দক্ষতাই কম হয়, কিন্তু কার্বন-জিংক ব্যাটারীর মতো অন্যগুলোর অবস্থা এতো খারাপ হয় না। একটা বাতি যদি এর দ্বারা জ্বালিয়ে রাখতে চান, ক্যাসেটের মোটর যদি এর দ্বারা ঘোরাতে থাকেন, কিংবা বাচ্চারা যদি তাদের বাতি-জ্বালা শব্দ করা পুলিশ-কার বেশ খানিকক্ষণ ধরে চালাতে থাকে তাহলে এর থেকে কম ফায়দা পাবেন। তাই এ ধরনের কাজের জন্য এই ব্যাটারী ব্যবহারটা শেষ পর্যন্ত সস্তা পড়ে না। কিন্তু রেডিও চালানো, পকেট কালকুলেটর চালানোর মতো হালকা কাজে এটাই সবচেয়ে সস্তা ব্যাটারী। তাছাড়া টর্চের জন্য বা অল্প ব্যবহৃত হওয়া খেলনার জন্যও এটা ভাল। যদিও সে ক্ষেত্রে একটা ভারী কাজই করতে হচ্ছে— কিন্তু সে কাজ হঠাৎ হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্য মাত্র করতে হয় বলে দক্ষতার এমন কিছু ঘাটতি পড়ে না। তাই এ সবের জন্যও বেশী দামের অন্য ব্যাটারী ব্যবহারের মানে হয় না।

কার্বন-জিংক ব্যাটারীর ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস ভাবতে হয় তা হলো উত্তাপ। ঠাণ্ডায় এটি ভাল কাজ করে না, ২০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের নীচে তো একেবারেই করে না। অবশ্য আমাদের দেশের আবহাওয়ায় সেটা চিন্তনীয় বিষয় নয়। বরং এদিক থেকে আমাদের দেশের জন্য এটি ভাল, কারণ উত্তাপ যত বেশী এর দক্ষতাও তত বেশী; সবচেয়ে বেশী ১০০° ফারেনহাইট উত্তাপে। অবশ্য এর খারাপ দিকও আছে। গরমে এটা কাজ ভাল করে বটে কিন্তু গরমের মধ্যে এর শেল্‌ফ লাইফ বা তোলা আয় কম; অর্থাৎ ব্যবহৃত না হয়ে পড়ে থাকলে ধীরে ধীরে যেভাবে এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় গরমে তা দ্রুততর হয়। ঠাণ্ডার মধ্যে তুলে রাখা সম্ভব হলে কার্বন জিংক ব্যাটারীর শেল্‌ফ লাইফ ভালই, কিন্তু গরমে এটা সুবিধের নয়।

হেভী ডিউটি

কিছু কিছু ব্যাটারীর গায়ের উপর দেখবেন 'হেভী ডিউটি' কথাটা লেখা আছে। নামেই বোঝা যাচ্ছে যে এরা ভারী কাজের জন্য। সাধারণ ব্যাটারীর চেয়ে উপযুক্ততর হওয়ার কথা। সাধারণ জিংক-কার্বন ব্যাটারীরই একটু ভিন্নরূপ এরা, আর এতে জিংক ক্লোরাইডকে একটা ইলেকট্রোলাইট হিসেবে ব্যবহার করা হয়; তাই এদেরকে জিংক ক্লোরাইড ব্যাটারীও বলা হয়।

দেখা গেছে এই ব্যাটারীগুলো শতকরা ৫০ ভাগ সার্থকনামা, অর্থাৎ এদের ভাল কাজে দক্ষতা বজায় রাখার ক্ষমতা সাধারণ ব্যাটারীর দেড়গুণের মতো। কাজেই দামও দেড়গুণের বেশী না হলে অপেক্ষাকৃত ভারী কাজে এদের ব্যবহার করা উচিত। বেশী ঠাণ্ডায় এদের কার্যকারিতা সাধারণ ব্যাটারীর চেয়ে খানিকটা ভাল, কিন্তু সেটা আমাদের জন্য ধর্তব্য নয়। শেল্‌ফ লাইফের দিক থেকে এটি সাধারণ জিংক কার্বন ব্যাটারীর সমতুল্য, তার চেয়ে ভাল কিছু নয়।

আলকেলাইন

কার্বন-জিংক ব্যাটারীর দুর্বলতাগুলো সত্যিকার অর্থে কাটাতে হলে যে ব্যাটারী ব্যবহার করা প্রয়োজন তা হলো আলকেলাইন ব্যাটারী। এদের গায়ের ওপর আলকেলাইন কথাটা লেখা থাকে। এদের দক্ষতা খুব ভাল।

বেশী ভারী কাজ করতে গিয়ে সাধারণ ব্যাটারী যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষমতা হারিয়ে বসে, আলকেলাইন সেখানে চমৎকার কাজ করে যায়। এদিক থেকে এর সুবিধা সাধারণ ব্যাটারীর চেয়ে মোটামুটি পাঁচ গুণ বেশী বলা যায়। তাই ফটো তোলার ফ্ল্যাশ বাতি, বড় বড় খেলনা, পোর্টেবল ফ্লোরোসেন্ট বাতি, ইত্যাদির জন্য আলকেলাইন ব্যাটারীর ব্যবহারটা উচিত কাজ। তাছাড়া সময় সময় ব্যবহার করে যদি দীর্ঘকালের জন্য তুলে রাখতে হয় তাহলেও আলকেলাইন কেনা ভাল—কারণ এর শেল্‌ফ লাইফ পাঁচ বছরেরও বেশী হতে পারে।

অবশ্য আলকেলাইন ব্যাটারীর দামও অনেক বেশী। উল্লিখিত সুবিধাগুলো অর্থাৎ ভারী কাজ, বেশী দিন তুলে রাখা, ইত্যাদির প্রয়োজন যদি না থাকে তাহলে এটা কিনে কাজ নেই। এই ব্যাটারীর গঠনও মূলতঃ সাধারণ ব্যাটারীর অনুরূপ শুধু এতে ক্ষার জাতীয় কিছু উপাদানের প্রাধান্য থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা কথা বলতে হয়, যা সাধারণ ব্যাটারী এবং আলকেলাইন উভয়ের সম্পর্কে প্রযোজ্য। উভয়ের ভোল্টেজ ধীরে ধীরে কমে আসে, চট করে হঠাৎ একেবারে কমে যায় না। কাজেই যেসব ব্যবহারে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজের বেশ খানিকটা কমেও কাজ চলে যায় সেক্ষেত্রে এদের কাছ থেকে কাজও বেশী পাওয়া যায়। একটি বিশেষ ভোল্টেজের সামান্য কম হলেও অচল, এমন ব্যবহারের জন্য এরা ভাল নয়।

সিলভার অক্সাইড

সর্বশেষ যে কথাটি বলা হয়েছে তার দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যাটারী হচ্ছে সিলভার অক্সাইড। আপনার টর্চ লাইটে যদি এটা ব্যবহার করেন তাহলে আলকেলাইন ব্যাটারীর চেয়ে তিনগুণ বেশী সময় ধরে এটি আলো দেবে। আর সে আলো এই পুরো সময়ের মধ্যে একটুও কমবে না— একেবারে পুরো নিভে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। ভোল্টেজ একটুও না কমিয়ে ব্যবহার করার প্রয়োজন যেখানে, সেখানে সিলভার অক্সাইডের জয় জয়কার।

ঘড়ি, কালকুলেটর, হিয়ারিং এইড ক্যামেরার লাইট মীটার ইত্যাদির 'বোতাম ব্যাটারী' হিসেবে এটা খুব প্রচলিত। বোতামের আকৃতির ছোট্ট চাকতি হিসেবে পাওয়া যায় বলেই এই নাম। অনেক ব্যবহারে ভোল্টেজ শেষ পর্যন্ত পুরাপুরি অক্ষুণ্ন রাখাটা জরুরী। নইলে ঘড়ি সময় ঠিক দেবে না, লাইট মীটার উল্‌টা পাল্‌টা রিডিং দিতে চাইবে।

এসব কাজে এই ব্যাটারী ব্যবহারের আরো একটা বড় কারণ আছে। শক্তির উৎস হিসেবে সিলভার অক্সাইড ব্যাটারীতে যত অল্প জায়গায় যত বেশী শক্তি জমা করে রাখা যায় আর কোন ব্যাটারীতে তত নয়। এপলো-১৫-এর অভিযাত্রীরা চাঁদে গিয়ে সেখানে যে অদ্ভুত গাড়ীতে ঘুরে বেড়ালেন তার শক্তি যুগিয়েছিল সিলভার অক্সাইড ব্যাটারী। কেন তা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

এত সব ভাল দিকের মধ্যে খারাপ দিক শুধু একটিই তা হলো অতিরিক্ত দাম। বোতামের মতো ছোট্টটি হলে কি হবে এর তুলনামূলক দামটা কিন্তু যথেষ্ট বেশী; সিলভার অর্থাৎ রূপার দামই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। সিলভার অক্সাইড বোতাম ব্যাটারীগুলোর ভোল্টেজও সাধারণতঃ ১.৫ ভোল্ট।

মার্কারী ব্যাটারী

সিলভার অক্সাইডের অতিরিক্ত দামের জন্য অনেকে একই কাজের জন্য মার্কারী বোতাম ব্যাটারী ব্যবহার করেন। এদের দাম সিলভার অক্সাইডের চেয়ে বেশ খানিকটা কম হয়। অন্ততঃ বিদেশে। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এদের ভোল্টেজ সাধারণতঃ কিছু কম ১.৩৫ ভোল্ট বা ১.৪ ভোল্ট হয়ে থাকে। ঘড়ি, ক্যামেরা ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য যেখানে সিলভার অক্সাইড এবং ১.৫ ভোল্ট নির্দিষ্ট করা আছে সেখানে তার বদলে মার্কারী ব্যবহার করলে বিপত্তি ঘটতে পারে— কেননা এ সব যন্ত্র একটুও কম ভোল্টেজ সহ্য করতে পারে না। কিন্তু হিয়ারিং এইডের মত জিনিসে যেখানে ভোল্টেজ একটু কম হওয়ার দরুন তেমন কিছু ইতরবিশেষ হয় না সেখানে সিলভার অক্সাইডের বদলে মার্কারী চলতে পারে।

মার্কারী ব্যাটারী পেন্সিল সাইজেও (AA) পাওয়া যায়। আজকাল বোতাম ব্যাটারী আকারে কিছু কিছু আলকেলাইন ব্যাটারী বাজারে ছাড়া হয়েছে। সাইজ এবং ভোল্টেজ মিললেও সিলভার অক্সাইড বা মার্কারী ব্যাটারীর বদলে এদেরকে ব্যবহার করার আগে মনে রাখা উচিত এদের ভোল্টেজ বেশিদিন এক থাকবে না। কাজেই ঘড়ির মতো জিনিসে এদের ব্যবহার করে লাভ নেই। সিলভার অক্সাইড এবং মার্কারী ব্যাটারীগুলো সাধারণতঃ যে সব কাজে ব্যবহৃত হয় সেখানে অতিরিক্ত কারেন্ট অর্থাৎ ভারী কাজের ব্যাপার নেই। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এদেরকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যে ভারী কাজের জন্যও এদের দক্ষতা চমৎকার— আলকেলাইনের মতোই বা তার চেয়েও বেশী। প্রসঙ্গতঃ চাঁদে গাড়ী চালাবার কথাটা আবার স্মরণ করা যায়। আর শেল্‌ফ লাইফের কথায় আসলে সিলভার-অক্সাইড এবং মার্কারী উভয়ের শেল্‌ফ লাইফ আলকেলাইনের মতোই দীর্ঘ—গরম ঠাণ্ডা যে কোন আবহাওয়ায়। কাজেই ক্যামেরার ভেতর বোতাম ব্যাটারী ঢুকিয়ে, মোটেই ব্যবহার না করলেও আপনি কয়েক বছর ধরে এর কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

নিকেল ক্যাডমিয়াম

এতক্ষণ যে সব ব্যাটারীর কথা বলা হলো সেগুলো ফুরিয়ে গেলে ব্যাস শেষ, আর কোন কাজে আসে না। এদিক থেকে নিকেল ক্যাডমিয়াম (সংক্ষেপে নিক্যাড) ব্যাটারী অনন্য; এদেরকে পুনর্বার চার্জ করে নূতনে পরিণত করা যায়। এরাই হলো সাধারণ ব্যবহার্য রিচার্জেবল ব্যাটারী। প্রথমবার বেশী দাম দিয়ে কেনা হয়ে গেলে বলতে গেলে জীবনভর এই ব্যাটারী ব্যবহার করা সম্ভব। কারণ হাজার বারের ওপরে এদেরকে চার্জ করা যায়— চার্জারের মধ্যে রেখে বাড়ীর

কারেন্ট সাপ্লাইয়ের সাথে কিছুক্ষণ লাগিয়ে রাখলেই হলো। প্রতিবার চার্জ করতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয় তাও প্রায় ধর্তব্য নয়। কাজেই ব্যবহার প্রতি নিক্যাড ব্যাটারীর যে খরচ পড়ে তা অন্য যেকোন ব্যাটারীর চেয়ে কম।

সাধারণ ব্যাটারী বা আলকেলাইনের মতো নিক্যাড D, C, AA এবং ছোট চেপ্টা এই কটি পরিচিত সাইজেই পাওয়া যায়। কিন্তু এদের ভোল্টেজ সাধারণ দেড় ভোল্টের পরিবর্তে ১.২৫ ভোল্ট। এ জন্য অবশ্য বিশেষ কোন অসুবিধা নেই, কারণ সাধারণ ব্যাটারী যে সব কাজে ব্যবহৃত হয় সেখানে খানিকটা কম ভোল্টেজে তেমন কিছু আসে যায় না। অন্যদিকে যে রকম অতিরিক্ত ভারী কাজে এই নিক্যাডকে চমৎকারভাবে ব্যবহার করা যায় তা আলকেলাইন ব্যাটারীকেও হার মানায়। এজন্য ঝালাই করার তাতাল (সোলডারিং আইরন) ইত্যাদির মতো উচ্চ কারেন্টের কাজে যদি ব্যাটারীর ব্যবহার করতে হয় তখন নিক্যাডই ভরসা। যদিও দরকার মতো চার্জ করা যায় বলে নিক্যাডের শেল্ফ লাইফের গুরুত্ব কম, তবুও বলে রাখা ভাল যে এর শেল্ফ লাইফ এলকেলাইনের মতোই চমৎকার। অপেক্ষাকৃত দামী কালকুলেটর ইত্যাদির সাথে চার্জার সহ নিক্যাড ব্যাটারী অনেক সময় দিয়ে দেয়া হয়।

হালকা কাজ, ভারী কাজ

এ পর্যন্ত আলোচনায় দেখা গেছে যে সাধারণ ব্যাটারী, আলকেলাইন অথবা নিক্যাডের ক্ষেত্রে করণীয় কাজটা হালকা বা ভারী তা জেনে ব্যাটারী বাছাই করা প্রয়োজন। দেখা গেছে যে হালকা কাজের জন্য সস্তা সাধারণ ব্যাটারীই লাভজনক, কিন্তু ভারী কাজের জন্য দামী ব্যাটারীই শেষ পর্যন্ত সস্তা পড়ে। তাই কোন কাজটা কতখানি হালকা বা ভারি তা আরো স্পষ্ট করে জানলে সুবিধা হবে। কাজটাতে কত মিলিএম্পায়ার কারেন্ট খরচ হয় তার একটা মোটামুটি হিসেব থেকে আমরা বুঝবো সেটা কতো ভারী কাজ।

ট্রানজিসটর রেডিওতে সাধারণতঃ ১০ থেকে ৫০ এর মতো মিলি-এম্পায়ার কারেন্ট খরচ হয়। এটা তাই হালকা কাজের একটা ভাল উদাহরণ। ক্যাসেট রেকর্ডারে ৭০ থেকে ২০০-এর উর্দ্ধে কারেন্টও প্রয়োজন হতে পারে। কাজটা তাই রেডিওর তুলনায় ভারী। কালকুলেটরে কারেন্টের পরিমাণ কম, এটা হালকা কাজ কিন্তু কত হালকা তা অবশ্য নির্ভর করে কালকুলেটরের সংখ্যাগুলো দেখানোর পদ্ধতির ওপর। এটা যদি LED (Light emitting Diode) ধরনের হয় যেগুলোতে উজ্জ্বল লাল আলোর মাধ্যমে সংখ্যা ফুটে ওঠে— তা হলে কারেন্ট অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী লাগে; চেপ্টা ৯ ভোল্ট ব্যাটারী চালিতগুলো ২০,৩০ এবং AA (পেন্সিল) ব্যাটারী চালিতগুলো ৪০-১০০ কারেন্ট নেয়। আর যদি এটা অধুনা বহুল ব্যবহৃত LCD (Liquid Crystal Display) ধরনের হয়— যেগুলোতে অনুজ্জ্বল ধাতব রঙের সংখ্যা দেখা যায়— তা হলে কারেন্ট লাগে অত্যন্ত কম, মাত্র ১ এরও কম। ঘড়িতে LED ধরনে ১০,৪০ এবং LCD ধরনে অনেক কম কারেন্ট খরচ হয়।

সত্যিকার ভারী কাজগুলো সাধারণতঃ আলো, তাপ বা মোটর সংক্রান্ত। সাধারণ টর্চলাইটে ৫০০ থেকে ১০০০ কারেন্ট লাগতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে ভারী কাজ, যদিও একটানা বেশী ব্যবহৃত হয় না বলে এর জন্য সাধারণ ব্যাটারীই যথেষ্ট। ব্যাটারী চালিত পোর্টেবল ফ্লোরোসেন্ট বাতিও (৬ ওয়াটের) ৫০০ থেকে ১০০০ কারেন্ট খরচ করে। বাচ্চাদের অপেক্ষাকৃত ভারী, দামী যে সব খেলনা নানা রকমভাবে গতিশীল হয়, আলো জ্বালে সেগুলোতে ৪০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত কারেন্ট লাগতে পারে। যে সব পোর্টেবল টেলিভিশন ব্যাটারী চালিত সেখানে ৫০০ থেকে ১৫০০ কারেন্টের প্রয়োজন। ক্যামেরার ফ্ল্যাশের জন্যও খুব বেশী কারেন্ট লাগে— প্রায় ২০০০-এর মতো। এগুলো সবই বেশ ভারী কাজের উদাহরণ।

ভারী কাজের জন্য আরেক ধরণের ব্যাটারী আছে যা বর্তমান আলোচনায় আনা হয়নি— সেগুলো হলো ষ্টোরেজ ব্যাটারী। মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত বড়, ভারী ব্যাটারীগুলো তার অন্যতম। এদেরকে প্রয়োজন মতো চার্জ করে নেয়া যায় এবং মোটর ঘোরানো, বাতি জ্বালানো, টেলিভিশন চালানোর মতো ভারী কাজ এদের দিয়ে করানো যায়। আমরা অবশ্য এখানে শুধু ঐ সব ব্যাটারীর কথা আলোচনা করছি সেগুলো হালকা পাতলা, শুকনা, ঘরের কাজে নিত্য ব্যবহৃত হয়, যাদের বাজার থেকে অমীন নিয়ে এলেই হলো, কোন রকম রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পানি দেয়া, এসিড দেয়া এসব হ্যাঙ্গামা যেখানে পোহাতে হয় না। এজন্য ষ্টোরেজ ব্যাটারীকে ঠিক এই পর্যায়ে ফেলা হয়নি।

ঢাকার বাজারে : কোনটা কিনবেন?

ঢাকার বাজারে মোটামুটি ব্যাপক একটা অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা নানা ধরনের ব্যাটারীর খোঁজ-খবর নিয়েছি। এদের দাম, প্রাপ্যতা, উপযোগিতা বিচার করে এ সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা যায়।

সাধারণ ব্যাটারীগুলোর মধ্যে D সাইজের অর্থাৎ বড় টর্চ ব্যাটারীর দাম জোড়া ১১ টাকা থেকে ১৫ টাকা, C সাইজ অর্থাৎ মাঝারীর দাম জোড়া ১৪-১৫ টাকা এবং AA সাইজ অর্থাৎ পেন্সিল ব্যাটারীর দাম জোড়া ১২ থেকে ১৬ টাকা। দুর্লভ বিদেশী ব্র্যান্ড হলে দাম আরো বেশী। দেখা যাচ্ছে যে সাইজ বিভিন্ন হলেও দাম এদের প্রায় সমান। চেপ্টা ৯ ভোল্টের ব্যাটারীতে পাওয়া যায়— এর দাম প্রতিটা ১৫ থেকে ২৫ টাকা ব্র্যান্ড ভেদে। কার্যকারিতা বেশী বলে সেই হিসেবে বড় D সাইজের ব্যাটারী ব্যবহার করতে পারাটাই সবচেয়ে লাভজনক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ৯ ভোল্টে চলা একটা রেডিও মাঝারী ভল্যুমে চালাতে যদি ১৫ মিলি এম্পায়ারের মতো কারেন্ট খরচ করে, তা হলে সেটা পেন্সিল ব্যাটারীতে চালালে ৪০-৪৫ ঘণ্টা চালানো যাবে, ৯ ভোল্টের চেপ্টা ব্যাটারীতে চালালে ৩০-৩৫ ঘন্টা, আর বড় টর্চের ব্যাটারীতে চালালে ১৫০–২০০ ঘন্টার মতো চালানো যাবে। অথচ পেন্সিল ব্যাটারী ও বড় ব্যাটারীর বাজারদর সমান, আর ৯ ভোল্টের একটি ব্যাটারী বদলে ছয়টি বড় ব্যাটারী কিনতে মাত্র তার দ্বিগুণের মতো দাম লাগে। রেডিওটিকে যখন নিয়ে বেড়াতে হয়না তখন ছোট ব্যাটারীর বদলে সাধারণ ছটি বড় ব্যাটারীর তৈরি 'পাওয়ার প্যাক' দিয়ে চালানো অনেক বেশী লাভজনক।

সাধারণ মাপের হেভী ডিউটি এবং আলকেলাইন ব্যাটারী ঢাকার বাজারে শুধু পেন্সিল সাইজে পাওয়া যায়— তাও বেশ দুষ্প্রাপ্য। আলকেলাইন জোড়া ৫০ টাকা এবং হেভী ডিউটি জোড়া ২৫ টাকা। অবশ্য পেন্সিল ব্যাটারীর চেয়ে সামান্য ছোট একটা বিশেষ সাইজে (AAA) আলকেলাইন ব্যাটারী প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে, দাম জোড়া ৩০—৩৫ টাকা। ভাল কাজে আলকেলাইনের সুবিধার কথা আগেই বলা হয়েছে। ফটো ফ্ল্যাশে, মোটরওয়ালা দামী খেলনায়—উল্লিখিত পেন্সিল আলকে লাইনগুলো লাভজনক হতে পারে, বেশী দাম সত্ত্বেও। বড় সাইজের আলকেলাইন পাওয়া গেলে, এর দাম সাধারণ ব্যাটারীর চেয়ে এই অনুপাতের বেশী না হলে ফ্লোরোফ্লেন্ট বাতি, ক্যাসেট প্লেয়ার ইত্যাদি কাজেও লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যেত। তাছাড়া আলকেলাইনের সুদীর্ঘ শেলফ লাইফের ব্যাপারটাও হেলা করার নয় যদি দীর্ঘদিন পরপরই শুধু এক একবার যন্ত্রটা ব্যবহার করতে হয়।

ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, হিয়ারিং এইড, ক্যামেরা ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন আকারের সিলভার অক্সাইড বোতাম ব্যাটারী এখন ঢাকার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে— দাম প্রতিটা ৩০ থেকে ৪০ টাকা। একই কাজের কিছু কিছু মার্কারী ও আলকেলাইন বোতাম ব্যাটারীও পাওয়া যাচ্ছে। দাম একই বলে এবং সিলভার অক্সাইডের সুবিধাগুলোর কারণে যেখানে সম্ভব সিলভার অক্সাইড ব্যবহার করাটাই লাভজনক। অবশ্য ক্যামেরার প্রয়োজনে ৫.৬ ভোল্টের এবং ১.৪ ভোল্টের বিশেষ সাইজের ব্যাটারীও করেছে। প্রথমটি প্রতিটি ৮০ টাকার মতো এবং দ্বিতীয়টি ৩৫-৪০ টাকা। রিচার্জেবল নিক্যাড ব্যাটারী আলাদাভাবে ঢাকার বাজারে পাওয়া যায়নি। তবে যন্ত্রপাতির সাথে চার্জার সহ এই ব্যাটারী অনেক সময় দেয়া থাকে।

সামনে কি আসছে?

এ পর্যন্ত যেসব ব্যাটারীর কথা বলা হয়েছে সেগুলো ইতিমধ্যেই যথেষ্ট চালু রয়েছে। কিন্তু আরো কিছু ব্যাটারী উন্নত দেশগুলোতে সদ্য বাজারজাত করা হয়েছে— যারা পাঁচ দশ বছরের মধ্যে আমাদের এখানে জনপ্রিয় হতে পারে। লেড-এসিড লেন্টার্ন ব্যাটারী নামে একটা ব্যাটারীর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বাতি জ্বালাবার কাজে জনপ্রিয় হবার। মোটর গাড়ীর ষ্টোরেজ ব্যাটারীর নীতিতে তৈরি হলেও এতে জেলীর মতো ইলেকট্রোলাইট ব্যবহার করা হয়েছে তাই পানি দিতে হয়না— তবে বারবার চার্জ করে নেয়া যায়। লিথিয়াম সেল নামে পরিচিত একটি বোতাম ব্যাটারী আগামীতে কালকুলেটর, ঘড়ি ইত্যাদির কাজে একচেটিয়া হয়ে যেতে পারে— প্রধান কারণ এর অবিশ্বাস্য রকমের শেলফ লাইফ যা কয়েক দশকের বিশ-ত্রিশ বছরেরও বেশী হতে পারে। সাধারণ ব্যাটারী অর্থাৎ কার্বন জিংকের নীতিতে তৈরি একটি নূতন বৈশিষ্ট্যময় ব্যাটারী বাজারে ছাড়া হয়েছে। অন্যান্য সব ব্যাপারে একই হওয়া সত্ত্বেও এটা মুহূর্তকালের জন্য অত্যন্ত উচ্চ কারেন্ট (২৫ এম্পায়ারের মতো!) দিতে সক্ষম। খুবই বিশেষ ধরণের কিছু কাজে এর ব্যবহার হবে।

আর সব কিছু থেকে ভিন্ন যে ব্যাটারী সামনে আসছে, সেটা হলো সৌর ব্যাটারী। ইতিমধ্যেই সৌর ব্যাটারী চালিত রেডিও ঘড়ি বাজারে ছাড়া হয়েছে। এ ব্যাটারী তার কাজের জন্য সূর্যের আলোর ওপর নির্ভরশীল, ফলে এর ক্ষয় নেই। শক্তি জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা থাকে বলে সূর্যের আলো যখন পড়ছে না তখনো যন্ত্র চালু থাকে। আমাদের দেশের মতো দেশে এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।

গবেষকের মোনাজাত

আয় খোদা আমার তত্ত্বের ওপর
তোমার বরকত ঢেলে দাও
যাতে পরে প্রত্যয়নের সময় না দেখা যায়
যে তোমার বান্দা মিথ্যে তত্ত্ব দিয়েছে।
তারা যেন আমাকে বি. এস. সি. দিতে পারে
এরপর পি. এচ. ডি. যেন যথারীতি আসে
অতঃপর ডি. এস. সি. এফ, আর এসও
যেন বিলম্ব না করে। আমিন।
আয় খোদা আমার গোনাহ মাফ করে দাও
আমার গোঁজামিলের জগাখিচুড়িকে তুমি মাফ করে দাও
তোমার আরশ থেকে তুমি তো দেখছই
কি রকম প্রতিযোগিতার মধ্যে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে।
আয় খোদা সম্পাদকের দিলে তুমি
রহম পয়দা করো।
তিনি যেন রেফারীর প্ররোচনায়
আমার প্রবন্ধটি কাটা- ছেঁড়া করে
শুধু নোট হিসেবে না ছাপান। আমিন।

সম্পাদকীয়

কাজী মোতাহার হোসেনের প্রয়াণে

[অক্টো-নভেম্বর-১৯৮১]

কাজী মোতাহার হোসেনের মৃত্যু এদেশের জ্ঞান-চর্চার ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। এই ইতিহাসের অনেকখানি তিনি নিজেই পূর্ণ করেছিলেন তাঁর দীর্ঘ বহুমুখী সক্রিয় অস্তিত্ব দিয়ে। পদার্থবিদ্যা, গণিত, সংখ্যাতত্ত্ব, সাহিত্য, বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন, ক্রীড়া এই সমস্ত দিকে তিনি শুধু অবদানই রাখেননি, একেবারে প্রথম সারিতে থেকে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রায় প্রত্যেকটিতে। শেষের দিকে যখন তিনি আর ওভাবে সক্রিয় ছিলেন না, তখনো তরুণরা অনুপ্রেরণা খুঁজতে যেতো কিংবদন্তীর নায়কের মতো খ্যাতিমান এই অধ্যাপকের কাছে তাঁর বক্তৃতা শুনতে, নইলে তাঁর কাছ থেকে শুধু গল্প শুনতে, যে গল্প প্রধানতঃ দীর্ঘ সময়ের বিস্তারে জ্ঞান-চর্চার গল্প।

কাজী মোতাহার হোসেন প্রাচীন ছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে চিন্তায় ও আচরণে নবীনদের অনেকের চেয়েও আধুনিক ও স্মার্ট ছিলেন। তাই তিনি দীর্ঘ জীবনের কোন পর্যায়েই সৃষ্টিশীলতা এবং প্রাসঙ্গিকতা হারাননি। মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী যখন সেই প্রাথমিক প্রচেষ্টার সময় তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তিনি এক দিকে যেমন উৎসাহিত করেছেন অন্যদিকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নানা রকম ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন— বক্তব্যের প্রকাশের, এমন কি বানান-রীতির। পরবর্তী সময়ে আমরা এ পত্রিকার তরফ থেকে তাঁর কাছে মাঝে মাঝে আরো গিয়েছি, সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাঁর মতামত প্রকাশ করেছি। সব সময় মনে হয়েছে আজকের সমস্যাগুলো, আজকের করণীয়গুলো সম্বন্ধে স্বচ্ছ মত দিতে তাঁর একটুও অসুবিধা হচ্ছেনা, একটুও আগ্রহের কমতি হচ্ছেনা। তিনি আজ আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেন— তাই নবীনদের পক্ষে আজ আর সম্ভব হবে না এমনি একজন প্রাচীন নবীনের কাছ থেকে শোনার, অনুপ্রেরণা নেবার।

টুকরো ছবি [আগষ্ট-সেপ্টেম্বর-৮২]

গ্যালিলিও স্মৃতি : ফ্লোরেন্স

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

ঘন্টা বাজাতে খুলে দিলো এক কিশোরী। একটু পরেই দেখা হলো ওর মায়ের সাথে। ওরা মা-মেয়েই দর্শকদেরকে বিজ্ঞান ইতিহাস মিউজিয়ামটি দেখাবার জন্য ভারপ্রাপ্তা। ইউরোপীয় রেনেসার সাথে অবিচ্ছেদ্য এই শহর ফ্লোরেন্সে পর্যটকের ভীড় যথেষ্ট। মাইকেল এঞ্জেলোর খোদাই করা ডেভিড, বতিচেল্লীর ভেনাস—এরা তো এখানেই। কিন্তু তার মধ্যে ফ্লোরেন্সের এই নির্জন গলিতে ততোধিক নির্জন এই বাড়ী আমার জন্য রেখেছে আরো বড় আকর্ষণ। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগের দিনগুলোতে এই ফ্লোরেন্স ও তার আশপাশেই আধুনিক পরীক্ষণ পদার্থবিদ্যার আর দুরবীণ-নির্ভর জ্যোতির্বিদ্যার ভিত রচিত হয়েছিল যার মূল নায়ক ছিলেন গ্যালিলিও। ফ্লোরেন্সের এই নির্জন বাড়ী ধারণ করছে তার কিছু নিদর্শন।

পীসা আর পাদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় গ্যালিলিওর প্রথম জীবনের কর্মক্ষেত্র হলেও তাঁর আনুগত্য সব সময় ছিল এই ফ্লোরেন্সের প্রতিই। নিজের তৈরি দূরবীণ আকাশের দিকে তাক করে এ সময় গ্যালিলিও একের পর এক বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছিলেন—অজানা সব তারা, ছায়াপথের প্রকৃতি, চাঁদের খাদ-পাহাড়, সূর্যের কলংক ইত্যাদি। বৃহস্পতির চারটা চাঁদ এই গ্রহকে আবর্তন করছে— এটা আবিষ্কার করে গ্যালিলিও এদের নাম দিয়েছিলেন 'মেডিচিয়ান তারা'। বলাবাহুল্য মেডিচিরা ছিলেন ফ্লোরেন্সের অধিকর্তা, গ্যালিলিওর বরাবরের উৎসাহদাতা।

১৬১০ সালে গ্যালিলিও পাদুয়ার অধ্যাপনার চাকরিটা ছেড়েই দেন। তিনি ফিরে এলেন তাঁর ফ্লোরেন্সে, শিক্ষকতা বাদ দিয়ে শুধু গবেষণায় মন দিতে। এখানেই তিনি দূরবীনের সাহায্যে দেখালেন শুক্র গ্রহের চাঁদের মতো কলা আছে। এসব দূরবীনের প্রায় শ'খানেক বানিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতেই ; ইউরোপের রাজন্যবর্গকে উপহার দিয়েছেন বেশ কটা। তাঁর তৈরি এবং ব্যবহৃত এমনি দু'টা দূরবীন রাখা আছে ফ্লোরেন্সের এই বিজ্ঞান-ইতিহাস জাদুঘরে।

এর একটির বিবর্ধন ক্ষমতা ১৪ গুণ। এক ডিগ্রী কোণকে ষাট ভাগ করলে এক আর্ক মিনিট এবং তাকে ষাট ভাগ করলে পাই এক আর্ক সেকেন্ড। এই দূরবীনের রিজলভিং পাওয়ার ২০ আর্ক সেকেন্ড- অর্থাৎ ঐ টুকু কৌণিক দূরত্বের সমান মাপের মধ্যে দৃশ্য বস্তু আলাদা করার ক্ষমতা এর আছে। তাছাড়া চোখ লাগালে ১৭ আর্ক মিনিট পর্যন্ত কোণ এতে এক সাথে দেখা যায়। দ্বিতীয় দূরবীনটির বিবর্ধন ২০ গুণ, রিজলভিং পাওয়ার ১০ আর্ক সেকেন্ড আর দৃশ্য ক্ষেত্র ১৭ আর্ক মিনিট। দূরবীণের সাথে সূক্ষ্ম কোণ পরিমাপের ব্যবস্থা করে গ্যালিলিও একে জ্যোতির্বিদ্যার মাপজোকে ব্যবহার করেছিলেন। ১৬১২ সালের ৩১শে জানুয়ারী তিন বৃহস্পতি গ্রহের ব্যাস মাপেন ৪১ আর্ক সেকেন্ডের হিসেবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখেছেন যে সঠিক দূরত্ব ও ব্যবধান মাপার জন্য একটা যন্ত্র তিনি সদ্য বানিয়েছেন।

মিউজিয়ামে রাখা এই দূরবীণই মনে হয় গ্যালিলিওর দূরবীণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রিজলভিং পাওয়ার সম্পন্ন। এর ২০ আর্ক সেকেন্ড রিজলভিং পাওয়ার অবশ্য বৃহস্পতির আলোর জন্য খানিকটা কমে যায়। কাজেই

গ্যালিলিও যদি বৃহস্পতির পর্যবেক্ষণে এই দূরবীণ ব্যবহার করে থাকেন তা হলে এর চাঁদগুলো গ্রহের কিনারার থেকে অন্ততঃ ২৫ আর্ক সেকেন্ড বাইরে না আসা অবধি তিনি তাদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

দূরবীণগুলোই ফ্লোরেন্সের মিউজিয়ামে গ্যালিলিওর একমাত্র স্মৃতি নয়। যেই পরীক্ষণগুলোর মাধ্যমে গ্যালিলিও আধুনিক বলবিদ্যার ভিত রচনা করেছিলেন সেই যন্ত্রপাতিরও কিছু হুবহু নমুনা এখানে রাখা আছে। পড়ন্ত বস্তুর গতি সম্বন্ধে গ্যালিলিওর কাজ বলবিদ্যার একটি যুগান্তকারী পরীক্ষা। সরাসরি উপর থেকে ফেলানো বস্তু অতি দ্রুত পড়ে যায়, তার গতি লক্ষ্য করা মুশকিল। তাই গ্যালিলিও ঢালু তলের উপর দিয়ে বল গড়িয়ে এই পড়ার গতি কমিয়ে দিলেন। গ্যালিলিওর সময় এই সময়টুকু মাপাও সহজ ছিল না। এই ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন ঘড়ির মাধ্যমে— বড় পিপা থেকে একটা পাত্রে পানি ফেলে। গ্যালিলিওর ঢালু তলটার বলে ইচ্ছে মত কমিয়ে বাড়িয়ে পরীক্ষাটি করা যেত। শুধু পড়ন্ত বস্তু নয়— এর দ্বারা সমভাবে ত্বরিত যে কোন বস্তুর গতির নিয়ম গ্যালিলিও আবিষ্কার করতে পারলেন। এসব পরীক্ষার সরঞ্জামাদি ঠিক তেমনটিই দেখতে পেলাম যেমনটি ছিল গ্যালিলিওর কাছে।

আজ স্কুলের ছেলেরাই জানে একটা বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে কদ্দুর যাবে তা বের করা যায় এই সূত্র থেকে—

$$\text{দূরত্ব} = \frac{১}{২} \times \text{ত্বরণ} \times (\text{সময়})^{২}$$

অথচ এই নিয়মটুকু আবিষ্কারের জন্য সেদিন গ্যালিলিওকে কতখানি মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে হয়েছে।

একই বস্তুর উপর দুটো বল কাজ করলে তার যে লব্ধি বল সেটা গ্যালিলিও প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন এবং ফ্লোরেন্সের মিউজিয়ামেও এ সংক্রান্ত মাপজোকের যন্ত্রপাতি রয়েছে।

বস্তুর গতিবিদ্যার জন্য যে ধরনের গাণিতিক বিশ্লেষণ দরকার— পরীক্ষণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গ্যালিলিওই প্রথম তা গড়ে তুলেছিলেন। এটাই পরবর্তী দু'এক শতকে বিজ্ঞানের অত্যন্ত শক্তিশালী গাণিতিক অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ফ্লোরেন্সের বিজ্ঞান-ইতিহাস মিউজিয়ামের প্রাচীন আঙ্গিকে এসব জিনিসে চোখ বুলালে, নেড়েচেড়ে দেখলে মনে হয় এই একটি মানুষ কি রকম যৌক্তিক মনের অধিকারী ছিলেন, কি রকম সৃজনশীলতা নিয়ে কাজ করে গেছেন! দূরবীণ চোখে মহাকাশের সূক্ষ্ম পরিমাপ, আবার বলবিদ্যার মৌলিক প্রশ্নগুলো একাকার হয়েছে তাঁর চিন্তনে।

অথচ নিজের সমাজপতিদের কাছে কি আচরণ তিনি পেয়েছিলেন? এমনকি বিদ্যাপতিদের কাছে? তাঁদের অনেকেই তাঁকে বিশ্বাস করেন নি। ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে পোপের আদালত তাঁকে শেষ জীবনে অপদস্থ করেছে। এই বিচারের সম্মুখীন হবার জন্য সত্তর বছর বয়সে তাঁকে অপরাধীর বেশে ফ্লোরেন্স থেকে যেতে হয়েছিল রোমে। কিন্তু এই ফ্লোরেন্স সেদিনও যেমন করে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, আজো মনে করিয়ে দিচ্ছে এই অসামান্য পুরুষকে— রেঁনেসার সব স্মারকগুলোর মধ্যে ধারণ করে। একটু দূরে উফিজী গ্যালারী, মেডিচিদের প্রাসাদ, বহু ঘটনার সাক্ষী পিয়াৎসা ডেল সিনোরিনার চত্বর এসবের মধ্যে এও এক তীর্থ পুষ্পনগরী ফ্লোরেন্স— যেখানে রেঁনেসার সুন্দরতম পুষ্পগুলো বিকশিত হয়েছিল।

ছোট বাচ্চা যদ্দিন শোয়া বসা বা হামাগুড়ি দেবার বয়সে রইলো তদ্দিনে দেহের যে উচ্চতা লাভ করে, দাঁড়াতে ও হাঁটতে শেখার সাথে সাথে তার চেয়ে খানিকটা খাটো হয়ে যায় সে। এ সময় এক ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চতা তার কমে যেতে পারে। এতে অবশ্য ঘাবড়াবার কিছু নেই। মেরুদণ্ডের হাঁড়ের টুকরোগুলো দেহের চাপ নিতে গিয়ে ঠিক মতো বসে নিচ্ছে মাত্র।

এমন কেন হয়?

তাপ

[নভেম্বর-ডিসেম্বর '৮২]

স্বাতী

দৈনন্দিন জীবনে আমরা এমন অনেক ঘটনায় অভ্যস্ত যার কারণ খুঁজে দেখি না। খুঁজলে দেখতাম এর পেছনে রয়েছে পদার্থ বিদ্যার সুন্দর সব নিয়ম।

চিমনীর চারপাশে

চুলার উপরে চিমনী বসালে চুলার ধোঁয়া রান্নাঘরে ছড়ানো বন্ধ হয়। চিমনীর ছিদ্রটা যদি চুলার ঠিক উপরে নেয়া নাও হয় তবুও কিন্তু ধোঁয়া চিমনী দিয়েই যায়। কেন এমন হয়?

চুলার গরম হওয়া বাতাস আর ধোঁয়া ঘরের ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে হালকা বলে ঐ ঠাণ্ডা বাতাস একে টেনে উপরের দিকে উঠাবে। একবার এই বায়ু প্রবাহের প্রক্রিয়া শুরু হলে চিমনী হুবহু উপরে না থাকলেও এটা চলতে থাকবে।

দিনের ক্যাম্প ফায়ার

শীতের রাতে আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে গানবাজনা করে স্কাউটের দল, এটাই ক্যাম্প ফায়ার। কিন্তু অনুষ্ঠানটি যদি দিনের বেলায় হতো আর এমনি আগুন জ্বালিয়ে ক্যাম্প ফায়ার করা হতো, সেটা খুব সুখপ্রদ ব্যাপার হতো না। কেন এমন হয়?

আগুনের চারপাশের বাতাস রাতে ঠাণ্ডা থাকে বলে চিমনীর ধোঁয়ার মতো এই আগুনের ধোঁয়াকে ঠাণ্ডা বাতাস ঠেলে উপরে পাঠিয়ে দেয়। দিনের বেলায় চার পাশের বাতাস অত ঠাণ্ডা হবে না বলে ধোঁয়া চারদিকে ছড়িয়ে সবার নাকে মুখে যাবার সম্ভাবনা বেশি।

ঢাকনির সাহায্যে

ডেগচির পানিতে যখন চাল ফোটাচ্ছেন, তখন ঢাকনিটা দিয়ে ঢেকে দিলে পানি তাড়াতাড়ি ফুটবে– এ খবর আপনার জানা আছে। কিন্তু কেন তাড়াতাড়ি ফুটবে? তাপের অপচয় কমে বলে? অর্থাৎ পরিচলন বা বিকিরণের মাধ্যমে কিছু তাপ খোলা ডেগচি থেকে বেরিয়ে যায় বলে? কিন্তু ঢাকনিটাওতো প্রায় ফুটন্ত পানির সমান উত্তপ্ত থাকে। সেটা থেকেও তো তাপ ওভাবে চলে যাবে। তবুও ঢাকনি দেয়া ডেগচি দ্রুততর ফোটানো সম্ভব। কেন এমন হয়?

পানি ফোটাবার সময় তাপের একটা বড় অংশই খরচ হয় খানিকটা পানিকে বাষ্পে পরিণত করাতে। খোলা ডেগচিতে এই বাষ্প বের হয়ে যেতে পারে সেই তাপটুকু সাথে নিয়ে। ঢাকনি একে ভিতরে রেখে দেয়।

এভারেষ্ট কেন সর্বোচ্চ?

পৃথিবীতে কোন পর্বত এভারেষ্টের চেয়ে খুব বেশি উঁচু (যেমন এর কয়েক গুণ) হবার সম্ভাবনা নেই। আসলে ত্রিশ কিলোমিটার হচ্ছে পৃথিবীর পর্বতের সর্বোচ্চ উচ্চতার সীমা। কেন এমন হয়?

এর বেশি উঁচু হলে নিজের ওজনের চাপে পর্বতের ভিত্তি তরলায়িত হয়ে পর্বতটি খানিকটা বসে যাবে। ফলে ঐ বাড়তি উচ্চতাটুকু আর থাকবে না।

হিমালয়ে হাওয়া বদল

বৃটিশ আমলে গরমে অস্থির হলে সাহেব-সুবারা গিয়েছেন সিমলা কি দার্জিলিং। পাকিস্তান আমলেও কেউ কেউ যেতেন মারী হিল। কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় ঠাণ্ডা হবার তো কোন কথা ছিল না। সূর্য্যি মামার কিরণের অংশ উঁচু জায়গা তো নিচু জায়গার চেয়ে কম পায় না। তাছাড়া ঠাণ্ডা বাতাস ভারী বলে তা তো নিচের দিকেই জমার কথা বেশি। কিন্তু তবু উঁচু জায়গা ঠাণ্ডা। এমন কেন হয়? বাতাস যখন পাহাড়ের উপর উঠে তখন তা যেখানে অপেক্ষাকৃত কম বায়ুচাপের জায়গাতে গিয়ে পড়ে। চাপ কম বলে বায়ু যেখানে বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে প্রসারিত হওয়াতে তার উত্তাপ কমে যায়, যেমন করে কমে যায় রেফ্রিজারেটারের গ্যাস প্রসারিত হলে।

জ্বর কাঠির ভাঙ্গা গড়া

জ্বরের সময় থার্মোমিটার গায়ে দিলে পারা ওঠে। নিয়ে নিলে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পারা নেমে যেতে পারে না। কারণ নলের এক জায়গায় একটু চাপা থাকে, ঝাঁকি না দিলে যার মধ্য দিয়ে পারা নামতে পারে না। কিন্তু ঐ একই চাপা জায়গা উঠার সময় দিব্যি পার হয়ে গেছে পারা। কেন এমন হয়?

চাপের মুখে পারা ঐ সরু জায়গা পার হতে পারে। ঝাঁকি দিয়ে যেমন এই চাপ দেয়া যায়, উত্তাপে প্রসারিত হলেও এমনি চাপ পড়ে। কিন্তু সংকুচিত হবার সময় নিচের পারা স্তম্ভ উপরের টুকুকে শুদ্ধ টেনে আনতে পারে না, কারণ এর আন্ত-অণু বলের অত জোর নেই।

গরম চা পরিবেশন নীতি

চায়ের রং তৈরি। কিন্তু মেহমানরা চায়ের টেবিলে বসতে মিনিট পাঁচেক বাকী। আপনি একেবারে গরম চা তাদের সামনে দিতে চান। দুধ-চিনি এখনই মেশাবেন, না দেয়ার ঠিক আগে মেশাবেন? সিদ্ধান্তটি যাই হোক, কেন এমন হয়?

দুধ পরিবেশনের ঠিক আগে মেশাবেন, কারণ দুধ চা'কে ঠাণ্ডা করবে। চিনিও তাই করবে, কারণ চিনি গলাতে শক্তি ব্যয় হয়, ঐ শক্তিটুকু চায়ের তাপ থেকেই চলে যায়। কোন অবস্থাতেই একটা ধাতুর চামচ কাপের ভেতর দিয়ে রাখবেন না। এটা নিজে গরম হয়ে, আর তাপ পরিবহন করে অনেকখানি তাপ নিয়ে নেবে।

ফট্ফট্-বোটের রহস্য

খেলনাটি রাস্তার পাশে ফেরিওয়ালাদেরই বিক্রী করতে দেখা যায় বেশি। একটি বালতির পানির মধ্যে চলছে টিনের তৈরি খেলনা বোট-ফট ফট শব্দ করতে করতে। ভেতরে কেরোসিনের ছোট্ট একটা কুপী জ্বালানো, তার উপর পানির ছোট্ট বয়লার–দুটা নল বালতির পানিতে বের হয়ে আসা। বয়লারে পানি বাষ্প হলে নলের পানি ধাক্কা খেয়ে সজোরে জেটের মতো বেরিয়ে আসলে বোট সামনে যায়। কিন্তু বয়লারের পানি ফুরিয়ে গেলে নল দিয়ে আরো পানি গিয়ে ভেতরে ঢোকে। এই ঢোকার সময়তো বোটের পেছনের দিকে চলার কথা, বেরোবার সময় সামনের দিকে যতখানি গিয়েছিল। কাজেই মোটের উপর বোটের এগোবার কথা নয়, তবুও কিন্তু এটা এগোয়। কেন এমন হয়?বয়লারের কিছু বাষ্প অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা নলে জমে সংকুচিত হয় ফলে বাইরে থেকে পানি এসে নলে ও বয়লারে ঢোকে। কিন্তু ঢোকার সময় সব পানি সরাসরি বিপরীত দিক থেকে আসে না বরং বিভিন্ন দিক থেকে তেরচা হয়েও আসে। বেরোবার সময় কিন্তু পানির পুরো জেট সোজা পেছনের দিকে, একই দিকে যায়। কাজেই ঢোকা, আর বেরোবার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অপ্রতিসাম্য রয়ে গেছে। বোট সামনের দিকে এগোতে যতখানি সংহত শক্তি পায় পেছনের দিকে যেতে ততখানি নয়। এই পার্থক্যটুকুই বোটকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বিজ্ঞান লেখকের বক্তব্য

[জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি '৮৪]

আবদুল্লাহ আল-মুতী

[২৪শে জানুয়ারি ১৯৮৪ তারিখে গ্রন্থভবনে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে লেখকের রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ। অনুষ্ঠানটি ছিল বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে বিশিষ্ট অবদানের জন্য লেখকের ইউনেস্কো কলিঙ্গ পুরস্কারে ভূষিত হওয়া উপলক্ষে।]

ইউনেস্কোর কলিঙ্গ পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র এবং বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র যৌথভাবে আমার বই সম্পর্কে যে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তাতে আমি একই সঙ্গে সম্মানিত ও বিব্রত বোধ করছি। সম্মানিত এই জন্যে যে এদেশে যে কোন লেখকের একটি বই প্রকাশিত হওয়া বা সে সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়াই অসাধারণ ব্যাপার; সেখানে কোন লেখকের সমগ্র রচনা নিয়ে আলোচনা হওয়া এক অতি অসাধারণ ঘটনা। আর বিব্রত এজন্য যে কবি বা শিল্পীরা যেভাবে মূলত রচনার ক্ষেত্রে স্বনির্ভর, আমার লেখার বিষয়বস্তু এমন যে তার জন্য প্রায়ই আমাকে অন্য বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক বা শিল্পীদের ওপর নির্ভর করতে হয়– তাঁদের সহায়তা ও সহযোগিতা ছাড়া আমার রচনা থাকত অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। বিশেষ করে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রপথিক তাঁদের প্রেরণা এবং যাঁরা সহযাত্রী তাঁদের দৃষ্টান্ত সর্বক্ষণ আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে। এঁদের সবার কাছে ঋণ তাই গোড়াতেই স্বীকার করে নেয়া প্রয়োজন।

আমার বক্তব্যের শেষে উপসংহার হিসেবে বললে ভাল হত এমন ক'টি কথা আগে ভাগে বলে নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই :

(ক) আমি যে ক্ষেত্রে কাজ করেছি সেটা প্রচলিত অর্থে না বিজ্ঞান, না সাহিত্য। তবে বিজ্ঞান-সমাজ-সাহিত্যের অস্পষ্ট সীমানায় এ ক্ষেত্রে বিচরণের এবং এই তিনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টার যে একটা বুদ্ধিবৃত্তিগত ও সামাজিক মর্যাদা রয়েছে কলিঙ্গ পুরস্কার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ইউনেস্কো মনে হয় তারই স্বীকৃতি দিয়েছে।

(খ) বাংলাদেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আদৌ যে কোন কাজ হচ্ছে সে সম্পর্কে বিদেশে আজ কিছুটা সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে; এটা আনন্দের কথা। এদেশের তরুণ বিজ্ঞানকর্মীরা হয়তো এতে উৎসাহিত হবেন।

(গ) আমি যা কিছু লিখি তা মূলত বাংলা ভাষায়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চাও যে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এটা বাংলা ভাষার সকল অনুরাগীর জন্য আনন্দ-সংবাদ বলে বিবেচিত হতে পারে।

শুরুতেই বলেছি আমার লেখার পেছনে প্রভাব বিস্তার করেছেন অসংখ্য ব্যক্তি। আসলে লেখক বা বিজ্ঞানী বা শিল্পী মাত্রই অনেকাংশে সামাজিক সৃষ্টি। যে কবি বা শিল্পী নিঃসঙ্গ ধ্যানময়তায় তাঁর কাব্য বা শিল্প সৃষ্টি করেন তাঁরও নান্দনিক অনুভূতি প্রভাবিত হয় তাঁর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল দিয়ে। এই পরিমণ্ডলকে বাদ দিয়ে তাই একজন বিশেষ লেখককে বিবেচনা করা শক্ত। আমার লেখার পেছনে কাদের প্রভাব কাজ করেছে তার ফিরিস্তি দিতে গেলে লম্বা কাহিনী হবে। তবু ভোলা শক্ত :

আমাদের গ্রামের বাড়ির সামনের ভিটার পর্ণকুটিরে বাস করত যে দিন মজুর কছির শেখ তাকে। আমি তখন স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, কছির শেখ আদৌ কোন লেখাপড়া করেনি। তাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম দিনরাত্রি, সৌরজগতের রহস্য–অথচ তার কাছে এসব ছিল দুর্বোধ্য আর অবিশ্বাস্য। সে কাহিনী লিখেছি আমার 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে' নামে প্রথম বইতে। আমার স্কুলের বন্ধু আবু জায়েদ শিকদারকে, যার আশ্চর্য হাত ছিল ছবি আঁকায় আর মাথা ছিল অঙ্কে। আমাদের স্কুলে বিজ্ঞান পড়ানো হত না, কিন্তু আমরা অনেক খুঁজে-পেতে পরখ নল, রাসায়নিক বস্তু ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাড়িতে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতাম, স্কুলে বের করতাম দেয়াল পত্রিকা।

আমাদের গণিত শিক্ষক শাহাবুদ্দিন স্যার যিনি উৎসাহ দিতেন নানা বিজ্ঞানের বই পড়তে- সে সব বই অধিকাংশ ছিল ইংরেজিতে; ভূগোলের শিক্ষক কাজী নূরুল হক যিনি শুধু পৃথিবীর নানা দেশ সম্বন্ধে আগ্রহ জাগাননি, বলেছিলেন ভাল বাংলা শিখতে হলে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' অন্ততঃ বিশ-ত্রিশ বার পড়বে। মোহাম্মদ মোদাব্বের, কামরুল হাসান, হাসান জান, রোকনুজ্জামান খান এমনি সব কিশোর-আন্দোলনের সংগঠকদের যাঁরা আমাকে টেনে নিয়েছিলেন হাজার হাজার শিশুকিশোরদের মধ্যে।

সৈয়দ আলী আহসান, মুনীর চৌধুরী, সত্যেন সেন, সরদার ফজলুল করিম, শহীদুল্লাহ কায়সার এমনি চল্লিশের দশকের সেরা সংস্কৃতি-কর্মী আর ছাত্র-সংগঠকদের যাঁরা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সুস্থ সংস্কৃতি, শিক্ষা, গণতন্ত্র, ভাষা আর শান্তির আন্দোলনে অংশ নিতে।

আবদুল বারী, নুর হোসেনের মতো শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী যাঁরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাকে পরিচিত করেছেন এদেশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে। যে সব সাহিত্যিক বন্ধুর সাথে আমরা পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ প্রভৃতি নানা আসরে সাহিত্যের নানা ক্ষেত্র নিয়ে তুমুল বিতর্কে মেতে উঠতাম এবং যাঁদের কাছ থেকেই আমার মূলত বাংলা লিখতে শেখা।

অগ্রজ প্রতিম আবদুল গণি হাজারীকে যিনি পঞ্চাশের দশকের শুরুতে আমাকে দৈনিক 'সংবাদ'-এর সাপ্তাহিক সাময়িকীতে 'বিজ্ঞান পরিক্রমা' নামে একটি কলাম লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন।

যে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে গিয়ে আমাকে বার বার ভাবতে হয়েছে কি করে মেটাব এদের উদ্দীপ্ত কৌতূহল, দেশের নানা প্রান্ত থেকে যে উৎসাহী তরুণরা আমাকে অসংখ্য চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে।

সারা দেশের যে অজস্র শিক্ষকের সাথে বছরের পর বছর আলোচনা করেছি শিক্ষাদানের কলাকৌশল নিয়ে।

যে অগণিত পাঠক, সম্পাদক, প্রকাশক নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন আমাকে লেখার জন্য– বলেছেন কেমন লেখা তাঁরা চান। এঁদের সবার কাছে আমার ঋণ অনেক।

আরো এক ধরনের ব্যক্তি আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন– তাঁরা আমার সমালোচক। বলা বাহুল্য সব সমালোচক এক জাতের নয়। যেমন,

আমার এককালের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিন এখনো দেখা হলেই অনুযোগ করে বলেন, 'তোমার ভাষাটা বড্ড কাঠখোট্টা। আরো বেশি বাংলা বই তোমাকে পড়তে হবে। আর লেখার অভ্যাস রাখবার জন্য রোজ অন্তত পাঁচ মিনিট কিছু লিখবেই।'

কেউ বেনামী চিঠি লিখে জানিয়েছেন আমার বাংলা শব্দ প্রয়োগে নাকি বিজাতীয় গন্ধ; হুমকি দিয়ে বলেছেন এ' ধরনের কার্যকলাপের ওপর তাঁরা বিশেষ করে নজর রাখছেন।

কেউ বলেছেন আমি যে সব বিষয় নিয়ে লিখি সে সবই তো অন্যের আবিষ্কার; এর মধ্যে তাহলে মৌলিকতা কোথায়? এতদিনে দেখলাম বন্ধুবর গাজী শামসুর রহমান তাঁর 'বাংলাদেশের কপিরাইট আইন' বইতে তার একটা জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন অন্যের আবিষ্কার যদি কেউ নতুনভাবে প্রয়োগ করে তাহলেও তাতে তার কপিরাইট বর্তায়। বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক আইজাক আসিমভ যিনি প্রায় শ'দুই বই লিখেছেন- এক সময় বলেছিলেন 'আমি অন্যের জটিল আবিষ্কারকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য ভাষায় শুধু ভাষান্তর করছি মাত্র।'

কেউ বলছেন আমাদের নিজেদের দেশের নানা স্তরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর সম্ভাবনা নিয়ে আরো বেশি করে লেখা দরকার, সেদিক থেকে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় তাঁরা হতাশ হচ্ছেন।

কারো মতে বিজ্ঞানের তথ্য শুধু ব্যাখ্যা না করে তার সাথে দেয়া প্রয়োজন আরো বেশি করে সামাজিক বিশ্লেষণ, সমাজ পরিবর্তনের রূপরেখা– যাতে বিজ্ঞান আরো সহায়ক হয় সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে।

কখনো কোন বন্ধু রায় দিয়ে বসেন, যে দেশে মানুষের পেটে ভাত নেই সেখানে বিজ্ঞানের গবেষণারই বা প্রয়োজন কি, বিজ্ঞানের সাহিত্যই বা কে পড়বে? তার চেয়ে বরং খেতে ফলাও দুটো দানা–খেয়ে কারো পেট ভরুক।

এ সবই আমাকে উৎসাহ যোগায়। এ সব সমালোচনা থেকে আরো স্পষ্ট হয় আমাদের চাহিদা আর প্রত্যাশা কত প্রচণ্ড আর সে অনুপাতে আমাদের আয়োজন, সামর্থ্য আর উদ্যোগ নিঃসন্দেহে কত সীমিত। নিউটনের মতো

মহাপণ্ডিতও একদিন বলেছিলেন, সমুদ্রের তীরে চকচকে নুড়ি কুড়িয়ে বেলা গেল, বিশাল সাগর পড়ে রইল সামনে। রবীন্দ্রনাথের মতো জ্ঞানতাপস জীবন সায়াহ্নে এসে বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে 'বিশ্বপরিচয়' নামে একটি বই লিখেছিলেন। এই অনধিকার চর্চার জন্য সংকোচ প্রকাশ করে তার ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন : 'আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী যিনি একাধারে সাহিত্য রসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন তাহলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।' মনে হয় এ কথা যেন আমারও।

আমাদের দেশ গরিব। চারপাশের পরিবেশের অনেক উপকরণ হয়তো মনে আশার চেয়ে হতাশারই সঞ্চার করে বেশি। তবু চল্লিশের দশকের শেষে কছির শেখের কথা বলতে গিয়ে আমি যা ভেবেছিলাম আজো তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি: আমাদের এ পিছিয়ে থাকা দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হল আগামী দিনের তরঙ্গ– একে কেউ ঠেকাতে পারবে না। কত বেশি করে আর কত ভাল করে একে আমরা ব্যবহার করতে পারি দেশের মানুষের প্রয়োজনে তারই ওপর নির্ভর করবে এদেশের সমৃদ্ধি, কল্যাণ আর প্রগতি। জনগণের মুক্তির জন্য এই শক্তিশালী হাতিয়ার তুলে দিতে হবে এদেশের সব মানুষের হাতে। তাদের মুখে দিতে হবে ভাষা, আর সে ভাষাকে প্রয়োগ করার কৌশল শেখাতে হবে জিজ্ঞাসার অনুসন্ধানে, পরিবেশের রূপান্তর ঘটাবার উপকরণ হিসেবে। আর এ পথেই সৃষ্টি হবে আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

আমাদের চারপাশে অন্ধকার শুধু অশিক্ষার আর দারিদ্র্যের নয়, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর অপবিজ্ঞানেরও। এসব কুসংস্কার আমাদের দুর্বল, ভীরু-কাপুরুষ, কর্মবিমুখ করে রাখে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে। বিজ্ঞানের মুক্ত চিন্তার আলোকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারলে তারা বৈরী প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে আরো সাহসের সাথে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। আর এ কাজ শুধু বিজ্ঞানীর নয়, এদেশের সমাজচেতন সব মানুষের। এজন্য যেমন চাই গবেষণাগারের কর্মী, শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, তেমনি তাদের সাথে খেতমজুর কছির শেখ আর রেল মজুর নূর হোসেনদের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা।

তাই বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে লিখতে লিখতে আমি ক্রমাগত শিখতে চেষ্টা করি, দেখতে চাই আগামী দিনের বাংলাদেশের ছবি। আর দেখে সাহস পাই। জানি আজ যা ক্ষীণ ঝর্ণাধারা, আগামীকাল তা বিশাল বেগবান নদী। সে স্রোত যেমন বহন করে বেগ তেমনি বহন করে উর্বর পলি। আগামী দিনের বিজ্ঞান আন্দোলন সারা দেশকে প্লাবিত করে এদেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ মাত্র নেই।

চমকপ্রদ

বিদ্যুত-বাল্‌বের হিসাব নিকাষ অথবা বাল্‌ব দীর্ঘজীবী করার কৌশল

[জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-' ৮৪]

মাসের শেষে বড়সড় একটা বিল দিতে হবার ভয়ে আমরা সব সময় তটস্থ থাকি বেদরকারী বাল্‌ব জ্বলছে কিনা। কিছুক্ষণের জন্য ব্যবহার না করলেও আমরা এটা অফ্ করে দিয়ে খরচ বাঁচাই। কিন্তু একটু জেনে দেখলে বুঝব সব সময় এতে খরচ বাঁচে না, বরং আরো বড় খরচের ব্যবস্থা হতে পারে।

সাধারণ বিদ্যুত বাল্‌ব জ্বালালে এর ফিলামেন্টগুলো প্রসারিত হয়। আবার নেভালে এটা ঠাণ্ডা হয়ে সংকুচিত হয় খুব দ্রুত। বারবার অনেক বার একটা ধাতুকে প্রসারিত আর সংকুচিত করলে শেষ পর্যন্ত এটা ভেঙ্গে যায়– কারিগরি ভাষায় যাকে ধাতুর 'ফ্যাটিগ' বা ক্লান্তি বলে। হঠাৎ করে বিশেষ কোন কারণ ছাড়া আমরা যখন আমাদের বাল্‌বকে 'ফিউজ' হয়ে যেতে দেখি তখন বুঝতে হবে এই ক্লান্তিই এর কাল হয়েছে। বাল্‌বের গুণভেদে কয়েক শ' কি কয়েক হাজার বার জ্বালালে নেভালে এটা হতে বাধ্য। কাজেই প্রত্যেক বার বালব নেভালে বিদ্যুতের খরচ বাড়ে বটে কিন্তু ক্লান্তি বেড়ে গিয়ে এর বিনষ্টি ত্বরান্বিত হয়। বিদ্যুতের খরচ বাল্‌বের দাম, আর মোটের উপর ক'বার জ্বালালে নেভালে নষ্ট হবার সম্ভাবনা এ সব থেকে হিসাব করা যায় ঠিক কত সময়ের জন্য হলে বাতি নেভানো লাভজনক। এর চেয়ে কম সময়ের জন্য হলে দরকার না থাকলেও বাতি জ্বালিয়ে রাখলেই খরচ বাঁচে। অবশ্য আমাদের দেশে বিদ্যুতের ব্যয় এত বেশি এবং সরবরাহ এত কম যে, এই সময়টুকু বেশ ছোট হতে বাধ্য। অর্থাৎ নেহাৎ কয়েক মিনিটের জন্য না হলে বাতি নেভানোই ভাল।

বিদ্যুৎ বাল্‌বের হিসাব নিকাষে আরো কতগুলো ব্যাপার লক্ষ্য করলে ভাল হয়। বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন একটি বাল্‌বকে পারতপক্ষে নাড়াচাড়া করতে নেই– এমন কি খুলে নিয়ে পরিষ্কার করার জন্যও না। যদি এরকম নাড়াচাড়া হয় তাহলে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি ফিউজ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। বিশেষ করে এমন পুরানোঝুলানো বাল্‌বকে যদি অন্য হোল্ডারে উল্টিয়ে উপরের দিকে লাগানো হয় তা হলে তো নির্ঘাৎ ফিউজ হবে। এর কারণ ইতিমধ্যে অতি 'ক্লান্ত' এর ফিলামেন্টের নানা অংশ ঝুলে পড়েছে, এবং তার পুরানো অবস্থায় তা কোন একটা ফকটা সুবিধাজনক অবস্থান নিয়ে আত্মরক্ষা করে আছে। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটার পর, আর কয়েক বার জ্বালিয়ে নিভিয়ে আরেকটু ক্লান্ত হলেই, ব্যাস আর নয়।

উই. পোকা! সাবধান!

[ফেব্রুয়ারি ,১৯৮৫]

সাব্বির আনোয়ার

আপনার বইয়ের শেলফের নিচে যদি হঠাৎ একদিন আপনি উইয়ের অবস্থান আবিষ্কার করেন, তা হলে আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে? রীতিমতো আঁৎকে ওঠার ব্যাপার নয় কি? এই ক্ষুদ্র জীব তাদের ক্রমাগত ও সম্মিলিত আক্রমণে আমাদের ঘরের নিভৃত কোণে নিঃশব্দে এমন ধ্বংসলীলা ঘটাতে পারে যে একে ভয় না করে কেউ পারে না। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে যদি কাজ করেন তাহলে এই উই পোকা থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। যদি এর আক্রমণের গোড়াতেই টের পাওয়া যায় তাহলে ভয়ের বেশি কিছু নাই। কারণ উই পোকার ধ্বংস প্রক্রিয়া ধীর গতিতে চলে। ৬০ হাজার সদস্যবিশিষ্ট একটি সুপ্রতিষ্ঠিত উই-রাজ্য তার পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ চালিয়েও দিনে মাত্র এক আউন্সের এক পঞ্চমাংশ কাঠ খেতে পারে।

উইপোকার সাথে নানা দিক দিয়ে পিঁপড়ার কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। তবে উভয়ের দেহগত বৈসাদৃশ্যও কম নয়। পিঁপড়ার মাথার সামনে যে স্পর্শক রয়েছে বা শুং রয়েছে তাতে কনুইয়ের মতো জোড়া আছে। উইয়ের শুং সোজা ও পুতি দানার মতো আকৃতিতে গড়া। পিঁপড়ার বুক ও পেটের মাঝখানে সরু কোমর রয়েছে। কিন্তু উইপোকায় এই দুটো প্রশস্তভাবে লাগানো। পিঁপড়ার যখন পাখা থাকে তা এক রকম হয় না, তাতে যে গুটি কয়েক শিরা থাকে তাদের প্যাটার্নও এক রকম হয় না। কিন্তু উইপোকার পাখার আকার, আকৃতি ও প্যাটার্ন একই রকম হয় এবং তাতে অনেকগুলো ছোট শিরা থাকে।

আমাদের দেশে যে উইপোকার উপদ্রব বেশি তা সাধারণত মাটির আশ্রয়ী। এদের সব সময় উষ্ণ বাতাস আর আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। নিজেদেরকে আর্দ্র রাখার জন্য এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার পথে মাটি দিয়ে এক রকম সরু নলাকার আচ্ছাদন তৈরী করে অগ্রসর হয়। উইয়ের বানানো এই নলগুলো আমরা দেয়ালে, মেঝেতে, সর্বত্র দেখতে পাই এবং এদের দেখেই উইয়ের অবস্থান সাধারণত টের পাই। উইয়ের যাত্রা সাধারণত তার স্বাভাবিক আবাস মাটি থেকে শুরু হয়; আর যাত্রার গন্তব্য কাঠ বা কাঠের আসবাব জাতীয় কোন খাদ্য বস্তু। যাত্রাপথে তাদের তৈরী করতে হয় ঐ সব উই-পথ। অবশ্য কাঠ যদি সরাসরি মাটির সংস্পর্শে থাকে তাহলে তাদের কষ্ট করে এই উই-পথ তৈরী করতে হয় না। উইয়ের হাত থেকে বাঁচার নিশ্চিত উপায় হল আর্দ্রতার সাথে তার যোগাযোগ নষ্ট করে তাকে অসহ্য অবস্থায় ফেলে দেওয়া । সেটা মাটির সাথে সরাসরি সংস্পর্শে যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে তার তৈরী নলাকৃতি উই-পথগুলো। এগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে।

উইয়ের আক্রমণের জন্য প্রশস্ত কতগুলো জায়গাকে চিহ্নিত করা য়ায়। ওগুলোর দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

কাঠের খুঁটি। কাঠের খুঁটির কোন অংশ যদি মাটিতে পোতা থাকে, তাহলে তা উইয়ের জন্য চমৎকার রাজপথের কাজ করতে পারে। এরকম খুঁটির কাছাকাছি মাটিকে কীটনাশক দিয়ে উই-মুক্ত করে নিতে হয়।

কংক্রীটের ফাটল। মাটিতে কংক্রীটের স্ল্যাব দিয়ে ভিত্তি তৈরী করলেও কিন্তু বাড়ি নিরাপদ নয়। ঐ কংক্রীটে যে সব ফাটল দেখা দেয় তার মধ্যে দিয়ে উই এসে বাড়ির কাঠের অংশে আঘাত হানতে পারে।

পোতা কাঠ। কাঠের টুকরা, নির্মাণের সময় ব্যবহৃত খুঁটির অংশ ইত্যাদি বাড়ির কাছে মাটিতে পোতা থাকলে তা উইয়ের আড্ডা হতে পারে।

লীক করা পানির পাইপ। যেখানে পানির পাইপের জোড়ায় বা পানির কলের গোড়ায় লীক করে সব সময় ভেজা থাকে তার আশেপাশে উইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার কোন অভাব হয় না। এ রকম পানি নিস্কাশনের পাইপে ফাটল থাকলেও সেখানে উই-রাজ্য গড়ে উঠতে পারে।

বদ্ধ জায়গা। যে সব জায়গায় বায়ু চলাচল করতে পারে না ঘরের সে সব অংশে সহজে আর্দ্রতা জমে উঠতে পারে এবং তা উইয়ের জন্য প্রশস্থ। ঘরের সর্বত্র সব কোণায় যেন বায়ু চলাচল ভাল থাকে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কাঠের সিঁড়ি। বাইরে থেকে বাড়িতে ওঠার সিঁড়ি যদি কাঠের হয়, তাহলে সেই সিঁড়ি উইয়ের জন্যও বাড়িতে আসার চমৎকার সিঁড়ির কাজ করে। এক্ষেত্রে সিড়ির তলায় কংক্রীটের ভিত্তি থাকা চাই এবং সেখানকার মাটিও শোধিত করে নিতে হবে।

উইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে তা নিয়ে ভাবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো বাড়ি তৈরীর বা খুঁটি পোতার আগেই। তখন প্রয়োজনীয় স্থানের মাটি উপযুক্ত কীটনাশক মিশিয়ে নিলে ওখান থেকে উইয়ের উপদ্রব আর হতে পারবে না। সাধারণত এরকম সার্বিক প্রক্রিয়ার মানে হলো বাড়ির বাইরের কিনারার নিচের এবং কাছের মাটির রাসায়নিক শোধন। এটি একটু ব্যয় সাপেক্ষ হলেও শেষ পর্যন্ত এটিই সব চেয়ে নিশ্চিত পন্থা। পয়ঃপ্রণালীর মুখ, নালা প্রভৃতির আশেপাশেও এরকম কীটনাশক মেশানো প্রয়োজন।

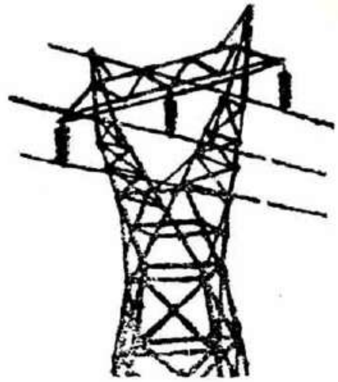

পশু পাখীর আচরণ : যে বিজ্ঞান এখনো শৈশবে

[মে- ১৯৮৫]

স্বাতী

হ্যাঁ এটাও বিজ্ঞান। ঐ যে তুমি মনের সুখে পিঁপড়ার পিছনে লাগ কিংবা লক্ষ্য করো মা পাখী কেমন করে বাচ্চা পাখীর বিরাট হা'য়ের মধ্যে খাবার এনে দেয়– ঐ পর্যবেক্ষণ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে অদ্ভুত এক বিজ্ঞান। আর এটা যে শুধু তোমার মত সবার কৌতূহল মেটাচ্ছে তাই নয় বেশ কাজেও আসে এই বিজ্ঞান। আমাদেরকে নানাভাবে পশুপাখীদের কাছাকাছি আসতে হয়। গ্রামে চাষবাস করলে,পুকুরে, নদীতে মাছ ধরতে গেলে কত প্রাণীর সাথেই তো কারবার করতে হয় হাল-বলদ, পোষা ছাগল, মোরগ- মুরগী এ সবতো সামাল দিতেই হয়, যে সব পাখী ধান খেয়ে যাবে তাদের খবরও কি কম জরুরী? শহরে থাকলে? রান্নঘরের তেলাপোকার উপদ্রব যাবে কোথায়? তাছাড়া পোষা বেড়াল কিংবা কুকুরের খবর?

আচরণ মানে সব রকম আচরণ। হাঁটা, দৌড়ানো ,সাঁতরানো, খাওয়া, জোড়বাঁধা , বাচ্চা দেয়া - এসবতো আছেই। তাছাড়া অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের সামান্য নাড়াচাড়া- যেমন শব্দ পেলে কান খাড়া করা এও লক্ষ্যণীয়। অনেক প্রাণী বিশেষ অবস্থায় চেহারা বদলায় রং বদলায়–বদলাবার কারণ বিভিন্ন হতে পারে। কোন ক্ষেত্রে এটা শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্য আবার কোন ক্ষেত্রে নিজের সাথীর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য। প্রত্যেকটি আচরণের পেছনে অনেক কিছু জানার আছে, বোঝার আছে। কুকুর কেন খায়? এটা বুঝতে গেলে জানতে হবে তার ক্ষুধার অনুভূতি কি, সে কি খাবার দেখে না তার গন্ধ শুকে প্রলুব্ধ হয়, সে কি ছোট বেলাতেই খাবার খুঁজে বের করার কায়দা কানুন শিখে নিয়েছিল? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উঠবে কুকুরের খাওয়ার আচরণকে বুঝতে হলে। শ'খানেক বছর আগে চার্লস ডারউইন নামে একজন বিজ্ঞানী 'বিবর্তনবাদ' আবিষ্কার করে সারা দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন নিজেদের বাঁচার তাগিদে সব প্রাণী পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। সে সব প্রাণীই বেঁচে থেকে বংশবৃদ্ধি করতে পেরেছে যাদের গুণাগুণ ও আচরণ খাপ খাওয়াবার অনুকূলে ছিল। তখন থেকে বিজ্ঞানীরা চাইলেন পশু-পাখীর আচরণগুলোকে তাদের টিকে থাকার সাথে সম্পর্কিত করতে।

খাপ খাইয়ে নেবার জন্য বিশেষ আচরণ করার একটি উদাহরণ নেয়া যাক। এক রকম মাছ আছে যাদের স্ত্রী জাতীয়রা বাসায় গিয়ে ডিম পাড়লে পুরুষ মাছ সে বাসা পাহারা দেয়। কিছুক্ষণ পর পরই পুরুষ মাছ বাসাটা একবার ঘুরে আসে আর তারপর কিছুক্ষণ সজোরে পাখনা নাড়িয়ে বাসার দিকে পানি চালনা করতে থাকে। এটা সে কেন করে? সহজ কিছু পরীক্ষার মাধ্যমেই তা জানা গেছে। পুরুষ মাছটাকে যদি সরিয়ে ফেলা হয় তা হলে ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যায়। যদি তাকে সেই আচরণ করতে দেয়া হয় কিন্তু ডিম আর তার মাঝখানে একটা কাচের দেয়াল দিয়ে দেয়া হয়, তাহলেও ডিম নষ্ট হয়। কিন্তু যদি পুরুষ মাছকে সরিয়ে ফেলে সেখানে একটা কাচের নল বসিয়ে এর ভেতর দিয়ে ক্রমাগত বুদবুদ তোলা পানি বাসার দিকে দেয়া যায়– ডিম নষ্ট হয় না। বোঝা গেল ব্যাপারটা হচ্ছে ডিমকে বাতাস

করা। বাসার পানি যাতে বন্ধ হয়ে না যায় ক্রমাগত নুতন বাতাস পেতে পারে সে জন্যই পুরুষ মাছ সে পানিকে চলাচলের অবস্থায় রাখে। নিজের ভবিষ্যৎ বংশধরদের বাঁচাবার জন্য এ আচরণ তার সৃষ্টি হয়েছে বিবর্তনের ফলে।

এভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণীর জটিল সব আচরণের পেছনে টিকে থাকার জন্য খাপ খাইয়ে নেয়ার চমৎকার সব উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। দেখা যায় যে প্রাণীর-আচরণ তার জীবন ধারণ ও বংশবৃদ্ধির একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে খুব দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে তা কিন্তু নয়। ডারউইনের আগে এই আচরণের সঠিক কোন ব্যাখ্যা দেবারই চেষ্টা কেউ করেনি। তাঁর পর যে কজন বিজ্ঞানীর নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় তাঁদের একজন হলেন হেনরী ফ্যাব্রে (১৮২৩-১৯১৫)। কীট পতঙ্গদের তাদের নিজস্ব পরিবেশে দীর্ঘদিন ধরে পর্য্যবেক্ষণ তিনিই প্রথম করেন। ফ্রান্সে তাঁর নিজের বাগানে ৪০ বছর ধরে তিনি মৌমাছি ও বোলতাদের উপর এই পর্য্যবেক্ষণ চালান। এর ফলেই আমরা প্রথম জানতে পারি এদের আচরণ কত জটিল হতে পারে। এই বিষয়ের উপর পথিকৃৎ বিজ্ঞানীদের আর একজন হলেন রাশিয়ান বিজ্ঞানী ইভানা পভলব (১৮৪৯-১৯৩৬)। তাঁর 'কন্ডিশন্ড রিফলেকস বা অভ্যস্তকৃত প্রতিক্রিয়া' নামক তত্ত্ব দিতে গিয়ে তিনি এক বিখ্যাত পরীক্ষা করছিলেন। একটা কুকুরকে প্রত্যেকবার খাওয়াবার ঠিক আগে একটা ঘণ্টা বাজানো হতো। এভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার পর খাবার না দিয়ে শুধু ঘন্টা শোনালেই কুকুরের মুখে লালা আসতো – সেটা অভ্যস্তকৃত প্রতিক্রিয়ার ফলেই। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে প্রাণীর আচরণের উপর কাজ করে বিখ্যাত হয়েছেন এমন কয়েকজনের উল্লেখ করা যায়। থিওডোর শ্লাইরলা কাজ করেন নিউইয়র্কে প্রাকৃতিক ইতিহাস যাদুঘরে। তাঁর তৈরী নানা রকম গোলক ধাঁধার মধ্য দিয়ে চলতে দিয়ে তিনি পিঁপড়ার উপর আচরণের দীর্ঘকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে পিঁপড়ার মত ভাল শিক্ষার্থী পাওয়া দুস্কর। একটা গোলক ধাঁধায় খাবার পাওয়ার সঠিক পথ খুঁজে পেলে অনুরূপ অন্য গোলক ধাঁধায় গিয়েও তারা সেটা ঠিক মনে রাখতে পারে।

কার্ল ফন ফ্রিশ কাজ করেন অস্ট্রিয়ায় তাঁর নিজ বাড়িতে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি মৌমাছির রং দেখার ক্ষমতা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। মৌমাছিকে আকর্ষণের জন্য নানা রঙীন কার্ড ব্যবহার করে তিনি প্রমাণ করেন যে মৌমাছিরা রং কানা নয়– আগে বিজ্ঞানীরা তাই মনে করতেন। ফুলে ফুলে ঘোরার সময় মৌমাছি ফুলের রংও লক্ষ্য করে।

আমেরিকার হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রেডারিক স্কীনার প্রাণীকে খাদ্যের জন্য নতুন ধরনের আচরণে অভ্যস্ত করার পরীক্ষণের জন্য বিখ্যাত। উদাহরণ স্বরূপ তিনি ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে বিশেষ একটি বাক্সে ঢুকিয়ে শিখিয়েছেন যে খাবার পেতে হলে তাকেও বিশেষ একটি বাতি জ্বালা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর একটি নির্দিষ্ট হাতলে চাপ দিলে খাবারের দরজা খুলে যাবে।

অস্ট্রিয়ার কনরাড লোরেনৎস দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাণীর নিজস্ব'ভাষা' শিখতে সমর্থ হয়েছেন। সেভাবেই তিনি সমর্থ হয়েছেন হাঁসের বাচ্চাদের সাথে এমন আচরণ করতে যাতে তারা জন্ম অবধি তাকেই– তাদের 'মা' মনে করে; তাঁর সাথে চলে, সাঁতার কাটে আর মায়ের মত আচরণ করে।

প্রাণীর আচরণ প্রকাশিত হয় তার বিভিন্ন মাংসপেশির জটিল সব সঙ্কোচন প্রসারনের ক্রম হিসাবে। এরা নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রের নির্দেশে। স্নায়ুতন্ত্র আবার তার অনুপ্রেরণা লাভ করে বিভিন্ন বাহ্যিক অবস্থা থেকে আবার কিছুটা প্রাণীর নিজের অর্ন্তনিহিত তাগিদ থেকে। খাবার দেখলে খাওয়ার আচরণ সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষ আচরণের জন্য পেটে ক্ষুধাও থাকা চাই।

অতীতে প্রাণীর আচরণ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝিগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। এদের সব আচরণকে মানুষের নিরিখে বিচার করতে চাওয়া হয়েছে বলে। মনে করা হয়েছে যে মানুষের মত এসব প্রাণীও রাগতে পারে, দুঃখিত হতে পারে, স্ফূর্তি পেতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে দেখতে গেলে একটা পশু তেড়ে আসছে কারণ এটা রেগেছে বা পালিয়ে যাচ্ছে কারণ এটা 'ভীত' এমন কথা সহজে বলা যায় না। তাছাড়া একটা পশু আগে থেকে ভেবেচিন্তে কাজ করতে পারেনা– যা মানুষ পারে। অনেক প্রাণী অবশ্য এমন অনেক কিছু করে যা পরে গিয়ে কাজে একটা উপকার হয়।

যেমন ওরা বাসা বোনে, বাচ্চাদের খাওয়ায়, দুর্দিনের জন্য খাবার সঞ্চয় করে– যার সবই বহুদিন পরেও কাজ দেয়। কিন্তু এ সব করার সময় ঐ বহুদিন পরের কথা চিন্তা করে তারা করে– বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এসব মনে হয় না। আর একটা বড় কথা হলো পশু-পাখীরা তাদের আচরণে অস্বাভাবিক কোন ঘটনার জন্য তৈরী থাকতে পারে না। স্বাভাবিক অবস্থায় যে আচরণকে খুব দরকারী এবং সুচিন্তিত মনে হয়, অস্বাভাবিক অবস্থায় সেটা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়াতে পারে। একটা পাখীর ছানা যদি দুর্ঘটনা ক্রমে আহত হয়ে বাসার বাইরে চলে যায় বা খাবারের মুখ হা না করতে পারে– তখন মা পাখী ওই বাচ্চাকে না দেয় খাবার,না করে কোন যত্ন, যেই মা পাখীকে এতই সন্তান-বাৎসল্য মনে

হয়। মনে হয় পাখীর আচরণের মধ্যে শুধু সেই ছানাকে যত্ন নেবার অভ্যাসটুকু রয়েছে যে বাসায় আছে এবং খাবারের জন্য হা করতে পারে। এর অন্যথায় কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সাথে সে তাৎক্ষণিকভাবে খাপ খাওয়াতে অক্ষম। পাখী এদিক থেকে ঠিক সন্তানের শুভ কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করছে না, চিরন্তন অভ্যাসবশত তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় সাড়া দিচ্ছে।

পশুপাখী কীটপতঙ্গের আচরণ গবেষণা এখনো বলতে গেলে শৈশবে রয়ে গেছে। এখনো অনেক কাজ বাকী। আর কাজগুলো বেশ জরুরীও বটে। যাদের আমরা আপদ মনে করি সে সব অনিষ্টকারী প্রাণীদের আচরণ না বুঝতে পারলে তাদের আমরা ঠেকাব কি করে? আবার যারা আমাদের উপকারী প্রাণী তাদেরকেও ঠিক মতো পালন করতে গেলে এ আচরণ বুঝতে হবে। তাছাড়া আমাদের পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রাখতে গেলেও সমস্ত প্রাণীর সঠিক অবস্থান আমাদেরকে নির্ণয় করতেই হবে।

হ্যালীর ধূমকেতু আসছে

হ্যালীর ধূমকেতুর প্রথম লিপিবদ্ধ উল্লেখ দেখা যায় খৃষ্টপূর্ব ২৪০ অব্দে চীনা গ্রন্থ 'শি চি তে' (ঐতিহাসিক দলিল)। এতে লেখা হয়েছে "সম্রাট চীন শি-হুয়াং এর রাজত্বের সপ্তম বর্ষে একটি ঝাড়ু- তারকা (ঝাড়ুর আকৃতি বলে ধূমকেতুকে চীনারা এ নামেই ডাকতো) প্রথমে পূর্ব দিকে দেখা গেল, এটা পরে উত্তর দিকে দেখা যায়। পঞ্চম মাসে (মে-জুন) এটা আবার পশ্চিম দিকে দেখা যায়। ওখানে ঝাড়ু- তারকাটিকে আরো ১৬ দিন ধরে দেখা যেতে থাকে"।

XXXIX

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে যেমন দেখেছি [আগস্ট-১৯৮৫]

ড. কাজী মোতাহার হোসেন

[সত্যেন্দ্রাথ বসুর মৃত্যুর পর 'লোকসাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক আবুল আহসান চৌধুরীর অনুরোধে ড. কাজী মোতহার হোসেন স্মৃতি-চারণা মূলক এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। 'লোকসাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশের জন্য ১৯৭৪ সালের ৯ই মে প্রবন্ধটি তিনি দেন। নানা কারণে এই পত্রিকার প্রকাশনা ব্যাহত হলে প্রবন্ধটি পরে লোকসাহিত্য পত্রিকায় গত বছর প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি কেবল শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন মাত্র নয়, একটি বিশেষ সময়ের কথাচিত্র হিসাবেও মুল্যবান। দুর্ভাগ্য এই স্মৃতি-চর্চাকারী নিজেও আজ আমাদের স্মৃতিরই অন্তর্গত। ত্রৈমাসিক লোকসাহিত্য পত্রিকার অনুমতিক্রমে আমরা এটা পুনমুদ্রিত করলাম।] —সম্পাদক

১৯২১ সালে নওয়াব স্যার সলীমউল্লাহ্ বাহাদুরের উদ্যোগে 'ঢাকা কলেজ'-কে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত করা হয়। সেই সময় ঢাকা কলেজের বি.এ, বি.এস-সি. ও এম. এস-সি.ক্লাশের তৎকালীন সুদক্ষ অধ্যাপকদের সহিত দেশ-বিদেশ থেকে আরও বহু সংখ্যক সুযোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত করে বাংলার (তথা ভারতবর্ষের) এই প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের অনুকরণে নিরীক্ষামূলক আদর্শ সর্ব-বিদ্যালয়রূপেই গড়ে তোলা হয়। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ থেকে যে বিদ্যামণ্ডলীর সমাগম হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন পদার্থবিদ্যাবিদ্ সত্যেন্দ্রনাথ বোস, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য , রাসায়নিক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ঐতিহাসিক এ .এফ. রহমান, সংস্কৃতজ্ঞ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলাবিদ্ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃতজ্ঞ হীরালাল দে, ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কাণুনগো, সংস্কৃত ও পালিবিদ্ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,পদার্থবিদ্যাবিদ্ রাধাকৃষ্ণান, ব্যবসা-বাণিজ্যবিদ্ পনত্তিকর, উদ্ভিদবিজ্ঞানী মাহেশ্বরী, গণিতজ্ঞ বিজয় রাঘবন ইত্যাদি; আর ঢাকা কলেজেই ছিলেন গণিতজ্ঞ ভুপতিমোহন সেন ও বঙ্কিমদাস ব্যার্নাজি, ইতিহাসে র‍্যামস বোথাম ও অশ্বিনী মুখার্জি, ইংরেজীতে সত্যেন ভদ্র, বাংলায় অক্ষয় কুমার দাসগুপ্ত, পদার্থবিদ্যায় ডব্লিউ.এ জেঙ্কিন্‌স, ইতিহাসে পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (?), সংস্কৃতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ইংরেজীতে আর্চবোল্ড বটমূলি ও টার্নার, দর্শনে ল্যাংলী, রাষ্ট্রনীতিতে টি.টি উলিয়মস ইত্যাদি। অবশ্য বাংলাদেশও তখন ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল।

তখন আমি ছিলাম পদার্থবিদ্যার অধ্যক্ষ জেকিন্সন্‌স সাহেবের প্রিয় ছাত্র এবং নবনিযুক্ত এসিসটান্ট লেকচারার। কিছুদিন পরে ১৯২১ সালেই জেকিন্সনস সাহেব কলিকাতায় এডুকেশন ডাইরেক্টরেটে চলে যাওয়াতে রীডার সত্যেনবাবু পদার্থবিদ্যা বিভাগের কর্তৃত্ব লাভ করেন। জেঙ্কিনস সাহেব সত্যেনবাবুকে বিশেষ করে বলে গিয়েছিলেন, আমার যাতে বিদ্যার উন্নতি হয় সে বিষয়ে যত্ন করতে। আমাকে বলে গিয়েছিলেন-"সত্যেনবাবু অতিশয় বিদ্বান লোক; যে কোনও বিষয় বুঝতে না পারলেই ওঁর কাছ থেকে বুঝিয়ে নেবে।" আমি এ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। বিশেষ করে বিদ্যুত ও আলোকবিজ্ঞানে আমার অনুরক্তি ছিল। Jeans এর বৃহৎ Electricity পুস্তকের সমুদয় বিষয়বস্তু (উদাহরণ ও প্রশ্নমালা-সহ) তাঁর কাছ থেকে ভাল করে বুঝে নিয়েছিলাম। এই বইয়ের প্রায় সাড়ে তিনশ' অংকের মধ্যে প্রায় ১০০টা তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলাম। তিনি তাতে কখনও বিরক্ত হননি। তাঁর কোনও ছাত্র তাঁকে এত প্রশ্ন করে নাই। সুতরাং আমি দাবী করতে পারি, আমি তাঁর সবচেয়ে বড় ছাত্র-অর্থাৎ শুধু ছাত্র নই, 'ছাত্রতর'ও নই, একেবারে 'ছাত্রতম' (!) একদিনের কথা বলি। অতি প্রত্যুষ, তখনও সুর্যোদয় হয়নি। আমি খাতাপত্র বই নিয়ে তাঁর

পদার্থবিদ্যার বসবাস ঘরে গিয়ে হাজির। দেখলাম তিনি আগেই এসে আপন মনে অংক কষছেন আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন এত সকালে কেন এসেছি। আমি জানালাম। 'দুই দিন ধরে একটা অংক মিলাতে পারছিনে, তাই সকালেই আসলাম।' তিনি অংকটা দেখেই বললেন, হাঁ এটা ত ম্যাক্সওয়েল করেছেন, mutual induction এর (পরস্পর প্রবর্তন সংক্রান্ত) অংক।" এই বলে অংকটা কষতে আরম্ভ করলেন, কিছুতেই মেলে না। এইভাবে সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল গেল, অংক হয় না। ওখানে বসেই আমাদের সকালের নাস্তা, দুপুরের খানা, বিকালের টিফিন খাওয়া হল। অবশ্য ঐদিনে তাঁর ও আমার ক্লাশ অন্য শিক্ষক দিয়ে করানো হল। বিকালে বললেন, "বেয়ারারা উশখুশ করে, ওরা বাড়ি যাবে। চল আমরা তোমাদের টিচার্স কমনরুমে গিয়ে বসি।" সেখানে বসে সাঁজের চা হল, দুপুররাত্রের খানাও হল, কিন্তু অংকটা হল না। রাত বারটার ঘন্টা বেজে গেল, তখন তিনি বললেন,

"চল, আমার বাড়িতে চল, সেখানে ম্যাক্সওয়েল-এর বই আছে।" গেলাম তাঁর বাড়িতে। তিনি দ্রুতপদে দোতলা থেকে বই নিয়ে এলেন। দেখা গেল, প্রমাণটার মধ্যে রয়েছে একটা পরীক্ষালব্ধ তথ্য। সে কথাটা আমাদের কারোরই মনে হয়নি; তাই অসম্পূর্ণ তথ্য নিয়ে বৃথাই চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর আমাকে উপদেশ দিলেন,– "দেখ কাজী, কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য বারংবার চেষ্টা করবে, ধৈর্য হারায়ো না। অনেক সময় অকস্মাৎ একটা সমাধানের সংকেত মনে পড়ে যায়; তখন সমাধানটা সহজ হয়। এটাই বোধহয় 'inspiration'; নবী- পয়গম্বদের inspiration-কেও হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দৈবযোগেই inspiration যাওয়া যায়।"

তাঁর ছাত্রদের পড়াবার পদ্ধতি ছিল আগে পদার্থবিদ্যার প্রাসঙ্গিক গণিত কিছুটা পড়ায়ে নিয়ে পরে ছাত্রদের আসল পাঠ হুড়হড় করে শেষ করিয়ে দেওয়া। একবার বি. এস- সি অনার্স ক্লাশের ফাইনাল পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার দুইমাস-আড়াই মাস বাকী থাকতে একদিন হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, "দেখ কাজী আজকাল দেখছি ছেলেরা ঠিকমতো ক্লাশে আসছে না, আমাকে দেখলে আরও দূর দিয়ে যায়। বোধ হয় অধিকাংশ ছেলে গণিতের সন্মুখীন হতেই ডরায়। পরীক্ষার ত আর ১০/১২ সপ্তাহ বাকী আছে, কিন্তু ওদের আসল কোর্সটা আরম্ভই হয়নি। যা হোক তুমি এই সময়ের মধ্যে ওদের কোর্সটা শেষ করে পড়িয়ে দেওতো। আমি নোটিশ দিয়ে দিচ্ছি। আমি জানি তুমি পারবে।" আমি বেশ পরিশ্রম করে ওদের নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় শেষ করে পড়িয়ে দিয়েছিলাম। ... আসল ব্যাপার এই–প্রফেসর বোস উচ্চমার্গের পাখী, তাঁর কাছে গণিতের সব বিষয়ই সমান সহজ। এ কারণে আমাদের মতো সাধারণ লোকের কথা ওরা বুঝতে পারে আর সবটা না বুঝলেও আরেকটু চেষ্টা করেই বুঝে নেয়। এ সম্পর্কে একটা কৌতুককর কথা মনে পড়ছে– আমার একটি ফুটবল-ক্রিকেট খেলুড়ে প্রিয় ছাত্র,দিগেন দাস, হঠাৎ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো,"স্যার একটা কথা বলবো, "তা কেন বলবিনে, বল কি বলতে চাস?" "স্যর?" আপনার আর শশাঙ্কবাবুর পড়ানো আমরা খুব পরিষ্কার বুঝতে পারি।" ভাবলাম, যা হোক আজ একটি ছাত্রের প্রশংসা পেলাম। কিন্তু তখনও ওঁর বক্তব্য শেষ হয়নি– বাক্যের শেষার্ধ হল, "কিন্তু স্যর সত্যেনবাবু এত সুন্দর পড়ান যে তা একটুও বুঝতে পারিনে।" তখনই গুমর ফাঁক হয়ে গেল। বুঝলাম, এ বক্তব্যের সারমর্ম হল – 'আপনি আর শশাঙ্কবাবু কি কচু পড়ান! ও তা আমরা এমনিই বুঝতে পারি।' বুঝলাম, অনেক ছাত্র দেবদেবীর ভক্ত, সাধারণ মানুষের কথা তারা গ্রাহ্য করে নাঃ তাতে রহস্য নেই। বুঝলাম, ওতো ঠিকই বলেছে,–আমরা ত ধর্ম ও সে সম্পর্কীয় অনেক উপদেশ, হিতকথা ও আখ্যায়ন, বিনা বিচারেই মেনে নিয়ে থাকি! উচ্চমার্গের কথা স্বতন্ত্র, তা বোঝবার ও ভাববার দরকার হয় না। যাক, ওরা নিরীহ প্রাণী সুখে থাক্।

সত্যেনবাবু তাঁর অনুষদের প্রত্যেকটি শিক্ষকের মন-মানসের কলকাঠি বুঝতে পারতেন এবং অনেক সময় তা পরীক্ষাও করে নিতেন। আমি একবার কেমন পরীক্ষায় পড়েছিলাম,বলছি। একবার এক পরীক্ষার প্রশ্নে কোনও অসতর্ক প্রশ্নকারক একটি প্রশ্নে অসম্পূর্ণ তথ্য থেকে সম্পূর্ণ উত্তর চেয়েছিলেন। আমি প্রশ্নটা নিয়ে ওঁর কাছে গিয়ে বলেছিলাম, "মডারেটদের হাত থেকে এমন প্রশ্ন টিকলো কেমন করে?" তিনি অবশ্যই প্রশ্নটা দেখে ব্যাপার বুঝে ফেলেছিলেন। তবু আমাকে বুঝাতে লাগলেন, "না প্রশ্ন ঠিকই আছে।" আর মোটা একখানা বই দেখিয়ে বললেন, "এই ত দেখ, এখানে এই রূপ প্রশ্ন আছে, পড়ে দেখ।" আমি বললাম, "স্যার! মোটা বই দেখে কি করব? তিনটা পরস্পরপর অনির্ভর ঋজু তথ্য, আর চারটে নির্ণেয় অজ্ঞাত রাশি! কোন অলিখিত শর্তও নেই। এর সমাধান কেমন করে হবে? আমি কিন্তু, এ প্রশ্নটা যারা চেষ্টা করে সময় নষ্ট করেছে তাদের প্রত্যেককেই পুরো নম্বর দেব।" তিনি একটু হেসে উত্তর দিলেন, "যাও তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।" তবু আমার কথাটা ঠিক আছে না বেঠিক হয়েছে, তার কোনও ইঙ্গিত দিলেন না। বুঝলাম, উনি মনে মনে খুশি হয়েছেন– আর আমাকে একটু বাজিয়ে নিলেন, খাঁটি না মেকি!

এরপর আর একদিন আমাদের পদার্থবিদ্যা অনুষদের ১০/১১ জন শিক্ষককে একসঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বাজিয়ে নিলেন। ও'র কাছে একখানা উচ্চপর্যায়ের পাটিগণিত ছিল, অনেক কূট অংকে ভরা! অংকগুলো দেখতে খুব সহজ মনে হয়, কিন্তু করতে গেলে জ্যামিতি, বীজগণিত, স্থানাংক জ্যামিতি বা কলন প্রণালীর জ্ঞানের আবশ্যক হয়। সেই বই

থেকে আমাদের সবাইকে সাত-আটটা বাছা বাছা অংক করতে দিয়ে বললেন, "সাতদিন পরে যে যতটা পার এনে আমাকে দেখাবে।" আমি পরদিনই সবগুলো সমাধান করে তাকে দেখালাম। (অন্যেরা কে কয়টা করতে পারলো সেটা উল্লেখ করা শোভন হবে না)। যাহোক সত্যেনবাবু খুব খুশি হয়েছেন, বোঝা গেল। মন্তব্য করলেন, "তোমার ত ম্যাথেমেটিক্স-এ য়্যাকুমেন (প্রকৃষ্ট পারদর্শিতা) আছে হে!" সত্যেনবাবুর মুখে এ খুব বড় প্রশংসা। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি স্ট্যাটিস্‌টিক্স পড়বে?" বল্লাম, "তা সুযোগ পেলে পড়তে পারি, কিন্তু সে সুযোগ কোথায়?" তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "আমি তোমাকে বেতনসহ নয়মাসের ছুটি দেব, আর বছরে তিনমাস তো এমনিই ছুটি আছে। গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হলেই তিনি আমাকে সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে গেলেন, আর (ডঃ প্রশান্তচন্দ্র) মহলানবিশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, – "দেখ, এ আমার ছোট ভাই-এর মত। একে বছরখানিকের মধ্যে যতটা পার পরিসংখ্যান শিখিয়ে দেও। একে যোগ্য মনে করেছি বলেই, আমি তোমার হাওয়ালায় রেখে যাচ্ছি।"

বুঝলাম সত্যেনবাবুর নির্বাচনী পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হয়েছি। এরমধ্যেই তাঁর মাথায় এসে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাগণিত চালু করতে হবে। আর সে জন্য শিক্ষক সৃষ্টি করতে হবে। আর সত্যেনবাবুর স্নেহ ও অনুগ্রহেই আস্তে আস্তে আমার পঠনের মোড় ফিরে গেল : পদার্থবিদ্যা থেকে পরিসংখ্যানে বা তথ্যগণিতের দিকে। এই মহাপুরুষের কাছে হিন্দু-মুসলিমের কোনও প্রশ্নই ছিল না; ছিল গুণের আদর আর সূক্ষ্ম বিচারবোধ। তিনি প্রথমে তথ্যগণিতকে অংক শাস্ত্রের সহিত সংযোজিত করে দিলেন। এর ফলে ১৯৩৯ সাল থেকে আমি তথ্যগণিত পড়াতে লাগলাম, আর পদার্থবিদ্যার ফলিত অংশ ত্যাগ করে অনার্স ক্লাসে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যাও পড়াতে লাগলাম। এইভাবে কিছুদিন চলার পর তথ্যগণিতের একটা পুরো অনুষদ সৃষ্টি করা হল। প্রথমে তথ্যগণিতের পাসকোর্স আর অনার্সকোর্স একসঙ্গে আরম্ভ হল। তার দুই বছর পরে এম. এ. কোর্সও খোলা হল ১৯৫০-৫১ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা বিষয়ে গর্ব করতে পারে; সে হচ্ছে, তথ্যগণিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে B. A. Honours Course খুলবার আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত অনার্সকোর্স খোলা হয়েছিল। ইতোমধ্যে ১৯৪৪ সালে সত্যেনবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। কিন্তু চলে গেলেও তিনি আমাদের কথা ভুলতে পারেননি।

একটু আগের কথা বলি : ১৯৩৬/৩৭ সাল থেকেই তিনি বাংলাভাষায় পদার্থবিদ্যা পড়াতেন। আমিও তাঁর পন্থা অনুসরণ করেছিলাম। এতে কোনও দিন অসুবিধা বোধ করিনি। বাংলাও অবশ্যই শিক্ষার বিষয়, ভেবেচিন্তে যথাযোগ্য পরিভাষা সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু যে শব্দটা বাঙালী জনগণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে, সেটা ত বাংলাভাষার অন্তর্গতই হয়ে গেছে। তার জন্য অনর্থক মাথা ঘামিয়ে হয়রান হওয়ার আবশ্যক নাই। যেমন– আদালত, স্কুল, কলেজ, ভোট, কণ্ট্রাক্টর, বাস, মোটরগাড়ী, পোষ্টকার্ড, ইত্যাদি। সত্যেনবাবু একবার আমাকে বলেছিলেন, "বাংলায় একখানা পদার্থবিদ্যার ব্যবহারিক বই লেখ, তা দেখে ছাত্রেরা পরীক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া প্রভৃতি ভাল করে বুঝতে পারবে। এখন ওরা ইংরেজি বই দেখে পরীক্ষণ বুঝতে চায়, কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারে না বলে ভুল করে।" আমি তেমন একখানা বই লিখেও ছিলাম; সত্যেনবাবু তা দেখে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু একবার পূজার ছুটির আগে একটি ছাত্র বইখানা নিয়ে গেল ছুটির শেষে ফেরত দেবে বলে। কিন্তু সে ছেলেটি আর ফিরল না। কি যে হলো বুঝতে পারলাম না।

তিনি কলকাতা চলে যাওয়ার পরে আমি তথ্যগণিত নাম দিয়ে একখানা 'পরিসংখ্যান'-এর বই লিখে তার ভূমিকাটা সত্যেনবাবুকে দেখিয়েছিলাম। তিনি পড়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর গবেষক-ছাত্রদের ডাক দিয়ে বললেন, "আরে, দেখ দেখ, কাজী কি করেছে!" এই বলে সম্পূর্ণ ভূমিকাটা তাদের পড়ে শুনলেন। তিনি অধিকাংশ পরিভাষাই পছন্দ করলেন, আর অল্প যে কয়টা তাঁর পছন্দ হল না সেগুলোর বিকল্প শব্দ আমাকে শুনালেন (আমি তা টুকে নিলাম)। ভূমিকাটা তিনি প্রবন্ধাকারে তাঁর "জ্ঞান-বিজ্ঞান" পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন অবশ্য, আমি এর আগেও চিঠিপত্রের মারফতে পারিভাষিক শব্দাদী লিখে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করতে ত্রুটি করিনি।...এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, তাঁর ঢাকা অবস্থানের ২৪ বছর পর্যন্ত তাঁর যেমন ছাত্র ছিলাম, সারা জীবন ভর আমি তাঁর ঠিক তেমন ছাত্রটিই ছিলাম। ...বহুকাল যাবত আমি প্রতিবৎসর মহলানবিশ সাহেবের ২০৩ নং বি. টি. রোড, কলকাতা- ৩৫ এ Indian Statistical Instituite -এর পরিদর্শক-শিক্ষকরূপে (এবং সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীরূপেও) আসা-যাওয়া করতম। আর সে সময় কয়েকদিন পরপরই সত্যেনবাবুর সঙ্গেও দেখা করতাম। সত্যেনবাবুও কখনও ইন্‌ষ্টিট্যুটে আসতেন। ..আমি Quantum Theory সংক্রান্ত সত্যেনবাবুর লেখাটার বাংলা অনুবাদ করেছিলাম এবং এর বাংলা নাম দিয়েছিলাম 'ঝলকবাদ'। প্রবন্ধটা কলকাতার 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সত্যেনবাবু আমার ভাষার স্বাভাবিকতা, সরলতা ও প্রাঞ্জলতার প্রশংসা করেছিলেন। অনুবাদটি কোন সালের কোন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল, আমার মনে নাই। ...আমার এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটি আমাকে নানা দিক দিয়ে আমার জ্ঞানবর্ধন ও অনাবিল সুখদান করেছেন। তার প্রতিদান দেওয়া

অসম্ভব। 'মায়ের কাঙ্গাল' আমি রাণী মহলানবিশকে 'মা' বলে ডেকেছিলাম বলে মহলানবিশ সাহেবও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। প্রীতি ভালবাসার এ-সব উদারক্ষেত্রে নেই কোনও ভেদাভেদ; মানুষের মনুষ্যত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপর এর প্রতিষ্ঠা।

মনে পড়ে একদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত পরিশ্রম করে দাবাখেলার তখ্তির উপর আটটা মন্ত্রী এমনভাবে সাজিয়েছিলাম যাতে কোনও মন্ত্রী অন্য কোনওটির মারমুখো না পড়ে। এইভাবে বের করেছিলাম মোট ৯২ ভাবে মন্ত্রীগুলো স্থাপন করা যায়। অবস্থানগুলো সংকেতে লিখে সন্ধ্যার আগেই সত্যেনবাবুকে দেখাতে গিয়েছিলাম। "ভাল করে আবার দেখ তো, অবস্থান সংখ্যা মোট ৯৬ হবে কিনা?" অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে, চট করে ওঁর মাথায় খেলেছে বোর্ডের চারজন বসে চারধারে সংকেত লিখলে একই সংস্থানকে চারজনে চারভাবে ব্যক্ত করবে। তাছাড়া গণনাতে নম্বরগুলো বাঁ থেকে ডানে অথবা ডান থেকে বামে ১, ২, ...৮ করে গণা যেতে পারে। অতএব মোট অবস্থান সংখ্যা ৮ এর গূণিতক হবে। পরে দেখা গেল মোট ১২টি মৌলিক অবস্থান আছে, এরমধ্যে ১১টিকে উপরোক্ত প্রণালীতে ৮ ভাবে লেখা যায়, এর একটি মৌলিক অবস্থান আছে যেটি বোর্ডের উভয়-কর্ণের সহিত সুষম, সেটিকে মোট ৪ ভাবে ব্যক্ত করা যায়। এই কারণে মৌলিক অবস্থান সংখ্যা ১১ × ৮ + ১ × ৪ = ৯২। এখানে সত্যেনবাবুর নির্দেশ অনুসারে ভুল খুঁজতে গিয়েই ১২টি মৌলিক সাজ বা অবস্থানের উপর নজর পড়লো। অন্যকথায়, ৯২টি সাংকেতিক অবস্থান হলেও ওগুলোর মৌলিক 'সাজ' মাত্র ১২টি। পরে আমি 'বিজয় রাঘবনে'র কাছে জানতে পারি, এ নির্ণয়টা নতুন নয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Euler ইতিপূর্বেই ৮ মন্ত্রীর ১২ সাজ ও ৯২ অবস্থান আবিষ্কার করে গেছেন। উনিও দাবাড়ু ছিলেন। যাহোক তাতে ক্ষুব্ধ হইনি– বড় বড় গণিতজ্ঞরাও ভাল দাবা খেলতে পারেন, এ শুনে আনন্দই পেয়েছি।

সত্যেনবাবু যখন ঢাকায় অবস্থান করছিলেন, তখনই ভারতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠানে Balanced Incomplete Block Design সম্বন্ধে গবেষণা চলছিল। বাংলায় বলতে গেলে, গবেষণার বিষয় হচ্ছে, 'অসম্পূর্ণ শ্রেণী-সংস্থান ব্যাপারে সুতৌল প্রকল্প'। আমি একদিন সত্যেনবাবুর কাছে গিয়ে বললাম আমি ভুল-নির্ভুল বিচারী পদ্ধতিতে (Trial method) কয়েকটি সুতৌল-অসম্পূর্ণ-সারি-সংস্থান (Balanced Incomplete Block Design) সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলে তার সংখ্যা গণনা করতে চাই।" উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "অনুমান কতটা trial লাগবে?" আমি বললাম, "৮০ হাজারের নিচে নয়, আবার ১ লাখের উপরে নয়।" "যাঃ যাঃ পাগলা, এত খাটনী করতে পারবে? এর পর আমি ৬ মাস পর্যন্ত এ কাজে লেগে থেকে মোট সাতশটা সমাধান পেলাম। সংস্থানটা ছিল, ১৫টা সারি, ১৫টা বিভিন্ন জাত, প্রত্যেক সারিতে ৬টি করে বিভিন্ন জাত। প্রত্যেক জাত ৬টা বিভিন্ন সারিতে থাকবে, আর প্রত্যেক জোড়া সারিতে ২টা সাধারণ জাত থাকবে। সত্যেনবাবুও এসময়, অনেকটা এই ধরনের কাজ করছিলেন। এবারে আর তাড়িয়ে দিলেন না; খুব মনোযোগের সহিত দেখলেন। তাঁর খুশি দেখে কে! থীসিসটা রেখে দিলেন, বাড়ি গিয়ে আবার দেখবেন। পরদিন বললেন, 'দেখ্ এই ২৭টা কিন্তু বিভিন্ন সমাধান নাও হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে বিভিন্ন সংস্থান isomorphic হয়ত নাম বদল করে বিভিন্ন সাজে সেজেছে।" আমি ভাল করে খতিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম সত্যেনবাবু ঠিকই ধরেছেন। পরে শ্রেণীকরণ করে দেখা গেল, মাত্র তিনটে non-isomorphic বা প্রকৃতই বিভিন্ন সংস্থান হয়েছে। তিনি বিশেষ যত্নের সহিত আমার সমুদয় গবেষণা-পত্রটি শুধরে দিলেন। এই গবেষণাপত্রের জন্য আমি ডক্টরেট পেয়েছিলাম। এর আদিতে ছিল সত্যেনবাবুর অসীম স্নেহ।

পারিবারিক সংস্পর্শেও প্রফেসর সত্যেন বোস অকুণ্ঠ মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি যে পাড়ায় থাকতেন তার আশেপাশে সকলের বাড়িতেই সপরিবারে বেড়াতে যেতেন। তাঁদের যথাযোগ্য খোঁজ-খবর নিতেন, বিপদ আপদের সময় সুপরামর্শ দিতেন। ১৯৪১ সালে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের নিদারুণ অসুখ হয়েছিল। তিনি দুই একদিন পরপরই দেখতে আসতেন। একদিন আমি ১১টার সময় ক্লাস নিতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "কাজী, আজকে তুমি আর ক্লাস করো না। বাড়িতে গিয়ে ছেলেটাকে দেখাশুনা কর গিয়ে। ওর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না।" তাই শুনে আমি বাড়িতে ফিরে এসে সারাদিন ও রাত্রি ছেলেটির সেবা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। ইতিপূর্বেই ছেলের জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মধ্যরাত্রের কিছু পরেই ছেলেটি যেন হৃৎপিণ্ডের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চীৎকার করে বলে উঠ্লো, – "আববাম! আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আরও তিনমাস বাকি আছে, কিন্তু আমি এই চললাম।" ...এই তার মুখের শেষ বাক্য। পরদিন সকালবেলা এসে সত্যেনবাবু এ ব্যাপার দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি, – ছেলেটাকে তিনি খুব ভালবাসেন– ওর আচার-ব্যবহার অতিশয় ভদ্র ছিল বলে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ১৯২৪ সালে সত্যেনবাবু অশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে জগদ্বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের ফোটন ও ঝলকবাদ সংক্রান্ত ব্যাখার এক অংশে কিছুটা ত্রুটি দেখায়ে এক গবেষণাপত্র লন্ডনে ছাপার

জন্য পাঠিয়েছিলেন; ঐ পত্র সেখান থেকে আইনস্টাইনের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির অকাট্য যুক্তি আইনস্টাইন স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং নিজে সেটা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বিশিষ্ট জার্মান পত্রিকা 'Zeitschrift fur Physik'—এ প্রকাশ করেছিলেন। পরে পরিশোধিত তত্ত্বটি 'বোসন' বা বোস-আইনস্টাইন ঝলক-কোয়ান্টাম তত্ত্ব নামে প্রচলিত হয়েছে। 'বোসন'-এর বিশেষ উৎকর্ষ রয়েছে সম্ভাবনা-তত্ত্বের নিখুঁত যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারে,– অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাত্রার তেজপুঞ্জের বিশ্লেষণে ফোটনগুচ্ছের মধ্যে যেগুলো অবিভেদ্য Unrecognisable). সেগুলোর সন্নিবেশ-সংখ্যা (Permutation) নির্ণয়ে যথাযথ গৌণিক-সংখ্যা (ফ্যাক্‌টরিয়াল) দিয়ে ভাগ করে নেওয়ার সতর্কতায়। ব্যাপারটা এত ঘোরালো ছিল যে, একমাত্র শ্রীযুক্ত বোস ছাড়া অন্য কোনও বৈজ্ঞানিকই অতটা গভীরে প্রবেশ করে তত্ত্ব ও পরীক্ষণের সমন্বয় সাধন করতে পারেননি। আমার সামান্য জ্ঞানে এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর বুঝাতে পারছিনে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ্যার কক্ষে বসেই প্রফেসর বোস ম্যাক্স-প্লাঙ্কের প্রস্তাবিত গাণিতিক সূত্রের সুষ্ঠু পরিশোধন করতে পেরেছিলেন বলে, আমরা (তাঁর শিষ্য-ভক্তগণ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ ও ভারত গর্ব অনুভব করতে পারে। এইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মহলও এই মহামানবের মস্তিষ্কের উদ্ভাবনশক্তির প্রশংসা না করে পারেন না।

সম্পাদকীয়

অনুসন্ধানীর সম্মেলন

[জানুয়ারি- ১৯৮৬]

বিজ্ঞান সমায়িকীয় সংযুক্ত বিজ্ঞান ক্লাব অনুসন্ধানী বেশ কয়েক বছর পর পুনরায় একটি জাতীয় সম্মেলনে মিলিত হলো। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা দেশের প্রথম বিজ্ঞান ক্লাব হিসাবে অনুসন্ধানীর জন্ম ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৬ এ কার্জন হলে মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর উদ্যোগে দেশের বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের প্রথম যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল অনুসন্ধানী ছিল তার স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান। তখন থেকেই অনুসন্ধানী দেশব্যাপী বহু শাখায় ছড়িয়ে পড়ে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনকে একটি জাতীয় রূপদানে সহায়তা করেছে। সে আজ দশ বছর আগের কথা। ইতিমধ্যে এ আন্দোলন বেশ খানিকটা এগিয়েছে। বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বছর সরকারীভাবে জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ প্রবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞান ক্লাবের অনুপ্রেরণা এভাবে ছড়িয়েছে দেশের গ্রামে গঞ্জে-সর্বত্র।

দেশের বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের এই অগ্রযাত্রায় অনুসন্ধানী তথা বিজ্ঞান সাময়িকীর একটি ভূমিকা যে বরাবর ছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু এই বিজ্ঞান সাময়িকীর দিকে তাকালেই আমরা যেন কিছুটা বুঝতে পারি যে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনে নূতন প্রাণ সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ আন্দোলন আজ সৃষ্টিশীলতার সমস্যায় ভুগছে। যে রকম পৃষ্ঠপোষকতা, উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ তরুণ বিজ্ঞনীদেরকে নূতন নূতন দিকে আকৃষ্ট করতে পারত তাতে আজ অভাব অনুভূত হচ্ছে। অনুসন্ধানীর জাতীয় সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা প্রতিনিধিবৃন্দ এই বিষয়টির দিকে গুরুত্ব আরোপ করেছে। দেশকে জানা, দেশকে গড়ার যে চূড়ান্ত লক্ষ্য অনুসন্ধানীর সামনে রয়েছে তার বাস্তবায়ন নিয়ে এতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তরুণ বিজ্ঞানীদের এমনিতরো সমাবেশ আমাদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করে। তাদের সংকল্প আমাদের সবাইকে সংকল্পবদ্ধ করে; একটি আনন্দময় সৃজনশীল তারুণ্য ভরা দেশের স্বপ্ন দেখায়।

হার্ট আমার হার্ট

স্বাতী

[জানুয়ারি-১৯৮৬]

শরীরে যে অঙ্গটিকে মানুষ জীবনের সাথে ভালবাসার সাথে সব চেয়ে বেশি চিহ্নিত করে সেটি হার্ট। অথচ চিকিৎসা গবেষণার দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে এই হার্ট গুরুত্ব পাচ্ছে সম্প্রতিক কালে, যখন এর বিকল হওয়াটাই মানুষের মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ হিসাবে সবার চোখে পড়েছে। ঐ যে গুরুত্বটা দেওয়া হয়েছে তার ফলও অবশ্য ফলছে। এ সম্বন্ধে সুখবর হলো হার্টের অসুখের উপর মানুষের বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, এবং এর থেকে মৃত্যুর হার এখন কমের দিকে। এ যুগে এ অসুখ এমন মহামারীর আকারে দেখা দিচ্ছে যে ১৯৬৯ সালে জাতিসংঘ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান একে 'মানুষের সামনে সব চেয়ে মারাত্মক মহামারী বলে আখ্যায়িত করেছিল।' কোন মহামারী নিয়ন্ত্রণে আসে কিভাবে? অবশ্যই আরো ভাল প্রতিষেধক এবং চিকিৎসার মাধ্যমে। কিন্তু যে কোন মহামারীর নিয়ন্ত্রণ প্রধানতঃ নির্ভর করে সাধারণ মানুষের সচেতনতা এবং সেই সাথে কিছু জরুরী অভ্যাস গড়ে তোলার উপর। হার্টের অসুখ এড়াবার জন্য জরুরী যে সব অভ্যাস সেগুলো বেশ সরল :

১। ধুমপানের অভ্যাস থাকলে সেটা বন্ধ করতে হবে অথবা একেবারেই কমিয়ে ফেলতে হবে।

২। এমন খাদ্য খেতে হবে যাতে চর্বি ও লবণ খুব কম- বিশেষ করে প্রাণীজাত চর্বি।

৩। সব সময় নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে, শরীরের পক্ষে যত খানি কঠিন ব্যায়াম সম্ভব ততখানি।

৪। মদ্য পান বাদ দিতে হবে অথবা কমাতে হবে।

৫। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশ্রাম নিতে হবে।

এ সব নিয়মের মধ্যে খুব একটা নূতনত্ব যে রয়েছে তা নয়। অতীতেও সুস্বাস্থ্যের জন্য এগুলোর গুরুত্বের কথা বলা হতো। কিন্তু আজ হার্টের অসুখের মহামারীতে এরা প্রায় অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে সবার জন্য।

দু'হাজার বছর আগেও চীন দেশের চিকিৎসকদের কাছে জানা ছিল যে অতি জটিল এক ধমনীজালের ভেতর দিয়ে রক্তকে ক্রমাগত সঞ্চালন করার জন্য হার্ট একটি পাম্প বিশেষ। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই খবরটি রাখত না বলে সে জগতে এটা পুনরাবিষ্কৃত করতে হয়েছে ১৬২৮ সালে উইলিয়াম হার্ভেকে– যাঁর "হার্ট আর রক্তের চলাচল প্রসঙ্গে" নামক পুস্তকটি একটি যুগান্তকারী পুস্তক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একটা পাম্প হিসাবে বর্ণনা করলেই যেন হার্ট সম্বন্ধে সব বলা হয়ে গেল। কিন্তু একবার ভাবতে হয় কেমনতরো এই পাম্প, আর কেমনই বা এর সংলগ্ন নলগুলো? হাতের মুঠোর সমান এর আকৃতি, পূর্ণবয়স্ক গড়পড়তা মানুষের ক্ষেত্রে ওজন মাত্র ১১ আউন্সের মত। অথচ এই ছোট পাম্পটিকে রক্ত সঞ্চালন করতে হয় প্রায় ৬০ হাজার মাইল দীর্ঘ রক্তনালীর মধ্য দিয়ে, নিয়ে যেতে হয় রক্তকে শরীরের সহস্র কোটি জীব-কোষের প্রত্যেকটিতে। একটি মানব জীবনের পুরো আয়ুষ্কালে এক টানা কাজ করতে হয় একে দৈনিক প্রায় এক লক্ষ বার সংকুচিত-প্রসারিত হয়ে।

বেঁচে থাকতে হলে হার্টের এই প্রক্রিয়াকে থামানো চলবে না, কয়েক মিনিটের জন্যও নয়। রক্তের সঞ্চালনকে শুধু চলতেই হবে না, তাকে চলতে হবে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে। হার্টের কম্পনের তালে তালে এর বিভিন্ন কপাটগুলো খুলতে হবে, বন্ধ হতে হবে যাতে করে নিলয় থেকে অলিন্দে অথবা ধমনী থেকে নিলয়ে উল্টো দিকে রক্ত না যেতে পারে। স্মর্তব্য যে হার্টের রয়েছে চারটি কামরা– উপরে দুটি অলিন্দ, নীচে দুটি নিলয়। সুন্দর ছন্দিত রূপে এরা একের

পর এক সক্রিয় হয় প্রতি বার হৃদ কম্পনের সাথে সাথে। এই ছন্দের তালটুকু রাখার দায়িত্ব হলো ডান অলিন্দের উপরে থাকা এক গুচ্ছ সরু স্নায়ুতন্তুর উপর। এখান থেকে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত গিয়ে হৃদকম্পনের প্রতিটি খুঁটিনাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

যতই শক্ত সমর্থ হোক না কেন পাম্প আর নলের যে কোন ব্যবস্থার মত হার্টের সঞ্চালন ব্যবস্থাতেও ত্রুটি দেখা দিতে পারে। কোন পাম্প ব্যবস্থায় কি রকম ত্রুটি সাধারণত দেখা যায়? নলগুলো অবাঞ্ছিত বস্তুকে ভর্তি হয়ে জাম হয়ে যেতে পারে, এরা কোনখানে ফুটো হয়ে যেতে পারে, লীক করতে পারে; আর এসব অঘটনের বিভিন্নতা একই সাথেও দেখা দিতে পারে। প্রতি হাজারে দশ জন শিশুর জন্মের সময়েই ত্রুটিপূর্ণ হার্ট থাকে–হার্টের কপাটগুলোতে লীক থাকতে পারে, দুই নিলয়ের মাঝখানের দেওয়ালে ফুটো থাকতে পারে ইত্যাদি। পাঁচ থেকে পনর বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে রিউম্যাটিক ফিভার বা বাত জ্বরের প্রকোপ দেখা যায়। এই জ্বরে হার্টের কপাটগুলোতে এমন ক্ষত দেখা দিতে পারে যে এরা ঠিকমত বন্ধ হতে চায় না, ফাঁক থেকে যায়।

অন্যান্য সমস্যাগুলো দেখা দেয় অপেক্ষাকৃত অধিকতর বয়সে। এ রকম একটি সমস্যা হয় হার্টের কম্পনের তাল রক্ষাকারী স্নায়ুতন্তুর গোলযোগে। এই তাল কেটে গেলে কপাট অসময়ে খোলা বন্ধ হতে পারে, ফলে হার্টের কাজে ব্যঘাত ঘটে। এর চেয়ে বেশী সচারাচর যে সমস্যা দেখা দেয় তার উৎস রক্তবহ নলগুলোর মধ্যে। বহুতরো কারণে এ সব ধমনী সমূহের দেওয়াল পুরু হয়ে উঠে এবং এদের স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায়। এমতাবস্থায় এরা সহজে প্রসারিত ও সংকুচিত হতে পারে না। ধমনীর এ রকম শক্ত হয়ে যাওয়ার একটি বড় কারণ হচ্ছে এতে চর্বি-জাত এক রকম সঞ্চিত পদার্থ। এই সঞ্চয়ের ফলে ধমনী শক্ত তো হয়ই এর ভেতরের রক্ত চলাচল পথটুকু ক্রমেই সরু হয়ে পড়ে। এরকম সঞ্চয় ধমনীর মধ্যে জমাট রক্তের এক ধরনের ছিপির সৃষ্টিও করতে পারে। ধমনীর দেওয়ালে চর্বি-জাত সঞ্চয়ের উপর রক্তের প্লেইটলেট নামক কোষগুলো মরে গিয়ে জমে উঠে। এই স্তুপে সুতার আকৃতিতে ফাইব্রিল নামক জিনিষ গড়ে উঠে এবং এসব তালগোল পাকিয়ে জমাট-রক্তের শক্ত ছিপি তৈরী হয়। এই ছিপি ক্রমে বড় হয়ে ধমনীর পুরো পথটাই বন্ধ করে দিতে পারে অথবা রক্তস্রোত দ্বারা অন্যত্র বাহিত হয়ে অপেক্ষাকৃত সরু অন্য কোন রক্তনালী বন্ধ করে দিতে পারে।

ধমনীর দেওয়াল শক্ত হয়ে যাওয়া, এর পথ বন্ধ হয়ে আসা এবং আনুসঙ্গিক কিছু রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণে ত্রুটির ফলে সৃষ্টি হয় রক্ত সঞ্চালনের সব চাইতে ব্যাপক অসুখটি–উচ্চ রক্ত চাপ। এর অর্থ ধমনীর দেওয়ালের উপর বহমান রক্তের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক হয়ে পড়া। উচ্চ রক্ত চাপের বড় বিপদ হলো এটা সহজে ধরা পড়ে না; আর শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে রক্ত নালীতে ততটা নয় যতটা কিডনীর মত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের যথেষ্ট ক্ষতি সাধনের পর। এরকম উচ্চ রক্ত চাপে পাম্প করতে হলে হার্টকে অতিরিক্ত খাটতে হয়। চাপ খুবই বেড়ে গেলে কোন্ রক্ত নালী ফেটে গিয়ে লীক দেখা দিতে পারে। রক্ত নালীতে বড় রকমের বাধা সৃষ্টি হলে অথবা এর থেকে রক্ত লীক হতে থাকলে দেহের কোন কোন কোষ-কলায় যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত পৌঁছতে পারে না। কোন কোষ-কলায় রক্তের সরবারাহ যদি অংশতঃও বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শিগ্‌গির ওটা জরুরী পুষ্টির অভাবে মরে যেতে পারে। এটি যদি মস্তিষ্কের কোষের ক্ষেত্রে ঘটে তা হলে তাকেই বলা হয় ষ্ট্রোক। ষ্ট্রোকের ফলে অস্থায়ীভাবে বাকশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা থেকে শুরু করে পক্ষাঘাত এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে।

হার্টের নিজের কোষ-কলায় যদি এভাবে রক্ত সরবরাহে ঘাটতি ঘটে তা হলে দেখা দেয় করোনারী নামে পরিচিত অসুখগুলো। হার্টের পেশীতে রক্তবাহিত পুষ্টির অভাবে তা দুর্বল হয়ে এর কাজের ব্যাঘাত ঘটায়; হার্টের দক্ষতা কমে যায়, এখানে ব্যথা অনুভূত হয়। হার্টের কারোনারী নামক ধমনীগুলোর পথ যদি এভাবে পুরাপুরি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মুহূর্তের মধ্যে ঐ ধমনী হার্টের যে অংশে রক্ত নিয়ে যায় সে অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং হার্টের কাজ বন্ধ হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে। একেই বলা হয় হার্ট এট্যাক।

হার্ট এট্যাক অনেক সময় অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আসে, ইতিপূর্বে কোন রকম উপসর্গ না ঘটিয়ে। তবে এদের প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধমনীর পথ সরু হবার এবং উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা থাকে দীর্ঘকাল ধরে। একবার হার্ট এট্যাক হয়ে বেঁচে গেলে বিশেষ সাবধানতা ও চিকিৎসার মাধ্যমে পরে এ রোগের বিরুদ্ধে সাফল্যের সাথে সংগ্রাম করা যায়। কিন্তু অন্ততঃ অর্ধেক রোগীর ক্ষেত্রে এসুযোগ পাওয়া যায় না, কারণ প্রথম এট্যাকেই মৃত্যু ঘটে। আজকাল অনেক অকাল মৃত্যুর জন্য এই অসুখটি অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে দায়ী।

হার্টের অসুখগুলো সাম্প্রতিক কালে এ রকম মহামারীর আকার ধারণ করলো কেন? এ নিয়ে বহু রকম তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে। তবে কতগুলো বিষয়কে সাধারণভাবে দায়ী করা হয়ে থাকে। তামাক প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ধূমপানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এর একটি কারণ। উন্নত খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং অধিক স্বচ্ছলতার ফলে চর্বি জাতীয় দামী খাবার খাওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে–এটাও একটি বড় কারণ। বিশেষ করে প্রাণীজাত চর্বির মধ্যে থাকে কোলেস্টোরেল নামক

জিনিষ যা ধমনীতে সেই মারাত্মক সঞ্চয়গুলো জমাতে সহায়তা করে। তা ছাড়া ঐ দামী খাবারগুলোতে শক্তিদায়ী ক্যালোরীও থাকে বেশী যা দেহের ওজন বাড়ায়। অথচ এই মোলায়েম খাবারগুলোতে স্থূল আঁশ জাতীয় অংশ কম থাকে বলে এগুলো যথেষ্ট খেয়েও খুব খাওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। এতেও অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। অতিরিক্ত ওজন হার্টের অসুখ ঘটাতে সাহায্য করে, হার্টকে অধিক কাজ করতে বাধ্য করে।

সাম্প্রতিক কালে জীবনযাত্রার প্রণালী সহজতর হয়েছে বলে অনেক মানুষের দৈনন্দিন শারীরিক পরিশ্রম কমে গেছে। এতে এক দিক দিয়ে হার্টের পেশীসহ শরীরের পেশীগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে; অপর দিকে খাদ্যের সাথে গৃহীত অতিরিক্ত ক্যালোরী ব্যবহৃত হয়ে না গিয়ে বরং ওজন বৃদ্ধি ঘটায়।

হার্টের অসুখের বিপদ সংকেত পাওয়ার উপায় কি? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু সংকেত আগে ভাগেই পাওয়া যায়। যেমন শারীরিক পরিশ্রমের পর বুকে ব্যথা অনুভূত হওয়াটা করোনারী হার্ট অসুখের সংকেত হতে পারে। এ রকম ব্যথা অনুভূত হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এগুলোকে পেটের গ্যাস বা হজমের গণ্ডগোল বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। অল্প কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঘোরা, মূর্ছা যাওয়া বা দৃষ্টিশক্তির গোলযোগ অনুভব করা–এসব ষ্ট্রোক হবার পূর্বেকার উপসর্গ হতে পারে। ঠিক সময় ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি মস্তিষ্কে রক্তবাহী কোন ধমনীটা বন্ধ হয়ে আসছে নির্ণয় করে সেটা পরিষ্কার করে দেবার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

হার্টের রোগ নির্ণয়ে এক সময় ষ্টেথেসকোপ দিয়ে হৃদকম্পন মেপে কিছু বুঝতে পারা ছাড়া ডাক্তারের বিশেষ কিছু করার থাকতো না। আজকাল কিন্তু আরো বহু উপায় রয়েছে এর। রক্ত নালী বেয়ে সোজা হার্টে ক্যাথিটার নামে সুঁচ চালান করে দিয়ে সেখানকার নানা ত্রুটি বোঝার সুবিধা হয়েছে। ওখানে বিশেষ তরল ক্যাথিটারের সাহায্যে ঢুকিয়ে ও এক্সরে ছবি তুলে এটা বোঝা যায়। রক্তের সাথে তেজস্ক্রিয় কিছু যৌগ ইনজেকশন করে মিশিয়ে পরে তেজস্ক্রিয়তার উদঘাটকের সাহায্যে হার্টের অবস্থা বুঝতে পারা যায়। উদঘাটকের সংকেতকে কম্পিউটারের সাহায্যে কর্মরত হার্টের নানা বর্ণের ছবিতে রূপান্তরিত করে অনেক কিছু স্পষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে।

হার্টের অসুখের নিরাময়ে ওষুধেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এন্টিকোয়াগুলেন্ট ওষুধগুলো ধমনীতে রক্ত জমাট বাধতে বাধা দেয়। মূত্রবর্ধক ওষুধ রক্তের অতিরিক্ত জলীয় অংশ সরিয়ে ফেলে তার চাপ কমায়। এন্টিবায়োটিক ওষুধ বাতজ্বর সহ আনুসঙ্গিক মারাত্মক অসুখগুলোর বিরুদ্ধে চমৎকার কাজ দিচ্ছে। উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বহু রকমের ওষুধ এখন চিকিৎসকের হাতে রয়েছে। হার্ট এট্যাকের ক্ষেত্রে হার্টকে পুনরায় দ্রুত চালু করার বিশেষ কৌশলও উদ্ভাবিত হয়েছে।

হার্টের অসুখে হস্তক্ষেপ করার শেষ অস্ত্র হলো অস্ত্রোপচার–আজ-কাল তারও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। কৃত্রিম হার্ট লাং মেশিন ব্যবহার করে সার্জনরা এখন হার্ট ও ফুসফুসকে শরীরের অন্য অংশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে নির্বিঘ্নে তাতে অস্ত্রোপচার করতে পারেন। এগুলো আগে অকল্পনীয় ছিল। এভাবে হার্টের কপাট ঠিক করে দেয়া যায় ধমনীর লীক সারানো যায়, এমনকি ত্রুটিপূর্ণ কপাট সরিয়ে সেখানে কৃত্রিম কপাটও বসানো যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়া ধমনীকে এড়িয়ে গিয়ে রক্ত সঞ্চালনের অন্য বিকল্প পথের ব্যবস্থা করে ষ্ট্রোক থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। হার্টের কম্পনের ছন্দ ব্যাহত হলে তার তাল রক্ষাকারী কৃত্রিম যন্ত্রও বসানো যাচ্ছে। পেইস মেকার নামে এই যন্ত্রকে ব্যাটারী দ্বারা চালু রাখা হয়।

হার্টের সফল অস্ত্রোপচারের পর প্রায় স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে যাওয়া আজকাল সচরাচর ঘটনা। আমাদের এই কালে তার অধিক বৈকল্যের কারণে চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণায় হার্ট যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে হার্টের অসুখের চিকিৎসায় যথেষ্ট আশারও সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি এ অসুখের মহামারীকে পুরাপুরি অতিক্রম করতে হলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মিত অভ্যাসগুলো গড়ে তুলতে হবে। অসুখের আগাম সংকেতগুলোকেও চিনে নিয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। চিকিৎসার যত উন্নতিই হোক এই সচেতনতার কোন বিকল্প নাই।

এইসব সাধারণ জিনিস

পানি

[ফেব্রুয়ারি-১৯৮৬]

এলিজাবেথ জেইনওয়ে

পানি একটি সার্বজনীন প্রতীক। ঘরের কলটি থেকে নেহাৎ পোষ মানানো ক্ষীণ ধারাতে আসলেও, সযত্নে কোমলায়িত এবং ফ্লোরাইড ওষুধ সহযোগে সংশোধিত হলেও, লক্ষ-বছরের পুরানো ভাণ্ডারের তেল জ্বালিয়ে বয়লারে আরামদায়ক উষ্ণতা লাভ করলেও পানিকে ঠিক পণ্যের পর্যায়ে ফেলা যাবে না। নগরবাসীদের জন্যও কিছু সুদূর স্মৃতি মাঝে মাঝে ঠিকই নাড়া দিয়ে উঠে, যে স্মৃতিতে পানি থাকা না থাকাটাই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে – বসতের স্থান, বন্য অঞ্চলের ভেতর দিয়ে যাওয়া রাস্তা, শিকার-স্থানের সীমা রেখা, দুর্ভিক্ষ আর প্রাচুর্য, জীবন আর মরণ।

ত্রিশ বছর আগে প্লেইনস রাজ্যগুলোর ভূত্বকের মাটি বাতাসে উড়ে চলে গিয়েছিল। চারণ ভূমির ঘাসের উপর লাঙ্গল চালানো হয়েছিল। আশা ছিল ঘাসের শক্ত গুচ্ছ-শিকড়কে কেটে ফেলাতে যে মাটি বাঁধনহীন হয়েছে বৃষ্টি এসে আবার তাকে বেঁধে দিয়ে যাবে। কিন্তু হায়, সে বৃষ্টি আসেনি। কালিফোর্নিয়ায় এমনিভাবে যে ধুলির গামলা সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তুর সংখ্যা মোঙ্গলদের দেশান্তরকেও হার মানায়। আজ শুনছি রাশিয়ানরা সাইবেরিয়ার অনাবাদী জমির উপর লাঙ্গল চালাচ্ছে। কিন্তু জল-ধারা আর বর্ষণের সনাতন গোঁয়ার দেবতারা এখনো মার্ক্স-লেনিনের শৃঙ্খলায় ধরা দিচ্ছে না, ফসলের সমারোহ সেখানে আসছে না।

ফ্রেয়া ষ্টার্ক তাঁর অনবদ্য ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন 'পানি মধ্যপ্রাচ্যের যত যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়েছে, ধর্ম এত ঘটায়নি'। মধ্যপ্রাচ্যের মত জায়গার জন্য এটা একটা খবরই বটে। তবে অনেক ঐতিহাসিকই তাইগ্রীস, ইউফ্রেটিস আর সিন্ধু বরাবর গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতাসমূহের ধ্বংসের জন্য বাঁধ, সেচ ব্যবস্থা আর সরবরাহ খালগুলোর তছনছ করে দেওয়া যুদ্ধ আর আক্রমণগুলোকেই দায়ী করেন। নগরী বিজিত হবার পর সরবরাহ নল আর সেচ-খাল অবহেলার কারণে বন্ধ হয়েছে না নগরকে কাবু করার জন্য আক্রমণকারীরা ইচ্ছে করেই এগুলো ধ্বংস করেছে তা জানা না গেলেও এটা ঠিক যে এগুলো আর পুনর্নির্মিত হয়নি। তবে তাই বলে আমাদেরও আধুনিকতার গর্বে এমন মনে করা উচিত নয় যে একালেও বৈজ্ঞানিক চিন্তা রাজনৈতিক চিন্তার উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে। কারণ এমন বহু জায়গা আজও মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে যা একদিন উর্বর ছিল। সভ্যতা সব সময় পানিকে সহজ প্রাপ্য মনে করেছে, সেটাই সভ্যতার ভুল।

বলেছি, পানি একটি সার্বজনীন প্রতীক। কিন্তু কিসের প্রতীক এটা? বিজ্ঞানী, বাইবেল এবং ফ্রয়েড–এরা সবাই এক বাক্যে বলছেন এটি জন্ম আর প্রারম্ভের প্রতীক। জৈব রসায়নবিদের মতে জীবনের শুরু হয়েছে সমুদ্রে। প্রায়-জীবন্ত সেই পাতলা শুরুয়াকে বজ্র-বিদ্যুতের আঘাত এসে জাগিয়ে তুলেছিল আর সৃষ্টি হয়েছিল পরস্পর মিলন ঘটার মত কিছু সৌকর্যময় প্রোটিনের অণু-এই হলো আমাদের সর্বাধুনিক রূপকথা। একটু পুরানো আর একটি গল্প থেকে আমরা জানতে পারি বিধাতার আদেশে আলো সৃষ্টি হবারও আগে তাঁর জ্যোতি পানিকে আত্মা দিয়ে গিয়েছিল। হয়তো এও সেই একই গল্প বলার আরো রাজকীয় ভঙ্গী মাত্র। আর ফ্রয়েডের কথায় যদি আসি, যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের মাথার ভেতর ঢুকে-বেরিয়ে, স্বপ্নের হাজারো টুকরাকে একত্র সেলাই করে তিনি যে সাবধানী সিদ্ধান্তে এসেছেন তা এ রকম ঃ

"পানিতে আছি অথবা জল ধারার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি এমন স্বপ্ন প্রায়শঃ জন্ম প্রক্রিয়ায়রই প্রতীকি প্রকাশ মাত্র"। এটি বেশ সুন্দর এবং পান্ডিত্যপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত বটে, কিন্তু একেবারেই বেকার। কারণ এতে জলরাশির আর একটি গোষ্ঠির কোন ব্যাখ্যা মিলে না– সেই তিক্ত, লবণাক্ত মরণ-সাগর আর তার দিকে ধাবমান যত মৃত্যুরূপী অনিবার্য জলধারা!

আমাদেরকে নূতন করে চিন্তা করতে হবে। পানি জন্মের যেমন প্রতীক, তেমনি এটি মৃত্যুরও প্রতীক– আসলে এর তাৎপর্য জন্ম ও মৃত্যুকে ধারণ করেও তার চেয়ে বৃহত্তর এবং সরলতর। তার গভীরতম পর্যায়ে পানি আসলে পরিবর্তনের প্রতীক। এজন্যই কি বাইবেলে শেষ বিচারের দিনের পর যে চিরস্থিতিশীল অপরিবর্তনীয় বিশ্বের সৃষ্টি হবে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে "এর পর সমুদ্র আর থাকবে না।"সত্যিতো পরিবর্তনহীন চিরন্তনতার ভিতর সমুদ্রের কি প্রয়োজন?

কিন্তু পানি হচ্ছে বর্তমান কাল। এর প্রবাহ রয়েছে। এটা নিজের কোন আকার নেয় না বরং যে কোন কলসী, ঘটি-বাটিতে নিলে নির্দ্বিধায় তার আকারটাই ধারণ করে; এবং তারপর ওর থেকে গড়িয়ে অন্য পাত্রের অন্য আকারে যায়– তাও নির্দ্বিধায়, অনাসক্ত ও অপ্রতারিতভাবে। পানির শক্তি নিহিত তার গতির মধ্যে। 'বদ্ধ পানি' কথাটি খারাপ অর্থেই ব্যবহৃত। রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে পানিরও মৃত্যু ঘটতে পারে।

পানি সব সময়েই বর্তমান কাল। এর বর্ণনা দেবার জন্য সব সময় ঘটমান বর্তমানের ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করতে হয়– বিস্ফারমান, প্রবহমান, ছুটন্ত, পড়ন্ত, ফুটন্ত ইত্যাদি। যে কোন কৃষক জানেন গত সপ্তার ভেজা মাটির আর আগামী সপ্তার বৃষ্টির উপর আজ তিনি নির্ভর করতে পারেন না, যদি না বাঁধ দিয়ে, সঞ্চয় পুকুর তৈরী করে এই দুইকে মিলিয়ে নেওয়া না হয়। তৃষ্ণার যে তাগিদ তা তাৎক্ষণিক। পানি কোন ঘটনা হতে পারে না। তাকে হতে হয় একটি উপস্থিতি। এই উপস্থিতিকে নিশ্চিত করা ছোট বড় যে কোন স্থিতিশীল সমাজের প্রাথমিক ভাবনা হওয়া উচিত।

দেশে আমি আরো বেশী ছুটির দিন দেখতে চাই। আর এমনি একটি দিন হওয়া উচিত জল-উৎসবের দিন। সেদিন দেশের বড় বড় বাঁধ, জল বিদ্যুৎ প্রকল্প, সেচ প্রকল্প এ সবে মানুষ তীর্থ যাত্রীর মত যাবে–দেখতে, বনভোজন করতে। ঐদিন প্রত্যেক শহরের স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনেরও একটি অনুষ্ঠান থাকা উচিত। শহরের মেয়র গর্বের সাথে কিছু তথ্য দিতে পারেন– যেমন এ শহরে কলেরা বা টাইফয়েডে শেষ কোন বছরে মৃত্যু ঘটেছিল। ঐ উৎসবের স্মারক হিসাবে প্রতি বছর নগরীতে নতুন কিছু উদ্বোধন করা যেতে পারে-কোন ফোয়ারা, কোন জলাধার অথবা নৌকার ঘাট!

আসলে কি বলতে চাইছি, বুঝলেন তো। পানি একটি সার্বজনীন প্রতীক কারণ এর প্রয়োজনটা সার্বজনীন। আজকের জীবনযাত্রায় এই বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের একার কিছু করার থাকে না, এ প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমেই মেটানো যায়–গড়ে তোলা যায় সঞ্চয় হ্রদ, সরবরাহব্যবস্থা, বাঁধ, জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বর্জ্য পানির রূপান্তর কেন্দ্র। আর নিঃসন্দেহে অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে সমুদ্রের পানির লবণ্যক্ত দূরীকরণ প্রকল্প আর মরুভূমিকেও তা করবে শস্য শ্যামলা।

কাজেই আমাদের জল-উৎসব হবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানুষ যে কীর্তির সৃষ্টি করতে পারে তাঁরই উদ্‌যাপন। এর চেয়ে যথাযথ কাজ আর কি হতে পারে? আমরা সবাই জানি ন্যায় পক্ষ ও অন্যায় পক্ষ উভয়েই বৃষ্টি হলে ভিজবে আর বৃষ্টি না হলে তৃষ্ণার্ত হবে। অতীতের উভয় পক্ষ একত্রে বসে বিরোধ মিটিয়ে পানির অধিকার ভাগাভাগি করার নজির বিরল। তা না করে তারা বরং বিরোধিতা জিইয়ে রেখে মরুভূমি সৃষ্টি করাটাই অধিকতর পছন্দ করেছে। তবে এখন বিশ্ব-জনসংখ্যা আর তার পানির প্রয়োজন বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের প্রকৌশল দক্ষতাও বাড়ছে। এ সময় ন্যায় পক্ষ আর অন্যায় পক্ষ একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই কি উভয়ের প্রিয় জীবন রক্ষার সহায়ক হবে না? পানির প্রবাহ শক্তি আর তার চিরন্তন পরিবর্তনশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করার এমনি সব প্রকল্প কি আমাদেরকে মানব প্রকৃতির প্রবাহ শক্তি আর চিরন্তন পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কেও কিছু শেখাবেনা?

সংক্ষিপ্তকৃত অনুবাদ:
মুহাম্মদ ইব্রাহীম

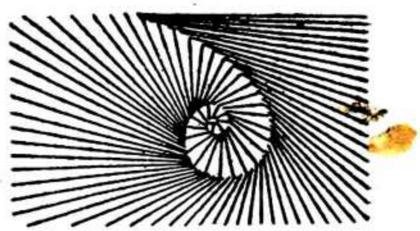

পরিমিত উত্তাপে পানি বিশুদ্ধকরণ : বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

[ফেব্রুয়ারি–১৯৮৬]

পানি বিশুদ্ধ করার জন্য তা ফুটিয়ে পান করার কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সাম্প্রতিক নানা তথ্য-উৎস থেকে দেখা যাচ্ছে যে সাধারণভাবে যে দূষিত পানি ব্যবহারের আশংকা থাকে তাতে বাহিত ক্ষতিকর জীবাণুগুলো ধ্বংস করতে পানিকে ফুটানোর প্রয়োজন হয় না। ফুটোবার ১০০° সেঃ এর পরিবর্তে একে মাত্র ৬০° থেকে ৬৫° সেঃ উত্তপ্ত করে সে অবস্থায় ১০ মিনিটের অধিক সময় রাখতে পারলেই এ ধরনের জীবাণুর সবই ধ্বংস হয়। এই তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে সহজতর উপায়ে পানি বিশুদ্ধীকরণের চিন্তা করেছেন দেশের বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি ইসরায়েল ও হল্যাণ্ডের একদল বিজ্ঞানী মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ন্ত্রিত সৌর উত্তাপন ব্যবস্থা ব্যবহার করেছেন সমবায় খামারের বাসিন্দাদের জন্য দৈনিক ৩০০ লিটার পানির ব্যবস্থা করতে। এ রকম একটা ব্যবস্থা করতে সেখানে ব্যয় পড়ে যাচ্ছে ১৫০০০ মার্কিন ডলারের মত। বাংলাদেশের গ্রামের গরীব গেরস্থের জন্য অত্যন্ত সরল ও সস্তা একটি ব্যবস্থা করে দিতে না পারলে তার পক্ষে এই পদ্ধতিতেও পানি বিশুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। তাই এর যথাযথ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র।

এই কাজের একটি দিক হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামে সচরাচর ব্যবহৃত পানীয় জলের উৎস থেকে পানি বাহিত যে সব রোগ-জীবাণু দেহে যেতে পারে তাদের ধ্বংস করতে নিম্নতম কোন উত্তাপে কতক্ষণ রাখা দরকার তা জেনে নেওয়া। ইতিমধ্যে গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলো থেকে এ সম্পর্কে আরো বিস্তৃত ভাবে জানার চেষ্টা চলছে। তাছাড়া এসব উৎসের পানি সরাসরি এবং পরিচিতি উত্তাপে শোষিত অবস্থায় পরীক্ষা করে পদ্ধতিটির কার্যকারিতা নির্ণয়েরও চেষ্টা চলছে। প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে পানিবাহিত প্রধান সবগুলো রোগের জন্য দায়ী যে সব জীবাণু–তারা ৬৫° সেঃ উত্তাপে ১০ মিনিটের মধ্যে অধিকাংশই ধ্বংস হয়, শুধু কয়েকটি মাত্রের জন্য ঐ উত্তাপে ১০ মিনিটের বেশী সময় রাখার প্রয়োজন হয়।

নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পর উল্লেখিত পরিমিত উত্তাপ পানিকে গরম করার জন্য যে কয়েকটি পদ্ধতিকে প্রাথমিক পর্যায়ে যথাযথ বলে মনে করা হচ্ছে তা' নিম্নরূপ।

সাধারণ রান্নার সাথে

এতে সাধারণ চুলাতে দৈনন্দিন রান্নার সাথে একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি শোধন করা সম্ভব, বিশেষ কোন অতিরিক্ত জ্বালানী খরচ ছাড়াই। উদাহরণ স্বরূপ সচরাচর ব্যবহৃত গোলতলী পাতিলে ভাত রান্নার সময় তাকে ঢাকনির পরিবর্তে চেপ্টা অধিক ব্যাসের বর্তুলাকার আর একটি পানি-পূর্ণ পাতিল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। চুলার অব্যবহৃত গরম হাওয়ার সেই আঁচ এবং চাল সেদ্ধ হবার সময়কার যে তাপ উপরের পানি-পূর্ণ পাতিলে লাগে তাতেই ঐ পানি প্রয়োজনীয় উত্তাপের অনেক উপরে গিয়ে পৌঁছে।

প্রাথমিক ফলাফলে। দেখা যাচ্ছে যে এক সের চালের ভাত রান্নার সাথে সাথে এ ভাবে চার সের পানি গরম করে নেওয়া যায়। ভাত রান্না হবার বেশ কিছুক্ষণ আগেই উপরের পানি ৬৫° সেঃ উত্তাপে পৌঁছে যায় এবং আরো মিনিট

পাঁচেকের মধ্যে তা ৮০° সেঃ উত্তাপে পৌছে। এরপর নামিয়ে রাখলেও অন্তত: আধ ঘন্টায় বেশী এর উত্তাপ ৬৫° সেঃ এর উপরে থাকে– যা জীবাণু নাশের জন্য যথেষ্ট।

দেখা গেছে যে এ ভাবে পানিপূর্ণ পাতিল না চড়িয়ে সাধারণ ভাবে এক সের ভাত রাধতে যে সময় লাগত এখানেও ঠিক তাই লাগে। অতিরিক্ত জ্বালানী খরচ হয় শতকরা মাত্র দশ ভাগেরও কম। অথচ রান্নার সাথে একই সঙ্গে না করে আলাদা ভাবে ৪ সের পানি উপরোক্ত উত্তাপে গরম করতে জ্বালানী লাগে এর পাঁচগুণ এবং পনরো মিনিটের মত আলাদা সময়েরও প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিতে ছোট একটি পরিবারের এক বেলার রান্নার সাথে সাথেই সামান্য অতিরিক্ত জ্বালানী খরচ করে ১০-১২ সের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে ফেলা সম্ভব।

সৌর-তাপের সাহায্যে

পানি শোধনের জন্য পরিমিত উত্তাপে তুলতে সৌরশক্তির দক্ষ ও সহজ ব্যবহার নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। এর ফলশ্রুতিতে যেই ব্যবস্থা সবচেয়ে যথাযথ হবে মনে হচ্ছে তা নিতান্তই সরল। কালো রঙের একটি চালুনি বা ট্রের আকারের পাত্রের উপর স্বচ্ছ পলিথিন বিছিয়ে তাতে দু'এক সেন্টিমিটার গভীর করে পানি রাখা হয়েছে। ঐ পানিকে একটি স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে এমন ভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যেন পলিথিন আগাগোড়া পানির পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে থাকে। বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে এই পলিথিনের সাথে সামান্য ফাঁক রেখে আরো একটি পলিথিন বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আর্থাৎ পানিটুকু এখানে পর পর দুটি পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে যাদের মধ্যে আধ ইঞ্চির মত বদ্ধ বাতাসের ব্যবধান রয়েছে। এ রকম অবস্থায় পুরো জিনিসটিকে রোদে মেলে ধরলে ভাল রোদে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে পানির উত্তাপ ৭৩° সেঃ পর্যন্ত উঠে যায়। গ্রীণ হাউস এফেক্ট এবং ডাবল পলিথিনের তাপ নিরোধী আবরণের ফলে এটা সম্ভব হয়। এ পরীক্ষা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসের। গরমের দিনে এই উত্তাপ আরো অধিক হবে বলে আশা করা যায়। এক বর্গমিটার আয়তনের ব্যবস্থায় দুই সেন্টিমিটার পুরু করে পানি এ ভাবে উত্তপ্ত করলে এক এক বারে ২০ লিটার (প্রায় ২০ সের) পরিশোধিত পানি অনায়াসে পাওয়া যাবে। আর ব্যবস্থাটির ব্যয় প্রধানতঃ ঐ পলিথিনটুকুর দামের মধ্যেই।

পানি সত্যি সত্যি পরিমিত উত্তাপে উঠেছে কিনা তা জানার সহজ উপায় উদ্ভাবনের জন্যও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছে– কারণ ব্যয় ও জটিলতার কারণে সাধারণ গ্রামবাসীর পক্ষে থার্মোমিটার ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এই কাজে প্রাথমিক পর্যায়ে যে ব্যবস্থাকে সবচেয়ে যথাযথ মনে হচ্ছে তাহলো একটা প্লাষ্টিকের ছোট্ট পাত্রের উপর কিছু গুঁড়ো মোম রেখে ওটা উপরের দুই পলিথিনের মাঝখানে রেখে দেওয়া। দেখা গেছে যে পানির উত্তাপ যখন ৫৮° সেঃ থেকে ৬২° সেঃ এর মধ্যে থাকে তখন মোমটুকু গলে যায় এবং তা উপর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। আসলে সাথে সাথে তা পর্যবেক্ষণেরও কোন প্রয়োজন নেই। কারণ পরে মোম ঠাণ্ডা হয়ে আবার জমে গেলেও তখন তাকে আর গুঁড়ো অবস্থায় দেখা যাবে না, দেখা যাবে লেপটানো অবস্থায়। এভাবে দেখা গেলেই বুঝতে হবে যে ইতিমধ্যে একবার পানিটা ৬০-৬২° সেঃ এর উপরের উত্তাপে উঠেছিল। তাছাড়া উচ্চতম উত্তাপে ওঠার পর ছায়া দিয়ে রাখলেও উত্তাপ বেশ খানিক্ষণ পরিমিত মাত্রায় নীচে নামে না। উদাহরণ স্বরূপ এ রকম ছায়াতে ৭৩° থেকে ৬১° সেঃ এ নেমে আসতে ৪০ মিনিট সময় লাগে। কাজেই মোম লেপটানো অবস্থায় পেলেই বুঝতে হবে পানির পরিশোধন সম্পন্ন হয়েছে এবং তা ব্যবহার করা যায়।

সৌর তাপের এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে খুব অল্প ব্যয়, জ্বালানী বা কোন রকম ঔষুধ ব্যবহার না করেই পানি নিয়মিত পরিশোধন করা যেতে পারে। সব দিক থেকেই পরীক্ষা নিরীক্ষা এখনো চলছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রগতি হলে এর ফলাফল সবিস্তারে প্রকাশ করা হবে। তখন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র সাধারণ্যের মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

উল্লেখযোগ্য যে ফুটাতে না হবার ফলে এ ভাবে পরিশোধিত পানির গ্রহণযোগ্যতা অধিকতর হতে পারে, কারণ একে ঠাণ্ডা করতে সময় কম লাগবে, তাছাড়া সেদ্ধ করা পানির মত বিস্বাদও এটা হবে না। কোন ওষুধ প্রয়োগ করতে না হওয়ায় শব্দ ইত্যাদি জনিত অগ্রহণযোগ্যতা এর থাকবে না।

সম্পাদকীয়

প্রাচীন সেই আগন্তুক : হ্যালীর ধূমকেতু

[মার্চ - ১৯৮৬]

এক একটা সময়ে এক একটি নতুন ঘটনা মানুষকে এক ধরনের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে পারে। হ্যালীর ধূমকেতুর আগমন এমনি একটি ঘটনা। এটি আলোড়ন সৃষ্টি করার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। একে তো ধূমকেতু আকাশে নিত্য দেখা যাবার জিনিস নয়। নিকট অতীতে কয়েকবার মাত্র আমাদের আকাশে এই ধরনের জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হয়েছে– ইকিয়া সেকি, কোহোতুক তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ধূমকেতুর মধ্যে আবার হ্যালীর ধূমকেতুটি বেশ কুলীন ধরনের। সেই দু' হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ একে দেখছে ৭৬-৭৯ বছরের নিয়মিত আবর্তনে। নিয়মটি অবশ্য বোঝা গেছে বহু কাল পরে এডমণ্ড হ্যালীর কল্যাণে। তাইতো এতো প্রাচীন পরিচিতি সত্ত্বেও এটি হ্যালীর ধূমকেতু।

হ্যালীর আবর্তন কালটিও মানুষকে কৌতূহলী করে তোলার জন্য খুব উপযুক্ত। এই কাল এত দীর্ঘ নয় যে সমস্ত পূর্বস্মৃতি লোপ পাবে, আবার এত হ্রস্বও নয় যে এবার না দেখলে পরের বার দেখবো বলে ভুলে থাকা যাবে। মোটামুটি অধিকাংশের পক্ষেই সুযোগটি একবারই আসবে– অতএব। ধূমকেতু দেখতে যদি শুধু সাধারণ একটি তারার মত হতো তা হলেও হয়ত এটা এতো কুতুহলের উদ্রেক করতো না। কিন্তু এর গঠন ভঙ্গীটি বেশ চমকপ্রদ বলেই মানুষ জানে। ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে একে যে 'কমেট' বলা হয় তার উৎপত্তি গ্রীক থেকে অর্থ 'চুল ওয়ালা তারা'। চীন দেশেই হ্যালীর ধূমকেতুকে প্রথম দেখা গিয়েছিল। চীনা ভাষায় ধূমকেতুকে বলা হয় 'হুই হসীং' অর্থাৎ ঝাড়ু তারা। তার এই চেহারা আবার সময়ের সাথে বদলায়– বিশেষ করে সেই অদ্ভুত লেজটি আকার আকৃতি দিক ইত্যাদি। এ সব নানা কিছু মিলে মহাকাশের এই বিরল আগন্তকটি আমাদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে বৈকি। আমরা অনেকে তাই এখন আকাশের দিকে তাকাচ্ছি– ভোর চারটায় উঠে খুঁজতে হলে তাও সই, শহরের বাইরে বাড়ডায় যেতে হলে তাও সই।' ধূমকেতু আমাদেরকে আকাশ-মনস্ক করছে সাথে সাথে খানিকটা বিজ্ঞানমনস্কও করেছে বটে। এবার হ্যালীর ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা বেশ সৌভাগ্যবান, কারণ তাঁরা এটার পর্যবেক্ষণ এই প্রথম বার করতে পারছেন মহাকাশযান থেকে একেবারে কাছে গিয়ে। আমরা সাধারণ মানুষরা কিন্তু এবার একটু কম ভাগ্যবান। পৃথিবী থেকে বেশী দূরে থেকে যাচ্ছে বলে হ্যালী অন্যান্য বারের মত এত চমকপ্রদ হচ্ছে না এবার। বিষুব রেখা আর দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে ভাল দেখা গেলেও অন্যত্র দেখতে কষ্ট হচ্ছে। হোক কষ্ট; তাও সই। চলুন খুঁজে দেখি হ্যালীর ধূমকেতুকে আজ কখন কোন দিকে দেখা যায়।

সম্পাদকীয়

[সেপ্টেম্বর-১৯৮৬]

নারী ও বিজ্ঞান

আগামী জানুয়ারী মাসে কমনওয়েলথ সেক্রেটারীয়েটের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একটি কর্মশালা। এর বিষয়বস্তু হলো উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণে নারীর ভূমিকা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীর স্থানের বিষয়টি আজকাল বেশ আলোচিত হচ্ছে, শুধু উন্নয়নশীল বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, উন্নত বিশ্বেরও। আধুনিক ইতিহাসে নারীকে ক্রমাগত সংগ্রাম করে অধিকার অর্জন করতে হয়েছে; কোন অধিকার সে এমনিতে পায়নি। আজ মনে হচ্ছে তার সংগ্রামের ক্ষেত্রটি হলো প্রযুক্তির উপর অধিকার, যেটি প্রকারান্তে আমাদের দেশের মত অবস্থায় নারীর অর্থনৈতিক স্বাধিকারের সংগ্রামের সাথে একাকার। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে নিছক শ্রম যেখানে জড়িত, বিশেষ করে স্বীকৃতিহীন অবমূল্যায়িত কায়িক শ্রম, সেখানে দরিদ্র মহিলাদের অবদান অনেকখানি। এটি গ্রামীণ কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তো বটেই, এখন শহরেও কম নয়। কিন্তু যেখানে প্রযুক্তির উপর অধিকারের প্রশ্ন উঠে, বিজ্ঞান-জ্ঞানের প্রশ্ন উঠে, সেখানে কিন্তু নারী অনেক পেছনে। অনেক কথাই বলা হয়ে থাকে এর সাফাই হিসাবে। নারী গাণিতিক চিন্তায় পারঙ্গম নয়, তার পারিবারিক দায়িত্ব এবং শারীরিক ক্ষমতা কোনটিই প্রযুক্তির কর্ণধার হতে তাকে সহায়তা দেয়না ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হলো প্রাণান্ত খেটে প্রযুক্তির শিকার হবার সময় এসব কথা কখনো বলা হয় না।

তাই কর্মশালার বিষয়বস্তুটিকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখি; বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণের প্রশ্নটি আনা হয়েছে বলে। কয়েক জন মহিলা অধ্যাপিকা বা বিজ্ঞানী থাকলেই যে সমস্যাটির কোন সমাধান হয়ে গেলো তা আমরা মনে করিনা। বিষয়টিকে মহিলা সর্ব-সাধারণের পর্যায়ে বিবেচনা করতে হবে। ধানের কল এসে যখন গ্রামের মেয়েটির ন্যূনতম আয়ের পথটি বন্ধ করে দেয় তখন সে সমস্যার সমাধানের জন্য ধানের কলকে সরাবার চেষ্টা করা যাবে না, সেটা অর্থহীন। বরং চেষ্টা করতে হবে কলের প্রযুক্তিটাই যেন ঐ মেয়েটিরও করায়ত্ত হতে পারে, সংগঠনের মাধ্যমে কলটির মালিকানাও যেন তাদের হাতে যেতে পারে। সেটি সম্প্রসারণের কাজ, শিক্ষার কাজ, চেতনা সৃষ্টির কাজ। সেই লক্ষ্যে আজ কাজ করতে হবে, সেটি নারী-মু র একটি বড় সংগ্রাম ক্ষেত্র। আজ প্রমাণের সময় এসেছে যে প্রযুক্তির কাছে অসহায় দর্শকের ভূমিকায় নয়, বরং সব পর্যায়ে প্রযুক্তির কর্ণধার হবার ব্যাপারেও নারী পুরুষের সমান অধিকার।

চাঁদের কাছে দুর্ঘটনা : এ্যাপলো-১৩ কাহিনী [সেপ্টেম্বর-১৯৮৬]

জেবা জয়নাব

এর আগে দুইবার মানুষ চাঁদের মাটিতে হেঁটে এসেছে: চাঁদে যাওয়ার বিস্ময় খানিকটা কেটেও গিয়েছে। তৃতীয় বারের মত চাঁদে নামার উদ্দেশ্য নিয়ে এ্যাপলো ১৩ এর তিন জন মহাশূন্যচারী যে দিন রওয়ানা হয়েছিলেন ইতিমধ্যে পরিচিত দৃশ্যটি সেদিন টেলিভিশনের সাধারণ দর্শকদের বেশী আর অবাক করেনি। দুদিন ধরে তারা দেখেছে এ্যাপলো যানের ভেতর তাদের কাজ কর্ম, শুনছে তাদের হাস্যোজ্জ্বল কথাবার্তা। অবশ্য যাত্রার শুরুতে যে কিছু বিঘ্ন না ঘটেছিল তা নয়, বেশ বিরক্তিকর বিঘ্নই ছিল সেগুলো।

প্রথমে দেখা গেল রকেট মোটরগুলোর জ্বালানী ঠিকভাবে সরছে না। সেটা ঠিক হতে হতে ডাক্তাররা আবার বলে বসলেন নির্বাচিত মহাশূন্যচারীদের এক জনের হামের ভাব দেখা যাচ্ছে, তিনি যেতে পারবেন না। তাঁর বদলে অন্য কাউকে যেতে হবে। এটা বোঝা গেল এপ্রিলের ৯ তারিখ, যাত্রা শুরুর ঠিক দুদিন আগে। ১১ই এপ্রিল যাত্রা করতেই হবে, কারণ ঐ দিন চাঁদ আর পৃথিবীর অবস্থান সঠিক থাকবে। এ দিন যাওয়া না গেলে আরো বহু মাস এ্যাপলো-১৩ কে অপেক্ষা করতে হবে তেমন একটি অবস্থার জন্য। তড়িঘড়ি করে অন্য এক জনকে নিয়ে এ্যাপলো-১৩ তাই ১১ই এপ্রিলই রওয়ানা হলো।

১৩ই এপ্রিল সোমবার। এ্যাপলো-১৩ এর যাত্রীরা টেলিভিশনে তাঁদের অগ্রযাত্রার কথা বলছিলেন। "আমাদের মোটেই কোন সমস্যা হয়নি" কিন্তু এরপর পাঁচটি মিনিট কাটতে পারেনি— সমস্যা ঘটলো, এমন সমস্যা যে মানুষের চন্দ্র যাত্রার ইতিহাসে এমনটি আর ঘটেনি। তিন জন মহাশূন্যচারী অনুভব করলেন বেশ সজোরে একটি ধাক্কা, একটি সাবধানকারী আলোও জ্বলে উঠলো। তাঁরা বুঝলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, সেটি হিউষ্টনে এ্যাপলোর গ্রাউন্ড ষ্টেশনের বিজ্ঞানীদের জানিয়েও দিলেন। কিন্তু মহাশূন্যে বা গ্রাউন্ড ষ্টেশনে তাঁদের কেউই তক্ষুণি বুঝতে পারেন নি ব্যাপারটি কত গুরুতর। মহাশূন্যযানের পেছনে ঘটে গেছে একটি বিস্ফোরণ, যা অক্সিজেনের দুটি ট্যাংকের মধ্যে একটিকে ভেঙ্গে ফেলেছে।

মহাশূন্যযানের ভেতরে বিপদের প্রথম আভাস দেখা গেল বিদ্যুৎ সরবরাহ কমে যাওয়ার মাধ্যমে। তিনটি ফুয়েল সেলের দ্বারা তৈরি হচ্ছিল এ্যাপলো-১৩ এর প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ। বিস্ফোরণের পর চালু রইলো এদের মধ্যে শুধু একটি। সবেধন একটি ফুয়েল সেল যেটুকু বিদ্যুৎ দিচ্ছিল তিনজন মানুষের জীবন তখন পুরাপুরি তার উপর নির্ভরশীল: এ্যাপলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়া পৃথিবীতে হবার মত নয়; ওটা তার জীবন। বিদ্যুৎ বন্ধ হবার মানে কম্পিউটার অচল হওয়া, যেই কম্পিউটার মহাশূন্যযানকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তা ছাড়া বিদ্যুতের অভাব হলে জানা যাবে না ওটা কখন কোথায় আছে, পৃথিবীর সাথে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর নিঃশ্বাস নেবার মত বাতাসও পাওয়া যাবে না ওখানে।

৪৫টি মূল্যবান মিনিট কেটে গেল গ্রাউন্ড ষ্টেশন থেকে সবকিছু হিসেব নিকেশ করে অবস্থাটা বুঝে উঠতে। তারপরেই তাঁরা বুঝলেন এখন কর্তব্য একটিই: সবকিছু বাদ দিয়ে যত শিগ্‌গির সম্ভব তিন জন মহাশূন্যচারীকে জীবন্ত পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। ইতিমধ্যে এ্যাপলো-১৩ চলে গেছে পৃথিবী থেকে ৩২০,০০০ কিলোমিটার দূরে

আর চাঁদ থেকে তখন এটা মাত্র ৬০,০০০ কিলোমিটার দূরে। অতদূর থেকে সরাসরি ঘুরে গিয়ে পৃথিবীর দিকে সজোরে যাত্রা করার উপায় নেই, কারণ প্রধান রকেটগুলোর সমস্ত শক্তি প্রয়োগেও এর জন্য প্রয়োজনীয় জোর পাওয়া যাবে না। একমাত্র চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে এসে প্রদক্ষিণ পথে তার স্বাভাবিক গতির ব্যবহার করেই পৃথিবী অভিমুখে সরে আসা যায়। কিন্তু সেটি করতে লেগে যাবে আরো চারটি দিন। অতদিন এ্যাপলো ১৩ এর ভেতর জীবন রক্ষাকারী বাতাস, পানি আর বিদ্যুৎ অবশিষ্ট থাকবে কি? মূল মহাশূন্যযানে তা থাকার সম্ভাবনা নেই, তবে উপায় একটি আছে।

সাগরে জাহাজডুবি হলে যাত্রীরা যে রকম জীবন তরীর উপর ভরসা করে, এ্যাপলো-১৩ এর মধ্যেও এমন কিছু ছিল যাকে জীবন তরীর মতো ব্যবহার করে বিপদ সংকুল মহাশূন্য পাড়ি দেবার আশা করা গেল। সেই জীবন তরী হলো এ্যাপলোর চন্দ্র-যানটি। স্বাভাবিক অবস্থায় এর কাজ হতো দু'জন যাত্রী নিয়ে চাঁদে অবতরণ করা, আর অংশত আবার মূল যানে ফিরে যাওয়া তাঁদের নিয়ে। কিন্তু এখন সে প্রশ্ন উঠেনা। ঐ চন্দ্র যানটা দু'জনের উপযুক্ত করে তৈরি, তিনজনের জন্য ছোট। আর ওটা এত শক্ত-সমর্থও নয় যে পৃথিবী পর্যন্ত পুরো পথ তাতে পাড়ি দেওয়া যাবে। তবে তার ভেতর আছে স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ, বাতাস আর পানির ব্যবস্থা; তাতে তিন জনের কয়েক দিন চলে যেতে পারে কোন মতে। এইই এখন একমাত্র আশা।

মূলযান আর চন্দ্রযানের মাঝখানের সুড়ঙ্গ পথে হামাগুড়ি দিয়ে মহাশূন্যচারী তিনজন এসে গেলেন তাঁদের জীবন তরী-চন্দ্রযানে। শুরু হলো উদ্ধারপর্ব। গ্রাউন্ড ষ্টেশনের সাথে এক যোগে তাঁদেরকে এখন তিনটি সমস্যার সমাধান করতে হবে:

(এক) এ্যাপলো যানের গতি ও দিক নিঁখুতভাবে ঠিক রাখা।

(দুই) বিদ্যুৎ যথাসম্ভব সংরক্ষণ করা যাতে করে যাত্রার একেবারে শেষে যখন অনেক বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে তখন সেটি ঠিকমত পাওয়া যায়।

(তিন) বেঁচে থাকার মত বাতাস আর পানি শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা।

ফিরে আসাতে কক্ষপথ থেকে বেরুবার জন্য রকেটটি চালু করতে হবে। একেবারে সঠিক মুহূর্তে। একটু আগে পরে হলেই অথবা তার জোর কম বেশী হলেই পৃথিবীর দিকে না এসে এ্যাপলো ১৩ চিরতরে হারিয়ে যাবে মহাশূন্যের অসীম গভীরতায়। মঙ্গলবার বিকেলের সেই মুহূর্তটির সিদ্ধান্ত হতে হবে একেবারেই নিঁখুত। ঐ দিন সারাদিন ধরে এ্যাপলো চাঁদের দিকে এগিয়েছে ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে। শেষ বিকেলে গিয়ে এই গতি দাঁড়িয়েছে ঘন্টায় ১০,০০০ কিলোমিটার। চাঁদের পেছনে যাওয়ার পর পৃথিবীকেও আর দেখতে পাচ্ছিলেন না যাত্রীরা। তাঁরা অতিক্রম করছিলেন চাঁদের পিঠের মাত্র ২০০ কিলোমিটার উপর দিয়ে— পরিষ্কার সব কিছু দেখা যাচ্ছে পিঠের— সেই চাঁদে তাঁদের নামা আর হয়ে উঠলো না। চাঁদের পেছনে থেকে বেরিয়ে পৃথিবী দেখতে পাওয়ার পরই তাঁরা বুঝলেন যে এবার তাঁদের অভিমুখ বাড়ীর দিকে। কিন্তু তার আগে সেই সঠিক মুহূর্তে রকেট চালু করা। গ্রাউন্ড ষ্টেশনের হিসেব মত সেটি ঠিকভাবেই সম্পন্ন হলো।

অবশেষে জিরোবার খানিকটা সময় পাওয়া গেল। সামনে ৪০,০০০ কিলোমিটারের মত দীর্ঘপথ; তারপর সব কিছু ঠিকমত চললে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে ডুব দেওয়া। তিনজন মহাশূন্যচারীর জন্য সেটিই লক্ষ্য, সেটিই ঘরে ফেরা, সেটিই জীবন। দুই দিন ধরে চললো মোটামুটি ঘটনাবিহীন যাত্রা। অবশ্য এর মধ্যে আরো দু'বার রকেটকে চালু করতে হয়েছে, যাত্রাপথের কিছু সংশোধনের জন্য। এটি করতে গিয়ে প্রত্যেকবার মহাশূন্যচারীদের কয়েক ঘন্টা করে পরিশ্রম করতে হলো। স্বাভাবিক অবস্থায় এসব কাজ কম্পিউটারের করার কথা— রকেটকে ঠিক সময়, ঠিক পরিমাণে চালু করা। কিন্তু এ্যাপলোর কম্পিউটার ব্যবহার করার উপায় নেই, যথেষ্ট বিদ্যুতের অভাবে, অন্যান্য অনেক জরুরী যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

আসলে বিদ্যুতের অভাবটিও তাঁদের তিন জনের জন্য দারুণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তাঁদের কক্ষটি হিম শীতল হয়ে রয়েছিল গরম করতে না পারার জন্য— উত্তাপ মাত্র ৪° সেলসিয়াস। শীতে তাঁরা কুঁকড়ে রয়েছিলেন। এই শীত তাঁদেরকে দিনের পর দিন চোখের দু'পাতাকে এক করতে দিচ্ছিল না। ঘুমোতে পারছিলেন না বলে তাঁরা আরো ক্লান্ত হয়ে আরো শীত অনুভব করছিলেন। গ্রাউন্ড ষ্টেশনে ডাক্তার অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন— এরকম অবস্থায় তাঁরা কাজে কর্মে মারাত্মক ভুল করতে পারেন। তাছাড়া ডাক্তাররা তাঁদের কম পানি পান করার ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন। একটি ট্যাংকে পানি বরফ হয়ে আছে। গ্রাউন্ড ষ্টেশন থেকে বলা হলো স্পেস স্যুটের এক কোণায় কেটে এর শীতলকারী ব্যবস্থা থেকে পানি নিয়ে পান করতে। কিন্তু তাঁরা এটা করতে চাচ্ছিলেন না।

অবশেষে উদ্ধার পর্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায় এসে উপস্থিত হলো। যদিও পৃথিবী এখনো ১৬০,০০০ কিলোমিটার দূরে, এ্যাপলোর গতি ঘন্টায় ৬,৪০০ কিলোমিটার আর প্রতি মুহূর্তে তা বেড়ে চলেছে। আর মাত্র ১৭ ঘন্টা।

গ্রাউন্ড ষ্টেশন থেকে করণীয় কর্তব্যগুলোর একটি তালিকা এ্যাপলোতে পাঠানো হতে লাগলো। তিন ঘন্টা লাগলো পুরো তালিকা পৃথিবী থেকে পড়তে আর মহাশূন্যচারীদের টুকে নিতে। শেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ত সময়টির আগে যেন ধীর স্থির থাকা যায় সেজন্য ঘুমোনোটা জরুরী, কিন্তু দু'তিন ঘন্টা চেষ্টা করেও ঘুম কারো হলো না। পৃথিবী থেকে ১০০,০০০ কিলোমিটার দূরে থাকতে তাঁরা জীবনতরী চন্দ্রযানটি ছেড়ে মূল যানে ফিরে আসলেন। এই ক'দিন জীবনতরী তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সেটি এবার ফেলে দিতে হবে মহাশূন্যে—ফিরে আসবে শুধু মূল যানটি, বায়ু মণ্ডলে ঢোকার সময়কার তাপকে রুখবার শীল্ড যার সাথে আছে।

মূল যানের কম্পিউটার চালু করা সম্ভব হলো। তালিকামত তিন জন কাজে লেগে গেলেন। প্রথমে প্রধান রকেটটি আলাদা করে ছুড়ে ফেলতে হবে। ঘুরতে ঘুরতে এটা বিচ্ছিন্ন হবার সময় প্রথম বারের মত তাঁরা তিনজন দেখলেন বিস্ফোরণের ফলে কিভাবে এটা কেটে গিয়েছিল— ধাতু তার সব দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। এসব তাঁরা গ্রাউন্ড ষ্টেশনে জানালেন। বিস্ফোরণের প্রচন্ডতা দেখে এবার ভাবনা হলো তাপশীল্ড নিয়ে, যেটা বায়ু মন্ডলে ঢোকার সময়কার প্রচণ্ড তাপকে ঠেকাবে। ওটা ঠিক আছে তো? জানার কোন উপায় নেই, ঝুঁকি নিতেই হবে। চন্দ্রযানকেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে দেওয়া হলো।

রাতের বেলা বলে পৃথিবীকে খুব একটা দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠের ১২ কিলোমিটার উপরে থাকতে হালকা বায়ুমন্ডলে মূল মহাশূন্যযানের প্রবেশ ঘটলো। উত্তপ্ত তাপ শীল্ডটি প্রথমে গোলাপী, তারপর বেগুনী রং নিয়ে জ্বলতে আরম্ভ করলো, তারপর টকটকে লাল আর আগুনের শিখা। আগুনের জন্য মহাশূন্যচারী তিনজন চারিদিকে কিছুই দেখতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁরা এর থেকে আত্মরক্ষা করতে পারছিলেন তো?

তিনটি মিনিট। ঠিক এই সময়টুকু পৃথিবীর সাথে বেতার যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। এই তিন মিনিট পৃথিবীতে সবাই অপেক্ষা করছিলেন অসম্ভব উদ্বেগ ও উত্তেজনা নিয়ে। শুধু হিউষ্টনে গ্রাউন্ড ষ্টেশনে বিজ্ঞানী কর্মীরাই নয়— পৃথিবীর কোটি কোটি টেলিভিশন দর্শক— রেডিওর শ্রোতা। তিন মিনিট এক সময় কেটে গেল; কেটে গেল আরো একটি অতিরিক্ত মিনিট, আরো তিরিশটি সেকেন্ড— কোন সাড়া নেই। উদ্বেগ শেষ সীমায় পৌঁছল। তক্ষুণি ভেসে আসলো তাঁদের কণ্ঠ। তাঁরা বেঁচে আছেন। তাপ-শীল্ড কাজ করেছে। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ যেন এক সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। খুলে গেল প্যারাসুট প্রথমে ছোট কয়েকটা, তারপর বড়গুলো। শুক্রবার, ১৭ই এপ্রিল দুর্ভাগা এ্যাপলো-১৩ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে, পৃথিবীর জলরাশির স্নিগ্ধ পরশে ছলাৎ শব্দে ফিরে এলো।

এ্যাপলো-১৩ দুর্ভাগ্য কবলিত হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবী থেকে এত দূরে চাঁদের কাছাকাছি জায়গায় ঘটা একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার পরেও সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বুদ্ধি খাটিয়ে যাত্রীদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে পারা— এটাই মানুষের গৌরব। মহাশূন্যচারী তিন জনের ধৈর্য্য ও সাহস এবং পৃথিবীতে থাকা বিজ্ঞানীদের দক্ষতা সেদিন অসম্ভবকে সম্ভব করছিল; দুর্ঘটনা তাই পরিণত হয়েছিল নূতন আস্থায়।

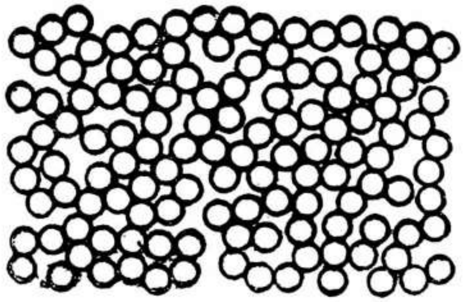

অসুখের খাদ্য নিয়ে লোকবিশ্বাস

[সেপ্টেম্বর-১৯৮৬]

নিত্যগোপাল বসু

অসুখ হলে রোগী কি খাবে তা নিয়ে বাড়ীর লোকদের চিন্তার অন্ত নেই। তবুও, ছোটোবেলায় যখনই জ্বর হয়েছে মা দিদিমা মুখের সামনে ধরে দিয়েছেন সাগু বার্লি কিংবা ডাবের জল। ভাত দেওয়া বন্ধ হয়েছে। ভাত খেলে নাকি জ্বর বাড়ে। বাড়ীতে গরু ছিলো। অন্য সবাই দুধ পেলেও জ্বর হলে দুধ দেওয়ার রীতি ছিলো না। জ্বর হলে দুধ নাকি খাওয়া উচিত নয় অথচ জ্বর হলে শরীরে যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয় তার জন্য দরকার জ্বালানীর। জ্বরে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না তাই প্রয়োজনের তুলনায় খাবার দাবার কম খাওয়া হয়। তারও পর এইসব বাছবিচারের বোঝা চাপিয়ে শরীরের খাদ্যের ঘাটতির সুযোগ করে দেওয়া হয়। ফলে শরীরের সঞ্চিত খাদ্যের ব্যয় হয় জ্বরের তাপ উৎপাদনে। তাই জ্বরে কিছু খেতে না দিলে শরীর সহজে দুর্বল হয়ে পড়ে— আর তা হয় উপবাসের দরুন। দেখা গেছে জ্বরে যাদের ওষুধের সাথে সাথে খাদ্যের যোগান ঠিক থাকে তারা দ্রুত সেরে ওঠে— শরীরও তেমন একটা রোগা হয় না। তবে যদি জ্বরের সাথে রোগীর পেটব্যথা পেটফাঁপা গা বমিবমি করা প্রভৃতি অস্বস্তি যুক্ত হয়ে থাকে— তবে খাবার সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। সহজপাচ্য খাবার দাবার এসময় ভালো।

পেটের অসুখেও বন্ধ করে দেওয়া হয় দৈনন্দিনের বরাদ্দ খাবার। শিশুদের বেলায় দুধ বন্ধ করে দেওয়া হয় এটা কিন্তু ঠিক নয়। শুধু সাগু বার্লিতে শিশুদের যা প্রয়োজন তার যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। আবার পেটের অসুখে শরীর থেকে জল ও লবণ বেরিয়ে যায় বলে তার অভাব একমাত্র বাইরে থেকে যোগান দিয়ে মেটানো সম্ভব। খাবার দাবার বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে, জলের অভাবে—খাদ্যের অভাবে অধিকাংশ শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে। পাতলা পায়খানা হলে নুন লেবু চিনির সরবত আর প্রয়োজনীয় সহজপাচ্য খাবার দেওয়া সঙ্গত হবে।

হাম হলে শিশুদের বুকের দুধ, মাছ মাংস বন্ধ করে দেওয়া হয়। অথচ শিশুদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট প্রোটিনের। হাম হলে এই দশ পনেরো দিনের সাধারণ বার্লি সাগুতে প্রোটিনের সাথে অভাব ঘটে ক্যালোরির। এতে শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সে আরো দুর্বল, রুগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে হাম হলে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ না করাই ভালো।

কুচোকৃমি হলে অনেকে মিষ্টি খাওয়াকে দায়ী করেন এটা বোধ হয় বেশী মিষ্টি খাওয়া যাতে না হয় সে ব্যাপারে একটা চাতুরী। মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করলে কুচোকৃমি সারে কি? মিষ্টি খাওয়ার সাথে কৃমি হওয়ারও কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনি, তেতো খেলে কৃমি মরে না।

ঠাণ্ডা লাগালে, দৈ কলা খাওয়া নিষেধ এমন ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। দই তৈরি হয় দুধ থেকে আর তা হয় এক বিশেষ ধরনের উপকারী জীবাণু ল্যাকটোব্যাসিলাসের উপস্থিতিতে। এতে দুধের সাধারণ ল্যাকটোজের পরিবর্তন হয় বলে যাদের দুধ সহ্য হয় না তাদের বেলায়ও দই হজম করতে অসুবিধা হয় না। এদের পক্ষে দই সহজপাচ্য বলে গণ্য হয়। আবার কলায় আছে পেকটিন। পেকটিন পেটের পক্ষে ভালো। ফলে ঠাণ্ডা লাগলেও দই এবং

কলা খাওয়াতে কোন দোষ দেখি না। তবে ফ্রিজ থেকে হিমশীতল দই বের করে সাথে সাথে না খাওয়া ভালো। যাদের সামান্য ঠান্ডাতেই ঠান্ডা লেগে যায় এদের পক্ষে ঐ হিমশীতল দই খাওয়া ঠিক নয়। তাতে সত্যি সত্যি ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

অসুখে রোগী অনেক সময় রক্তাল্পতায় ভোগে, যাকে ডাক্তারী ভাষায় বলে এ্যানেমিয়া। অনেকে ওষুধের সাথে সাথে পথ্যের আয়রন বা লোহার দিকে তখন নজর দিতে চান। লোহার উৎস হিসাবে খুঁজে খুঁজে কুলপো শাক, ডুমুর, থোড় বা কাচকলার আয়োজন বাড়ে। মনে রাখতে হবে, যে কোনো শাকে কমবেশী লোহার যোগান পাওয়া সম্ভব। লোহার কড়াইতে রাঁধলেও বেশ কিছুটা আয়রন আমাদের শরীরের কাজে আসে। তাই রান্নার জন্য এ্যালুমিনিয়াম বা অন্য ধাতু ও ধাতুসংকরের চেয়ে লোহার কড়াই ভালো।

অম্বলের অসুখে কোল্ডড্রিংকস খেলে রোগী নাকি ভালো থাকে। এটা কিন্তু ভুল ধারণা। কোল্ডড্রিংকস তৈরি হয় বেশ ভালো পরিমাণের ফসফোরিক এ্যাসিড বা সাইট্রিক এ্যাসিড দিয়ে। এইসব এ্যাসিড পাকস্থলীর অম্লতা বাড়িয়ে তুলে পাকস্থলীর আরো ক্ষতি সাধন করে। এইসব ঠান্ডা পানীয়ে ব্যবহৃত কেফিন পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের নিঃসরণ বাড়িয়ে তোলে। এতে পেটের ঘা সহজে সারতে চায় না। আবার কোল্ডড্রিংকসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাকস্থলীর ঘাকে ফুটো করে দিতে পারে। তাই অম্বলের অসুখে কোল্ডড্রিংকস একেবারেই নয়।

অসুখে কিংবা অসুখ থেকে উঠে তাড়াতাড়ি রোগীর শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য শিং মাগুরের ঝোল খেতে দেওয়া হয়। শিং মাগুর নাকি রক্ত বৃদ্ধি করে। সাধারণ যে কোনো মাছের তুলনায় শিং মাগুরের অতিরিক্ত গুণাগুণ আবিষ্কৃত হয় নি। তবে এইসব মাছ জিইয়ে রাখা চলে বলে— সবসময় টাটকা মাছের যোগান পাওয়া সম্ভব। বাজার থেকে যদি টাটকা মাছ মেলে তো— সে যে কোনো মাছ হোক না কেন— বেশী পয়সা দিয়ে শিং-মাগুর কেনার যুক্তি নেই।

শান্তিনিকেতনে জীবনাশ্রয়ী শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

..আমাদের ডাক্তারের সাহায্যে শরীর বিদ্যা ও যন্ত্রাধ্যক্ষের সাহায্যে যন্ত্র বিদ্যার চর্চাও হইবে। এখানে সর্বদাই ঘর তৈরি ও ঘর মেরামত চলিতেছে। এই কাজে যথোচিত পরিমাণে যোগ দিবার জন্য ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করা আবশ্যক। ছুতারের কাজ, তাঁতের কাজ ও বাগানের কাজের ব্যবস্থা এখানে আছে। এই সকল কাজে ছাত্ররা যাহাতে নিয়মিত শিক্ষা পায় তাহা দেখা চাই। সাবান, কালি, কাগজ প্রভৃতি ব্যবহার্য বস্তু প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সপ্তাহে সপ্তাহে এ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞ রাসায়নিককে কলিকাতা হইতে আনাইয়া লওয়া অসম্ভব হইবে না।

বাঁ-হাতি

[নভেম্বর-ডিসেম্বর- '৮৭]

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

আমার ছোট্ট ছেলে উজল বেশ বড় হয়ে উঠেছে, তার বয়স এখন সাড়ে পাঁচ। ওর সব কিছুই আমাদের অন্যান্যদের মতো, শুধু একটি বিষয় ছাড়া। সে বাঁহাতি। সে যখন খুব ছোট তখন থেকেই আমরা জানতাম সে বাঁহাতি। কারণ বাঁহাতে সে জিনিসপত্র তুলতো, বাঁ পায়ে বলে লাথি মারত, কাগজে আঁকিবুকিও করতো বাঁ হাতে। আমরা জানতাম এটি তার জন্মগত গুণ, একে বদলাবার চেষ্টা করলে বদলাতে সে হয়তো পারতো; কিন্তু সেটি জবরদস্তি হতো। হাত পায়ের ব্যবহারে একটি আড়ষ্টতা তার থেকে যেতো। তাই ডান হাতিদের জগতে তাকে আমরা বাঁহাতি হয়েই গড়ে উঠতে দিয়েছি।

ছোটবেলায় একটি লেখা পড়েছিলাম অমল দাশ গুপ্তের ন্যাটা তত্ত্ব। সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কোন কোন বাচ্চা কেন ন্যাটা অর্থাৎ বাঁহাতি হয়ে উঠে। পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু তখন বুঝিনি এ সম্বন্ধে একদিন আরো সরাসরি ভাবতে হবে। আমরা ডান হাতে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বেশি বোধ করবো না বাম হাতে— তা নির্ভর করে মস্তিষ্কের একটি নিয়ন্ত্রক অংশের অবস্থানের উপর। ওটি যদি মস্তিষ্কের বাম দিকে থাকে তাহলে আমরা হবো ডানহাতি। অধিকাংশ মানুষের তাই থাকে। কিন্তু শতকরা গড়পড়তা কয়েক কয়েকজনের জন্য এই নিয়ন্ত্রক থাকে ডান পাশে, তাই তারা হয় বাঁহাতি। ব্যাপারটি জন্মগত।

উজল এখন স্কুলে যাচ্ছে, কিছু কিছু লিখছে। তাকে যখন লেখা শেখাতে যাই বা তা শোধরাতে চাই তখন আমাকে সব সময় মনে রাখতে হয় যে সে বাঁহাতি। এটি যদি মনে না রাখি তাহলে অনেক সময় আমার দেখানোর ভুলের জন্যই সে উল্টা ক বা উল্টা B লেখে বসে। আয়নায় ক বা B কে দেখতে যে রকম হবে সেই আরশি লিপির মত। এ ধরনের গোলে মালে প্রায়ই দেখি সে কাগজের ডান দিক থেকে বাম দিকে লিখে যাচ্ছে বেশ তরতর করে। তার নামটিই সে অনেক সময় লিখে ফেলে উজল এর পরিবর্তে লজউ।

এখন বুঝি ব্যাপারটি ঘটেছে আমরা সব ডানহাতি মাস্টারদের ভেতরে সে পড়ে গেছে এক বাঁহাতি ছাত্র। তাই শুরুতে তার এই অসুবিধা। আমরা বাংলা বা ইংরেজি লিখি শরীরের দিক থেকে ক্রমে বাইরের দিকে। উজলকে লিখতে হয় বাইরের দিক থেকে শরীরের দিকে। তার জন্য এটি আরবী লেখার মতো। দুই পক্ষের বুঝাবুঝিটা হবার পর উজল এখন ও রকম ভুল কম করে।

তবে খেলাধূলায় লক্ষ্য করি বাঁহাতি হবার জন্য উজল বেশ সুবিধা পায়। সামনাসামনি বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করার সময় সে বাঁ পায়ে যা করে তার সামনের ডানহাতি প্রতিপক্ষ সেটি ঠাহর দিতে পারে না। তার ভাই যখন টেনিস বলটি ছুঁড়ে দিয়ে বল করে ন্যাটা ব্যাটসম্যান উজল তখন দিব্যি সেটি হাঁকাতে পারে যেদিকে কেউ আশা করে না সে দিকে।

আজকাল আমি আমাদের ডানহাতি জগতে এই বাঁহাতি ছেলেটির সুবিধা অসুবিধাগুলো নিয়ে খুব ভাবি। বাসায়, স্কুলে, অফিসে, যেখানে যাই ছোট খাট খুটিনাটিগুলো খেয়াল করি– দেখি অনেকগুলোই তৈরি হয়েছে আমাদের ডানহাতিদের কথা মনে রেখে। অবশ্য দু'এক ব্যাপারে বাঁহাতিদেরও সুবিধা হয়ে যায় প্রকারান্তে।

রান্নাঘরে গেলে লক্ষ্য করি এই সাধারণ আলু ছেলার আঁকশিটা এটি তো বাঁহাতে ব্যবহার করা চলবে না। এমন কি ছুরিটাতেও যেদিকে ধার দেয়া আছে তাতে বাঁহাতির অসুবিধা। ফ্রিজের দরজার হাতলটা ডান হাতে খোলার উপযোগী করেই তেরি। এতে অবশ্য বাঁহাতির সুবিধাই হয়। কারণ সে একে ডান হাতে খুললে বাঁ হাত দিয়ে স্বচ্ছন্দে এর ভেতর রাখা নেয়ার কাজটি করতে পারে। টিনের খাবারের টিন খোলার জন্য যে ক্যান ওপেনার সেটি কিন্তু বাঁহাতে ব্যবহারের যো নেই। খাবার টেবিলে একটি বিপত্তি লক্ষ্য করি। উজল যখন তার ভাইয়ের ডানে পাশাপাশি ঘেযাঘেযি করে খেতে বসে, তার বাম হাত আর ভাইয়ের ডান হাত উভয়ে খাবার প্রক্রিয়ায় নড়াচড়া করে বলে ঠোকাঠুকি লেগে যায়– সেই থেকে ঝগড়া। অথচ তারা সরেও বসবে না উজলও ভাইয়ের বামে বসবে না। উজলের একটি কাগজকাটা কাঁচি আছে। কিন্তু কাঁচি মাত্রই এমনভাবে তৈরি যে উজল সেটি বাঁ হাতে সহজে ব্যবহার করতে পারে না। বাচ্চাদের জন্য যে ক্যামেরাটি কিনেছিলাম তার ব্যবহারও উজলের জন্য অসুবিধাজনক– কারণ তার শাটার বোতামটি ডান দিকে।

কাপড় ইস্তারি করার সময় ভাবি যে বাঁ হাতির পক্ষে এটি অসুবিধাজনক হবে। কারণ বাঁ হাতে ইস্তারি ধরলে এর কর্ডটি মাঝখানে এসে বিরক্ত করবে। কাঁটাওয়ালা ঘড়িতে বা ডিজিট্যালে বাঁ হাতে সময় ঠিক করতে গেলে ঘড়ি উল্টিয়ে নিতে হয়, কারণ কাজ করতে হয় ঘড়ির ডান পাশে। এতে বেশ অসুবিধা ডায়াল দেখা যায় না বলে। শুধু টাইপ রাইটারে টাইপ করার সময় দুই হাতের সমান ব্যবহার। বরং বাঁহাতির সুবিধাটি একটু বেশি কারণ ইংরেজি টাইপরাইপটারে অধিক ব্যবহৃত বেশির ভাগ অক্ষরই কী বোর্ডের বামে।

টেলিফোনটির দিকে লক্ষ্য করে মনে হলো এই একটি জিনিস বাঁ-হাতিদের কথা মনে রেখেছে। এর কর্ডটি বাম দিকে লাগানো– তাই একে বাঁহাতে ধরাটাই সুবিধাজনক। কিন্তু পরে ভাবলাম– সেও তো ডান হাতির সুবিধার্থেই–ডায়াল করার জন্য, টোকাটুকি করার জন্য ডান হাত মুক্ত রাখতে, অথবা কয়েন টেলিফোনে পয়সা ঢুকাতে।

উজল এখনই গান বাজনার ভক্ত। শিগ্‌গির একদিন হয়তো সে কোন বাদ্য যন্ত্র বাজাতে শিখতে চাইবে। কিন্তু বাজনার তার-যন্ত্রগুলো এমনভাবে তৈরি যে তাকে সেগুলো ডানহাতিদের মতো করেই বাজাতে হবে। যেমন বেহালা বা গীটারে আঙ্গুল সঞ্চালন বাঁ হাতে এবং ছড়টানা বা টোকা দেওয়া ডান হাতে হবে এমনি করেই এরা তৈরি। বাঁহাতি কেউ যদি অন্যভাবে এদের বাজাতে চায় তাহলে সারগাম ঠিক রাখার জন্য তারগুলোকে খুলে অন্যভাবে বাঁধতে হবে। তাছাড়া একটি বড় অর্কেষ্টার কথা ভাবা যাক। পাশাপাশি অনেক বেহালা বাদকের মধ্যে বাঁহাতি কেউ যদি উল্টো দিকে ছড় টানে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? সবার ছড় যখন এক যোগে ডান দিকে যাচ্ছে, একটি ছড় বাঁ দিকে– কেমন দেখাবে? অবশ্য বাজনার শিক্ষকরা গোড়া থেকে বাঁহাতি ছাত্রকেও ডানহাতির মত করেই শেখান। দুই হাতই কাজে লাগে বলে তার কাছে সেটি অসুবিধাজনক হয় না।

গাড়ি চালাতে গেলে, হঠাৎ করে সজোরে ব্রেক কষতে হলে সেটি করতে হয় ডান পায়ে। বাঁহাতির আবার সেই পা টাই অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এখানেও তার অসুবিধা।

আমার হাতিয়ারের বাক্সটি লক্ষ্য করেছিলাম। এতে প্রায় সবগুলো জিনিসই ডান বা বাঁ উভয় হাতেই সমানে ব্যবহার সম্ভব– হাতুড়ি, করাত, পেরেক সব! কিন্তু সেদিন ওয়ার্কশপে পোর্টেবল পাওয়া স'টা (বিদ্যুৎ চালিত ছোট করাতে) দেখছিলাম সেটি একেবারেই ডানহাতি জিনিস। বাঁ হাতে এটি ধরতে হলে হাতকে ঘুরিয়ে আনতে হবে– এ ক্ষেত্রে সেটি রীতিমত বিপজ্জনক ব্যাপার হবে। এসব ব্যাপারে বাঁহাতিদের প্রয়োজনটি নিয়ে কেউ কি ভাবে?

এ নিয়ে উজল নিজে কি ভাবে? তাকে কিন্তু বাঁহাতি হবার জন্য কখনো বিন্দুমাত্র বেকায়দায় আছে বলে মনে হয়নি। বরং সবার কাছ থেকে এই ক্ষেত্রে আলাদা হওয়াটা সে যেন রীতিমত উপভোগ করে। একটি ব্যাপার থেকে তার মনোভাব কিছু আঁচ করা যায়। প্রথম প্রথম যখন ডানহাতি শিক্ষকতার চাপে তার বাঁহাত মাঝে মাঝে আরশি লিপির মত উল্টো অক্ষর লিখছিল তখন সে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতো– 'ক'টি কোন দিকে লিখবো? তোমার দিকে না আমার দিকে?' ভাবখানা এই যে যদি দু'দিকেই পারি নেহাৎ তুমি বললে ঐ দিকে লিখবো।

বর্ণালী

প্রিন্সিপিয়ার তৃতীয় শতবার্ষিকী

[জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-১৯৮৮]

ফিলোসফী নেচারলিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা অর্থাৎ প্রাকৃতিক দর্শনের গাণিতিক নীতি বিশ্বের কয়েকটি যুগান্তকারী গ্রন্থের অন্যতম। জাগতিক ও মহাজাগতিক সমস্ত গতিকে একটি অমোঘ গাণিতিক শৃঙ্খলায় আনয়নে নিউটনের অমর কীর্তি এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৬৮৭ সালে। বর্তমান বছরটি ছিল এর তৃতীয় শতবার্ষিকী। সংক্ষেপে *প্রিন্সিপিয়া* নামে পরিচিত এই গ্রন্থ সম্পর্কে তাই নানা রকম আনুষ্ঠানিক ও জনতোষ আলোচনা ও অন্যান্য উদ্যোগ এই বছর সংঘটিত হয়েছে।

প্রিন্সিপিয়া রচনার ইতিহাসটুকুও বেশ চমকপ্রদ। ১৬৮৪ সালে ধুমকেতু খ্যাত জ্যোতির্বিদ হ্যালী একবার কি একটি বিষয়ে নিউটনের সঙ্গে আলোচনা করতে এসে কথায় কথায় জানতে পারেন যে নিউটন কয়েক বছর আগেই মাধ্যাকর্ষণের ব্যস্ত বর্গ নিয়ম গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে গতিবিদ্যার অনেক কিছু। কিন্তু কাগজ-পত্রগুলো তিনি এমন গোলমাল করে রেখেছেন যে ওর অনেক কিছু হারিয়েও যাচ্ছে। যেই প্রমাণটুকুর জন্য সে সময় অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীরা হন্যে হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন নিউটন অনায়াসে তাকে অবহেলায় ফেলে রেখেছেন দেখে হ্যালী শংকিত হয়ে উঠলেন। তিনি নিউটনকে অবিলম্বে এ নিয়ে একটি বই লিখতে ধরে বসলেন এবং নিজেই প্রকাশনার ব্যয় বহনে রাজী হলেন। হ্যালীর পীড়াপিড়ীতে নিউটন রাজী হলেন; শুধু রাজীই হলেন না নিজেকে এর সৃষ্টিতে বিলিয়ে দিলেন।

এরপর নিউটনের আঠারো মাসের প্রায় অবিরাম অমানুষিক পরিশ্রমের ফসল হয়ে এলো *প্রিন্সিপিয়া*। সমসাময়িক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে এই পুরো সময়টিতে নিউটন আহার-নিদ্রাকে অত্যন্ত গৌণ বিষয়ে পরিণত করেছিলেন। চব্বিশ ঘন্টার অধিকাংশ সময় তিনি অর্ধ পোষাকে বিছানায় বসে কাজ করতেন, সমস্যাগুলোকে একটানা চিন্তায় ধরে রাখতেন—যতক্ষণ সমাধান না হতো।

অবশেষে ল্যাটিন ভাষায় রচিত এই গ্রন্থ ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। এর প্রথম অংশে গতির নিয়মগুলো বিবৃত করা হয়েছে। তারপর গতিবিদ্যার সাধারণ নীতিগুলো, মাধ্যাকর্ষণের ব্যস্ত বর্গ নিয়ম ও সেখান থেকে গ্রহসমূহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের প্রমাণ এবং জ্যোতির্বিদ্যার আরো বহুবিধ ঘটনার গাণিতিক ব্যাখ্যা এই অংশে রয়েছে। বইয়ের দ্বিতীয় অংশের প্রধান উপজীব্য তরলের গতিবিদ্যা—আবর্ত ইত্যাদির গণিত। তৃতীয় অংশে সূর্য ও গ্রহসমূহের ভর কষে বের করা হয়েছে, পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণে চাপা হবার পরিমাণ ও ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে, জোয়ার-ভাটার তত্ত্ব দেয়া হয়েছে, সূর্যের আকর্ষণে চাঁদের গতিতে অনিয়মের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে এবং পৃথিবীর অক্ষের খানিকটা টাল মাটাল গতি গণিতের আওতায় আনা হয়েছে। এককথায় গ্রন্থটি বিশ্বকে নিখুঁত যান্ত্রিক ও গাণিতিক পরিকল্পনায় আনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা এবং সেই হিসেবে শত শত বছর ধরে কোষগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

স্বাভাবিকভাবেই প্রিন্সিপিয়ার তৃতীয় শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিজ্ঞানীরা ব্যাপারগুলোকে পুনরায় আলোচনায় এনেছেন। বিশেষ করে নিউটনের বহু সম্মান ও বহু মান-অভিমানের কেন্দ্রস্থল রয়্যাল সোসাইটি এবং তাঁর নিজের বিদ্যানিকেতন ও কর্মস্থল ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ জাতীয় বেশ কিছু আনুষ্ঠানিক আয়োজন হয়েছে। কিন্তু আরো কিছু আয়োজন হয়েছে যেগুলো সর্বসাধারণের জন্য— প্রিন্সিপিয়ার ইতিহাস এবং এর গুরুত্বকে সবার কাছে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য।

ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার একটা প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিয়েছে যা শুধু নিউটনের নিজের রচনা ও প্রকাশনা নিয়ে। এতে নিউটনের এমন সব কাজ, পান্ডুলিপি, আঁক কষা স্থান পেয়েছে যার থেকে প্রিন্সিপিয়া রচনার পটভূমিকে কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। এর সবই হয়তো প্রকাশিত বই থেকে লাভ করা সম্ভব— কিন্তু নিউটনের চিন্তাগুলোকে তাঁর স্বহস্তে বিধৃত অবস্থায় দেখা— সেই অনুভূতিটিই আলাদা। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তির কাছে এ অমূল্য।

হুইপল মিউজিয়াম এই উপলক্ষে একটি কাজ করেছে যা অনেককে উপকৃত করবে। এটি হলো দশটি পোষ্টারের একটি সিরিজ। একই আঙ্গিকে রচিত এই পোষ্টারগুলোর প্রত্যেকটিতে রয়েছে পাঠ্য বস্তু এবং চিত্রের একটি সুদৃশ্য সমন্বয়। পোষ্টারের মাঝখানটায় প্রায় ৪০০ শব্দ পর্যন্ত বর্ণনা এবং দুপাশে প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলী—ব্যক্তিবর্গের ছবি নিউটন ও প্রিন্সিপিয়ার ইতিহাসের প্রধান চরিত্রগুলো, রেখাচিত্রগুলো, বইয়ের বিভিন্ন অংশের প্রতিলিপি ইত্যাদি।

পাঠ্য অংশগুলো সযত্নে রচিত—সাতজন বিভিন্ন লেখকের দ্বারা। এতে নিউটনের জীবনী, প্রিন্সিপিয়ার পটভূমি, গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা, পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে বিশ্বে এ গ্রন্থের প্রভাব— সবই এসেছে। পোষ্টারগুলো পরপর পড়ে গেলে একটি সুন্দর শৈল্পিক আবহের মধ্য দিয়ে চিরায়ত পদার্থবিদ্যার প্রধান দিক সম্পর্কে সুন্দর ধারণা পাওয়া যেতে পারে। মুদ্রিত এই পোষ্টার সিরিজটির একটি বড় কৃতিত্ব হলো যে কোন সাধারণ স্কুলের কমনরুমে এটি একটি তাৎক্ষণিক চমৎকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দিতে পারে মাত্র শ'খানিক টাকার বিনিময়ে— কারণ এইটুকু মূল্যের বিনিময়েই এটি কেনা যায়।

প্রিন্সিপিয়ার তৃতীয় শত বার্ষিকী উপলক্ষে বৃটেনের ডাকবিভাগ কিছু স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করেছে। এর একটিতে একটি আপেলের ছবির উপর মুদ্রিত হয়েছে প্রিন্সিপিয়ার পুরো নাম— আপেলটি মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের কথিত কাহিনীর স্মরণে। আর একটিতে গ্রহ সমূহের ছবি সেই সঙ্গে এদের উপবৃত্তাকার কক্ষ নিয়ে কিছু রেখাচিত্র। তৃতীয় একটি ডাক টিকেটে রয়েছে পানিভর্তি স্বচ্ছ কাচের একটি গোলতলী ফ্লাস্কের ছবি— যার মধ্য দিয়ে কিছু মুদ্রিত বস্তুর প্রতিসরিত প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। আলোকবিদ্যার উপর নিউটনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের স্মারক এই ডাকটিকেট। নিউটনের তত্ত্বের সর্বাধুনিক ব্যবহারের ইঙ্গিত স্থান পেয়েছে আর একটি ডাকটিকেটে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে এবং পৃথিবীর ছবি নিচ্ছে।

ফরাসী প্রতিমন্ত্রীর গ্রামীণ কারিগরি বিদ্যালয় পরিদর্শন

[ডিসেম্বর৮৮-ফেব্রুয়ারী-৮৯]

'এই সুন্দর দেশে এটি আমার সুন্দরতম মুহূর্ত'—এ কথাগুলো বলছিলেন ফ্রান্সের মানবিক উদ্যোগ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বার্নাড ক্যুশনার টাঙ্গাইলের সুরুজে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থী ছেলে মেয়েদের উদ্দেশ্য করে। বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের গ্রামীণ প্রযুক্তি ও মৌলিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের কার্যক্রম খুবই মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে তিনি বলেন এখানে শিক্ষা, জীবন ও উপার্জনকে যেভাবে একই সঙ্গে সমন্বিত করা হয়েছে তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জন্য একটি মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ভূমিহীন পরিবারের ছেলে মেয়েরা যে রকম উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনের সঙ্গে একে আত্মস্থ করছে এটি তাঁকে অত্যন্ত আনন্দিত ও আশাবাদী করে তুলেছে। ফরাসী প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন যে নিজেদের বাড়ীর কাছ থেকে শিক্ষা ও প্রযুক্তির এই সমন্বিত আয়োজন যাঁরা করেছেন তাঁদের চেষ্টা ও নিরীক্ষার একটি সুদূরপ্রসারী ফল আশা করা যায়।

মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূত ষ্টাইন্সলো'স ফিলিওল, ফ্রান্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তোজাম্মেল হক এবং ফ্রান্সের কয়েকটি সুবিখ্যাত দৈনিক ও সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকবৃন্দ। তাঁরা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর কিশোরীদেরকে শ্যালো পাম্প সংরক্ষণ, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্প কিংবা মুরগী পালনের মত কুশলী কাজ করতে দেখে অভিভূত হন। বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম যথাযথ শিক্ষা ও যথাযথ প্রযুক্তির সম্প্রসারণে কেন্দ্রের এই ধ্যান-ধারণাগুলো তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা অতিথিদেরকে শারীরিক কসরত দেখায় ও মৌলিক বিদ্যালয়ের গান পরিবেশন করে। উল্লেখ্য যে এখানে পৌছতে কিছুটা পথ অতিথিদেরকে রিক্সায় অতিক্রম করতে হয়।

রান্না ঘরের বিজ্ঞান

[জানুয়ারী-১৯৯১]

গৃহস্থ

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক সমাধান রান্নাঘরের কিছু নিত্য নৈমত্তিক কাজে বেশ লেগে যায়। বিষয়গুলো সাধারণ মনে হলেও অনেক সময় যথেষ্ট মন খারাপ আর খিটিমিটির কারণ ঘটাতে পারে। অথচ কত সহজেই না এগুলো এড়ানো যায়।

অক্ষত সেদ্ধম ডিম

সেদ্ধ করতে গিয়ে ডিম ফেটে গেছে, ভেতরে পানি ঢুকেছে, ডিমের আঁকাবাঁকা রেখা ডেগচিতে ছড়িয়ে পড়েছে এমন ঘটনা দেখতে কার ভাল লাগে। তাই ওটা নিয়েই শুরু করা যাক। ডিমের খোলসের ভেতরটা পুরো তরল পদার্থে ভর্তি নয়— এর মধ্যে খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকে বাতাস, ডিমের যে প্রান্ত বড় সেখানে অতি ক্ষুদ্র কিছু ছিদ্র খোলসের মধ্যে থাকে। সেদ্ধ করার সময় বাতাস গরম হয়ে এর চাপ বাড়লে ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তা বের হয়ে যায়। কিন্তু অতি তাড়াতাড়ি গরম করতে গিয়ে বাতাস দ্রুত অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বের হয়ে সেরে উঠতে পারে না। তখন তার চাপে খোলস ফাটে, পানি ঢুকে, নরম ডিম বের হয়ে আসে।

সেদ্ধ করার ঠিক আগে খোলসের বড় প্রান্তে পিন দিয়ে যদি একটি ছিদ্র করে দেওয়া হয় তাহলে ওটা দিয়েই বাতাস বেরিয়ে যেতে দেখা যাবে। ফাটা বন্ধ করার এটি একটি উপায়।

ফ্রিজ থেকে বের করা খুব ঠাণ্ডা ডিম হঠাৎ গরম পানিতে পড়লেও খোলস ফেটে যেতে পারে। ঠাণ্ডা ডিম সাধারণ পানিতে ডুবিয়ে স্বাভাবিক উত্তাপে নিয়ে আসলে এটা হবে না। সেদ্ধ করার সময় পানিতে একটু লবণ ছিটিয়ে দিন। এটি অবশ্য ফাটা ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু ফাটার পর ফাটল বন্ধ করতে সাহায্য করবে। তরল ডিম লবণ পানির সংস্পর্শে আসা মাত্র তাড়াতাড়ি জমে গিয়ে ফাটল বন্ধ করে দেবে। পানি ঢোকার অথবা ডিম বের হয়ে আসার সম্ভাবনা কমে যাবে।

ডিমের কুসুমে আস্তরণ

সেদ্ধ করা ডিম পাতে আসলো। ভেঙ্গে দেখা গেল কুসুমের গায়ে বিশ্রী সবুজ ছাই রঙের আস্তরণ। ডিমের প্রতি আপনার আকর্ষণটাই নষ্ট হয়ে গেল। একটু সাবধান হলেই এটি এড়ানো যেত।

ডিম গরম হবার সময় হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি হয়। পরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবার সময় এই গ্যাসের সঙ্গে ডিমের কুসুমে থাকা আয়রনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। হাইড্রোজেন সালফাইডের হাইড্রোজেন চলে যায়, সালফারটুকু আয়রনের সঙ্গে কাচে আয়রন সালফাইড গঠন করে কুসুমের সঙ্গে লেগে থাকে। তাই সেদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করে নিলে ঐ আস্তরণ জমতে পারে না— ডিমের কুসুম থাকে সুন্দর হলদে রঙের।

তালগোল পাকানো ন্যুডল্স

ন্যুডল্সের ব্যবহার আজকাল আমাদের রান্নাঘরে বাড়ছে। তা ছাড়া একই রকম আরেকটা জিনিস সেমাই। এ সব রাঁধতে একটি বিপত্তি প্রায়ই ঘটে— তা হলো পরস্পরের গায়ে সেটে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে যাওয়া। এ রকম

ন্যুডল্‌স বা সেমাই দেখতে খেতে মোটেই ভাল লাগে না। গায়ে গায়ে লেগে যাওয়ার কারণ হলো ময়দার তৈরি এসব জিনিসের গায়ে যে আলগা ময়দা থাকে সেদ্ধ করার সময় সেটা আঠা তৈরি করে।

ঐ আলগা ময়দাটুকু দূর করতে পারলে এটি ঘটবে না। সেদ্ধ করার পরপর গরম পানিতে ধুয়ে নিলে এর একটি সুরাহা হয়। আরো দুটা পথ অবশ্য আছে। একটি হলো অনেক বেশী পানিতে এদের সেদ্ধ করা। এতে সেদ্ধ ন্যুডল্‌সে লেগে থাকার মত আলগা ময়দা বেশী থাকবে না কারণ পানিতে ছড়িয়ে তার অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে যাবে। অন্য উপায়টি হলো তেলে বনস্পতিতে বা বাটার অয়েলে রান্না করা। পানিতে সেদ্ধ করার সময়ও অন্ততঃ কিছু তেল দিয়ে দিলে এদের গায়ে তেলের আবরণ পরস্পরের সঙ্গে লাগতে বাধা দেবে। এভাবে পাওয়া যাবে ঝর ঝরে ন্যুডল্‌স বা সেমাই।

রসুন-পেঁয়াজের নিয়ন্ত্রণ

খাবারকে আমরা হয়তো রসুন গন্ধী করতে চাই— কিন্তু কতখানি? অনেক সময় অতিরিক্ত রসুন গন্ধী হলে ভাল লাগে না। আবার কখনো অনেক রসুন দিয়েও রসুনের স্বাদ-গন্ধ পাই না। এটি নিয়ন্ত্রণের উপায় কি?

রসুনের রয়েছে এলিনিন নামের দ্রব্য আর এলিনেজ নামের একটি এনজাইম। এ দুটি একত্র হলেই রসুন-গন্ধের সৃষ্টি হয়। কোয়ার ভেতরে রসুন অন্য সব উদ্ভিদের মত অসংখ্য জীবকোষে বিভক্ত থাকে। এদের কোষ দেয়াল অক্ষত থাকলে ঐ রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটেনা, রসুন গন্ধেরও সৃষ্টি হয় না। রান্নার সময় খাবারে মেশাবার আগে রসুনের কোয়াকে যত কাটা হবে, বা ছেঁচা হবে কি পেষা হবে তত অধিক সংখ্যায় তার কোষ দেয়াল ভাঙবে, আর গন্ধ বেরোবে তত বেশী। এখন আপনিই ঠিক করুন খাবারকে কতখানি রসুন-গন্ধী করতে চান। যত বেশী চান তত বেশী করে রসুনকে কাটুন বা পিষুন। খাবারে দিয়ে ফেলার পর যদি মনে করেন ওটা একটু বেশী হয়ে গেছে, তারও উপায় আছে। রান্নাটা একটু বেশী করে করুন, রান্না এনজাইমের বিক্রিয়াটি কমিয়ে ফেলে।

পেঁয়াজও রসুনের মত একই দলের উদ্ভিদ। কাটা বা পেষার উপর এর এ ঝাঁজ-গন্ধ নির্ভর করে। তাছাড়া এর ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটি চোখে জ্বালা ধরায়, অশ্রু ঝরায়। তাই পেঁয়াজের কাটা বা পেষা যত বেশী করবেন চোখের অসুবিধা তত বেশী হবে। কাজগুলো কল থেকে ঝরছে এমন পানিতে ধরে করতে পারলে আপনার কান্না কম হবে। এতে বিক্রিয়ার অণুগুলো ধুয়ে যাবে, বাতাসে ছড়িয়ে আপনার চোখে আসতে পারবে না।

কপি-শালগমের অপ্রিয় গন্ধ

ফুলকপি, বাঁধা কপি, শালগম— এসব মৌসুমের প্রিয় খাবার। এমন প্রিয় খাবারও রান্নার সময় সৃষ্ট এক অপ্রিয় গন্ধের কারণে অনাকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। এর একটি বিহিত হওয়া প্রয়োজন।

অপ্রিয় গন্ধটির কারণ হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস যেটি পঁচা ডিমের গ্যাস নামেও পরিচিত। এসব সবজীতে এমন কিছু যৌগ থাকে যা রান্নার সময় এই গ্যাসের সৃষ্টি করতে পারে। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হলো রান্না দ্রুত করা। অনেকখানি পানি ডেগচিতে আগে থেকেই সেদ্ধ করতে থাকেন। এমন অবস্থায় এতে সবজী ছেড়ে দিলে খানিকক্ষণ শান্ত হয়ে চট করে আবার তা ফুটতে আরম্ভ করবে। ফলে গন্ধ সৃষ্টির সুযোগ ঘটবে না।

খোসা ছাড়ানো ফলের রং

কলা, আপেল এরকম কিছু ফল খোসা ছাড়িয়ে বা কেটে বেশীক্ষণ রেখে দিলে উন্মুক্ত অংশ খয়েরী রং ধারণ করে বিশ্রী হয়ে যেতে পারে। এদের মধ্যে এমন কিছু যৌগ থাকে যা বাতাসের সংস্পর্শে আসলে অক্সিডাইজ্‌ড হয়ে যায়—রংটি এরই ফল।

ছিলার বা কাটার পরেই বাতাসের সংস্পর্শে যৌগগুলো আসতে পারে। কাটা বা ছিলা জায়গায় লেবুর রস আনারসের রস বা সিরকা ছিটিয়ে দিলে ঐ বিক্রিয়াটি ঘটতে পারে না। ক্রীম, মেয়োনীজ বা অন্য কোন সস্‌ মেখে দিলেও একই হয়।

মুচমুচে পেটীজ, পাই

পেটীজ বা পাই তৈরি করার সময় সবার লক্ষ্য থাকে উপরের ময়দার আবরণটি খেতে মুচমুচে হোক। এর জন্য ছোট ছোট চিলতে ফ্লেক ময়দার খমীরের সাথে মেশানো হয়। খমীরটা এমন শক্ত করতে হবে যেন বেলার সময় ছিঁড়ে না যায়, আবার ফ্লেকগুলো খমীরের সারা গায়ে সমানভাবে মেশে।

খমীর তৈরি করার সময় ফ্লেকগুলো গলে গিয়ে এর মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাই যদি হয় তা হলে পেটীজ হবে শক্ত— মুচমুচে হয়ে পরতে পরতে উঠে আসবে না। এ জন্য খমীরকে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা দিতে হবে, আর এটি যত ঠাণ্ডা থাকে তত ভাল। ময়দা মাখার আগে পাত্র, চামচ, বেলোন ইত্যাদি সব ঠাণ্ডা করে নেয়া দরকার। কাজ করতে হবে বরফ পানি দিয়ে। খমীরের মধ্যে আঙ্গুল গিয়ে যাতে এর উত্তাপ না বাড়ে সে জন্য পানি মেশানোর জন্য কাঁটা চামচ ব্যবহার করা যায়। বেলার আগে খমীরকে আবার হিম-শীতল করে নিতে হবে।

এত সাবধান হলে তবেই চমৎকার মুচমুচে পেটীজ বা পাই এর নিশ্চয়তা পাওয়া যেতে পারে।

সম্পাদকীয় [ফেব্রুয়ারী-মার্চ-১৯৯১]

কম্পিউটার আমরা কতখানি ব্যবহার করছি

কম্পিউটার আমরা ব্যবহার করছি, আবার করছিও না। ব্যাপারটিকে এখনো একটি বিলাসিতা মনে করার প্রবণতা রয়ে গেছে। আমাদের বহু রকম কর্মকাণ্ডে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ক্ষেত্রে অনেক সময় বলা হয় ফাইল হারিয়ে গেছে বা চাপা পড়ে গেছে। যেখানে অনেক মানুষ, অনেক তথ্য নিয়ে কারবার সেখানে কাগজের আধিক্যের কারণেই প্রায়শ ঊর্ধতন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর পক্ষে সব খবর এক সঙ্গে নিজের আয়ত্বে রাখা সম্ভব হয় না। ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্য একত্র করা, এদের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করা এই কাজটি জটিল হলে তার জন্য বিভিন্ন সহকারীর উপর পুরাপুরিভাবে নির্ভর করতে হয়। তাঁদের যে কেউ পুরো বিষয়টিকে বিলম্বিত করতে পারেন। অথচ বিপুল পরিমাণ তথ্য যে কারো সহজ আয়ত্তের মধ্যে রাখার প্রযুক্তি কম্পিউটার আজ এনে দিয়েছে। আর এটি এতখানি ব্যয়বহুল আর নাই যে ব্যয়ের কারণে এর থেকে দূরে থাকতে হবে। সহজে ব্যবহারের ইউটিলিটি প্রোগ্রামগুলো শেখা এখন যে কারো পক্ষেই অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব। আর এ কাজটি সবার আগে করা দরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর। এর মানে এই নয় যে দফতর মাত্রেই কম্পিউটার থাকতে হবে বা কাগজপত্রে কোন রেকর্ড থাকবে না। সাধারণভাবে যেমনটি চলছে তেমনটিই থাকবে, তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক তথ্যগুলো কম্পিউটার নথিভুক্ত করা হবে, যাতে করে তার ভিত্তিতে দ্রুত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে উর্দ্ধতন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর পক্ষে তখন বেশ স্বাধীনভাবে বিষয়গুলোর তাৎক্ষণিক বিবেচনার সুযোগ ঘটবে। তা ছাড়া জটিল প্রক্রিয়াকরণকে সহজ করে তুলে তাঁর পক্ষে সবদিক বিবেচনা করে, আঁক কষে তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া অধিকতর সম্ভব করে তুলবে।

কম্পিউটারকে ব্যাপকভাবে দফতরের কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে কয়েকটি প্রচলিত ভুল ধারণার অবসান আমাদের ঘটাতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার ব্যয়বহুল, কম্পিউটার জটিল এবং নাজুক একটি যন্ত্র, কম্পিউটার ব্যবহার আয়ত্ত করা খুবই কারিগরি একটি কাজ, কম্পিউটারকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং বিশেষ ব্যবস্থায় আলাদা কক্ষে না রাখলে এটি নষ্ট হয়ে যায়। ধারণাগুলো ভুল, এটি মনে রেখেই কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার কাজ দক্ষ করার পথে আমাদের এগোতে হবে।

সাধারণ নিয়ে অসাধারণ ভাবনা

[ডিসেম্বর-'৯১]

রবার্ট ফুলঘুম

বাড়ী বদলানোটা সব সময় আমার আত্মচিত্তের প্রতি একটি আঘাত হয়ে আসে। ভাবতে ভাল লাগে যে আমি যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ। কিন্তু সেই মুহূর্তটি যখন আসে— সব আসবাব সব সম্পত্তি ঘর থেকে যখন বের হয়ে যায়, কিছু ফেলে গেছি কিনা দেখতে ফিরে আসি— তখনই মেঝের উপর এই সব জিনিস চারিদিকে দেখতে পাই। যেখানে ডেস্কটি ছিল তার পেছনে, যেখানে বুক কেইসটা ছিল তার পেছনে, বিছানাটি যেখানে ছিল তার পেছনে, আর যেই কোণার বাক্স ছিল সেখানেও।

জিনিস— ধূসর, প্যাঁজানো, ছিদ্র ছিদ্র জিনিস। নাঃ, তা হলে আমি সত্যি তেমন পরিচ্ছন্ন নই। পড়শীরা কি ভাববে? আমার মা কি বলবে? তারা যদি এখন পরিদর্শনে আসতো তা হলে? আমি এসব ভাবি। এক্ষুনি এগুলো পরিষ্কার করে ফেলা উচিত— এই জিনিস। যখনই আমি বাড়ী বদলাই তখনই একে দেখা যায়। এটি কি?

এক মেডিক্যাল জার্নালে পড়েছিলাম জিনিসটাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁরা মানুষের এলার্জীর সমস্যা নিয়ে কাজ করছিলেন। এতে তাঁদের ফলাফল এখানে প্রাসঙ্গিক। দেখা গেছে এর মধ্যে আছে পশম, কার্পাস, কাগজ, পোকার দেহাংশ, খাদ্য, উদ্ভিদ, গাছের পাতা, ছাই, ছত্রাকের আণুবীক্ষণিক স্পোর, এক কোষী প্রাণী, আর প্রচুর পরিমাণে হাবিজাবি যাদের সনাক্ত করা যায়নি— বেশীর ভাগই প্রাকৃতিক এবং জৈব।

কিন্তু যা বলা হল তা পড়ে বিবিধের মধ্যে। জিনিসটির সিংহভাগ কিন্তু আসে দুটি উৎস থেকেঃ মানুষ— উঠে যাওয়া গায়ের চামড়া, আর চুল এবং উল্কা—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত হানার সময় তার ভেঙ্গে পড়া গুঁড়া (তামাশা করছি না, এটি সত্যিই ঘটে, প্রতিদিন টনে টনে এসে পড়ছে)। অতএব, অন্য কথায় বলতে গেলে যা কিছু আমার বিছানার বুক কেইসের, ড্রেসারের বা বাক্সের পেছনে তার বেশীর ভাগই আমি এবং তারকাচূর্ণ।

একজন উদ্ভিদবিদ আমাকে বলছিলেন যে এ জিনিস যদি একটি বয়োমের মধ্যে নিয়ে তাতে একটু পানি দেয়া হয় আর রোদে রেখে একটি বীজ এতে পুতে দেয়া হয়— তাহলে অঙ্কুরিত বীজ এতে পাগলের মত বাড়তে থাকবে। আর একই কাজ যদি আপনি ছায়ায় রেখে করেন তা হলে চমৎকার মাশরুম জন্মাবে। তারপর সে মাশরুম যদি খান তা হলে অনেক তারকা দেখতে পাবেন।

আর যদি সত্যিই এ জিনিসের অনেক খানি দেখতে চান তা হলে আপনার বিছানার চাদরটি তুলে নিন। একে একটি আঁধার ঘরে নিয়ে জোরে ঝাড়া দিন, তারপর একটি টর্চ লাইটের আলো জ্বালান। কি দেখছেন? দাদীর বাড়ীর তাকে রাখা কাঁচ গোলকের ভেতর ছোট্ট তুষারমানবটির মত মনে হচ্ছে না? লন্ডন ব্রিজ পড়ে যাচ্ছে— আমি পড়ে যাচ্ছি, তারারা পড়ে যাচ্ছে, আর অন্য সব কিছুও পড়ে যাচ্ছে। কেউ বলে আবার ঘুরে ওঠার জন্যই এরা পড়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা বেশ ভালভাবেই প্রমাণ করেছেন যে আমাদের আতুড় ঘর নাক্ষত্রিক। আমরা নক্ষত্র বস্তুতে গড়া। আর এই খানে আমার ডেস্কের পেছনে আমি যেন আমার সেই উৎসে ফিরে যাবার আলামত পাচ্ছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐ আদি বস্তুর পুনর্যোগের মাধ্যমে কি জানি কি হয়ে পড়ছে। আর আমার নিজের ঘরের কোনাকানচিতে কি ঘটছে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেছে। এতো ময়লা নয়— এ যে মহাজাতিক কম্পোষ্ট।

বিজ্ঞান সাময়িকী অনুবাদ

কি করে নোবেল পুরস্কার পাওয়া যায়

[মে ১৯৯২]

আমীর আমিরানী

[সম্প্রতি বিবিসি টেলিভিশনে 'নোবেল শতাব্দী' নামে একটি ডকুমেন্টারী সিরিজ প্রচারিত হয়েছে। লেখক এই অনুষ্ঠানটির জন্য গবেষণা ও প্রণয়নের অন্যতম দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এখানে সেই অভিজ্ঞতা লব্ধ কিছু খবর তিনি কৌতুকচ্ছলে পরিবেশন করছেন]

প্রথমত কিছু সাধারণ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাক। ধৈর্য ধরে দীর্ঘকাল আশেপাশে থাকার পরিকল্পনা নিন, আর দোহাই আপনার মারা যাবেন না। মরণোত্তর কোন নোবেল পুরস্কার নাই। ষ্টকহোমের ডাক আসতে প্রচুর সময় লেগে যেতে পারে। অবশ্য যদি আপনি কোয়ার্ককে কাছে থেকে দেখার মত সুপার-মাইক্রোস্কোপ কিংবা এইডসের নিরাময় আবিষ্কার করে ফেলেন তা হলে ভিন্ন কথা— সেক্ষেত্রে যে কোন বয়সেরই হোন না কেন আপনাকে বেশী অপেক্ষা করতে হবে না।

খেয়াল করে দেখুন আপনি ইউরোপীয় কিংবা আমেরিকান কিনা। যদি হন তা হলে প্রারম্ভটা শুভ আপনি স্মিত হাসি হাসতে পারেন। আর যদি তা না হন ঘাবড়ে যাবেন না। চটপট জার্মানী, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড অথবা বৃটেনের বিমান টিকেট কেটে ফেলুন— কিংবা আমেরিকার। জাহাজে আসলেও মন্দ হয় না— সুব্রামানিয়াম চন্দ্র শেখরের মত জাহাজেই কিছু একটি আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন যা আপনাকে পুরস্কারটি এনে দেবে। তারপর খেয়াল করে দেখুন আপনি পুরুষ কিনা। যদি হন তা হলে বড়সড় একটি হাসি হাসতে পারেন। এমনকি খবরটা আপনি বন্ধুবান্ধবদেরকেও জানাতে পারেন। তাঁরা অবশ্য এ খবরে খুব একটা অবাক হবেন না, তাঁরা তো আর জানেন না, এই তথ্য আপনি কিসের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে যাচ্ছেন। যদি পুরুষ না হন, ঘাবড়ে যাবেন না। না, ঠিক আছে, একটু খানি ঘাবড়াতে পারেন। তারপর আপনার সম্ভাব্য বাকী জীবন কালের জন্য সমস্ত সামাজিক কাজকর্ম বাদ দিয়ে নিজেকে টেবিলের সঙ্গে বেঁধে রাখার প্রতিজ্ঞা নিন। অবশ্য বিকল্প ব্যবস্থাও নিতে পারেন, হরমোনটরমোন ঐ সব আর কি, বিজ্ঞান আজকাল কিনা করতে পারে।

তাহলে আপনি পশ্চিমা, আপনি পুরুষ। এরপর ব্যাপারস্যাপার একটু জটিল হতে আরম্ভ করবে। এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নিন যেখান থেকে নোবেল পুরস্কার বিজয়ের ভাল রেকর্ড আছে, আর যার কাড়ি কাড়ি টাকা আছে। ওটার ঘাটতি হলে বড় বড় ফাউন্ডেশনগুলোর কোনটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন। যদি আপনি অর্থনীতিবিদ হন তা হলে শিকাগোর দিকে এগোবার চেষ্টা করুন, তবে এম, আই, টি কিংবা ইয়েলও ভাল বিকল্প হতে পারে। বিজ্ঞানীরা অবশ্য আরো বেশী জায়গা থেকে পছন্দ করতে পারেন— কিন্তু কালিফোর্নিয়া বা বোষ্টনের মধ্যে কোথাও থাকতে পারলে উত্তম। আমেরিকা যদি ভাল না লাগে সুইজারল্যান্ড, জার্মানী এবং সুইডেনকে সুপারিশ করা যায়।

উঠে আসছে অথবা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত—এমন একটি কেন্দ্র বেছে নিন, এ সম্পর্কে সব কিছু পড়ুন। আপনার কেন্দ্রে সব লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করুন— তাঁরাই তো আপনাকে মনোনীত করবেন, আপনার ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের সঙ্গে সাক্ষাত করুন (অবশ্যই), দুই এক জন সুইডশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন, তাঁদের প্রতি চমৎকার হোন। এই সব কিছু যদি করে থাকেন—তবে আপনি ভালই করছেন।

এবার শক্ত কাজগুলো। খেয়াল করে দেখুন আপনি খোলা মনের অধিকারী কিনা, আপনার আইডিয়াগুলোর উপর নিজের অবিচল আস্থা আছে কিনা এবং অসীম ধৈর্য্য আপনার রয়েছে কিনা। এগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই করা একটু কঠিন হতে পারে, তাই আপনি বিশ্বাস করতে পারেন এরকম কোন সৎ সহকর্মীর সাহায্য নিন। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুণ, আর যদি আপনি নিশ্চিত হন যে এসব গুণ আছে, তবে একটি পার্টি আয়োজন করে সুইডেনের রাজাকে ওতে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

এরপর দেখুন আপনার কর্তৃপক্ষের ভ্রমণ বাজেটটি যথেষ্ট উদার কিনা। যদি হয় তা হলে ওটা আক্রমণ করুন। যদি না হয় তাহলে হুমকি দিন— বেল ল্যাবোরেটরী, ওয়েলকাম, জেনারেল ইলেকট্রিক, আই বি এম কিংবা ওরকম অন্য কোথাও চলে যাবার হুমকি দিন— যেখানে আপনাকে আরো বেশী টাকা, ভ্রমণের আরো বেশী সুযোগ এবং হয়তো নিজস্ব ব্যবহারের জন্য সুপার কম্পিউটার দেয়া হবে। ভিজিটিং ফেলোশিপ, প্রফেসরশীপ, ছুটিকালীন অতিথি বিজ্ঞানী ইত্যাদির যে কোন আমন্ত্রণ লুফে নেবেন। মনে রাখবেন বহু সমস্যার হঠাৎ সমাধান, মূল্যবান আলোচনা— এসব ঘটেছে অপরের ল্যাবোরেটরীতে।

ইতিমধ্যে আপনি নিশ্চয় চল্লিশের কোঠায় বেশ কিছু এগিয়ে গেছেন। গবেষণা প্রবন্ধ ও প্রকাশিত হয়েছে প্রচুর, আর সেগুলো থেকে প্রায়ই উদ্ধৃত করা হচ্ছে সর্বত্র। খেয়াল করে দেখুন সূচক গোছের কোন একটি সম্মান ইতিমধ্যে আপনার হস্তগত হয়েছে কিনা যেমন চিকিৎসা বিদ্যায় লাস্কের পুরস্কার, রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশীপ অথবা ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমীর সদস্যপদ। যদি হয়ে থাকে তাহলে লক্ষণ শুভ, লক্ষ্যের দিকে আপনার যাত্রা সরল রেখায় রয়েছে। যদি না হয় ঘাবড়াবেন না। হয়তো বা কেউ উদ্যোগ নিতে ভুলে গেছে।

এখন আপনার কিঞ্চিৎ ভাগ্যের প্রয়োজন হবে। তাই বলে এ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। পুরানো প্রবাদ বাক্যটি স্মরণ করুন "দৈব ঘটনা ততক্ষণ পর্যন্ত দৈব যতক্ষণ পর্যন্ত না ওটি উপযুক্ত লোকের ক্ষেত্রে ঘটছে; তারপর ওটি হয়ে পড়ে আবিষ্কার"। এতদিনে আপনি নিজে নিশ্চয়ই জেনে গেছেন আপনি উপযুক্ত লোকটি কিনা। যদি মনে হয় আপনি তা নন তা হলে আবার শুরুতে ফিরে যান, দেখুন গোলমালটি কোথায়।

এখন শুধু একটি জিনিসই বাকী— কিছু একটা উদ্ভাবন করতে হবে অথবা আবিষ্কার করতে হবে। এর জন্য অবশ্য আপনাকে সত্যিই খুবই ভাল হতে হবে— সে ব্যাপারে কোন ভিন্ন পন্থা নাই। যদি এতে বাকী থাকে তাহলে আরো কিছু অত্যন্ত উঁচু দরের গবেষণা করুন, আর নিজ ক্ষেত্রে আদানের জন্য জীবনকালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি-পুরস্কারটির আশা পোষণ করে যান। 'গত বছরের কাজ' এই শিরোনামে যে প্রশ্নটি আছে তা নিয়ে ভাববেন না। পেটন রুজ ১৯১১ সনে কিছু ভাল কাজ করেছিলেন। তাঁকে ১৯৬৯ সনে পুরস্কারটি পেতে ৫৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বিনয়ী হবেন না। সবাইকে জানতে দিন যে পুরস্কারটি পেলে আপনি খুশী হবেন, নোবেল প্রাইজের প্রাথমিক বছরগুলোতে অনেককে পুরস্কার দিতে দ্বিধা করা হতো পাছে তারা সেটি নিতে অস্বীকার করেন। আর আপনার বন্ধুরা আপনার হয়ে তদ্বীর করতে চাইলে তাদেরকে তা করতে দিন— কারণ আখেরে ওটি কাজ দেয়। পরে ওরা যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে পুরস্কার আপনাকে বদলে দিয়েছে কিনা উলফগ্যাং পাউলীর মত জবাব দিন "না, আমি আগে থেকেই বিখ্যাত ছিলাম"। আর পুরস্কারের টাকাটা নিজেই রাখুন। এর বহু ব্যবহার রয়েছে, যেমনটি আইনষ্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের খরচ যোগাতে এর অংশ বিশেষ ব্যবহার করতে গিয়ে।

উপরের তালিকাটির মধ্য দিয়ে আপনি যদি সফলভাবে অগ্রসর হয়ে থাকেন আর নীচের বাক্যটি যদি ২০ শব্দের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারেন তা হলে অন্য সব বিষয় ঠিক থাকলে আপনিও নোবেল পুরস্কার না পাওয়ার কোন কারণ নাই। বাক্যটি হলো, "আমি নোবেল পুরস্কার জয় করতে চাই.........."আপনার প্রতি সৌভাগ্য কামনা রইলো।

সম্পাদকীয়

ধরিত্রী সম্মেলনে যা হলো

[আগষ্ট- ৯২]

বারদিন ধরে এক অভূতপূর্ব সমাবেশে, অনেক বাঙময়তা, আশা ভঙ্গের অনেক ঘটনা এবং অনেক সুস্পষ্ট পদক্ষেপ ঘোষণার মাধ্যমে গত ১৪ই জুন ধরিত্রী সম্মেলন শেষ হয়েছে। ব্রাজিলের রিওডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন শেষ অবধি বিশ্বের গতিপ্রকৃতিকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারবে তা ভবিষ্যতের বিচার্য বিষয়। কিন্তু এ কথা ঠিক যে ধরিত্রী সম্মেলনকে মানব জাতির ইতিহাসের জন্য, এর ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য এবং এই জীবনময় ধরণীর জন্য একটি মাইল ফলক হিসাবে বিবেচনা করা হবে। যতখানি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়নি বটে তবে এর সাফল্যগুলোও সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা রাখে। বিশ্বের দেশগুলোর নায়কদের, এবং দেশে দেশে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সূচনায় এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সবাই এখন অন্তত উপলব্ধি করছেন যে পরিবেশের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যভাবে রচিত একটি সার্বজনীন উন্নয়ন আয়োজন ছাড়া সবারই ভবিষ্যত অন্ধকার। এই উপলব্ধি থেকেই সাক্ষরিত হয়েছে দুটি চুক্তি— একটি জলবায়ু পরিবর্তন রোধ সংক্রান্ত, অন্যটি জীববৈচিত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত। কিছুটা দুর্বলভাবে হলেও বন সম্পদ নীতি সম্বন্ধেও একটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরিবেশ অবক্ষয় রোধ করে সারা বিশ্বের জন্য টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্মেলনের প্রারম্ভকে সত্যিকারভাবে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার কাজে এটিই হয়তো শেষ পর্যন্ত বড় নিয়ামকের কাজ করবে।

কর্মসূচী এজেন্ডা-২১ গৃহীত হয়েছে। এটি একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় অবশ্য করণীয় বিষয়গুলোর একটি বিস্তারিত দলিল। এর জন্য অর্থযোগানের প্রক্রিয়াটি আশানুরূপ না হলেও তারও একটি প্রারম্ভ ঘটেছে। গোড়াতে যা আশা করা হয়েছিল সেই আর্থ চার্টার বা বিশ্বসনদ রচনা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তারই প্রথম ধাপ হিসাবে এসেছে রিও-ঘোষণা যেখানে সব দেশের সরকারগুলো পরিবেশ ও উন্নয়নের বিষয়ে কতগুলো মৌলিক নীতি অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।

ধরিত্রী সম্মেলনে ধরা পড়েছে, এত বড় লক্ষ্যে এত জরুরী লক্ষ্যে এক মত হতে গিয়েও শক্তিমানরা নিজ-স্বার্থ নিয়ে কেমন ব্যতিব্যস্ত থাকতে পারে। বাকী সকল দেশের ঐকমত্য সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার জীববৈচিত্র চুক্তিতে সাক্ষর করেনি সে দেশের কোম্পানীগুলোর স্বার্থে কিছুটা আঘাত আসতে পারে বলে। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ চুক্তিকেও সে করেছে দুর্বল। মধ্য প্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ কয়েকটি দেশ নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসের উপর গুরুত্ব দেয়া সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে তাদের আপত্তি রেকর্ড করিয়েছে। ধনী ও শক্তিমান দেশগুলো সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে তাদের অতি ভোগবাদী জীবন ষ্টাইল সম্পর্কে, অস্ত্র ব্যবসা সম্পর্কে, নায্য বাণিজ্যনীতি সম্পর্কে এবং সর্বোপরি দুনিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠির অবর্ণনীয় দারিদ্র সম্পর্কে কোন আলোচনা বা কোন সত্যিকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অন্যদিকে এ সব প্রশ্নে ধনী দরিদ্র সবদেশের বেসরকারী গোষ্ঠি ও প্রতিনিধিসমূহের ঐকমত্য, প্রচেষ্টা ও চাপ ধরিত্রী সম্মেলনকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

সম্পাদকীয়

[অক্টোবর-১৯৯২]

তথ্য-প্রযুক্তির আবাহন

তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের ঢেউ ধীরে ধীরে আমাদের দেশেও লেগেছে। বিদেশ থেকে টেলিফোন পাওয়া এবং বিদেশে টেলিফোন করা বেশ কিছু দিন ধরে সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফ্যাক্স করে দলিলপত্রের, চিঠির হুবহু প্রতিলিপি ক্ষণিকে যে কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া এখন কোনো সমস্যা নয়। নিজের না থাকলেও ফ্যাক্স মেশিন এখন সর্বত্র, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই সার্ভিস সহজলভ্য। আমাদের চিরাচরিত চিঠি হয়তো ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত জরুরি যোগাযোগের ক্ষেত্রেই শুধু টিকে থাকবে। অবশেষে দু'এক সপ্তাহ আগে সিএনএন-এর নিয়মিত অনুষ্ঠান চালু করার মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির আরো বিস্তারিত ক্যানভাস দৈনন্দিন অনেকের সামনে উন্মোচিত হল। বাংলাদেশ বিমানের শ্লোগান 'ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী'– এই কথাটি উপলব্ধি করার জন্য এখন আর বিমানের যাত্রী হবার প্রয়োজন হচ্ছে না।

কিন্তু পৃথিবী যে ছোট হয়ে আসছে এই সত্যটিকে আমরা কোন দিক থেকে কাজে লাগাচ্ছি? এ কি শুধু বিদেশের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথা বলার আনন্দ কিংবা সকালবেলায় অফিস প্রস্তুতির ফাঁকে ফাঁকে সিএনএন-এর দেয়া বিশ্বচিত্র একটু উপভোগ করার স্বাদ? শুধু তাই যদি হয় তাহলে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব আমাদের জন্য নতুন কোন আশার বাণী বয়ে আনতে পারবে না। অথচ নিজেদেরকে নতুনভাবে উন্নয়নের সংগ্রামে নিয়োজিত করার কিছু উদ্দীপক বীজ এই বিপ্লবের মধ্যে নিহিত ছিল। আমরা পৃথিবীর সফলতর দেশগুলোকে এখন চাক্ষুষ করতে পারছি। তাদের সবাই যে গোড়া থেকেই সফল ছিল এ কথা বলা যাবে না। সাফল্য এসেছে ওরা বিশ্বপরিস্থিতির অনুকূল করে নিজেদেরকে তৈরি করতে পেরেছে বলে। সেসব দেশে মানুষ কিভাবে প্রযুক্তির সুযোগ নিয়েছে, শ্রম ও কুশলতার চাহিদার সুযোগ নিয়েছে, তথ্য-বিস্ফোরণ এখন তার উপলব্ধি আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে। আমরা কি সেখান থেকে কিছুই শিখব না? এই তথ্যপ্রযুক্তিটার কথাই ধরা যাক না। সেটি যদিও খুব উন্নত দেশগুলোর সৃষ্টি— অন্যরাও পিছিয়ে নেই মোটেই। শ্রম দিয়ে, কুশলতা দিয়ে, উদ্যোগ দিয়ে এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে অনেকে, নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়েছে অনেকে। সুযোগ আমাদেরও রয়েছে এর মধ্যে, যদি আমরা সে সুযোগ নিতে জানি। বিশ্বকে নিকটে পাওয়া তখনই সার্থক হবে যখন এ সুযোগ আমরা নেব। একইভাবে সিএনএন-এ উন্নত বিশ্বের গণতান্ত্রিক ধারা প্রত্যক্ষ করা সার্থক হবে যদি আমরা তার থেকে নিজেদের রাজনীতিকে জনস্বার্থের কাছে জবাবদিহিমূলক করে তোলার শিক্ষা লাভ করি এবং গণমাধ্যমকে সেইভাবে কষ্টি পাথরের মতো ব্যবহার করতে শিখি।

ধরিত্রী সম্মেলন ও তারপর : আমাদের করণীয়

সেমিনারে মূল বক্তব্য

[নভেম্বর-ডিসেম্বর '৯২]

ভূমিকা

'ধরিত্রী সম্মেলন ও তারপর : আমাদের করণীয়' শীর্ষক সেমিনারটি গত ১৯শে আগস্ট ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শিশু মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ধরিত্রী সম্মেলন পরবর্তী অবস্থায় আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র এটি আয়োজন করে। উল্লেখযোগ্য যে গত বছর ধরিত্রী সম্মেলনের প্রস্তুতি উপলক্ষে বাংলাদেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন একটি কর্মশালায় মিলিত হয় তখন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রকে এর আয়োজনের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং কর্মশালার ফলশ্রুতি হিসাবে কেন্দ্র ধরিত্রী সম্মেলনের জন্য বাংলাদেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বক্তব্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করে।

ধরিত্রী সম্মেলন পরবর্তী বর্তমান এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বন ও পরিবেশ, মৎস্য ও পশুপালন বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ আল নোমান। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনার সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর মুহাম্মদ ইব্রাহীম সেমিনারের পটভূমি উপস্থাপন করেন। সেমিনারে প্যানেল বক্তার দায়িত্ব পালন করেন উবিনীগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফরহাদ মাজহার, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এভান্সড ষ্টাডিজ-এর পরিচালক ড. এ আতিক রহমান, এবং নারী পক্ষের জনাব শিরিন হক।

গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন উর্বিনীগের নির্বাহী পরিচালক জনাব ফরিদা আখতার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. তাহমিদা বেগম, এডাবের জনাব ইয়াসমীন আহমেদ,এন, এফ. ই, এন এর সভাপতি জনাব এফ করিম, বিসিকের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব আবূ তাহের, নাকোমের সভাপতি জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান খান, আই সি ডি ডি আর বি'র ডঃ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, বি সি এ এস-এর জনাব, এ কে এম মোর্শেদ এবং জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাব মাহফুজুর রহমান।

ধরিত্রী সম্মেলনের সৃষ্ট আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের অতি জরুরী পরিবেশ ও উন্নয়নের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাবার কাজে মত বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় এ সেমিনার কিছুটা অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মূল বক্তব্য

❑ ধরিত্রী সম্মেলনের ফলাফলগুলোকে খুব সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে হবে। সেখান থেকে যদি কোন দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের বাঁচার পথের সন্ধানে।

❑ সকলের জন্য একটি নূন্যতম জীবনমান অর্জনের যে আকুতি আমাদের মধ্যে রয়েছে এজেন্ডা ২১ তার জন্য একটি কর্মকাঠামো দিয়েছে। এখন এই বিশ্বজনীন এজেন্ডা ২১-এর আলোকে আমাদেরকে তৈরি করতে হবে আমাদের নিজস্ব এজেন্ডা। আর সেটাকে বাস্তবায়িত করতে হতে হবে দৃঢ়চিত্তে।

❏ ধরিত্রী সম্মেলনের দেয়া কর্মকাঠামো আমাদেরকে উন্নয়নের বিকল্পধারা অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে। যে ধারা উন্নয়নকে গুটিকতেক সৌভাগ্যবানের উন্নতি মনে করবেনা, অদূরদর্শী লাভের লোভে পরিবেশকে বিসর্জন দেবেনা, বিশ্ব সংস্থার অর্থায়নকে নিজের অধিকার হিসাবে নিজ নিয়ন্ত্রণে দেশের মানুষের জন্যই শুধু ব্যয় করবে। শক্তিমান যাতে আমাদেরকে শোষণ না করতে পারে সেটি দেখবে।

❏ পরিবেশ বিষয়গুলো এক সম্মেলন বা এক দশকের সমাধানের ব্যাপার নয়, এর সঙ্গে জাতিসংঘের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন আছে, সমাজ ব্যবস্থা বদলের প্রশ্ন আছে, আমাদের সংগঠিত হবার প্রশ্ন আছে, গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে জনগণের সমন্বয়ের প্রশ্ন আছে।

❏ 'পৃথিবী একটি, একে রক্ষা কর'— এ শ্লোগানকে আকাঙ্খা হিসাবে গ্রহণ করি, কিন্তু বাস্তবতা হিসাবে নয়। বাস্তবে পৃথিবী একটি নয় এটি শ্রেণী হিসাবে পরিষ্কার দুই ভাগে বিভক্ত। এটি এখন ধনীদের নিয়ন্ত্রণে।

❏ দেশের কৃষকরা হাজার হাজার বছর ধরে এদেশের জৈব বৈচিত্র রক্ষা করেছে, বিকশিত করেছে তাদের খামার পর্যায়ে। আজ জৈব বৈচিত্র ধ্বংসের জন্য প্রধান দায়ী হচ্ছে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা। এটি দেখছি সারের ক্ষেত্রে, কীটনাশকের ক্ষেত্রে, পাম্প মেশিনের ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি নির্ভরশীলতায়। এক জাতের এক শস্যের প্রতি প্রীতি এনেছে কীটের আক্রমণ, নষ্ট করেছে হাজারো জাতের বৈচিত্র আর মাটি ও কৃষি সম্পর্কে কৃষকের হাজার বছরের জ্ঞান। শষ্যবীজের ঐ সম্পদ এখন শুধু পাওয়া যাবে আন্তর্জাতিক জিন ব্যাংকে। এসব বিষয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আমাদেরকেই অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

❏ সম্প্রতি বৃক্ষরোপনের জন্য সরকার যে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছেন সেটি একটি প্রশংসনীয় কাজ হয়েছে।

❏ ধরিত্রী সম্মেলনে সে সব জিনিষই গুরুত্ব পেয়েছে যা ধনী দেশগুলোর গায়ে লাগছে। অথচ অনেক কিছু আমাদের গায়েও আঘাত হানছে প্রতিদিন। দক্ষভাবে এসব জিনিসকে আন্তর্জাতিক ফোরামে নিয়ে যেতে হলে আমাদের নিজস্ব জ্ঞান এবং কারিগরি ভাবে নিখুঁত হবার কোন বিকল্প নাই। সরকারকে তাই দেশের ভেতর থেকেই এটি আহরণ করতে হবে। সমকক্ষ হবার একমাত্র উপায় হলো নিজেদের জ্ঞান ব্যবহার করা।

❏ ধরিত্রী সম্মেলনে দারিদ্রের বিষয়টি আনা হয়নি। আমরা দাবী করেছি শিগ্‌গির এঁর উপর পূর্ণাঙ্গ কনভেনশন হোক। পাশ্চাত্য জগত তার ভোগ-বিলাসী জীবনের পূর্ণ পারিবেশিক মূল্য চুকিয়ে দিলে সম্পদের হস্তান্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে, এইডের প্রয়োজন হবে না।

❏ নারী সংগঠনের এখানে উদ্বিগ্ন হবার দুটি কারণ ছিল। একটা হলো প্রকৃতি ও নারীকে এক করে দেখার প্রবণতা। ঘর পরিষ্কার রাখা থেকে এখন পৃথিবী পরিষ্কার রাখার যাবতীয় দায়িত্ব যেন মহিলাদের। দ্বিতীয়টি হলো যে ধরনের পপুলেশন প্রোগ্রাম নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকার দুইই হরণ করে পরিবেশের দোহাই দিয়ে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা।

❏ জনসংখ্যার দ্বারা পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বলে ধনী দেশগুলো সমস্যাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে লড়াই হবে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। তারপর নিজেদের জীবন যাত্রার ফলে সৃষ্ট দূষণগুলোর দিকে তাকাতে হবে।

❏ শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যে কোন ফোরামেই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখা দেবে, ধরিত্রী সম্মেলনও তার ব্যতিক্রম নয়।

❏ আগামীতে যে পরিবেশ কাঠামো তৈরি হবে তাতে সব কিছু ব্যাপকভাবে আলোচনা হবে। এজেন্ডা-২১ এর আলোকে বাংলাদেশের এজেন্ডা আমরা তৈরি করবো।

❏ ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক ভূমিকা পালন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সরকার তার থেকে একটি গুণগত পরিবর্তন আনতে চায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে কাজ করতে চায়।

❏ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে, সন্ত্রাসকে পরাভূত করতে হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলোর ঐক্যের প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশী।

❏ আধুনিক কৃষির সমস্যাগুলোর ব্যাপারে যাঁরা উদ্বিগ্ন বোধ করছেন তাঁদের আরো ব্যাপকভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরা উচিত, যাতে এ ব্যাপারে একটি জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টি হতে পারে।

❏ দেশের পরিবেশ বিজ্ঞানী ও পরিবেশ কর্মীদের ধ্যান ধারণাকে আরো স্পষ্ট করে তুলতে হবে। আমাদেরকে আরো জানতে হবে, অনুশীলন করতে হবে তাদেরকে নিয়ে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য আরো মত বিনিময় করতে হবে।

❏ পানি সেচের জন্য এদেশে বহু উপযুক্ত পন্থা রয়েছে— গভীর নলকূপ তার মধ্যে একটি নয়। অথচ ত্রিশ হাজার গভীর নলকূপ দেশে লাগানো হয়ে গেছে। কয়টা চলে, কিভাবে চলে, কেন চলে সেটাও বিরাট ইতিহাস। তার মধ্যে আরো গভীর নলকূপ বসানোর জন্য গভীরভাবে আয়োজন চলছে।

❏ ধরিত্রী সম্মেলনে আমাদের প্রধান মন্ত্রীর যাওয়া এবং তাঁর একটি সক্রিয় বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়া দরকার ছিল; আমরা একটি সুযোগ হারিয়েছি। ভবিষ্যতে পরিবেশ ও উন্নয়নের পুরো ব্যাপারটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে এটি প্রধান মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ফোকাসে থাকা উচিত।

❏ যে গণতান্ত্রিক সরকার এসেছে আমরা তাকে শক্তিশালী দেখতে চাইনা। সরকার যদি নিজের মধ্যে সেই শক্তি অনুভব না করেন তা হলে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিচ্ছি, শুধু যা দরকার তা অর্জনে বলিষ্ঠতার সঙ্গে ভূমিকা পালন করুন ও কাজে নামুন।

❏ শুধু শহরে নয় গ্রামের ভেতরে ভেতরে সন্ত্রাস যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। সন্ত্রাসকে যদি সরকার না খেতে পারে তা হলে সন্ত্রাসই এই সরকারকে খেয়ে ফেলবে।

❏ জনগণের অংশগ্রহণের কথা বলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে। এর কাঠামো আমরা গড়ছি না বরং যে টুকু ছিল অবহেলায় তা ভেঙ্গে দিচ্ছি। উপজেলার পদ্ধতিটাকেই বাতিল করার কোন কারণ ছিলনা। গ্রাম সরকারের ধারণাটি ক্ষমতাশীন দলের একটি বলিষ্ঠ প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু এখন আর এ নিয়ে কিছু শোনা যাচ্ছেনা। মানুষকে কাজের মধ্যে আনতে চাইলে এই উভয়েরই বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী।

❏ বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকে পরিবেশ পরিচর্যা করতে শেখাতে হবে। স্কুলের আঙ্গিনায়, স্কুলে উচ্চতর পর্যায়ে পাঠ্যসূচীতে এর পাঠ ও অনুশীলন হওয়া দরকার।

❏ পরের সমালোচনা না করে নিজেদের আত্মসন্ধানই এখন বেশী প্রয়োজন। নিজেদের সঙ্গে নিজেদের ষড়যন্ত্র যদি আমরা বন্ধ করতে পারি তবে বাইরেরটির সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারবো।

❏ দারিদ্র নিয়ে, নিজেদের অধিকার নিয়ে দুনিয়ার সঙ্গে কথা বলতে হলে নিজস্ব রাজনীতির গণভিত্তিকে শক্তিশালী করতে হবে। পরিবেশ নিয়ে কথা বলার সময় নিজেরা ব্যাপক জনগণের কাছ থেকে কি রকম দূরত্বে অবস্থান করছি তা বিবেচনা করতে হবে। আমরা কি সাধারণ মানুষের জীবন— পরিবেশের বিনিময়ে উন্নয়নের নীতিকে ঢালাও ভাবে গ্রহণ করিনি? আমদানী বর্জ্য-ভিত্তিক শিল্প, চিংড়ি চাষ, গভীর অরণ্যের কাঠের যথেচ্ছ শিল্প-ব্যবহার এসব তারই উদাহরণ।

❏ যেটুকু সম্পদ আমাদের আছে তাতে মানুষের অধিকার নেই। যেমন ভূমির ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত না করতে পারলে দারিদ্র্য বিমোচন অসম্ভব।

❏ পরিবেশ তো বটেই, আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে গড়ে তুলতে চাইছি, আন্তর্জাতিক বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেভাবে আমাদের যথাযথ স্থান নিতে চাচ্ছি অনেক জ্ঞানযোগী মানুষের অবদান ছাড়া তা সম্ভব হবে না।

❏ আমাদের পরিবেশের জন্য একটি দিক আছে ভেতরে আর একটি দিক আছে বাইরে। ইকোডিপ্লোমেসীর জন্য গলাবাজিই যথেষ্ট নয় এর জন্য জ্ঞানের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সরকার আমাদের নেতৃত্ব দিক, এনজিও নেতৃত্বের প্রয়োজন হবে না। সরকারের নির্দেশে আমরা সাধ্যমত করবো। জনগণ সম্পৃক্ত বলিষ্ঠ রাজনীতি ছাড়া আমাদের সম্পদকে নিরাপত্তা দেয়া যায় না, যেমন নিরাপত্তা দেয়া যায় না জাতীয় নেতার জীবনকে।

❏ সরকারের সাফল্যের জন্য সবার কাছ থেকে একটি ইতিবাচক ভূমিকা প্রয়োজন। সরকারকে বলিষ্ঠ করার জন্য আরো উপলব্ধি ও চিন্তাভাবনাকে অবশ্যই স্বাগতম জানানো হবে। স্থানীয় সরকার কাঠামোর ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। তৃণমূল পর্যায়ে এ রকম সরকার দায়িত্ব পালন না করলে জনগণের অগ্রবাহিনী সৃষ্টি হবে না।

❏ ২০ বছরের জন্য যে ফরেষ্ট্রি মাষ্টার প্ল্যান করা হচ্ছে তাকে সকলে মিলে সমৃদ্ধ করা দরকার। শেষ পর্যন্ত সম্পদের উপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাটাই বড় কথা সাধারণ মানুষ যেন কর্মদ্যোগ নিতে পারে সে জন্য উপযুক্ত ঋণ দেবার ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী।

❏ আমরা সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। দুর্বলতার দিক তুলে ধরতে হবে, তেমনি সাফল্যের দিকও। যারা দূর্নীতিমুক্ত বলিষ্ঠ নীতির মানুষ তাদের বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষী চক্রের ষড়যন্ত্রের শেষ নাই। আমরা যেন জেনে না জেনে তাতে পা না রাখি, সজাগ থেকে কাজ করি। সফল আমরা হবোই।

ইতিহাসের ঢাকা নগরী : প্রযুক্তি ও জনজীবন [মে- '৯৩]

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

"নাবিকদের আর জাহাজ নির্মাতাদের কোলাহল, বাণিজ্যের ব্যস্ততা, রাজকীয় জাঁকজমক–সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। নেমে এসেছে একটানা নিস্তব্ধতা আর একাকীত্ব। সব কিছু এক বেদনার্ত শান্তির কবলিত।"

দৃশ্যটি ঢাকার ধোলাই খালের। ১৮০০ সালে ঢাকায় কালেক্টর ডি-অয়লি এমনিভাবেই তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করছিলেন এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথের অবক্ষয়ে। তাঁর ভাবনা সে সময় ফিরে গিয়েছিল মোগল রাজধানী ঢাকার গৌরবময় দিনগুলোতে, ধোলাইয়ের পাড়ে যখন তৈরি হচ্ছে মীরজুমলার, শায়েস্তা খানের নৌবহর; এখানে ভীড়ছে দূর দূরান্তের সওদাগরী জাহাজ। আর যে ধোলাইকে তিনি সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন সেটি ক্রমশ ঃ ধ্বংসস্তূপে এবং আবর্জনায় আক্রান্ত। তারপরও বহুযুগ কেটে গেছে। আজ আর খালের চিহ্নটুকুও নাই। অবশ্য নিস্তব্ধতা বা একাকীত্বেরও কিছুই নেই। এর নামটি আজ সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্য যুগের অন্য প্রযুক্তির তৎপরতার সংগে, ধোলাই খালের যন্ত্র তৎপরতার সংগে।

যে কোন জনপদে জীবনের সংগে সব সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে জীবনের নিয়ামকগুলো। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিরায়ত উপায় উপকরণগুলো যেমন এতে থাকে, তেমনি সুন্দর করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষ আরো কুশলী হয়ে উঠতে চায়। এখানেই আসে প্রযুক্তির প্রশ্ন, যার সংগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানের সমর্থন থাকতে হয়। ইতিহাসের ঢাকা নগরী তা শুধু একটি জনপদই ছিল না, এটি তো সেই রহস্যনগরী যার সৃষ্ট সম্পদের কথা, যার বাসিন্দাদের কুশলতার কথা আলোচিত হতো বিশ্বের নগরে-বন্দরে; ভ্রমণের হাজারো ঝুঁকি নিয়ে যার উদ্দেশ্যে তরী ভাসাতেন বিশ্বের সওদাগর আর পর্যটকরা।

ঢাকার ইতিহাসের এই অধ্যায়ের শুরু যেদিন সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খান আফগান, মগ আর পর্তুগীজদের সংগে যুঝতে গিয়ে রাজধানী নিয়ে আসতে চাইলেন উপদ্রবের আরো কাছাকাছি। ধলেশ্বরী আর বুড়ীগঙ্গার স্রোত ধরে এখানে এসে তিনি অনুভব করলেন নদী যোগাযোগের সুযোগপূর্ণ অথচ উচ্চ অবস্থানের এই জায়গাটিই হবে রাজধানীর উপযুক্ত স্থান। সেটি ১৬০৮ সনের কথা। প্রাকৃতিক জলধারার সংগে আঁকাবাঁকা খালটি খনন করিয়ে ইসলাম খাঁ ধোলাইকে পূর্ণত্ব প্রদান করেন– যা তখন ডেমরার কাছে বালু নদী থেকে বের হয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে এর প্রধান জলধারার গৌরবে বুড়ীগঙ্গায় পড়তো। এর সংগে সংযুক্ত ছিল শহরের নানা অঞ্চলের আরো ছোট ছোট বহু জলধারা। সব মিলিয়ে নৌ প্রযুক্তির ব্যস্ত নগরী ঢাকাকে সেদিন কোন কোন ইউরোপীয় পর্যটক তুলনা করেছেন ভেনিসের সংগে। পর্যটকদের একজন ছিলেন ফরাসী বণিক তাভের্নিয়ের। ১৬৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় পৌছে তিনি লেখেন :

"শহরটি খুব বড়, দৈর্ঘ্য সুবিস্তৃত। সবাই নদীর ধারে বাস করতে চায়। শহরটি লম্বায় সাত মাইলের ও বেশি।"

পর্তুগীজরা এর আগে থেকেই এ অঞ্চলে আসছিলো, কখনো দস্যুরূপে, কখনো শান্তিতে। এবার ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ বণিকরাও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কুঠি গড়লো বাংলার মোগল রাজধানী ঢাকায়। বুড়ীগঙ্গার ধার ঘেঁষেই এসব কুঠি—আজ যেখানে আহসান মঞ্জিল সেখানে, যেখানে মিটফোর্ড হাসপাতাল সেখানেও। তখন বাণিজ্য কুঠিগুলোর প্রধান কাজ ঢাকার বিশ্বনন্দিত রফতানী দ্রব্যগুলো নিজদেশের জন্য ক্রয় করা। ঢাকার সমৃদ্ধির জন্য এই

চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল মোগল রাজদরবার আর সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের থেকে চাহিদা। পুরো বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর উইলিয়াম হেজেস ১৬৮২ সালে ঢাকায় এসেছিলেন সুবেদার শায়েস্তা খানের সংগে বাণিজ্য সুবিধা সংক্রান্ত আলাপের জন্য। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা জানতে পারি :

"নদীতে পালতোলা বজরাগুলো বেশ আরামদায়ক। বজরার দু' ধারে ভেনেশিয়ান জানালার ভেতর দিয়ে আরামে বসে নদীর দৃশ্য দেখা চলে। পাশ দিয়ে চলে গেল বড় বড় জাহাজের একটি বহর—এগুলো ঢাকা থেকে পণ্য নিয়ে যাচ্ছে হুগলীতে কোম্পানীর জাহাজে বোঝাইয়ের জন্য। সেখান থেকে যাবে ইউরোপে। ২৫শে অক্টোবর ঢাকা নগরীতে প্রবেশের সময় বজরা থেকে যে দৃশ্য চোখে পড়লো তা অনন্য। নদী ঘেঁষেই লালবাগ কেল্লার মিনার আর বুরুজগুলো মাত্র কয়েক বছর আগে আওরঙ্গজেবের পুত্র সুবেদার আজিম সেটি নির্মাণ শুরু করিয়েছেন। একটু দূরেই শাহসুজার তৈরি বড় কাটরা-বিশাল সম্মুখ ভাগে সুউচ্চ প্রধান ফটক, পাশে অপেক্ষাকৃত নিচু পার্শ্ব ফটক, অষ্টকোণ মিনার-সবই নদীকে সামনে রেখে। আর রয়েছে শায়েস্তা খানের তৈরি ছোট কাটরা, ছোট কিন্তু তাঁর আসলের নিজস্ব স্থাপত্য বৈশিষ্টে মন্ডিত।"

যে শহর হেজেস দেখলেন তা টঙ্গী পর্যন্ত ১৪ মাইল বিস্তৃত। অসংখ্য গলি গুঁজিতে পরিপূর্ণ। শায়েস্তা খান থাকেন কেল্লার ভেতর প্রাসাদে এখানেই তাঁর সংগে আলোচনা হলো। কেল্লা, কাটরার পেছনে চক এবং তার সুন্দর মসজিদ। আরো পরে হোসেনী দালান, ঈদগাহ; সাতগুম্বুজ মসজিদ।

কি এই পণ্য যা নিয়ে এত বাণিজ্য। হেজেসের আমলের বেশ কিছু পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কিছু বাণিজ্য রেকর্ড থেকে এ সব পণ্যের যে তালিকা পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে :

সূতা, সূতী বস্ত্র, চাটি বা প্রদীপ, পাটের বস্তা, চূণ, কালজিরা, তল, লাক্ষা, হাতীর দাঁত, সুপারি, পান, তামাক, মাদুর, কুসুম ফুল, চাল, খেসারী, মুগ, মশুর, কলাই, বুট, মটর, সরিষা, পিঁয়াজ, চিনি, গুড়, ঘি, লবণ, হলুদ, আদা, মরিচ, চিড়া, আবীর, নারকেল, মাছ, কাঠ কয়লা, কাঠ, কাঠের আসবাব, নৌকা, কাগজ, কালি, মৃৎপাত্র, সোনা, রুপা, লোহা ও পেতলের সামগ্রী, লোহার পাত, মধু, পাথর, বাঁশ, ঝুড়ি, আফিম, লং, সব্জী ও ফল।

জীবনের বিচিত্র চাহিদার সংগে তাল মিলিয়ে বিচিত্র পণ্য। এ তালিকার মধ্যে আমদানী পণ্য খুব বেশি নাই প্রধানত ধাতু এবং ধাতুর দ্রব্যগুলো। রফতানীর তুলনায় আমদানী খুব কম হওয়াতে ঢাকার দ্রব্যাদির মূল্য বিদেশী বণিকরা মেটাতেন সোনা বা রূপা দিয়ে। রফতানীর একটি অংশ গ্রামাঞ্চলের কৃষিপণ্য। বাকী একটি বিরাট অংশই হলো ঢাকা এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে উৎপাদিত শিল্প দ্রব্য। বলতে গেলে ঢাকা নগরীতে তখন নানাবিধ উৎপাদন প্রযুক্তির একটি ঘন সমাবেশ ছিল। এর বিভিন্ন পাড়ার যে নাম আজ অবধি টিকে রয়েছে তাও এ কথার সাক্ষ্য দেয় তাঁতী বাজার, বানিয়া নগর (সোনা-রূপার কাজ), কামার নগর, কুমারটুলী, পটুয়াটুলী (চিত্রণ শিল্প), সূত্রাপুর (ছুতার), শাঁখারী বাজার এগুলো তখন থেকেই চলে এসেছে।

ঢাকাকে সব চেয়ে অধিক খ্যাতি দিয়েছিল এর বস্ত্র বিশেষ করে সূক্ষ্ম মসলিন। মোগল আমলে এখানে রফতানী নির্ভর এক সুবিস্তৃত বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছিল। ঢাকা এবং আশপাশে সোঁনার গাঁ, ধামরাই, জঙ্গলবাড়ি, বাজিতপুর এ সব এলাকা জুড়ে এই শিল্প। এখানকার মোটা সূতীবস্ত্র প্রধানত বাংলার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাত। আর সূক্ষ্ম মসলিন যেত রাজপুরুষ ও উচ্চ শ্রেণীর ব্যবহারে এবং রফতানীতে। মসলিনের বিশ্বখ্যাত উচ্চ মানের মধ্যেও উচ্চতম মানের মসলিন মালবুস খাস তৈরি হতো স্বয়ং দিল্লী সম্রাটের ব্যবহারের জন্য। মসলিনের মান এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বাদশাহী প্রশাসনের একটি বিভাগই সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৭৮৭ সালে এর রফতানী যখন অনেক হ্রাস পেয়েছে, সেই বছরও ঢাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকার মসলিন শুধু ইংল্যান্ডে রফতানী হয়েছে। তখনকার মুদ্রা-মানের বিবেচনায় এই পরিমাণ কম নয়।

ঢাকার মসলিনের প্রযুক্তিগত কৌশল শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপেরও বিস্ময় উদ্রেক করতো। ১৮৩৬ সনে ড. উরে নামক বিশেষজ্ঞ লিখেছেন ঃ

"ঢাকার মসলিন বস্ত্র ও সূতা এখনও তৈরি হচ্ছে, যার কাছে ইউরোপের উদ্ভাবনী শক্তিও হার মানে। এ নিয়ে তাঁদের ঔৎসুক্যেরও সীমা ছিল না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সে সময়ের একটি প্রতিবেদনে আছে;

অণুবীক্ষণের তলায় দেখা গেছে ঢাকাই মসলিনের সূতা অনিয়মিতভাবে পাকানো যার থেকে অনেক আঁশ বেরিয়ে থাকে। একটি সূক্ষ্ম তন্তুর ব্যাস এক ইঞ্চির ১,০০০ ভাগের ১ ভাগ থেকে ১,৫০০ ভাগে ১ ভাগ পর্যন্ত হয়। সূতা চ্যাপ্টা ও ফিতার ন্যায়। তন্তুর এই আকৃতির উপর ঢাকাই মসলিনের স্বচ্ছতা নির্ভরশীল।"

কিন্তু প্রযুক্তিটি ছিল আগাগোড়া বিকেন্দ্রীকৃত শ্রম ঘন এবং হস্ত কুশলতা নির্ভর। এর যান্ত্রিক বিনিয়োগ মোটেই ব্যয়বহুল ছিল না। ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস টেলর তাঁর ১৮৪০ সালে প্রকাশিত বইয়ে লিখেছেন :

কাঁচামাল থেকে সূতা তৈরি এবং তা থেকে উৎকৃষ্ট মসলিন বয়ন সম্পূর্ণ করতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মোট সংখ্যা ১২৬ বলে জানা যায়। এর সবগুলোই বাঁশের ছোট খড় বা নলখাগড়ার তৈরি এবং পাতলা দড়ি বা সূতা দিয়ে বাঁধা থাকে। এ ছাড়া এ সকল জিনিসপত্র তৈরি কারিগরি কৌশল এতই গ্রাম্য ও সহজ যে প্রায় প্রত্যেক তাঁতীই নিজে নিজে সবগুলো উপকরণ তৈরি করতে পারে।

শিল্পোৎপাদনের গৌরবময় দিনগুলোতে ঢাকা-কেন্দ্রীক শিল্পগুলোতে যথেষ্ট বৈচিত্র ছিল- তা রফতানীকৃত পণ্যগুলোর তালিকা থেকেই বোঝা যায়। তবে মনে হয় নন্দনকলাসম্মত আবরণ এবং আভরণ সৃষ্টিতেই ঢাকার খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। মসলিনের পরেই যে কারণে ঢাকার নাম বেশি ছড়াতো তা হলো এর সূচী-শিল্প, বিশেষ করে ফুল-বুটি তোলা বস্ত্র কাসিদা। প্রধানত পারস্য, মিশর, আর তুরস্কে পাঠানো হতো ঢাকার কাসিদা। তুরস্কের সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মে পাগড়ীতে ব্যবহৃত হতো বলে এখানেই কাসিদার একটি বিরাট চাহিদা ছিল বলে জানা যায়। শঙ্খের প্রাকৃতিক কঠিন আকৃতির উপর অস্ত্র প্রয়োগে কি সুন্দর অলংকার সৃষ্টি করা যায় তার প্রমাণ ঢাকার শাঁখারী বাজারের শাঁখারীরা সেদিন রেখেছে, আজও রাখছে প্রায় একই প্রক্রিয়ায়। শাঁখার জোড়া, এর স্থায়ী চিত্রণের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি এখানেই গড়ে উঠেছিল। সোনা-রূপার সূক্ষ্ম কাজের জন্য যে ধাতুবিদ্যা ও কুশলতা প্রয়োজন তাতেও ঢাকার প্রসিদ্ধি ছিল বহু দিনের।

ঢাকার প্রসিদ্ধি যার জন্যই হোক এর সমৃদ্ধি কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় কিছু রাজপুরুষ, ধনী-ব্যবসায়ী, এবং সর্দ্দার পোদ্দার লোকের মধ্যে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান ভাল ছিল বলে মনে হয় না, সেই সমৃদ্ধির যুগেও। মোগল রাজধানী থাকার সময় বা তার পরপর ঢাকার লোকসংখ্যা গিয়ে পৌঁছেছিল প্রায় দশ লক্ষে। পৃথিবীর কোথাও তখন এত বড় জন বসতিপূর্ণ আর ক'টি নগরীইবা ছিল। উৎপাদন ও বাণিজ্যের বিশাল কেন্দ্র হওয়াতে কুশলী কারিগর ও কর্মীরা এখানে ভীড় করেছিলেন। কর্মসংস্থান হয়তো ছিল, আশেপাশের অঞ্চল থেকে বেশি, নিরাপত্তাও ছিল, কিন্তু পছন্দসই জীবন ছিল কি?

যে তাঁতীদের জন্য ঢাকার এত সমৃদ্ধি তারই উদাহরণ নেওয়া যাক। যে সময় একজন কুশলী তাঁতীর আয় মাসে ৪ টাকা এবং তার সহকারীর আয় মাসে ২ টাকা, সে সময় মোটা চালের দাম দেখা যাচ্ছে টাকায় পৌনে ২ মণ। পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারেরত চালের খরচ যোগাতেই মাসে ২ টাকা ফুরিয়ে যেত। স্পষ্টত ঢাকার পণ্যরাজির চাহিদা ঢাকা শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল না। বিশ্বনন্দিত প্রযুক্তির সৃষ্টিকাররা ছিলেন সে প্রযুক্তির সুফল থেকে সর্বোতভাবে বঞ্চিত। অবাক হবার কিছু নেই যে ঢাকার স্বর্ণযুগ বলে কথিত শায়েস্তা খানের আমলে এসে ইতালীর পর্যটক মানুচ্চি লিখেছেন– এখানে সাধারণ ঘরবাড়ি তৈরি হয় খড় দিয়ে। তাভার্নিয়েরেরও মতে এগুলো বাঁশ খড়ের কুঁড়ে ছাড়া কিছু নয়।

সাধারণ লোকের জন্য ঢাকায় তখন নাগরিক সুবিধা বলতেও বেশী কিছু ছিল না। যানবাহন শুধু ধনী লোকেরাই ব্যবহার করতো– শুধু ঘোড়া অথবা পাল্কী। কোন রকম চক্রযানের প্রচলনই ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের অন্যত্র গরুর গাড়ীর ব্যবহার থাকলেও ঢাকায় মানুষের যাতায়াত বা মাল পরিবহন কোনটির জন্যই এটি ছিল না। সাধারণ লোক শুধু হেঁটেই যাতায়াত করতো। নেহাৎ প্রয়োজনে নৌকাই ছিল একমাত্র সম্বল। দশ লক্ষ লোক অধ্যুষিত শহরের আবর্জনা নিষ্কাশনের অভাব একে এমন অবস্থায় নিয়ে আসতো যে মাঝে মাঝে বাজারের এক এক অংশ ইচ্ছে করেই পুড়িয়ে দিতে হতো।

মোগল রাজ সরকার অবশ্য দরিদ্র ও অসুস্থদের দেখাশোনার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা করতো। সম্রাট জাহাঙ্গীরের ফরমান ছিল "সমগ্র সাম্রাজ্যে বড় বড় শহরে হাসপাতাল স্থাপন করা হোক এবং এর সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধপত্রের ব্যয়ভার সরকার থেকে নির্বাহ করা হোক।" সেই ফরমানের কার্যকারিতা ঢাকায় শেষ পর্যন্ত যতটুকু টিকে ছিল তাতেই দেখা যাচ্ছে ১৭৬৯ সালে ঢাকাস্থ দাতব্য চিকিৎসার কাজে রাজ সরকারের ব্যয় হয়েছে মোট নয় হাজার টাকা। টাকার মানের বিবেচনায় এটি পরবর্তী কালে কোম্পানি সরকারের ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত মানের ছিল। একথা ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস টেলরও তাঁর কোম্পানি আমলের ঢাকার বিবরণীতে (১৮৪০) স্বীকার করে গেছেন। তবে বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রয়োজনের তুলনায় এ ছিল একেবারেই অপ্রতুল। অভুক্ত নাগরিকদের জন্য লঙ্গরখানার ব্যয় নির্বাহের জন্য মোগল আমলে কিছু খাস জমি বরাদ্দ করা ছিল।

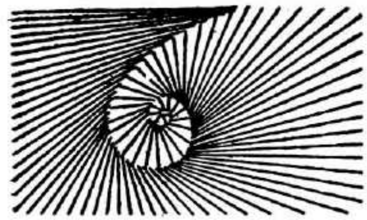

তাম্র যুগের এক নিঃসঙ্গ পথিক : আইসম্যান [সেপ্টেম্বর-১৯৯৩]

নাতাশা

পর্বতটি বেশ সুউচ্চ, ক্লান্ত পথিক চূড়ার কাছে উঠে বিশ্রাম নিতে গিরিপথের একটি গর্তমত জায়গায় গিয়েছিল। ঐ অতখানি উপরে সে কেন গিয়েছিল কোনদিন আমাদের সে কথা জানা হবে না। হয়তো বা সে ছিল একজন পশুচারক। একটি পশু পর্বত ঢালে চরতে চরতে বেশি উপরে উঠে গিয়েছিল বলে তাকে ফিরিয়ে আনতে তার সেখানে যাওয়া। হয়তো বা ব্যবসায়ী ছিল সে, পর্বত অতিক্রম করে অন্যদিকে যাওয়া দরকার ছিল। অথবা তুকতাক বিদ্যার দাবিদার সাধুগোছেরও হয়ে থাকবে সে। আমরা শুধু কল্পনাই করতে পারি।

কিন্তু এর অনেক কিছু আমাদের কল্পনা তেমন করতে হচ্ছে না, কারণ এ সব তখন চাক্ষুষ। আমাদের পথিক এখানে বিশ্রাম করতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বার্চগাছের তৈরি তার থলেটা খুলেছিল। এর ভিতর সযত্নে সবুজ পাতায় মোড়া কয়েকটি কাঠ-কয়লা ছিল। যদি এত বেশি উপরে উঠে সে না যেত তাহলে হয়ত ঐ কাঠকয়লা দিয়ে আগুন জ্বালাতো। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয় কারণ আগুন জ্বালাবার ডালপাতা নিতে কোন ছোট ঝোপঝাড়ও নাই। থলের মধ্যে আইব্রে পশুর এক টুকরা মাংস ছিল, খুব সম্ভব ঐ দিনই তা শিকার করেছিল সে। আর ছিল কিছু ছোট ছোট বন্য ফল। খাবার বলতে এই টুকুই ছিল।

মানুষটা পুরুষ, বয়স ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে। উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। জায়গাটা দারুণ ঠাণ্ডা। উপযুক্ত কাপড় কিছু আমাদের পথিকের ছিল। পরনে তার পশু চর্মের পোষাক। গলার দিকে জড়ানো ঘাসের বুনানো শাল। তার চামড়ার জুতার ভেতরে খড় পোরা ছিল। পোষাকের তলায় তার নগ্ন চামড়ায় কিন্তু ছিল বেশ কিছু আঁকিবুকি; উলকি কেটেছিল সে গায়ে। পিঠের নিচের দিকে এক সঙ্গে কয়েকটি করে সমান্তরাল নীল রেখা, বা হাঁটুর পেছনে একটি ক্রস চিহ্ন, ডান গোড়ালির সঙ্গে ডোরা চিহ্ন। কাছেই ছিল তার কুঠারখানি মানুষের দখলে সেদিনকার সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। আজ যাকে আমরা আল্পস পর্বত বলি সেটির দিকে তাকাচ্ছিল ঠিক সে সময় ঘটলো বিপত্তি। হয়তো বা হঠাৎ আসা কোন তুষার ঝড় তাকে হকচকিয়ে দিয়েছিল, হয়তো বা সে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল ক্লান্তিতে বা কোন অসুখে। তাকে সেই জায়গায়, সেখানেই বিশ্রাম নিতে হলো। একে একে সে তার সঙ্গের জিনিসগুলো নামিয়ে রাখলো তার আশে পাশে তারপর বাম দিকে কাৎ হয়ে একটি বড় পাথর খণ্ডের উপর শুয়ে পড়লো। ঘুম তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছিলো সে। সেই ঘুম আর কখনো ভাঙ্গেনি। অজস্র তুষারের গভীর গহীনে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল সে– পাঁচ হাজার বছরের জন্য।

১৯ শে সেপ্টম্বর, ১৯৯১। জার্মান দম্পতি হেলমুট আর এরিকা পার্বত্য অঞ্চলে হাইকিং করতে গিয়েছিলেন। জায়গাটি অষ্ট্রিয়া আর ইটালীর সীমান্তের কাছাকাছি। সাধারণ ভ্রমণপথের থেকে একটু সরে গিয়েছিলেন তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে। হঠাৎ এরিকার নজরে পড়লো বরফের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা একটি ছোট মাথা ও কাঁধ। প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন কেউ একটি পুতুল ফেলে গিয়েছে এখানে। কিন্তু শিগগির ভুল ভাঙ্গলো। আর ভুল যখন অবশেষে পুরাপুরি

ভাঙ্গলো তখন জানা গেল মানুষের এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম প্রায় অবিকৃত মৃতদেহ এটি। দেহটি অবিকৃত থেকেছে মিশরের মমীর মতো কোন কৃত্রিম ব্যবস্থায় নয় বরং প্রকৃতিরই সযত্ন রক্ষণে। তার অবিকৃত থাকার ব্যাপারটি একটি প্রাকৃতিক দৈব ঘটনা। আমাদের সেই নিঃসঙ্গ পথিক সেই যে পর্বতের ঢালে একটি নিচু গর্তমতো জায়গায় শুয়েছিল সেই গর্তটি তুষারে ভর্তি হয়ে সমান হয়ে গিয়েছিল। এরপর হাজার হাজার বছর ধরে এর উপর দিয়ে যখন হিমবাহ গড়িয়েছে তার মহা-পেষণ এই মৃতদেহকে ছুঁতে পারেনি। যদি পারতো তাহলে এটি ছিন্নভিন্ন পিষ্ট হয়ে কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। বরফে ঠাসা ঐ গর্তে কোন অক্সিজেন থাকতে পারেনি। তাই ঐ নিম্ন তাপমাত্রায় কোন রকম পচন ধরতে পারেনি দেহে।

আবিষ্কৃত হবার পর দ্রুত খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে প্রাচীন কালের সেই নিঃসঙ্গ মানুষটির। সে আজ পরিচিত আইসম্যান বা বরফমানুষ নামে, প্রত্নতত্ত্ববিদ, বিজ্ঞানী, সাধারণ মানুষ সবারই দারুণ কৌতূহল তাকে নিয়ে। এর কারণ তার দেহের আশ্চর্যজনক অবিকৃতি। অক্ষিকোটরে চক্ষু গোলক পর্যন্ত তার যথারীতি রয়ে গেছে যেন পাঁচ হাজার বছর অতীত থেকে এসে সে আজকের দুনিয়ার সব কিছুর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছে। তার সঙ্গে যে জিনিসপত্র ছিল সেগুলোও চমৎকার অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সব মিলে প্রত্নতত্ত্ববিদের জন্য এ এক মহা আবিষ্কার অনেকে যার তুলনা করেছেন বিশের দশকে মিশরে তুতান খামুনের মমি ও সম্পদ ভাণ্ডার আবিষ্কারের সঙ্গে।

তবে এই আবিষ্কারের মধ্যেও একটু দুঃখ রয়ে গেছে। ৫০০০ বছর যা করতে পারেনি ৯১-এর সেই সেপ্টম্বর দিনে এরিকা আর হেলমুটের তাকে দেখে ফেলার পর মাত্র ৪ দিনে আজকের অতি উৎসাহী উদ্ধারকারীরা তাই করেছে। প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন সাম্প্রতিক কোন দুর্ঘটনার শিকার এই বেচারা। বরফ কাটা কুঠার ব্যবহার করে আর স্কী করার লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে তাকে বরফ শয্যা থেকে তোলার চেষ্টা করেছে। ফলে যা হবার তা হয়েছে। ওদের এক জন বরফ খোঁড়ার জন্য ওখান থেকেই একটি লাঠি কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। পরে দেখা গেছে যে তিনি যাকে কাঠি মনে করেছিলেন সেটি আসলে আইসম্যানেরই পিঠে বোঝা নিবার সুবিধার্থে ব্যবহৃত ব্যাকপ্যাকের ফ্রেমের ভাঙ্গা অংশ। কাঠের ফ্রেমে তৈরি বোঝা নেবার এমন ব্যবস্থা এত প্রাচীন কাল থেকে আর কোথাও পাওয়া যায়নি। উদ্ধারকারীদের একজন তাড়াহুড়া করতে গিয়ে আইসম্যানের ৬ ফুট লম্বা ধনুকের এক প্রান্ত ভেঙ্গেই ফেলেছেন। ভাঙ্গা অংশ সবার অজান্তে বরফের মধ্যে থেকে গেছে। এটা উদ্ধার করা গেছে আরো এক বছর পর।

টানা হেচড়ায় আইসম্যানের পোষাকটির যেটুকু টিকে ছিল তাও ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে। হেলিকপ্টারে করে নিকটবর্তী গ্রামে নিবার পর আইসম্যানের দেহকে একটি কফিনে জোর করে ঢুকানো হয়েছে। খুব সম্ভব ঢুকানোর সময় তার বাঁ হাতের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে। ঐ শুরুতে যখন অনেকের মধ্যে অযত্নে দেহটাকে রাখা হয়েছিল তখন তাঁর চামড়ায় ফাঙ্গাস জমতে শুরু করেছিল। প্রথমে উদ্ধারকারীরা টের না পেলেও দক্ষ প্রত্নতত্ত্ববিদ এক নজর তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন এ দেহ অন্তত চার হাজার বছর পুরানো। তাঁর কুঠারখানির ষ্টাইল দেখেই এটি চট করে বলা সম্ভব হয়েছিল। পরে কার্বন ডেইটিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত জানা গিয়েছে যে তার বয়স পাঁচ হাজার বছর।

যদিও প্রথমে কুঠারটি ব্রোঞ্জের মনে করা হয়েছিল, রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা গেল এটি প্রায় বিশুদ্ধ তামার। অর্থাৎ আইসম্যান ব্রোঞ্জ যুগের মানুষ নয়, আরো আগের তাম্র যুগের মানুষ। শুরুতে আইসম্যানের দেহ যথেষ্ট সম্মান না পেলেও তার প্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানার পর পরই তা বিজ্ঞানীদের কড়া পাহারায় চলে গিয়েছে। ইতিমধ্যে তার দেহ তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করা হয়েছে। আধুনিকতম এক্স-রে, কম্পিউটার সব প্রযুক্তি ব্যবহার করে এর সব রকম পরিমাপ উপাত্ত নেওয়া হয়েছে। এ সবের ভিত্তিতে আইসম্যানের পূর্ব চেহারাও উদঘাটন করা হয়েছে। এখন আমরা দেখতে পারছি আমাদের সেই নিঃসঙ্গ পথিকের আসল চেহারা। প্রশস্ত নাক, খানিকটা বেরিয়ে থাকা ওষ্ঠ, কালো চুল, অল্প কালো দাড়ি, সাবধানী চোখ।

কিন্তু হাজার বছরের ওপার থেকে যে মৃতদেহটি আমাদের সামনে আছে অনেকাংশে অবিকৃত হলেও সেটি বেশ জীর্ণশীর্ণ। হাত পা গুলো শুকনা কাঠির মত। পাজরের হাঁড় চামড়ায় প্রায় লেগে রয়েছে। চামড়া টান টান, খয়েরী রঙের ট্যান করা কাঁচা চামড়ার মত। হাতের আঙ্গুলগুলো আধা গুটানো মুঠার মত। হয়তোবা মৃত্যুর মুহূর্তে সে দূরে রাখা কুঠার খানি অভ্যাসবশত হাতে চেপে ধরার চেষ্টা করেছিল। দাঁতগুলো প্রায় সবই অক্ষত অবিকৃত। বরফের চাপে নাক আর ঠোঁট কিছুটা থেতলে গেছে, বাঁ বাহু একটি উপরের দিকে উঠে গেছে। কিন্তু বাকী সবকিছু সাধারণ রয়ে গেছে যেমনটি ছিল পাঁচ হাজার বছর আগে। ভিতরের অঙ্গগুলো তার প্রায় অক্ষতই রয়ে গেছে, এমনকি তাঁর মস্তিষ্কও। প্রাপ্তি স্থানের কাছে অষ্ট্রিয়ার ইন্সব্রুক শহরে ইন্সব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ফ্রীজারেই আপাতত আইসম্যানের বাস। মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য শুধু স্বল্প সময় তাকে বাইরে থাকতে দেয়া হয়।

আইসম্যানের মৃতদেহ তার সময়ের কথা আমাদেরকে যত না জানাতে পেরেছে। ঐ নিঃসঙ্গ পদযাত্রায় তার সঙ্গে যে সব জিনিস ছিল সেগুলো বরং আরো অনেক বেশি জানিয়েছে। নিঃসন্দেহে আইসম্যান তাম্রযুগের সেই সাহসী মানুষদের একজন যারা পর্বতারোহণের সকল দক্ষতা ও সরঞ্জাম নিয়ে বিপদসংকুল এবং জনহীন আসম অঞ্চল পাড়ি দিত। তার পোষাক আর হাতিয়ারের মধ্যে প্রস্তুতির কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না। মৃত্যুর কালে আইসম্যানের মালিকানায় যে সব জিনিস ছিল তার মধ্যে অবশ্যই সবার আগে নজরে পড়ে তার কুঠারখানি। কাঠের তৈরি হাতল একটু বেঁকে গিয়ে প্রান্তে ধাতব অংশে সংযোগের ফাটলে শেষ হয়েছে। এখনো কাঁচা চামড়ার দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে তামার ফলাটি হাতলের সাথে আটকানো রয়েছে। ফলাটি বেশ উন্নত ধরনেরই বলতে হবে। কারণ অতি প্রাচীন যে সব কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো সরল গঠনের, আইসম্যানের কুঠারের মত বক্র গঠন আর নেই। ঘণ্টা আকৃতিতে ছড়িয়ে থেকে এটি হাতলে আটকাবার কাজে অধিকতর উপযোগী। এতদিন মনে করা হতো এই ষ্টাইলের কুঠারের ব্যবহার এসেছে আইসম্যানের সময়ের আরো বহু শত বছর পরে।

আইসম্যানের ছিন্ন ভিন্ন পোষাকের টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে মোটামুটি পূর্বাবস্থায় আনার চেষ্টা করা হয়েছে। শত তালিতে গড়া এ এক জিগ'স পাজলের মত অবস্থা, কাজটি খুব সুন্দর হয়নি। তবুও এর মধ্যে থেকে গবেষকরা কয়েকটি তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন। পোষাকটির মূল সেলাইগুলো দেখা গেছে দক্ষ হাতে পশুদেহের সূক্ষ্ম রগ দিয়ে করা। এর উপর পরবর্তী সময়ে মেরামতের কিছু কাজ দেখা যাচ্ছে স্থুলভাবে ঘাসের সুতার সেলাইতে। এই শেষেরগুলো খুব সম্ভব আইসম্যান নিজেই করেছে। এর থেকে গবেষকরা সিদ্ধান্তে এসেছেন আইসম্যানের একটি সামাজিক যোগাযোগ রয়েছে অন্য মানুষের সঙ্গে যারা তার পোষাক বা হাতিয়ার তৈরির কাজটি করে গিয়েছে। মৃত্যুকালে যত নিঃসঙ্গই থাকুক জীবনে আইসম্যান হয়তো অতো নিঃসঙ্গ ছিল না। পোষাক পরীক্ষা আইসম্যানের বাড়ি সম্বন্ধেও কিছু ধারণা দিয়েছে। পোষাকের মধ্যে পাওয়া গেছে এক জাতীয় বন্য গমের দুটি অতি ক্ষুদ্র ফুল। তার পোষাক থেকে ঝড়ে যাওয়া পশমের সঙ্গে পাওয়া গেছে একই গমের কিছু পরাগ রেণু। এই গমটি জন্মে শুধু মাত্র নিম্ন সমতল ভূমিতে। তাতে বোঝা যায় পর্বতে তার বিচরণ হলেও আইসম্যানের বাড়ি খুব সম্ভব নিচে সমতলে। আর একটি তথ্য এসেছে ওর থলের মধ্যে থাকা কাঠকয়লা থেকে। এই কাঠকয়লার রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে বিভিন্ন ধরনের কাঠ এর মধ্যে রয়েছে। তবে একটি কাঠ এমন যা, আইসম্যানের মৃত্যুর স্থল থেকে দক্ষিণ দিকে পাঁচ ছয় ঘণ্টা হেঁটে যাওয়ার জায়গাতে জন্মে, কিন্তু উত্তর দিকে একে পেতে হলে অন্তত কয়েক দিনের পথ হাঁটতে হবে। এতে মনে হয় আইসম্যানের বাড়ি বর্তমান ইতালীর এলাকায় দক্ষিণ তিরোলে হবার সম্ভাবনাই বেশি।

এবার আসা যাক আইসম্যানের সঙ্গে পাওয়া অন্যান্য সরঞ্জামের কথায়। হরিণের চামড়ার তৈরি এর তীর রাখার তূণটি সবাইকে অবাক করেছে। এমন একটি তূণে তাম্র যুগতো নয়ই ব্রোঞ্জ যুগেরও কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১৪টি তীর এর মধ্যে রাখা ছিল। ধনুকের লাঠিটি ছিল ওর নিজের চেয়েও লম্বা-প্রায় ছয় ফুট। তীরগুলোর মাত্র দুটি ছিল সম্পূর্ণ তৈরি। এদের আগায় চোখা করা ফ্লিন্ট পাথর, গোড়ায় পালক। অন্য তীরগুলো ছিল অসম্পূর্ণ। ধনুকটিতেও ছিলা ছিল না। খুব সম্ভব আইসম্যান তার পুরানো অস্ত্রশস্ত্র হারিয়ে ফেলেছিল বা নষ্ট করে ফেলেছিল। সেই যাত্রায় সে নতুন অস্ত্র তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল। আইসম্যানের সঙ্গে আরো একটি অস্ত্র ছিল। এটি একটি চাকু-ধাতব নয় কাঠের হাতলে লাগানো ফ্লিন্ট পাথরে গড়া চমৎকার একটি চাকু। খুব সম্ভব চামড়া কাটতে অথবা পশুর দেহ কেটে খেতে এই চাকুটি ব্যবহৃত হতো। চাকু ঢুকিয়ে রাখার আবরণীটির মধ্যে যেন নতুনত্ব আছে, কারণ শুকনো শন জাতীয় ঘাসে বোনা এমন একটি অস্ত্র আবরণী তাম্রযুগে আর কোন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে দেখা যায় নি। আইসম্যানের ঝোলায় এ ছাড়া পাথরে তৈরি একটি বড় সূঁচ অগ্রভাগে শিং-এর চোখা অংশ সংযুক্ত একটি কাঠি, মুচড়িয়ে তৈরি সূতার ভেতরে গাঁথা যুক্ত ছিদ্র একটি পাথরের চাকতি এবং চামড়ার সুতায় বাঁধা এক টুকরো ফাঙ্গাস শিং লাগানো কাঠিটি খুব সম্ভব ফ্লিন্ট পাথরে ধার দিতে ব্যবহৃত হতো। আইসম্যানের ঝোলায় এ রকম ভাল মানের বেশ কিছু ফ্লিন্টের টুকরা পাওয়া গেছে যা হাতিয়ার তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে। হয়তোবা সে এগুলোর ব্যবহারও করতো। সূতায় গাঁথা চাকতিটি ঐ ফাঙ্গাস- সে হয়তো প্রাথমিক চিকৎসার একটি ব্যবস্থা আইসম্যানের ফার্ষ্ট এইড সরঞ্জাম।

কিইবা এমন কিছু ছিল আইসম্যানের কাছে। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের দিকের সেই কাল দিনটিতে। তার নিঃসঙ্গ পদ যাত্রার মধ্যে তার পোষাক আষাকে এমন কিছু বৈশিষ্ট তো কোথাও ছিল না। তবুও আজ পাঁচ হাজার বছর পর এমনভাবে আবিষ্কৃত হয়ে গিয়ে অতীতের এই সাধারণ মানুষটি হয়ে পড়েছে বিশ্ববাসীর অনেকের কাছে প্রিয় এবং আলোচনার পাত্র। বিজ্ঞানীদের ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের বহু গবেষণার বিষয়।

এভারেষ্ট শৃঙ্গে : মহাবিজয়ের ৪০ বছর [অক্টোবর-নভেম্বর '৯৩]

স্বাতী

১৯শে মে ১৯৫৩ সন- তেনজিং, হেলারীর এভারেষ্ট বিজয়ের দিন বহু মানুষের বহু দিনের প্রচেষ্টার পর, বহু আত্মত্যাগের পর উদ্ধত গিরিশৃঙ্গকে পদানত করার দিন। সেটি ছিল সারা দুনিয়ার সাড়া জাগানো একটি সংবাদ। ১৯৯২ সনের ১২ ই মে এভারেষ্ট চূড়ায় আর একটি দিন। ৩২ জন নারী পুরুষ সেই একটি দিনে একই চূড়ায় আরোহণ করেছে- একই পথে যে পথে তেনজিং আর হিলারী এগিয়েছিলেন। তাঁরা দুইজন চূড়ার কাছে যে কঠিন সংকীর্ণ জায়গাটুকু অতিক্রমে প্রাণান্ত হয়েছিলেন সেখানটিতে ৩২ জন আরোহীর অনেকে এক পাশ করে সারিবদ্ধ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল যাঁরা চূড়া থেকে নেমে আসছেন তাঁদেরকে পথ করে দেবার জন্য। না ৯২ সনটি কোন বিশেষ ভীড়ের বছর ছিল না। এই ৯৩ তে ১০ ই মে ঐ রেকর্ডও ভঙ্গ হয়েছে। কারণ সেদিন এভারেস্ট চূড়ায় উঠেছেন ৩৮ জন নারী-পুরুষ। এই ভীড় একদিনে ঘটেনি। ১৯৫৩-এর সেই মহা বিজয়ের পর ২০ বছরের মধ্যে মাত্র ৩৮ বার মানুষ এভারেস্ট আরোহণ করেছেন। এর পরের দশবছর আরোহণ ঘটেছে ১০০বারণ ১৯৯২ পর্যন্ত শেষ দশকটিতে এখন অনেকের জন্য চেষ্টা করার একটি বাস্তব সম্মত চ্যালেঞ্জ। এভারেস্ট আরোহণ ১৭ বছরের একজন ফরাসী বালক এই চ্যালেঞ্জে সফল হয়েছে। ৫৫ বছর বয়সী একজন কোটিপতি ভদ্রলোকও এই সাফল্য লাভ করেছে। অথচ আরোহণের পথ, দুর্গমতা, ঝুঁকি অনেকাংশেই রয়ে গেছে বরাবরের মত। বৈচিত্র আনতে গিয়ে নানা রকম বাড়তি চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন একদিনে দ্রুত উঠা, স্কী করে নামা, শীতকালে আরোহণ করা, অক্সিজেন না নিয়ে উঠা ইত্যাদি। অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়াই এভারেষ্ট আরোহণের ঘটনা ঘটেছে ৫১ বার।

আরোহনের সেদিনের প্রয়োজন আর আজকের প্রয়োজনের মধ্যে তফাত কতখানি, কোথায়? ১৯৫৩ সনে তেনজিং ও হিলারী সেই বৃটিশ আরোহন অভিযানের অংশ ছিলেন সেটি ছিল সেদিন পর্যন্ত সব চাইতে সুসজ্জিত ও সুপ্রস্তুতি সম্পন্ন অভিযান। এতে যে তাঁবু ব্যবহৃত হয়েছে তা ছিল অনুরূপ পর্বতারোহণে বহু পরীক্ষিত। আরোহীদের জুতাকে ডিজাইন করা হয়েছে বহু ভাবনা চিন্তায়, খাদ্যের রেশন ব্যবস্থা ছিল-সুচিন্তিত, শারীর বৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বোত্তম চিকিৎসা সুবিধা সঙ্গে ছিল। কিন্তু আজ যে প্রযুক্তির সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে সে তুলনায় ঐ উন্নত ব্যবস্থাকে বলা যায় অকিঞ্চিৎকর।

আগেকার বুটগুলো ছিল চামড়ার তৈরি, সহজেই ভিজে ভারী হয়ে যেত এবং রাতে পানি জমে গিয়ে ফ্রষ্টবাইটের পথ করে দিতে। ওরকম পর্বতারোহরণে একটি বড় আংশকাই হলো পায়ে ফ্রষ্টবাইট। ঐ বিজয়ী অভিযানে অবশ্য নতুন ধরনের রাবার ব্যবহৃত হয়েছিল- কিন্তু তাও ছিল খুব ভারী- প্রায় এক কিলো। আজকের এভারেষ্ট আরোহীরা হালকা ধরনের প্লাষ্টিক বুট ব্যবহার করে আধ কিলোর বেশি যার ওজন নয়। এগুলো শক্ত বা দৃঢ় নয় বরং ক্যাম্বিশের মত নরম-এটি কঠিন পথে চলার কাজটি সহজ করে। সেদিনকার তাঁবুগুলো ছিল সুতীবস্ত্র ও নাইলনে তৈরি যা খাটানো হতো এলুমিনিয়াম রডের সাহায্যে। দুই জনের একটি তাঁবুর ওজন হতো ৬-৮ কিলো, এর আকৃতি হতো সনাতন

ত্রিভুজ আকৃতির। এখনকার তাঁবু আরো উপযোগী কৃত্রিম তন্তুতে তৈরি গোলাকৃতি বা সুড়ঙ্গাকৃতি, ওজন ২ কিলোর বেশি নয়। এরকম আকৃতি ঝড়ো বাতাসকে বাধা দেয় ভাল। এভারেষ্ট আরোহণে কনকনে হাওয়ার ঘন্টায় দেড়শ কিলোমিটারের বেশি বেগের ঝড় প্রায়ই সহ্য করতে হয়। আগুন জ্বালাবার ছোট্ট বুটেন ষ্টোভটিও এখন অনেক উন্নত।

সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন এসেছে আরোহণকারীদের পোষাকে। যে নতুন ধরনের কৃত্রিম তন্তুর অন্তর্বাস ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে শরীরের ঘাম বাইরে চলে আসে। আগেকার ব্যবহৃত সিল্কের অন্তর্বাসে ঘাম ভেতরে থেকে যেত। পলিষ্টার তুলায় পোষাক যত তাপ বিরোধী এখন হচ্ছে আগেকার পশমের পোশাকে তা হতো না। ১৯৫৩ তে শেরপা কুলীদেরকে টিনজাত খাদ্য পরিবহনে প্রাণান্ত হতে হয়েছে। আজকে যে ফ্রিজ-ড্রাইড খাদ্য ব্যবহার করা হচ্ছে তা অনেক হালকা মোড়কে বহন করা যায়।

অতি উচ্চতায় আরোহণ কাজ করতে গিয়ে মানুষের শরীরের উপর কি কি প্রতিক্রিয়া হয় যে সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশি জানি। অক্সিজেনই এখানে অনেক কিছুর মূল। বোতলে করে অক্সিজেন বহন না করে এভারেষ্টে উঠা যায় এবং উচ্চাকাঙ্খী আরোহীরা তাই করে থাকেন। এভারেষ্ট আরোহণে উপরের দিকে গিয়ে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা সমুদ্র পৃষ্ঠের মাত্রার শতকরা ৩০ ভাগেরও কমে নেমে যায়। এভারেষ্ট যদি আর মাত্র ৩০০ মিটার উঁচু হতো তা হলে অক্সিজেন ছাড়া সেখানে আরোহণ একেবারেই অসম্ভব হতো। এখন মাসখানেক ধরে অক্সিজেনের স্বল্প মাত্রায় থাকার অভ্যাস গড়ে তুললে অসম্ভব হয় না। এভাবে অভ্যাস যদি না করা হয় তাহলে এভারেষ্টে অক্সিজেন ছাড়া উঠলে সেকেণ্ডের মধ্যে মানুষও মূর্চ্ছা যাবে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যাবে। অভ্যস্ত হবার সময় রক্তে অতিরিক্ত হেমোগ্লোবিন তৈরি হয় যার ফলে যেটুকু অক্সিজেনে আছে তার দক্ষ ব্যবহার সম্ভব হয়। এতে অবশ্য অন্য বিপত্তি ঘটে। রক্ত অতিরিক্ত ঘন হয়ে হার্ট এটাক ও ষ্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ায়।

অতি উচ্চতায় আরোহণের আর একটি ঝুঁকি হলো ফুসফুস আর মস্তিষ্কে পানি জমে যাওয়া। অক্সিজেনের নিম্ন মাত্রার সঙ্গে যুঝতে গিয়ে হার্টকে অনেক বেশি সজোরে পাম্প করতে হয়। ফলে ফুসফুসে আর মস্তিষ্কে যেখানে কোষ দেয়ালগুলো পাতলা রক্ত থেকে তরল লীক করে বেরিয়ে পড়ে আর ওখানে জমা হয়। পর্বত শীর্ষে চিকিৎসার অবর্তমানে এ সব অবস্থা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। ১৯৫৩ সনে যখন এভারেষ্ট বিজিত হচ্ছে– তখন ফুসফুসের অথবা মস্তিষ্কের এসব ঝুঁকির কথা জানা ছিল না। ষাটের দশকে প্রথম চিকিৎসা সাময়িকী লানসাটে এ সম্বন্ধে আবিষ্কারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর আবিষ্কারবর্তা চার্লর্স হিউস্টন নিজে একজন পর্বতারোহী এবং চিকিৎসক। ১৯৭০ সনে কাঠমুণ্ডুতে এক সম্মেলনে তিনি দেখান কিভাবে মস্তিষ্কে পানি জমার ফলে মানুষ ও শরীরের নিয়ন্ত্রণ হারায়, দু'ঘন্টার মধ্যে মূর্চ্ছা যেতে পারে। অনেকে ব্যাপারটি আন্দাজও করেন না এ জন্য যে প্রথম দিকে মাথা ধরা বমি ভাব ইত্যাদি দিয়ে মূল লক্ষণগুলি ঢাকা পড়ে যায়। উচ্চ পর্বতারোহণে মাথাধরা, বমি ভাব অপেক্ষাকৃত সাধারণ কিছু উপসর্গ।

আধুনিক পর্বতারোহীদের মধ্যে যারা শেরপাদের সাহায্য নিতে চান না, অক্সিজেন বোতল ছাড়াই এভারেষ্টে উঠতে চান– তাঁরা সত্যই উচ্চাকাঙ্খী। প্রচুর ঝুঁকি তাঁদের নিতে হয়। আশার কথা হলো যে এখন ঝুঁকিগুলো মোটামুটি জানা এবং তার জন্য কিছুটা প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব। আর যারা এভারেষ্টে শুধু পৌছাতেই চান তাঁরা এসব ঝুঁকি অনেক কমিয়ে ফেলতে পারেন শেরপাদের সাহায্য নিয়ে, এবং ৮০০ মিটারের উপরে অক্সিজেন বোতল ব্যবহার করে।

এই কম ঝুঁকিপূর্ণ আরোহণ অবশ্য এভারেষ্ট আরোহণকে যথেষ্ট সম্ভব ও জনপ্রিয় করে তুলেছে; আরোহণের অন্তত চেষ্টা করছেন আজকাল অনেকেই। এর ফলশ্রুতিতে নতুন ধরনের কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে হিমালয়ের কোলে। ১৯৫৩ সনের মহাবিজয়ের সময় এটি ছিল পৃথিবীর একটি গহীন কোণ- অনাঘ্রাত সৌন্দর্যের প্রতীক। আর আজ এ জায়গাটি পরিবেশ দূষণের একটি অদ্ভুত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিচে বনভূমির মধ্যে বড় বড় জায়গায় গাছ কেটে ফেলা হয়েছে পর্বতের দিকে অগ্রসরমান মানুষদের জন্য পথ করে দিতে, তাদের জন্য রসদের স্তূপ তৈরি করতে। খুম্বু হিমবাহের নিচে যেখানে আরোহীরা বেইস ক্যাম্প তৈরি করে সেটি আজ আবর্জনার একটি বড় বর্জ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া এখানে বিভিন্ন দলের মধ্যে জায়গা নিয়ে ঝগড়া, প্রতিযোগিতা এবং পরিবেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রায়ই অস্বস্থিকরঅবস্থা সৃষ্টি করছে।

নেপাল সরকার এভারেষ্ট আরোহণের 'ফি' বৃদ্ধি করেছে। আগে সেখানে ৫ সদস্য পর্যন্ত একটি দলের জন্য আরোহণ ফি বাবদ দিতে হতো দশ হাজার ডলার, এখন সেটি হলো পঞ্চাশ হাজার ডলার। ৫ জনের উপরে প্রতিজন বাড়তি সদস্যের জন্য আরো দশ হাজার ডলার করে। এরকম টাকা নেবার যুক্তি হলো একদিকে যেমন পরিবেশের কিছু ক্ষতি পূরণ করা যাবে, অন্যদিকে বড়দলকে নিরুৎসাহিত করা যাবে। কিন্তু অনেকে ভাবছেন এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। এ রকম অতিরিক্ত ফি শুধু টাকাওয়ালাদেরকেই এভারেষ্ট অঞ্চলে আসবে অন্যরা যারা সত্যিকার অর্থে পর্বত

প্রেমিক, পরিবেশ প্রেমিক- তারা বাদ পড়ে যাবে। যাদের টাকার জোরটাই বড় তারা পরিবেশের পরোয়াও খুব একটা করবে না। তাদের জন্য থাকবে খাটানো দড়ি, দেদার খাদ্য, জ্বালানী ও উপকরণের সরবারাহ এবং বিশাল শেরপাবাহিনীর সহায়তা- যার কোনটিই পরিবেশ সহায়ক নয়। ১৯৫৩ সনে যে পথে এভারেষ্ট বিজিত হয়েছিল তাতে প্রায় ৮০০০ মিটার উচ্চতায় রয়েছে 'সাউথ কোল' নামের একটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সমতল জায়গা। এখান থেকে সাধারণত শেষ পথটুকু অতিক্রমের চেষ্টা নেয়া হয়। এইখানে বছরে বছরে জমে উঠেছে এক ব্যতিক্রমী পরিবেশ দূষণ উৎস যার মধ্যে রয়েছে ২৩ জন আরোহণকারীর সমাহিত ও অসমাহিত মৃতদেহ, ১৫০০ টি উজ্জ্বল হলুদ রঙের অক্সিজেন বোতল, বহু পরিত্যক্ত তাঁবু ইত্যাদি। কিছুই এখানে মিশে যায় না, ঐ শৈত্য এবং হালকা অক্সিজেন বোতলে জৈব অবক্ষয় হতে চায় না। ধারণা করা হয় যে সাউথ কোলের আবর্জনার মোট পরিমাণ ১৭ টনের মত- যার মধ্যে ১৯৫৩ এর সেই অভিযান থেকে আবর্জনা রয়েছে। এ সব পরিষ্কারের চেষ্টা যে একবারে হয়নি তা নয়। কিন্তু পরিষ্কার করতেও হয়েছে একই রকম পর্বত অভিযানের- যার নিজেরই আবার সৃষ্টি করতে হয়েছে অনুরূপ আর্বজনা। আর কাজটিও অত্যন্ত বিপদ সংকুল। তাই খুব একটি সুবিধা হয়নি। মানুষ বেশি গেলে আর্বজনা বাড়বে, পরিবেশ রক্ষা পাবে না– এ সহজ কথা। অথচ মানুষ বেশি যাচ্ছে, অনেক মানুষ এভারেষ্ট আরোহণের গৌরব লাভ করেছে– নারী পুরুষ, অল্প ও অধিক বয়স নির্বিশেষে। কিন্তু ১৯৫৩ সনে তেনজিং ও হিলারী যে বিজয় গৌরব অর্জন করেছিলেন প্রথম হওয়া ছাড়াও তার মধ্যে আরো একটি অনন্যতা ছিল। তাঁরা অপেক্ষাকৃত অধিক উর্দ্ধে আরোহণ করেছিলেন অন্তত সরকারি হিসাবে। সাম্প্রতিক পরিমাপ অনুযায়ী এভারেষ্টের উচ্চতা সে সময়ের জানা উচ্চতার চেয়ে ৬ ফুট কম। ১৯৫৩ সনের হিসাবে এটি ছিল ২৯০২৮ ফুট, আর এখন ২৯০২২ ফুট। এভারেষ্টের উচ্চতা পরিমাপের প্রতিযোগিতা এভারেষ্ট আরোহণের চেয়ে কম নয়। উপগ্রহ, লেজার আলো, চূড়ায় প্রিজম রেখে সুদূর থেকে আলোক প্রেরণ ইত্যাদি কোন পদ্ধতি বাদ যাচ্ছে না। শেষ কথা অবশ্য এখনো কেউ বলতে পারেননি। কিন্তু আমাদের জন্য গর্বের কথা হলো প্রথম কথাটি বলেছিলেন একজন বাঙালী রাধানাথ শিকদার। এভারেষ্টের উচ্চতা প্রথম তিনিই নির্ণয় করেছিলেন।

সম্পাদকীয়

টেলিভিশনের বিশ্বায়ন

[ডিসেম্বর '৯৩/জানুয়ারি '৯৪]

দু'এক বছর আগে ডিশ এন্‌টেনা যখন দেশে প্রথম চালু হলো তখন ব্যাপারটিকে বড় লোকের সখ বলেই মনে হয়েছিল। বাংলাদেশ টেলিভিশন সিএনএন ও বিবিসি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে এর স্বাদ নিয়ে এসেছিল সাধারণ মানুষের জন্য। টেলিভিশনের দর্শক মধ্যবিত্ত মানুষ এতে প্রথমবারের মত দেখলেন আন্তর্জাতিক মানের প্রচার মাধ্যম কি জিনিস। সংবাদ কিভাবে তৈরি হয়ে কিভাবে পরিবেশিত হয়। নানা ব্যক্তিত্বকে কিভাবে সর্বসাধারণের মুখোমুখি করতে পারে টেলিভিশন আর আধুনিক গণতন্ত্রে জনমত গঠন ও নির্বাচনে এ প্রচার মাধ্যম কিভাবে কাজ করতে পারে। আমাদের নিজের জগতে যদিও এসবের থেকে অনেক দূরে রয়ে গেল, তবুও আর একবার মনে হলো পৃথিবী দ্রুত ছোট হয়ে আসছে বৈকি।

এখন এ প্রযুক্তি আরো ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে আসার সূচনা হয়েছে। সিএনএন, বিবিসি-সাংবাদিকতা, রাজনীতি, বিশ্বপরিস্থিতি-ইত্যাদি সম্বন্ধে যা করছিল তাই এখন অন্তরঙ্গ সব বিষয়ে করা শুরু করছে ষ্টার টিভি। ষ্টার টিভির বিভিন্ন চ্যানেল পপ সঙ্গীতের জন্য এমটিভি, ক্রীড়া জগৎ নিয়ে প্রাইম স্পোর্টস' আর নানা স্বাদের বিনোদন নিয়ে 'ষ্টার প্লাস' ও হিন্দী 'জিটি ভি' এখন পূর্ব-পশ্চিম বিশ্ব, ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়ার আনন্দ বিনোদন, চিন্তা-বিশেষ করে তারুণ্যের সংস্কৃতিকে একাকার করে ফেলার কিছু উপাদান এনে দিচ্ছে। যদিও এটি সত্য যে এটি শহুরের মধ্যবিত্তের তরুণ অংশের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকবে কিন্তু প্রযুক্তি হাতের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সার্বিক মননে এর একটি প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নয়। এর মধ্যে অনেকখানি অপচয় থাকবে, অনেক খানি ক্ষতিকর দিক থাকাও বিচিত্র নয়। তবে বিশ্ব যে কাছাকাছি আসছে তারই এই অনিবার্য ফল এই অগ্রগতির ইতিবাচক দিকও কম নয়। বিশাল অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে এর তরুণ তরুণীরা নিজেদের মধ্যে সাযুজ্য ও আত্মীয়তা অনুভব করবে, একে অপরের মত আনন্দ ও বিকাশ লাভের ও স্বাধীনতা ভোগের আকাঙ্ক্ষা করবে এটি ইতিবাচক দিক বৈকি। ভাল মন্দ যাই হোক এই অনিবার্য প্রবণতার সুযোগ এনে দিয়েছে প্রযুক্তিকে ক্রমাগত সহজলভ্য করে পাবার ক্ষমতা। আধুনিক ইলেকট্রনিক ও ইনফরমেশন প্রযুক্তিতে এটি খুবই লক্ষণীয়। যেই ডিশ এনটেনার কথা ভাবলে কিছু দিন আগেও অন্তত অর্ধ লক্ষ টাকার কথা মনে হতো এখন বাড়ী বাড়ী তার নিয়ে গিয়ে মাসিক দু'একশ' টাকার বিনিময়ে তা পাওয়া যাচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে এ সুবিধা ঘরে ঘরে দিতে এগিয়ে আসছেন অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। মনে হচ্ছে ভিসিআর প্রযুক্তি একদা যতখানি পারেনি 'কেবল্ টি ভি' এবার তাই করতে যাচ্ছে।

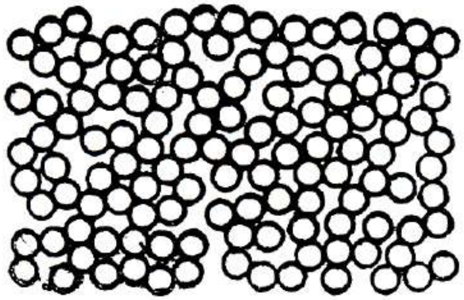

এ যুগের রোবট শ্রমিক

[মার্চ-এপ্রিল -'৯৫]

স্বাতী

আমাদের দেশে রোবট আমরা দেখিনা বটে, কিন্তু রোবট বললেই বেশ পরিচিত একটি ছবিই আমাদের চোখে ভেসে উঠে। এ ছবিটি হলো একটি যান্ত্রিক মানুষের ছবি। চোখ-কান-মুখের আদলে কিছু না কিছু থাকবে, পা হোক, চাকা হোক মানুষের মত দুটা কিছুর সাহায্যে চলাফেরা করবে, আর যান্ত্রিক স্বরে মানুষের ভাষাতেই কথা বল্‌বে। এই এক ধরনের রোবটের কথাই আমরা বেশী জেনেছি, বাস্তব নমুনার বা কল্পকাহিনীর ছবিতে বেশী দেখেছি বলে রোবটের এই চিত্রটি আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। কার্যক্ষেত্রে রোবট প্রযুক্তি ব্যাপক আকারে যেখানে রয়েছে তার ছবি কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির।

আসলে রোবট মানে মানুষ সদৃশ কিছু হতে হবে এমন কোন কথা নেই। স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে এমন যে কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই রোবট বলা যায়। শব্দটা এসেছে চেক ভাষার শব্দ রোবোটা থেকে যার মানে হলো 'ক্লান্তিকর কাজ'। বার বার এক ভাবে করে যেতে হয় বলে অথবা পরিশ্রমসাধ্য বলে যে সব কাজ ক্লান্তিকর সেগুলো মানুষ রোবোটের হাতে তুলে দিতে পারে। এজন্যই এই নাম। আজ তাই অধিকাংশ রোবটের সাক্ষাৎ মিলবে উন্নত দেশসমূহের কারখানায়। সেখানে রোবট বহু রকমের কাজ করছে, মানুষ শ্রমিকের বিকল্প হিসাবে। তারা ওয়েল্ডিং করে ধাতু জোড়া দিচ্ছে, যথাস্থানে ছিদ্র করে দিচ্ছে, রং লাগিয়ে দিচ্ছে এমন কি আইসক্রীম তৈরীর পর তার গায়ে সযত্নে কাগজের মোড়ক পরিয়ে দিচ্ছে। এগুলো সব এমন যাতে নিয়ম-বাঁধা কাজ বার বার করতে হয়। মানুষের জন্য এটি বিরক্তিকর হতে পারে কিন্তু রোবটের কিছু যায় আসে না। সে নিঁখুত দক্ষতায় ক্লান্ত না হয়ে, ভুল না করে ঐ একই কাজ অসংখ্যবার করে যেতে পারে।

মানুষের কাজ করছে, তাই বলে রোবটকে দেখতেও মানুষের মত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। শিল্প ক্ষেত্রে যে সব রোবট আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোর অধিকাংশ নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর গতিশীল অংশ হলো একটি মাত্র বাহু যা জিনিসপত্র তুলতে পারে, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে। রোবটের আকার আকৃতি অবশ্য নির্ভর করে তাকে কি কাজ দেয়া হচ্ছে তার উপর। এমন রোবটও রয়েছে যারা ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ কিংবা ঘড়ির মত সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশগুলো জুড়তে সক্ষম।

আজকাল কিছু কিছু শিল্পোন্নত দেশের কারখানাগুলোতে রোবট শ্রমিক এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যে সেখানে এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হচ্ছে। রোবট নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে বিষয় তাকে বলা হয় রোবটিক্স। রোবটের ব্যবহার এবং তার গবেষণার সবার চেয়ে এগিয়ে আছে জাপান। জাপানের ইলেক্ট্রনিক ও মোটর গাড়ী শিল্পে সর্বাধিক সংখ্যক রোবট শ্রমিক ব্যবহার হয়।

রোবট প্রযুক্তির মূলে রয়েছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যন্ত্রকে কাজ করাবার কৌশল। এরকম যে কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকে কাজ করাবার জন্য প্রয়োজন হয় কোন না কোন ধরনের সেন্সর-যা ঐ ব্যবস্থায় সৃষ্ট ফলাফলকে সারাক্ষণ পরিমাপ করতে থাকে। এই পরিমাপের বিষয় হতে পারে উত্তাপ, রং, রাসায়নিক গঠন, চাপ, আকার, আকৃতি, ওজন সব কিছু। এই সঙ্গে থাকতে হয় একটি কম্‌পারেটর অংশ যা পরিমাপে প্রাপ্ত ফলকে সব সময় অভীষ্ঠ ফলের সঙ্গে তুলনা করতে

থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ব্যবস্থাটি যদি হয় উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য, তা হলে যে উত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছে তা থার্মোমিটাররূপী সেন্সর সব সময় পরিমাণ করতে থাকে। আর কম্পারেটেরের কাজ করে থার্মোষ্টাট নামক যন্ত্র। থার্মোমিটারের পাঠকে থার্মোষ্টাটে আগে থেকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া অভীষ্ট উত্তাপের সঙ্গে তুলনা করে দেখা হয়। যদি এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয় তাহলে কম্পারেটর একটি ত্রুটিসূচক সংকেত কনট্রোলার নামক নিয়ন্ত্রক অংশে পাঠায়। কনট্রোলারই এই ত্রুটি শুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। যেমন উত্তাপ নিয়ন্ত্রকের ক্ষেত্রে ত্রুটি সংকেতের ফলে উত্তাপক ব্যবস্থাটি আর একটু বেশীক্ষণ চালু থেকে অথবা আর একটু বেশী সময় বন্ধ থেকে অভীষ্ট উত্তাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। রেফ্রিজারেটর, মুরগীর ডিম তা দেবার ইনকিউবেটর ইত্যাদিতে এরকম স্বয়ংক্রিয় উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ থার্মোষ্টাটের মাধ্যমে হতে আমরা দেখি।

আসলে প্রায় সব স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মধ্যে যে নীতি কাজ করে তা হলো একটি 'ফীডব্যাক' ব্যবস্থা। ফলাফল যা পাওয়া গেল তা আবার ব্যবস্থাটির শুরুতে ফিরিয়ে দেয়ার নামই ফীডব্যাক। এর ফলে যন্ত্রটি নিজেই নিজেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সংশোধন করে নিতে পারে। অনেক জটিলতর, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাকে কোন কোন সময় সঠিক কর্মধারা শিখিয়ে দিতে হয়। এর নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া নিজ থেকে যখন খুবই কাংঙ্খিত কোন অবস্থায় এসে উপনীত হয় তখন মানুষ পরিচালক সেটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মধ্যে স্থায়ী করে দিতে পারেন পরবর্তী সব সময় অনুসরণের জন্য। আবার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নিজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও শিখতে পারে, যদি সেভাবে একে ডিজাইন করা হয়। এতে একটি কম্পিউটার নিজ থেকেই ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে দেখে ফলাফল কি হয়। ফলাফল যদি খুব কাঙ্খিত কিছু হয় তা হলে ঐ পরিবর্তনগুলোকে স্থায়ী রূপ দেয়া হয়।

আধুনিক রোবটিক্সে এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কম্পিউটার একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এতে পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করে কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন মানুষ ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় গাড়ীর পরিমাণ দেখে সেই অনুসারে কম সময় বা বেশী সময় মোড়ের এক দিকের রাস্তা খোলা-বন্ধ রাখতে পারেন। এই কাজটি যদি রোবট ট্রাফিক পুলিশকে দেয়া হয় তা হলে কাজ হতে পারে এভাবে; রাস্তার সঙ্গে থাকা সেন্সর মোড়ের কাছে গাড়ীর সংখ্যা নির্ধারণ করবে। কম্পিউটার এই তথ্য এবং পূর্বে দেয়া আরো নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে স্থির করবে মোড়ের কোন দিকের ট্রাফিক বাতি কতক্ষণ জ্বলা উচিত। সেই হিসাবে বাতিতে সংকেত যাবে।

মানুষের বদলে রোবট ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা দিতে কি সুবিধার জন্য? এর নানা কারণ রয়েছে। কিছু কিছু কাজ আছে যাতে এত বেশী জটিল বিশ্লেষণ এত দ্রুত করতে হয় যা নির্ভুলভাবে করা মানুষের জন্য সম্ভব হয় না। সেখানে রোবটের সহায়তা নেয়া যায়। রোবট শ্রমিক সূক্ষ্ম, অনেকবার পুনরাবৃত্ত, বিরক্তিকর কাজ যেরকম দীর্ঘক্ষণ একই দক্ষতার সঙ্গে করে যেতে পারে মানুষ শ্রমিক তা নাও পারতে পারে। তাই শিল্প-রোবটগুলো যেভাবে সূক্ষ্ম লেজার রশ্মির সাহায্যে নির্মীয়মান, মোটর গাড়ীর কোন অংশের নিখুঁত পরিমাণ নিয়ে, সেগুলোর তথ্য কমিম্পউটারে বিশ্লেষণ করে, তারপর তা সংযোজনের ব্যবস্থা করে মানুষের পক্ষে সেটি দুরূহ হতে পারে। তা ছাড়া কিছু কাজ আছে যা এমন অভিনব বা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে করতে হয় যে রোবট ছাড়া তা সম্ভবই নয়। যেমন মঙ্গল গ্রহ থেকে মাটি সংগ্রহের কাজ সেখানে মানুষ যাবার আগে একমাত্র রোবটের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। আর একটি বড় কারণ হচ্ছে উন্নত বিশ্বে দক্ষ শ্রমিকের জন্য প্রচুর ব্যয় হয়, তাই সেখানে রোবট শ্রমিক অনেক সময় ব্যয়ও সাশ্রয় করে।

ব্যাপক হারে রোবট শ্রমিকের বিস্তৃতি শুধু প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নয়, ভবিষ্যতে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায়ও যে প্রচুর ভূমিকা রাখবে তা বলাই বাহুল্য।

ইন্টারনেট-ব্যবসা

[সেপ্টেম্বর- '৯৮]

আরিফ বাদশা খান

বিশ্বের হিসাব-নিকাশে কোনো কিংবদন্তিই এখন পর্যন্ত মানুষের কল্পনাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু মানুষের এ কল্পনাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা রয়েছে ইন্টারনেটের। এ সাইবার-ওয়েভের ডানায় ভর করে লক্ষ লক্ষ চতুর তরুণ-তরুণী এখন এর কঠিন আবরণের মধ্যকার কোমল শাঁসটুকু খুঁজে ফিরছে। কয়েকজন সৌভাগ্যবান ও দূরদর্শী ব্যক্তি খুব দ্রুতই এর সুযোগ নিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন নেটস্কেপ কম্যুনিকেশন এর প্রতিষ্ঠাতা জিম ক্লার্ক। যতদূর সম্ভব এই ইন্টারনেট ব্যবস্থাটি যদি কাউকে সম্পদশালী করে থাকে তবে নিঃসন্দেহে তিনি জিম ক্লার্ক। বস্তুত তাঁর কোম্পানীর ওয়েভ ব্রাউসার ও নেটসকে তাঁর সৌভাগ্য করে এনে দিয়েছে। যখন নেটসকেপই কর্মকান্ড বিশ্বব্যাপী শহরগুলোকে ভাসিয়ে দিয়েছিলো, তখন এর থেকেই তিনি আয় করে নেন কমপক্ষে ১৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। অপরদিকে তরুণ-তরুণীরা স্থাপন করেছে 'ডেমোন ইন্টারনেট সার্ভিস এন্ড ইউনিপাম এবং PIPEX এবং দু'টি 'ইন্টারনেট অ্যাকসেস প্রভাইডার' যেগুলো ইতিমধ্যেই ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ ব্যবসায় সম্ভবত অন্য কোনো নেটসকেপ বা ডেমোন গড়ে ওঠবে না, তবে ইন্টারনেট ব্যবসাটি সম্ভবত সাইবার স্পেসের প্যাঁচে পড়ে সাধারণ ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাজারে এ ব্যবসায়ের ঘাটতিপূর্ণ চাহিদা এবং এর পণ্য ও সেবার সরবরাহ ভোক্তা বা ক্রেতা সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে কার্যকর হচ্ছে এবং সবাই লাভবান হচ্ছে।

বিল্ডিং সাইবার সার্ভিস লিমিটেড

ইন্টারনেট কর্মকান্ডের সম্প্রসারণের সাথে সাথে নানাবিধ ব্যবসার প্রসার ঘটছে এবং ইন্টারনেট সম্পর্কিত তথ্যকেন্দ্র ও পুস্তক-পুস্তিকার শত শত দোকান গড়ে উঠেছে। এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা ইন্টারনেট ব্যবহার করছে এবং 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভ' এদের বিজ্ঞাপন প্রচার ও নির্দেশ গ্রহণ করছে। কিন্তু তারা ভোক্তা বা গ্রাহকদের পণ্য সরবরাহের ব্যাপারে গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে। একটি চমৎকার ব্যাপার হলো, এরা অতিরিক্ত কোনো কর্মী নিয়োগ ছাড়াই সপ্তাহে ৭ দিন এবং প্রতিদিন ২৪ ঘন্টাই বিশ্বের বিশাল ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে সক্ষম হচ্ছে। অবশ্য তাদের কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা বা ব্যর্থতা রয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এর মাধ্যমে আপনার সফলতা বা ব্যর্থতা রয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আপনি কি এর মাধ্যমে আপনার বই কিংবা সিডি পৃথিবীর সর্বত্র সরবরাহ করার নিশ্চয়তা দিতে পারবেন? অতীতের একটি বইয়ের লাইব্রেরী ইন্টারনেটের মাধ্যমে হয়েছে 'ভবিষ্যৎ ফ্যান্টাসি বইঘর' বা 'ফিউচার ফ্যান্টাসি বুকশপ'। কিন্তু ইন্টারনেটের অন্তর্গত হওয়া এতে যেমন থাকবে প্রাচীন বই, তেমনি পাওয়া যাবে নতুন বই। আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ব্যবহার করে বিবেচনাধীন ক্যাটালগে চোখ বুলিয়ে দেখতে পাবেন পুরাতন নতুন ও যেসব বই এখনো প্রকাশ পায়নি সেসব বইয়ের তালিকা। আপনার

খোঁজা-খুঁজির পর যে বইটি আপনার পছন্দ হবে সেটি পাবার জন্য ই-মেইল বা ইলেক্ট্রনিক মেইলের মাধ্যমে পাঠাবার নির্দেশ দিতে পারেন।

কিন্তু ধরুন আপনারা এখন পর্যন্ত এভাবে কিছুই কিনেননি, যা একবিংশ শতাব্দীর অনেক বিপণী ব্যবসায়ীদের সাথে তুলনীয়, সেক্ষেত্রে ঐ ফিউচার ফ্যান্টাসি বুকশপ ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনার ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করতে চাইবে না, কারণ এক্ষেত্রে কিছু বস্তুগত সমস্যা থাকে। কেউ ইলেক্ট্রনিক আড়ি পেতে আপনার নম্বরটি নিয়ে তা অব্যবহার করতে পারে। এর পরিবর্তে ঐ বুকশপ স্নেল মেইলের মাধ্যমে আপনার ক্রেডিট কার্ডের বিস্তারিত বিবরণ কিংবা চেক পাঠানোকে গুরুত্ব দেবে। আপনার বইগুলোও একইভাবে ধীরগতির পথে আপনার কাছে এসে পৌঁছবে। এটা মনে রাখা দরকার যে, এই গ্রহে জাহাজের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী স্থানান্তরের খরচ অনেক ক্ষেত্রে এগুলোর ক্রয় মূল্যের চেয়েও বেশি হয়ে থাকে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিপণন :

নানা ধরনের ব্যবসা রয়েছে। এক্ষেত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে চমৎকার তথ্য সম্পাদিত 'সাইবার-ব্রেশিউর' এর দ্বারা ই-মেইলের মাধ্যমে পণ্য সামগ্রীর অর্ডার দেয়া যায়। এগুলো হলো বিক্রয়-তথ্য, সফটওয়্যার এবং ভোক্তাদের সেবা সরবরাহের ইন্টারনেট মাধ্যম। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার প্রসারের ফলে তারা তাদের উৎপাদিত সফটওয়্যারের বিপণন, খবর প্রচার বিনোদন চিত্র ও সামগ্রীর বিজ্ঞাপন, লাভের জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতি কাজে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে। এর অবদান অনস্বীকার্য। কারণ আপনি ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপনের জন্য যা ব্যয় করছেন তা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি, এ ব্যাপারে যা খরচ হওয়ার তা হয় কেবলমাত্র আপনার তথ্য সরবরাহের জন্য। এ ব্যাপারটি আপনাকে ভাবিয়ে তোলে যে আপনি হয়তো ইন্টারনেট নামক একটি ক্ষতিকর কিছুর ওপর সওয়ার হচ্ছেন, আসলে কিন্তু তা নয়।

বাজার ব্যবসার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট হয়ে উঠবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনার পণ্য ও সেবা বিপণণের জন্য ইন্টারনেটের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগুতে হবে। আসলে কথা হলো ব্যবসা করার জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে অর্থ লেন-দেনের ব্যাপারটি। কিভাবে একজন নতুন ব্যবসায়ী শিকারির খপ্পর রক্ষা করে নিরাপদে তার ক্রেডিট কার্ডটি পাঠাতে পারে সেটাই বড় সমস্যা। এ প্রশ্নের বেশ কতগুলো উত্তরও আছে এবং এগুলোর বেশিরভাগই সংক্ষিপ্ত। এক্ষেত্রে ভিসা নিয়ে কিংবা মাইক্রোসফটের মাধ্যমে অথবা মাষ্টার কার্ডের দ্বারা সমস্যার সমাধান করা হয়। তবে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানা গেছে যে, এসব দর কষাকষির অবসান ঘটেছে। যে পর্যন্ত এগুলোর বিকল্প খুঁজে পাওয়া না যাবে, সে পর্যন্ত শুধু কয়েক ধরনের ব্যবসার জন্য এটা কাজ করবে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরুন আপনি কোন একজন সম্পাদকের পূর্বের সম্পাদকীয়গুলো সংগ্রহ করে ইন্টারনেটে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রতিটি সম্পাদকীয় সংগ্রহ করে ইন্টারনেটে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ধরা যাক, প্রতিটি সম্পাদকীয় ইন্টারনেটে পেতে হলে পাঠকদের ২০ টাকা করে পরিশোধ করতে হবে। যদি হাজার হাজার গ্রাহক তা গ্রহণ করে, তাহলে তা আপনার মতো প্রকাশক ও ঐ সম্পাদকের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। গ্রাহকরা এক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সংযোগ চালু রেখে ঐসব লেখা হতে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করবে। এক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন উক্ত তথ্যের মূল্যের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং অল্প কিছু তথ্য সরবরাহ করা আপনার জন্য ঠিক নয় এবং তা বাস্তব সম্মতও নয়।

পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি লোভনীয় উন্নত প্রযুক্তি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেটি এখন সুইডেনে মনডেক্স কর্তৃক পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ক্রেডিট কার্ডের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে চতুরতা বিষয়ক সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে মনডেক্স। সাথে সাথে এর মধ্যে নগদ লেনদেনের ব্যাপারটিও অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। অবশ্য মনডেক্স এখনো আসল সময়ের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত নয় এবং এর মধ্যে কিছু কন্টকাকীর্ণ বিষয় রয়েছে। কারণ কোম্পানিগুলো এসব বিষয়কে জেঁকে ধরবে। প্রথমত তারা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কাছে ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ চাইবে, দ্বিতীয়ত গ্রাহকদের এজন্য প্রয়োজন হবে বিশেষ টেলিফোন, কম্পিউটার প্রযুক্তি এবং এগুলোর উপযোগী উন্নত ক্রেডিট কার্ড।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ :

ডিজি ক্যাশ (Digi Cash) অর্থের রূপান্তর একটি চমৎকার আশাব্যঞ্জক ইলেক্ট্রনিক আর্থিক পদ্ধতি। ডিজি ক্যাশের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রনিক আর্থিক পদ্ধতি বা ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ (ই-ক্যাশ) পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এর দ্বারা শুধু 'ক্লিক' করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা যাবে এবং যা হয়ে উঠবে জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি। এর দ্বারা এ নগদ অর্থের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। 'বড় ভাই' ও তার 'বৌ' যেমন ছোটদের ব্যাপারে সর্বদা আতঙ্কিত থাকেন, ঠিক তেমনি কাগুজে টাকা ব্যবহারকারীরাও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কেনাকাটার ব্যাপারে কিংবা ই-মেইল পদ্ধতিতে লেনদেনের ব্যাপারে ভীত থাকেন। ই-ক্যাশ কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অর্থেরই নিরাপত্তা দেবে। অবশ্য কোনো কোনো ক্রেতার এটি যথেষ্ট মনে হতে না-ও পারে। যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে লেনদেন হবে তা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে, তবে এ ব্যাপারে হয়তো কোনো 'কার্ড কোম্পানি' অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের লাভ তুলে নেবে। যে কোনো নির্দিষ্ট অংকের অর্থের লেনদেনের জন্য এটি একটি ভালো ব্যবস্থা হবে এবং যদি বর্তমানে কিংবা কয়েক মাসের জন্য আপনার ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধও থাকে তাহলেও উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। কারণ এক্ষেত্রে শুধু ঐ কৌশলী বিক্রেতাকে টেলিফোনে আপনার ক্রেডিট নম্বরটি জানানোই যথেষ্ট।

ডিজি ক্যাশ এক মিলিয়ন সাইবারবাক (Cyberbucks) ছেড়েছে, যা হলো প্রথমবারের মতো ইলেক্ট্রনিক ব্যাংক নোট। আশা করা হচ্ছে যে, এই বছরই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ই-ক্যাশের প্রচলন ঘটবে।

সাইবারক্যাশ (Cyberbucks) ইন্টারনেট হলো অপর একটি অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থা, যা সাম্প্রতিককালে প্রচলিত ক্রেডিট কার্ডের মতোই তবে অধিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যুক্ত। একটি সাধারণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারে এ সাইবারক্যাশকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন এবং এ পদ্ধতিতে আপনার সাধারণ ক্রেডিট কার্ড নম্বরটি ইন্টারনেট চোরদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। অবশ্য সাইবারক্যাশ এখনও প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং ক্ষুদ্র লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিক্যাশের তুলনায় ঘাটতি পূর্ণ।

ইন্টারনেটে রয়েছে বহু আর্থিক পদ্ধতি। এদের সবগুলোই একই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে এবং এগুলোর সমস্যাগুলোও একই রকম, যে সব সমস্যার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই সাইবার ব্যবসা শুরু করার জন্য এত তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। আপনার যদি সেরকম কোনো স্বপ্ন থেকে থাকে, তাহলে ব্যাংকে অর্থ-সঞ্চয় করুন এবং সাইবার সমস্যাগুলো ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে দেখুন। যখন এর মধ্যস্থ ভয়ঙ্কর ঠকবাজী অপসারিত হয়েছে বলে আপনার মনে হবে, তখন দেখবেন টাকা আপনার কাছে কিছুই নয়, তখন আপনার মাথায় শুধু থাকবে টাকার 'ড্রাফট'।

সাম্প্রতিক

কম্পিউটারের শতাব্দী সংকট

[সেপ্টেম্বর-'৯৮]

একবিংশ শতাব্দীকে বরণ করার জন্য বহু ইতিবাচক ঘটনা দুনিয়াতে ঘটছে। কিন্তু শতাব্দীর উত্তরণের মুহূর্তটিতে একটি সংকটজনক পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে কম্পিউটারের জগতে। আশংকা করা হচ্ছে যে, ঐ মুহূর্তে দুনিয়ার অধিকাংশ কম্পিউটার বড় ধরনের একটি অনর্থ ঘটাবে, বিশেষ করে যে সব কম্পিউটারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে সেগুলো। অনর্থের কারণ হবে তারিখ। কম্পিউটারের সব কাজের পটভূমিতে চলছে এর ঘড়িটি যেটি এর সব কাজের সময় ও তারিখ নির্ধারণ করে দিচ্ছে। বছরের হিসাবে এর মধ্যে পরিবর্তিত হয় শেষ দুটি সংখ্যা। ১৯৯৯ এর শেষ মুহূর্তটিতে ৯৯ শেষ হয়ে ওতে চলে আসবে ০০- অর্থাৎ পরবর্তী বছরটি পরিণত হবে ১৯০০ তে। ফলে কম্পিউটারের কাজকর্মে মারাত্মক গোলযোগ সৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

সাম্প্রতিক নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অনেকগুলো কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সমস্যাটি ঘটবে যদি সেই মুহূর্তে কম্পিউটার চালু থাকে। যদি তা বন্ধ থাকে তা হলে তার চলমান ঘড়ি যথা নিয়মেই ১৯৯৯ কে ২০০০ সনে পরিণত করবে। কিন্তু যদি তা না থাকে তা হলে বছর প্রথমে হবে ১৯০০। কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম কাজ করতে গিয়ে বুঝবে যে এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বছর পরিণত হবে ১৯৮০তে। আর ১৯৮০ এর যে সব তথ্য ইতিমধ্যে রয়েছে তার সঙ্গে বর্তমানেরগুলো তালগোল পাকিয়ে একটি জগাখিচুড়ি পাকাবে। কাজেই শতাব্দী বদলের উৎসবে যাবার সময় সবাইকে যার যার কম্পিউটার সুইচ বন্ধ করে যাবার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে নানা দেশে এ নিয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। আমাদের দেশেও এ নিয়ে কিছুদিন আগে একটি সেমিনার হয়ে গেল। বৃটিশ সরকার ২০০০ কমিটি নামে একটি টাস্কফোর্স পর্যন্ত এর জন্য গঠন করেছে। কমিটির প্রচারণার ফলে কম্পিউটার উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী সংকল্প ব্যক্ত করেছে যে তাদের তখনকার কম্পিউটারগুলো শতাব্দী-সংকট মুক্ত থাকবে। কিন্তু সংকটমুক্ত বলতে কে যে কী বোঝাচ্ছে তাই এখনো স্পষ্ট নয়। স্পষ্টতঃ চাওয়া হচ্ছে যে ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৮ তে উত্তরণ যেভাবে ঘটেছে ১৯৯৯ থেকে ২০০০ এ উত্তরণ হুবহু সেভাবে হতে হবে। কিন্তু যারা দাবী করছে তাদের কম্পিউটার শতাব্দী সংকট মুক্ত তাদেরগুলো পরীক্ষা করে তেমনটি দেখা যাচ্ছে না।

নাইনটি নাইন-২০০০ নামক সংগঠন কম্পিউটারগুলো সংকটমুক্ত কিনা পরীক্ষা করার জন্য প্রুফ ইট ২০০০ নামে একটি সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেছে। এর দ্বারা এখনই সব কম্পিউটার পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হচ্ছে— তা শতাব্দী সংকট মুক্ত থাকবে কিনা।

শতাব্দী শেষের রাতের মধ্যপ্রহরে কম্পিউটার খোলা থাকলে বিপদটি কেন ঘটবে তা ব্যাখ্যা করা যাক। প্রত্যেক পার্সোনাল কম্পিউটারে BIOS নামে এক সেট প্রোগ্রাম থাকে যা এর মেমোরি চিপে স্থায়ীভাবে গ্রথিত। এরা

প্রত্যেকবার কম্পিউটার অন্ করার সময় এর জরুরী কিছু কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর কম্পিউটারের যে ঘড়ি তা ব্যাটারী চালিত কম্পিউটার খোলা কি বন্ধ তা নির্বিশেষে এটি চলতে থাকে এবং সময় তারিখ রক্ষা করে। তখন যে সব কম্পিউটার চালু রয়েছে তার অনেকগুলোতে BIOS এমনভাবে তৈরী যাতে মেমোরীতে আসার পর তারিখকে ১৯৯৯ এর পর ২০০০ এ পরিণত করবে। কিন্তু সেটি সে করবে কম্পিউটার খোলার মুহূর্তে। তারিখ পরিবর্তনের সময় কমিপউটার বন্ধ থাকলে পরবর্তী খোলার সময় BIOS এটি ঠিক করে নিতে পারে। কিন্তু পরিবর্তনটি খোলা অবস্থায় ঘটলে কাজটি করার সুযোগ পাবেনা। তার আগেই দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

সম্পাদকীয় [নভেম্বর '৯৮]

মৃত্যুঞ্জয়ী লারা

আজ থেকে প্রায় বার বছর আগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন যার বিষয় ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ। উদ্যোক্তা ছিল কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট। বিষয়টি উন্নত বিশ্বেও গুরুত্ব পাচ্ছিল সে সময়, কারণ সেখানেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পেশায় মেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণে আসছিল না। না আসার কারণও ছিল অনেক, এসব পেশায় তাদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে রয়েছিল প্রচুর। সেগুলোকে দূর করার জন্য চলছিল এক ধরনের আন্দোলন। সেই আন্দোলনেরই ঢেউ হিসেবে এশিয়া-অঞ্চলের জন্য আয়োজিত হয়েছিল ঢাকার সম্মেলন। বিজ্ঞানের এবং তারো চেয়ে বেশি প্রযুক্তির পেশায় মেয়েদের আসার বাধা এ অঞ্চলে আরো অনেক বেশি বলেই প্রতীয়মান হয়েছিল সেখানে। বাধার অনেকটাই মনোভঙ্গীজনিত— মেয়েদেরকে যতটা না বিজ্ঞানী বা প্রকৌশলী হিসেবে দেখা, তার চেয়েও বেশি দেখা সংসারধর্ম পালনে তার দায়িত্বের মধ্যে, ফলে শুধু বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কেন, চ্যালেঞ্জ নিতে হবার মতো প্রতিযোগিতামূলক যে কোনো পেশায় মেয়েদেরকে মেনে নিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠি নি।

বারো বছর আগের থেকে এখনকার পরিস্থিতিতে কিছুটা হয়তো উন্নতি হয়েছে, কিন্তু মনোভঙ্গীগত বিষয়টি রয়ে গেছে অনেকখানি। বৈমানিক লারার মর্মান্তিক মৃত্যু এবং এর পরের কিছু আলোচনা সে কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। লারা ছিল আমাদের নতুন প্রজন্মের নারীর আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনার প্রতীক যেমন তার মা ও বাবা সেই সম্ভাবনা এগিয়ে নেবার কাঙ্ক্ষিত অনুপ্রেরণাদায়ী। দুর্ঘটনা লারাকে ও সহকর্মী সুমনকে অতি তরুণ বয়সে সবার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। এটি হৃদয় বিদারক– কিন্তু চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী নতুন নারীত্বের জন্য এটি পরাজয় নয়, বরং জয়ের জন্য পুরুষের মতো সমান ঝুঁকিকে বরণ। তাই প্রতিষ্ঠিত বৈমানিক-লেখক যখন বহুল পরিচিত যুক্তিগুলো দিয়ে বলার চেষ্টা করেন বৈমানিকের পেশা নারীর জন্য নয়, তখন প্রতিবাদে সোচ্চার হয় মেয়েরাই, সবিনয়ে বলে সরি, আপনার উপদেশ মেনে নিতে পারলাম না, মেয়েরা পাইলট হবে বৈ কি।

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হলো কিশোরী কার্যক্রম— মেয়েদেরকে সমান অধিকার ও সমান অগ্রগতির সুযোগ করে দেবার চেষ্টায়। এর সচেতনতা সৃষ্টিকারী প্রচেষ্টায় আমরা ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলো বহুদিন যাবত ব্যবহার করে আসছি। তিনি লারার মা। তাঁর শোক আজ কিশোরী কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত আমাদের সবার জন্যই মর্মান্তিক শোক আর সেই সঙ্গে নবায়িত প্রেরণা, চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করার জন্য। লারার বোন বলেছেন, 'আমরা শোকাহত, কিন্তু এই শোকের মাঝে গৌরবের অহঙ্কার আছে।' আমাদের সকলেরও ঠিক একই অনুভূতি।

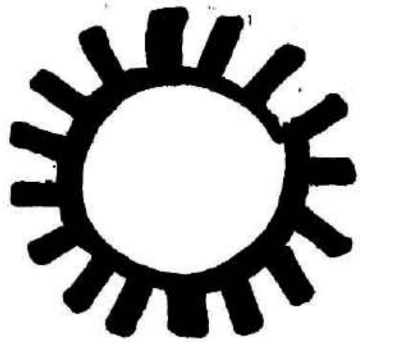

আলেয়া বেগমের সারাজীবন :

[অক্টোবর-'৯৯]

সময়ের প্রেক্ষিত নিয়ে একটি রূপকথা

মূল: গডফ্রীড বোমান

বাংলা রূপান্তর : মুহাম্মদ ইব্রাহীম

রান্না ঘরের ছাদের উপরে একটি ডিম ছিল। ডিমটি ছিল অত্যন্ত ছোট, একটি পিনের মাথার চেয়েও ছোট। গল্প-দাদু ডিমটি ভাল করে দেখার জন্য তাঁর চশমা খুঁজছিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে ডিমটি ফুটে আলেয়া বের হয়ে আসলো। আলেয়া বের হয়েই গল্প দাদুর বাম কাঁচের কাছে হেঁটে আসলো। কাঁচের মধ্যে নিজের প্রতিফলন দেখে সে নিজেই মুগ্ধ: 'বাহঃ কি সুন্দর আমি, সার্থক জনম আমার।'

বলে রাখি, আলেয়া একটি মে-ফ্লাই মাছি। মুগ্ধ আলেয়া চোখ ফেরাতেই চোখে পড়লো পৌরসভা ভবনের বড় ঘড়িটি। ঠিক সকাল সাতটা বাজে এ ঘড়িতে। আলেয়া বিড়বিড় করে আপন মনে বললো 'বড় ব্যস্ত যাবে দিনটা। আমাকে বড় হতে হবে, প্রেম করতে হবে, বিয়ে করতে হবে, বাচ্চা জন্ম দিতে হবে, তারপর মরতে হবে- সবকিছুর জন্য সময় মাত্র ১২ ঘন্টা। সব করে উঠতে পারবোতো? চেষ্টা তো করতে হবে।'

ছোট্ট দুখানা ডানা মেলে দিয়ে সদ্যজাত আলেয়া বেগম সাহস করে বাগানের দিকে উড়ে গেল। সেখানে তার সঙ্গে দেখা হলো বেশ সৌম্য চেহারার মাঝ বয়সী বাদশা মিয়ার। বাদশা লাজুক কণ্ঠে একটু খানি মাথা নুইয়ে শুধু বলতে পেরেছিলো 'ওগো সুন্দরী'। লাজে মুখ লাল করে আলেয়া বল্‌লো 'আমি একটু আগে ভূমিষ্ট হয়েছি মাত্র'। বাদশার বয়স হয়েছে-অন্তত অর্ধ দিন। কিন্তু এখনো তার দিব্যি চেহারা। আলেয়ার চোখে তো রীতিমত সুপুরুষ। বাদশা বল্‌লো 'দেখ মেয়ে, নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। বিয়েটা তাড়াতাড়ি সারা দরকার'। দুজনের চোখে পড়লো পৌরসভার সেই ঘড়ি-এখন সাড়ে আটটা। অনেক সময় গেছে এর মধ্যে-বাগানের ফুলগুলোর মধ্য দিয়ে একটুখানি প্রেম নিবেদনের চেষ্টা বাদশা করেছিল-কিন্তু সময় পায়নি। হঠাৎ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে আসলো তার মুখ-চিৎ হয়ে পা উপরের দিক করে শুয়ে পড়লো। সে গতায়ু হলো।

জন্মের পর পরই এই মৃত্যুর দৃশ্য- আলেয়াকে যতটা না ব্যথিত করলো তার চেয়ে করলো অবাক। একটু কাঁদতে পারলে হয়তো ভাল লাগত কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলো সে তখন রীতিমত ভারিক্কী একজন বয়স্কা মহিলা। এ বয়সে আবেগ তার মানায় না। তা ছাড়া ইতিমধ্যে জন্ম নেয়া তরুণ তরুণীরা তার চারপাশে উড়ছিলো। আলেয়ার উপদেশ দিতে ইচ্ছে করছিলো। 'তরুণ বন্ধুরা সময় বড় মূল্যবান, ত্বরা কর, ত্বরা কর-নইলে শিগ্‌গির দেখবে জীবনটি বড় অন্তঃসারশূন্য'। কিন্তু কথা শোনার সময় তাদের কোথায়? ওরা ছুটে চলেছে রোদের দিকে। আলেয়াও সাহস সঞ্চয় করে এগোল সেদিকে।

এখানেই দেখা হলো আলেয়ার তার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে। এবার সরাসরি কাজের কথায়। দ্বিতীয় স্বামী বাসেদ আলীর বয়স বা রূপ নিয়ে আলেয়ার মাথা ব্যথা নেই। বাসেদের জিজ্ঞাসা 'তোমার কি আগে বিয়ে হয়েছে? সে স্বামীকে ছাড়লে কেন?' 'ছাড়ার কথা কেন, সে বেচারা যে মরেই গেল। সে তো কবেকার কথা। অনেকটা সময় ধরে আমি বিধবা'। এই যে কথাবার্তা এটিও মে ফ্লাই-মাছির জীবনের অনেক লম্বা সময়। তাই কথা না বাড়িয়ে সরাসরি বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা।

বাসেদের সঙ্গে আলেয়ার বিয়েটা সুখের হয়নি। পিপঁড়াদের ডিম ছিনতাই সংক্রান্ত একটি কেসে পড়ে তার জেল হয়েছিল। সেই যে জেলে নিয়ে গেল তার খবর আর আলেয়া বেগম পায়নি। এর মধ্যে সে ডিম্ববতী হয়েছে। কয়েকশ' ডিম পেড়ে হালকা হওয়া আলেয়া ডানা মেললো ঝড়ো হাওয়ায়। কি প্রশান্তি, কি আরাম এই ভাবনাহীন ভেসে বেড়ানো।

ক্লান্ত আলেয়া নেমে এসে আম পাতার উপর জমা একটুখানি পানি খেয়ে নিয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

যখন ঘুম ভাঙলো সূর্য তখন ডুবু ডুবু। আমগাছের উপর ধীরে ধীরে হাঁটছিল প্রবীণা আলেয়া বেগম। সন্ধ্যার লালচে আলোতে তার চারপাশে পোকা, মাকড়, শামুক সবাইকে বাড়ী ফিরতে দেখছিলো সে। সবাই ব্যস্ত-কিন্তু আলেয়া নয়। ওর ব্যস্ততা শেষ। হঠাৎ সে স্থির হয়ে গেল। আলেয়া বেগমের জীবনাবসান হলো।

পুনশ্চঃ মে ফ্লাই মাছি বিভিন্ন ধরনের মাছিদের একটি প্রজাতি। তাদের গড় আয়ুষ্কাল বারো ঘণ্টার মত।

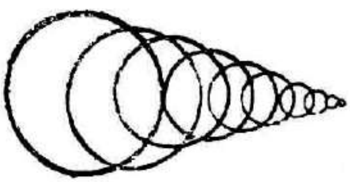

সময়ের মূল্য

[অক্টোবর '৯৯]

ই-মেইল বচন থেকে অনূদিত

এক বছরের মূল্য যদি বুঝতে চাও
তাহলে যে ছাত্র এবার ফেল করেছে তার সঙ্গে কথা বল।
এক মাসের মূল্য যদি বুঝতে চাও
যে মা সময়ের আগে বাচ্চা জন্ম দিল তার সঙ্গে কথা বল
এক সপ্তাহের মূল্য যদি বুঝতে চাও
সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে কথা বল।
এক দিনের মূল্য যদি বুঝতে চাও
দিন মজুরের সঙ্গে কথা বল।
এক ঘণ্টার মূল্য যদি বুঝতে চাও,
যে প্রেমিক, প্রেমিকার সাক্ষাতের অপেক্ষা করছে তার সঙ্গে কথা বল।
এক মিনিটের মূল্য যদি বুঝতে চাও,
যে যাত্রী ট্রেন মিস করলো, তার সঙ্গে কথা বল।
এক সেকেন্ডের মূল্য যদি বুঝতে চাও,
যে মোটর দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেল তার সঙ্গে কথা বল।
এক মিলিসেকেন্ডের মূল্য যদি বুঝতে চাও,
অলম্পিকে যে রৌপ্য পদক পেল তার সঙ্গে কথা বল।
এক নেনো সেকেন্ডের মূল্য যদি বুঝতে চাও,
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বল।

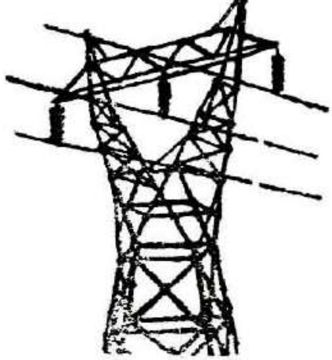

চমকপ্রদ

ডিম্বাণুর উদার নীতি : নতুন প্রজাতির সৃষ্টি [জানুয়ারী-২০০০]

সুকুমার রায়ের হাঁস আর সজারু মিলে হাঁসজারু, কিংবা বক আর কচ্ছপের সংকর বকচ্ছপের কথা মনে আছে? বাস্তব জগতে খচ্চর (ঘোড়ার আর গাধার সংকর) কিংবা লাইগারের (লায়ন আর টাইগারের সংকর) মত কয়েকটিকে বাদ দিয়ে সংকর সৃষ্টি প্রাণিজগতে খুব বেশী সহজলভ্য নয়। তাছাড়া এই সংকরগুলোকে কোন আলাদা প্রজাতি বলা যায়না- কারণ এরা বংশবৃদ্ধি করতে পারেনা। প্রজাতির হতে হলে একই প্রজাতির মধ্যে মিলনে বংশ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

আসলে সংকর মাত্রেরই জীবন গোড়া থেকেই বিপদ সংকুল। এর শুরুটাই সব চেয়ে বড় বাধা যে সময় মায়ের ডিম্বাণু বাবার শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত হবার কথা সে মুহূর্তটিকে। এক প্রজাতির শুক্রাণু অন্য প্রজাতির ডিম্বাণুকে সাধারণত নিষিক্ত করতে পারেনা-প্রজাতির সংখ্যা এ ভাবেই নির্ধারিত হয়ে আছে।

এই ব্যর্থতার কারণ নিষিক্ত রয়েছে শুক্রাণুর গায়ে থাকা কিছু প্রোটিন যাকে আমরা বলতে পারি 'চাবি'। নিষিক্ত হতে হলে ডিম্বাণুর গায়ে থাকা অন্য প্রোটিন যাকে 'তালা' বলতে পারি তার মধ্যে একে ফিট হতে হবে। একমাত্র তাহলেই নিষেকের দরজা খুলবে। প্রত্যেক প্রজাতির এই তালা-চাবি সুনির্দিষ্ট রয়েছে। এক প্রজাতির চাবি অন্য প্রজাতির তালা খুলবেনা। যদি নূতন প্রজাতি সৃষ্টি হতে হয় তাহলে তালা-চাবির একটি নতুন কম্বিনেশনের প্রয়োজন হবে পুরানোটা বজায় রেখে তা চলবে না। এটি ঘটার সম্ভাবনা কম। কারণ তালা যদি কোন কারণে নিজেকে বদলায় তা হলে এ তালায় ফিট করার মত নতুন চাবি পেতে সময় লাগবে। যতদিনে সেই চাবি বিবর্তিত হবে, তত দিনে এই তালা মরে যাবে। নিজ প্রজাতির পুরানো চাবিতেতো তাকে আর খোলা যাবেনা।

তবে এর মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে। যেমনটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এক ধরনের ঝিনুকের ক্ষেত্রে। এই ঝিনুকগুলোর মধ্যে কাছাকাছি বেশ কিছু প্রজাতি রয়েছে। মনে হচ্ছে এখানে নতুন প্রজাতি অপেক্ষাকৃত সহজেই সৃষ্টি হতে পারে। এর শুক্রানুর চাবিটি হলো লাইফিন নামের প্রোটিন যা প্রত্যেক প্রজাতিতে কিছুটা আলাদা। ঝিনুকের ডিম্বাণুর তালাটি অন্য একটু বৈশিষ্ট্যময়। এই তালা শুধু একটি চাবিতে খুলবে এমন কথা নেই এর যে প্রোটিন তার অংশ বিশেষকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যায় যে তার এক এক অংশ কিছুটা ভিন্ন চাবিতে খুলতে পারে। একই সঙ্গে অবশ্য অন্য অংশগুলো পুরানো স্বাভাবিক চাবিতে খোলার উপযুক্ত নিযুক্ত থেকে যায়। এমন পরিবর্তিত চাবি যদি পাওয়া যায় যা তালার একটি অংশে ফিট করে নিষেক ঘটায়, তা হলে কয়েক প্রজন্মের মধ্যে এই পরিবর্তনটিই ডি, এন, এর মাধ্যমে স্থায়ী রয়ে যায়। আর তালার সব অংশ এই চাবিকেই খুলতে আরম্ভ করে। তখনই জন্ম হয় একটি নূতন প্রজাতির।

ঝিনুকের মধ্যে এর বিষয়টি আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা তখন নূতন প্রজাতি সৃষ্টির রহস্যটি আরো ভাল বুঝতে পারছেন। তাঁরা মনে করছেন ঠিক ঝিনুকের মত না হলেও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও এরকম দল-ছুট গোছের শুক্রকীটকে ডিম্বকীট যাতে গ্রহণ করতে পারে যে পথ কোন না কোনভাবে খোলা থাকে।

যা আসছে

ডাক্তারের কাছে জেনেটিক প্রফাইল

[এপ্রিল-২০০০]

এখন আমরা ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি হয়তো আগের প্রেসক্রিপশনগুলো দেখতে চান। পুরানো বড় অসুখের ক্ষেত্রে হয়তো পুরো মেডিক্যাল হিষ্ট্রি চান। তারপর তিনি রোগ নির্ণয় করে ওষুধ দেন। বাজারে সবার জন্য যে ওষুধ রয়েছে সেখান থেকেই বেছে তাঁকে ওষুধ দিতে হয়, কোন রুগীর জন্য সেটি কোন দিক থেকে যুৎসই না হলে তিনি নাচার। আগামী দিনগুলোতে আমরা এই ব্যাপারে কি আশা করতে পারি।

বিশ-ত্রিশ বছর পর হয়তো ডাক্তার আরো একটি জিনিস চাইবেন রুগীর কাছ থেকে। সেটি হলো রুগীর জেনেটিক প্রফাইল। না, এর জন্য বাক্স ভরে গাদা গাদা কাগজ নিয়ে যেতে হবে না, বরং ছোট একটি প্লাষ্টিকের কার্ড-অনেকটা আইডি কার্ডের মত, সেটিই হবে এক একজনের জেনেটিক প্রফাইল। কথা বলতে বলতে ডাক্তার কার্ডটি তাঁর কম্পিউটারের ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন। কম্পিউটারে দু'একটি কথা টাইপ করে, স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে হয়তো বলবেন "আপনার ফ্লুটি বেশ একটু জটিল রকমেরই, তবে কোন চিন্তা নাই- ফার্মেসীতে ঠিক আপনার প্রয়োজনের মত করেই বিশেষ ওষুধ তৈরীর কাজ কম্পুটার শুরু করে দিয়েছে। যাবার আগে ওষুধটি নিয়ে যাবেন। কালই অসুখ ভাল হয়ে যাবে"। এসময়ের মধ্যে কম্পিউটার আপনার জেনেটিক প্রোফাইল দেখে নিশ্চিত হয়েছে ফ্লুটির প্রতি আপনি জেনেটিক দিক থেকে কি রকম সংবেদনশীল-আপনার জন্য ওষুধটিতে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। সেখান থেকে নির্দেশ চলে গেছে সংলগ্ন ফার্মেসীর স্বয়ংক্রিয় মেশিনে ঠিক তেমনি করে, খাস আপনার জন্যই ওষুধটি তৈরী করার জন্য।

প্রায় এই রকম একটি দৃশ্য আমরা আশা করতে পারি, কারণ আগামী কয়েক বছরে মানব দেহের ১৪০,০০০ টির মত জিনের প্রত্যেকটির কোডিং আমরা বুঝে ফেলতে পারবো বলে আশা করা যায়। অর্থাৎ এই প্রত্যেকটি জিন আমাদের কোষে কি জন্য আছে, জীবনের উপর কি তার প্রভাব তা জানা হয়ে যাবে। যেমন ৪০০০ বিভিন্ন অসুখের মধ্যে কোন কোনটিতে ব্যক্তিগত ভাবে আমার জেনেটিক পরিস্থিতির কারণে আমি কাতর। এভাবে প্রত্যেকের নিজস্ব "সম্পূর্ণ" জেনেটিক বৈশিষ্ট্য একটি কম্পিউটার চিপের কার্ডে লিখে রাখা যাবে- সেটিই জেনেটিক প্রফাইল।

এটি ডাক্তারকে জানিয়ে দেবে আমার শরীরের ঘাটতিগুলো-কোন্ বিশেষ এনজাইম বা প্রোটিনের ঘাটতি আমাকে বেকায়দায় ফেলছে। একের পর এক ওষুধ দিয়ে ডাক্তারকে দেখতে হবে না যে সেটি আমার কেন্দ্রে কার্যকর কিনা, এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আমার ক্ষেত্রে সহনীয় কিনা ইত্যাদি। ফলে অনেক ক্ষতি এবং অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। জেনেটিক প্রোফাইল অনুযায়ী আমার যেমনটি দরকার, যেমনটি আমার জন্য সহনীয় হবে তেমনি ওষুধ আমার জন্যই তৈরী করা যাবে- এবং সেটি আমাকে একবারই ফিট্ করবে? যেমন করে দর্জির মাপ নিয়ে বানানো পোষাক একবারেই ফিট্ করে।

যে ওষুধ দেয়া হবে তার প্রকৃতিটা কেমন হবে? আমাদের অতি পরিচিত ওষুধগুলো তার মধ্যে থাকবে-এন্টিবায়োটিক, এন্টিহিষ্টামিন, ব্যথা নাশক, ঘুমের ওষুধ-ইত্যাদি সবকিছু তবে এর মধ্যে প্রত্যেকটিকে আবার হুবহু

প্রয়োজন অনুসারে অদল বদল করা যাবে। তবে এসব ছাড়াও ওষুধের ব্যাপ্তি বেড়ে যাবে অনেক অনেক-বলতে গেলে প্রায় সব রকমের অসুস্থতার জন্য শারীরিক মানসিক, এমন অনেক অসুখের জন্যও যেগুলোর সত্যিকার কোন ওষুধ এখন নাই। আজ যে সব ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় নেই সেখানেও হবে ওষুধের জয়জয়কার। টিউমার সারাতে সার্জনের ছুরির চেয়ে ডাক্তারের ক্যাপসুলই বেশী কার্যকর হবে। অনেকের মতে গুরুতর দুর্ঘটনাজনিত কেইস ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করতে হয়তো চিকিৎসা বিদ্যার জন্য ক্রমেই লজ্জাস্কর বলে মনে করা হবে।

জেনিটিক কারণে যে সব অসুখের সৃষ্টি হচ্ছে বা যেগুলো প্রশ্রয় পাচ্ছে সেজন্য জিন চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এবার সত্যিকারের অগ্রগতি হবে। তবে মনে হয় সেটি বিকল জিন মেরামত করার চেয়ে, ঐ বৈকল্যের ফলে কোন প্রোটিনের ঘাটতি হচ্ছে-সেটি জানার উপরই গুরুত্বটা বেশী থাকবে। যেমন ডায়বেটিক রুগীর ক্ষেত্রে পায়ের রক্তচলাচল বন্ধের যে প্রবণতা সেটি ভিইজিএফ-২ নামে একটি প্রোটিনের সাহায্যে দূর করা সম্ভব হচ্ছে সম্প্রতি। এমনিভাবে গুরুতর হার্টের রুগীর জন্য এমন প্রোটিন উদঘাটন করা হচ্ছে সেটি হার্টে নূতন রক্তনালী তৈরী করে সেখানে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। এ ধরনের প্রোটিনগুলো তৈরী হবে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট জেনিটিক নির্দেশনার মাধ্যমে।

এই শতকের ওষুধগুলোর মূল রসায়ন শাস্ত্রে নিহিত থাকার বদলে তা থাকবে জেনেটিক শাস্ত্রে নিহিত। সনাতন রাসায়নিক ওষুধগুলো রাসায়নিক দ্রব্যের তৈরী এবং তা কাজ করে প্রধানত রোগের লক্ষণের উপশমে-যেমন এসপ্রিন। আগামী দিনের ওষুধ কাজ করবে মানব জিন, মানব প্রোটিন, মানব কোষের ভিত্তিতে; রাসায়নিক দ্রব্যের ভিত্তিতে নয়।

একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

[জুলাই-২০০০]

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

'একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' এমন একটি শিরোনাম নিয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করার জন্যই আমি প্রথমে ক্ষমাপ্রার্থী। বিজ্ঞানের বহু সোনা-ফলানো শাখার কোনটিরই বর্তমান সম্পর্কে আমার এমন কোন জ্ঞান নেই যার ভিত্তিতে আগামী দিনের কথা কিছু আন্দাজ করতে পারি। তবুও আর দশ জন সাধারণ মানুষের মত দর্শক হিসাবে যা দেখছি, কাগজে যা পড়ছি, তার ভিত্তিতে কল্পনাকে কিছু এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং আপনার কল্পনার সঙ্গে কৌতূহল ভরে তা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করতে দোষ কি! মনীষীরা বলেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে। বিংশ শতাব্দীর দিকে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলে হয়তো একবিংশের ভাবভঙ্গী বুঝতে সহায়ক হবে। বিজ্ঞানীদের জন্য বিংশ শতাব্দীটা শুরুই হলো একটি বিপ্লব-দিয়ে, কোয়ান্টাম বিপ্লব। অনেকগুলো মৌলিক ধারণা ভেঙ্গে দিল এটি। কণিকা আর তরঙ্গের পৃথক সত্ত্বা রইলো না। সকল অস্তিত্ব হয়ে পড়লো সম্ভাবনার ব্যাপার, নীতিগতভাবে বিজ্ঞানের পক্ষে সর্বাত্মক নিশ্চয়তা দাবি আর সম্ভব হলোনা। এসব ছাড় দেয়ার বিনিময়ে অবশ্য আমরা প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হলাম-বস্তুকে সর্বোতভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, তাকে সূক্ষ্ম কৌশলে কাজে লাগানোর ক্ষমতা, এমনকি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের শুরুর মুহূর্তে কি ঘটেছিল, তার পরিণতিই বা কি হতে যাচ্ছে সেটি আন্দাজ করার ক্ষমতা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেকটা আমরা কাটালাম এই অভূতপূর্ব ক্ষমতাকে সুসংহত করতে।

কোয়ান্টাম বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর বছরটিতে। আর তার ঠিক মাঝামাঝি বছরের কাছাকাছি সময়ে ঘটলো আর একটি মহা-ক্ষমতা লাভ। ডি এন এর গঠন উদঘাটিত হলো। যেই নীলনক্শা ধরে জীব সৃষ্টি ও বিকশিত হয় সেটি এর ফলে মানুষের শুধু বুদ্ধির সীমার মধ্যে এলো না, কর্মের সীমার মধ্যেও চলে এল। জিন কারিগরি জীবনের মৌলিক উপাদানের উপর হাত দিলো। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধেকটিতে আমাদের এই ক্ষমতা এতখানি বিকশিত হলো যে আজ আমরা তাকে নিয়ে সাহসী সব স্বপ্ন দেখতে পিছ পা হচ্ছি না।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দুটি দশকে এসে আরো কিছু ঘটনা ঘটলো যা একবিংশের উপর প্রচুর প্রভাব ফেলবে। এর একটি হলো সাধারণ যুক্তি বা লজিকের অনুসরণে অসংখ্য ছোট ছোট কাজের ধাপে জটিল কাজ করার ঝামেলাটি অনায়াসে কম্পিউটারের হাতে ছেড়ে দিতে পারা। এর সঙ্গে যোগ করে দেয়া গেল তথ্য বিনিময়ের জন্য টেলিযোগাযোগের বিস্তৃত জাল-এক দিকে একেবারেই ঘরোয়া, অন্যদিকে একেবারেই বিশ্বজনীন। ফলে বিশ্বের সবাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবার এক অদ্ভুত সুযোগ এসে গেলো। কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি জীবনকে বদলাতে শুরু করলো, এবং বিজ্ঞানকেও। সেই যে বস্তুকে নিয়ে কোয়ান্টাম বিপ্লব ঘটেছিলো, এখন সেটি ক্ষুদ্রায়িত ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বায়নের ফসল ফলালো। প্রায় একই সঙ্গে মানুষ নিজের একটি মাত্র ঠাঁই আপন বিশ্বটি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে- পরিবেশ রক্ষা ও বিশ্বকে টেকসই রাখার প্রবল আগ্রহ তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। ধরিত্রী সম্মেলন ও

তারপরের সময়ে এই আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞানকেও প্রভাবিত করেছে বৈ কি? এই সব প্রভাবকে সঙ্গে নিয়েই আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি।

স্বাভাবিক ভাবেই একবিংশ শতাব্দীর অন্তত প্রথম দিকে আমরা বিগত দিনগুলোর কিছু ধারাবাহিকতা দেখতে পাবো। উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীতে আমরা যখন আসছিলাম তখনো বিজ্ঞান মানুষের জীবন যাত্রার প্রযুক্তিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে শুরু করেছিলো- অন্তত উন্নত বিশ্বে। বিদ্যুৎ চালু হয়েছিল, হয়েছিল টেলিফোন ও মোটরগাড়ী। রেডিয়োর আসি আসি অবস্থা। কিন্তু আজকের মত প্রভাবটি সর্ববিস্তৃত ছিল না, আর এত সরাসরি বা তাৎক্ষণিকও ছিলনা। কিন্তু আজ বিশ্বায়নের যুগে জীবনযাত্রায় মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলো এবং অর্থনৈতিক বাজার বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় খুব বড় নিয়ামক হতে বাধ্য। সেদিন বিজ্ঞান যতটা স্বাধীন ও নিজের গন্ডীতে থেকে তার গতিপথ ঠিক করেছিল, আজ সেটি অনেকটাই অসম্ভব। তাই প্রযুক্তি-বাজারের আজকের সীমান্ত-যুদ্ধগুলোকে লক্ষ্য করলে খানিকটা আঁচ করা সম্ভব বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা কোন কোনদিকে প্রসারিত হবার সম্ভাবনা অধিক। তাছাড়া মানুষের জীবন ভঙ্গীতে আর চিন্তার ধারায় যে সব মৌলিক পরিবর্তন এখন ঘটছে সেগুলো বিজ্ঞান চর্চার পুরো ব্যাপারটিকেও যে অনেকটা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত করে দেবে না, তাও বা কে বলতে পারে।

এই মৌলিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গে আমার কাছে যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে তা হলো বিজ্ঞানে বিশ্বব্যাপী মানুষের অংশগ্রহণ বাড়বে। তথ্য প্রযুক্তিই এই বাড়াকে অনিবার্য করে তুলবে। কম্পিউটারের সঙ্গে মানুষের মিথষ্ক্রিয়ার যে ক্রমবর্ধমান সুযোগ তা শুধু কম্পিউটার বিজ্ঞানকেই দ্রুত সমৃদ্ধ করবে না, কম্পিউটারের মাধ্যমে অন্যান্য বিজ্ঞান চর্চার পরিধি বাড়াবে। বিজ্ঞানের অনেক শাখাতেই জুড়ে আছে কম্পিউটারে প্রোগ্রাম লেখা, কম্পিউটার সিম্যুলেশন করা ইত্যাদি। এ সবে অনেক বেশি মানুষের অংশ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তা ছাড়া তথ্য প্রযুক্তি যে ভাবে এগোচ্ছে পৃথিবীর নানা প্রান্তের বিজ্ঞানীরা নিত্য কানেক্টেড হয়েই কাজ করবেন– ল্যাবোরেটরির সীমিত গন্ডীতে তাঁদের কাজকে বাঁধা যাবে না। ভার্চুয়াল ল্যাবোরেটরি, রিমোট ল্যাবোরেটরি অনেক দেশের অনেক গবেষকদলকে একই সঙ্গে কাজ করতে দেবে। বিজ্ঞানকে 'পাবলিক নলেজ' হিসাবে দেখার প্রবণতাটি বিংশ শতাব্দীর। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চাকেও সত্যিকার 'পাবলিক একটিভিটি'তে পরিণত করার কৃতিত্ব বোধ হয় থাকবে একবিংশ শতাব্দীর হাতেই। এই শতাব্দীর শুরু থেকেই বিজ্ঞানী মানুষ বেশি বেশি নিজের দিকে তাকাচ্ছে, অর্থাৎ নিজের জৈব সত্ত্বার দিকে। অতীতে তাঁরা বস্তু জগতের কথা যত মৌলিকভাবে উদঘাটন করেছেন, জীবজগতের কথাকে সেভাবে পারেননি। এখন বোধ হয় সেই বিপ্লবটিই ঘটতে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীতে কোয়ান্টাম বিপ্লবের সমতুল্য কিছু জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটাটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া প্রযুক্তিগত দিক থেকে এই বিষয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা এখন আকাশ ছোঁয়া হয়েছে এবং দ্রুত এগোবার চাপটিও তাই অত্যন্ত বেশি। মানব-জোনোম প্রকল্প এখন সমাপ্তির পথে। অর্থাৎ শিগ্‌গির মানুষের বিস্তারিত জেনেটিক পরিচয় সবার করায়ত্ত হবে- আমরা জানবো আমাদের কোন জিনটি কিসের জন্য দায়ী, কি পরিবর্তন করতে হলে কোনটির কলকাঠি নাড়তে হবে। এই জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে মানুষ যে নিজের উপর কি করতে না পারবে সেটিই ভাবার বিষয়।

জেনিটিক কারিগরির ক্ষেত্রে প্রজাতির সীমা ইতোমধ্যেই লঙ্ঘিত হয়েছে। নানা প্রজাতির জীবের মধ্যে জিনের প্রতিস্থাপন থেকে চলছে, এমন কি উদ্ভিদের জিন প্রাণীতে পর্যন্ত। পুরো জীবজগতটাই এখন এই কারিগরের কাঁচামাল। তাই জীব-বৈচিত্র এখন অমূল্য জাতীয় সম্পদ- এর উপর সত্ত্ব নিয়ে এখন সবাই খুব সচেতন হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরো হবে। একবিংশ শতাব্দী যত এগোবে ততই হয়তো মানুষ তেলের খনি বা লোহার খনির চেয়ে দেশের জীব-বৈচিত্রকে অধিক বড় সম্পদ বলে মনে করতে শিখবে।

বিজ্ঞানীরা এখন মানব দেহকে ক্রমেই তাঁদের বৈধ এলাকা করে নিচ্ছেন- শুধু জরুরী কারণে ছোট খাট রদবদল নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য। মানব ক্লোনিং এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। টিস্যু ক্লোনিং এর মাধ্যমে একেবারে খাস করে নিজের জন্য তৈরি দেহের সব রকমের স্পেয়ার পার্টস তাও বেশি দূরে নয়। এই প্রক্রিয়া কতদূর যাবে, নিজেকে মানুষ কতখানি বদলাবে, কতখানি নবায়ন করবে, আয়ুষ্কালের সম্ভাবনা কতখানি বাড়িয়ে দিতে পারবে, এমন কি নিজের বংশধরকে কতখানি আত্ম-সদৃশ, আর কতখানি নতুন পরিকল্পিত রূপ দেবে- এগুলো একবিংশ শতাব্দীতে পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানতে পারবো। তবে এ সবের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এখন এমন অচিন এলাকায় চলে যাচ্ছেন, এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হচেছন যা তাঁরা অতীতে কখনো চিন্তা করেন নি।

উদাহরণস্বরূপ একজন মানুষের সঙ্গে তার অরিজিনাল দেহটির কি সম্পর্ক সেটি নির্ধারণ করতে হবে। আমার প্রায় সবকিছুই যদি বদলে যায়, তখনও আমি কতটুকু আমি থাকবো, আসলে আমিটাই বা কি, এ ধরণের বেয়াড়া প্রশ্নের উত্তর হয়তো তাঁকে দিতে হবে।

ভুক্তভোগী মানুষ হিসাবে দরিদ্র দেশের আমরা একবিংশ শতাব্দীর এসব অগ্রগতি থেকে আরো কিছু আশা করতে পারি। হয়তোবা জৈব প্রযুক্তি খাওয়া-পরা-জ্বালানি-স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা মেটাবার অভাবে যে দারিদ্র তার থেকে আমাদেরকে অব্যাহতি দিতে পারবে। এই দিকটিতে হয়তো আমাদেরও অবদান থাকবে। বিশ্বায়নের একটি ইতিবাচক ফল হিসেবে হয়তো দুনিয়ার মানুষ দুনিয়াটাকে একসঙ্গে টেকসই করার কথা ভাববে। বৈষম্যের মাধ্যমে একাংশকে টেকসই করার দুরাশা বাদ দিয়ে, পরিবেশকে প্রাকৃতিক থাকতে দিয়ে, অসীম প্রবৃদ্ধির দিকে ধাবিত না হয়ে, অন্য ধরনের একটি সমৃদ্ধ জীবনমানকেই দুনিয়ার সবাই তৃপ্তিকর বলে মেনে নেবে। ঐ পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষেও সে রকম তৃপ্তিকর অবস্থার কাছাকাছি যাওয়া যেমন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হবে তার অর্জনে অবদান রাখাও সহজ হবে। বিজ্ঞান এমনি একটি পরিস্থিতির দিকে যাবার সহায়ক হলে তাকে একবিংশের একটি বড় বিপ্লব হিসাবে স্বাগত জানাতে হবে। ধরিত্রী সম্মেলনের পর থেকে উন্নত বিশ্ব সহ সারা দুনিয়াতে এমনি একটি আকাঙ্ক্ষা ক্রমে জোরদার হয়েছে।

বিজ্ঞানী যে রকম বেশি বেশি করে দেহগত অর্থে নিজের দিকে তাকাবে তেমনি আত্ম-উপলব্ধি অর্থেও তা করবে। এই প্রক্রিয়াটিও ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। স্পেস প্রোগ্রামের এখন একটি বড় কাজই হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে জীবনের সন্ধান করা। এক সময় আমাদের মত বা আমাদের চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান প্রাণীর সম্ভাবনাকে ধরে নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহু কিছু করেছেন। সিগন্যাল পাঠিয়েছেন চারদিকে, দূরপাল্লায় যাত্রার আগে এদের সাক্ষাত লাভের সম্ভাবনায় মানুষের আত্ম-পরিচয়ের আইডি কার্ড বানিয়ে দিয়েছেন সযত্নে। এখন ক্রমাগত নেতিবাচক ফলাফলে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে জীবনের ছিটে ফোঁটাও, ক্ষুদ্র জীবাণুর আকারে হলেও কোথাও আবিষ্কারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

অব্যাহত থাকবে এই কারণে যে আসলে মানুষ বুঝতে চায় বিশ্ব ব্রাহ্মান্ডে তার আসল অবস্থানটিকে। বিজ্ঞানের সাধারণ বিচারে এটি স্পষ্ট যে মহাবিশ্বের যে ব্যাপ্তি আর যে বৈচিত্র তাতে পৃথিবী নামক একটি ছোট বিন্দুর তেমন কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকার কথা নয়। কাজেই এখানে যা যা ঘটেছে, যার মধ্যে সব চেয়ে বড় জিনিস হলো জীবন, বিশেষ করে মানুষের জীবন, সে রকমটি আরো অসংখ্য জায়গায় হওয়ার কথা। অথচ এ পর্যন্ত চেষ্টায়ও তার কোন প্রমাণ মেলেনি। তা হলে অতি প্রাচীন প্রশ্নটির সম্মুখীন আবার হতে হয়, জীব বিবর্তন কি শুধু এই নগণ্য পৃথিবীটিতেই সম্ভব হয়েছে? এই গ্রহটি কি এতই বিশিষ্ট যে এখানেই শুধু সম্ভব হয়েছে বিবর্তনের এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে এমন বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটেছে যা নিজের সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে সক্ষম। পুরো মহাজগত সম্পর্কে, এমন কি সুদূরতম অতীতে মহাজগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি সম্পর্কেও জানার দাবী করেছে, এমন কি সুদূরতম অতীতে মহাজগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি সম্পর্কেও জানার দাবী করেছে এটি; শুধু তাই নয় নিজেকে সহ আরও অনেক কিছুকে সজ্ঞানে বদলাবার দুঃসাহসও দেখিয়েছে এই বুদ্ধিমত্তা। মানুষের এই আত্মা পরিচিতির সন্ধানটি একবিংশ শতাব্দী এগোবার সঙ্গে সঙ্গে আরো প্রবল হবে।

প্রবল হবার একটি বড় কারণ হলো এ সময় হয়তো মানুষ কিছুটা স্থায়ী ভিত্তিতে আমাদের পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বাইরে বসত করার চেষ্টা করবে। আপাতত চাঁদ আর মঙ্গলই লক্ষ্য। পরে অন্যান্য গন্তব্যও যোগ হতে পারে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির অনেকখানিই যেমন এসেছে যুদ্ধ বিগ্রহের বা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এবং মহাশূন্য অভিযানের প্রয়োজনে, তেমনি একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অনেকখানিই সৃষ্টি হতে পারে গ্রহান্তরিত হবার প্রয়োজনে। কারণ সত্যিকারভাবে ঠাঁই বদল করতে হলে এবং তা করে উপকৃত হতে হলে, বেশ কিছু মৌলিক সমস্যার সমাধান আগে বিজ্ঞানকে করতে হবে। এর জন্য বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতির প্রয়োজন হবে।

যেমন ধরা যাক মঙ্গলকে বাসযোগ্য করতে হলে সেখানকার যে বায়ুমণ্ডল, ভূমি, ভূগর্ভ সেখান থেকে সম্পদ আহরণ করে প্রয়োজনীয় পরিমন্ডল সৃষ্টি করতে হবে। পানি খাদ্য, জ্বালানী এখান থেকেই আসতে হবে- যা হয়তো সম্ভব হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াকরণের উপর নির্ভর করে। কৃত্রিমভাবে পানি, বাতাস তৈরি, কৃত্রিম সালোক সংশ্লেষণ- ইত্যাদির প্রয়োজন হবে। হয়তো দেখা যাবে মঙ্গল নয়, আরো দূরে এমন কি সৌর জগতের বাইরে কোথাও রয়েছে আমাদের জন্য উপযুক্ত ঠাঁই। সেখানে জীবৎকালে গিয়ে পৌঁছতে হলে অসাধারণ গতি সম্পন্ন মহাশূন্যযান দরকার। কি হবে সেরকম যানের চালিকা শক্তি? সে ক্ষেত্রে মৌলিক আবিষ্কার প্রয়োজন। হয়তো পদার্থবিদ্যার জন্য

আরো বড় চ্যালেঞ্জ এখানে লুকিয়ে রয়েছে। আলোর গতির কাছাকাছি গতি যা প্রায় অসাধ্য, যার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক তত্ত্বের অনেক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়, এমনি কিছুর প্রয়োজন হবে। হয়তো বা আলোর গতির সমান গতির অসম্ভবতার মত অমোঘ বিষয়েও নূতন ফাঁকফোকর বের হয়ে যেতে পারে গবেষণার নূতন মাত্রার ফলে। এর কতখানি একবিংশ শতাব্দীতে ঘটবে তা এখন বলা না গেলেও অনেকখানিই যে ঘটবে তা নিঃসন্দেহ। আমরা সবাই অবশ্য গ্রহান্তরে যাবো না। মানুষের প্রকৃত আবাস আরও বহু কাল এই পৃথিবীতে থাকবে। কিন্তু মানুষের নানা উল্লম্ফনের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যা ঘটবে তা কিন্তু কম বেশি সকলের জন্যই পাওনা হবে, সকলের জীবনকেই তা বদলাবে। আজ আমাদের অনেকের জন্য যে সব বাধাকে অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো মনে হচ্ছে কাল হয়তো তা মনে হবে না। ঘন বসতির সমস্যা, খাদ্যের সমস্যা, ক্যান্সার বা এইডের মতো প্রতিকারহীন অসুখের সমস্যাগুলোর সামনে নিজেদেরকে আজ অসহায় বলে মনে হচ্ছে, বিজ্ঞানের আগামী অগ্রগতিগুলো সেগুলোকে হয়তো সহজ সমাধানযোগ্য করে ফেলবে। এটি শুধু অযৌক্তিক আশাবাদের কথা নয়, বিজ্ঞানের ইতিহাসই এমনি আশাবাদের জন্ম দিচ্ছে। এই ইতিহাস দেখিয়েছে বিজ্ঞান কোন অন্ধ নিয়তির দ্বারা চালিত হয়নি, বরং মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এক এক যুগের সমাজ চিন্তা আর অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞানকে সেভাবে সেদিকে ধাবিত করেছে।

যেমন নবায়নযোগ্যতা বিষয়টিকে পঞ্চাশ বছর আগেও বিজ্ঞান তেমনভাবে আমল দেয়নি, কারণ প্রচলিত অর্থনীতি বা সমাজ সেভাবে একে আমল দেয়নি। যখন থেকে দিতে শুরু করেছে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা সেখানে নিয়োজিত হয়ে সোনা ফলিয়েছে। এখন বিশ্বজোড়া পরিকল্পনা রয়েছে কিভাবে নবায়নযোগ্য শক্তিকে আমরা বেশি বেশি করে কাজে লাগাবো। শক্তি উৎপাদনটিই একমাত্র লক্ষ্য এখন আর নয়, সেই শক্তির দক্ষতাটাও বড় কথা, যাতে অল্প শক্তি উৎপাদন করেই বেশি কাজ করিয়ে নেয়া যায়। শক্তি উৎপাদনে শুধু সম্পদ ব্যয়ের প্রশ্নটিই বড় নয়, পরিবেশকে টেকসই রাখার প্রশ্নটিও বড়। তেমনভাবে বিশাল আকারের ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম এক সময় যা করতো, অনেক মালমশলা, অনেক শক্তি ব্যয় করে ক্ষুদ্রাকার সিলিকন চিপ এখন তার চেয়ে অনেক বেশি করছে নগণ্য বস্তু আর নগণ্য শক্তি দিয়ে। এই প্রক্রিয়া আরো অনেক দূর যাবে। সামনে যে ইলেকট্রনিক কৌশলাদি আসবে সেগুলোর কারুকার্য আণবিক অবয়বের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। ক্ষুদ্রায়নের কাজ আরো বহু মাত্রায় এগিয়ে যাবে। ইলেকট্রনিক কৌশলে এখন বিদ্যুৎ যে ভূমিকা রাখছে, তার কিছু আলোককে ছেড়ে দেয়া হবে। সব কিছু মিলে কাজ বেশি হবে, কিন্তু খাই কম হবে।

আগামী দিনের সমাজ, আগামী দিনের অর্থনীতি যদি বিশ্বের সব মানুষের কথা মনে রেখেই তার অগ্রাধিকার ঠিক করে তা হলে বিজ্ঞানের এই চমৎকার বৈপ্লবিক সম্ভাবনাগুলোও এই পথেই এগোবে, সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সব মানুষকে তার মৌলিক সুফলগুলো পৌঁছে দেবে। এই সুফলগুলোর একটি হবে শিক্ষার কৌশলের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যার ফলশ্রুতিতে আপাত প্রতিকূল পরিবেশে বাস করেও পৃথিবীর সব শিশু নিজের মেধার ও সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ ঘটাতে পারবে আর বিশ্ববিজ্ঞানে অবদান রাখতে পারবে সবার জন্য। মানুষ ক্রমেই বস্তুসম্পদ, বা ভারী-সম্পদের দিক থেকে মেধা-সম্পদের দিকে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর সব চেয়ে বড় অর্জন হয়তো ঘটবে এই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে। এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্বজনীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাগিদ আজ প্রচণ্ডভাবে সৃষ্টি করতে হবে, এবং এ কাজে আমাদের দায়িত্ব হবে খুব বেশি। বিশ্বায়নের ফলে এর জন্য আমাদের আন্দোলন, আমাদের অবদানটুকু যোগ করার সুযোগ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। সেটি সম্ভব হলে আমাদের দেশের ছেলে মেয়ে সেদিন নিজের দেশকে ত্যাগ না করে, আমাদের শ্যামল পল্লীতে বসেই শুধু দেশের ভাত কাপড়ের সমস্যা সমাধানে গবেষণা করবে না, বরং মহা-একীভূত তত্ত্বের মাধ্যমে জৈব অজৈব সব সত্তার সরল অথচ পরম সুন্দর পরম তৃপ্তিকর ব্যাখ্যা কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় সেই গবেষণায় নিমগ্ন হবে। এ কাজে আগাগোড়া সে কানেক্টেড থাকবে সারা বিশ্বে ঐ গবেষণার সম্মুখভাগে কর্মরত বাকি সব বিজ্ঞানীদের সঙ্গে। এই লক্ষ্যে কাজে নামার এখনই উপযুক্ত সময়।

বিজ্ঞান সাময়িকীর ৪০ বছরের রচনা তালিকা ◆

আগামী দিনের শক্তি	বোরহানুল ইসলাম সিদ্দিকী	সেপ্টেম্বর ১৯৬০
সাম্প্রতিক/স্ট্রেলকা ও বেলকার মহাশূন্য ভ্রমণ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ১৯৬০
বর্ণালী/মহাজাগতিক রশ্মি, তেজস্ক্রিয়তা, নাইলন, ইন্‌ফিনিটি, বর্ণালী	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ১৯৬০
তেজস্ক্রিয়তার এপিঠ-ওপিঠ	মাসুদুজ্জামান	নভেম্বর ১৯৬০
বর্ণালী/স্থান-কাল, হীরা, প্রোটোপ্লাজম	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৬০
নবতম		নভেম্বর ১৯৬০
সাম্প্রতিক/পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৬০
ত্রয়োদশ পাকিস্তান বিজ্ঞান সম্মেলন		ফেব্রুয়ারী ১৯৬১
বিজ্ঞান সাময়িকী সম্পর্কে 'উত্তরণ'		ফেব্রুয়ারী ১৯৬১
সাম্প্রতিক/গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, আরো একটি তারা, অসনাক্তকৃত উড়ন-চাকী সম্মেলন, উড়ন-চাকী সম্পর্কে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক, ঢাকা কলেজে বিজ্ঞান প্রদর্শনী	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ফেব্রুয়ারী ১৯৬১
আপেক্ষিক তত্ত্ব: সবার জন্যে	মোহাম্মদ আহসান	মার্চ-এপ্রি '৬১
বিজ্ঞান সাময়িকী সম্পর্কে 'পরিচয়'		মার্চ-এপ্রি '৬১
পেটের ভিতর চিনির আড়ত	আবদুল মোমিন	মার্চ-এপ্রি '৬১
বর্ণালী/ট্রানসিস্‌টর, সৌর কলঙ্ক, ইনসমনিয়া, আলকেমী	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মার্চ-এপ্রি '৬১
অথ সংখ্যা সংবাদ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মার্চ-এপ্রি '৬১
সাম্প্রতিক/গবেষণাগারে মানুষ তৈরী, মাথা আছে মুখ নেই, মস্তিষ্ক পরিশোধক ওষুধ, মরুতে ফসল ফলবে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মার্চ-এপ্রি '৬১
নবতম/চতুর্মাত্রিক যান	সাজ্জাদুর রহমান	মার্চ-এপ্রি '৬১
অনুসন্ধিৎসা	ক্যাডেট আবদুল মালেক	মার্চ-এপ্রি '৬১
সবুজ সূর্য	বরকতউল্লাহ	মার্চ-এপ্রি '৬১
আপেক্ষিক তত্ত্ব সবার জন্যে	মোহাম্মদ আহসান	মে ১৯৬১
নবতম/শব্দ-তড়িৎ-মিটার	ফেরদৌস কোরেশী	মে ১৯৬১
সাম্প্রতিক/মহাশূন্যে প্রথম মানুষ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ১৯৬১
মঙ্গলে মাষ্টার	শাহগীর	মে ১৯৬১
জিজ্ঞাসা	সোফিয়া খান	মে ১৯৬১
পৃথিবীকে, মহাশূন্যের ওপার থেকে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৬১
ইন্‌ফিনিটির ধাক্কা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৬১
আবিষ্কার	মোহাম্মদ আলী	নভেম্বর ১৯৬১
ভৌতিক নয়, আনুভৌতিক	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৬১
নবতম অবদান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৬১
পরিবর্তমান এই বিশ্বে	বিষ্ণু দে	ফেব্রুয়ারী ১৯৬২
বিবর্তন	শেখ বরকত উল্লাহ	ফেব্রুয়ারী ১৯৬২
সম্ভাবনার জগত	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন ১৯৬২

◆ কিছু সংখ্যা এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না বলে তালিকাটি কিছুটা অসম্পূর্ণ

বিশ্ব-পরিক্রমা স্কোর বোর্ড (মহাশূন্যচারীগণ সম্পর্কীয় তথ্য)	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন ১৯৬২
মহাশূন্যে নুতন মানুষ: গ্লেন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন ১৯৬২
অশ্রুত রাগিনী	সুরাইয়া বেগম	জুন ১৯৬২
ছবি তোলার সবক	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন ১৯৬২
য়্যানালাইটিকাল জ্যামিতিতে কতোগুলো মৌলিক সংযোজন	অধ্যাপক এ. আর. খলীফা	জুলাই ১৯৬২
জীবনের পরম রূপ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৬২
কয়লা শুধু ময়লাই নয়	সংগ্রহ: বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের 'কয়লা' পুস্তিকা থেকে	জুলাই ১৯৬২
পারমাণবিক শক্তির পেছনে	আবুল কাসেম	নভেম্বর ১৯৬২
আলাদীনের সেই যাদুর কার্পেট	জিয়া-উল হক	নভেম্বর ১৯৬২
যমজ মহাশূন্যচারী	দিদার-উল আলম	নভেম্বর ১৯৬২
নাক ডাকা কি আপনার সমস্যা	সিদ্দিকুর রহমান	নভেম্বর ১৯৬২
পারমাণবিক শক্তি	ড. উসমানীর বক্তৃতার রিপোর্ট	মে ১৯৬৩
একটি প্রতিভা, একটি বিস্ময়	এ. কে. এম. আহমদউল্লাহ	মে ১৯৬৩
ঘুড়ি	বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন	মে ১৯৬৩
প্রথম পূর্ব পাকিস্তান বিজ্ঞান মেলা	আজিজুল বারী	মে ১৯৬৩
বিশ্ব পরিচয়ের ভূমিকায় (ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে লিখিত পত্র)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আগস্ট ১৯৬৩
সঞ্জীবনী রক্ত	বেলায়েত হোসেন	আগস্ট ১৯৬৩
অথ আড্ডা তত্ত্ব	জ. ও. ম. শামসুল হোসাইন	সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
চমকপ্রদ/কাঁঠালবিচি সংবাদ, চুম্বকের টানে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
অন্ন চাই	মনোয়ার হোসেন	সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
শক্তির সন্ধানে মানুষ	মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	অক্টোবর ১৯৬৩
আলোর প্রতিসরণ	আইজাক নিউটন	অক্টোবর ১৯৬৩
আজব ক্রীষ্টাল	বরকত উল্লাহ	অক্টোবর ১৯৬৩
আমাদের পাট সম্পদ	ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ খুদা	ডিসেম্বর ১৯৬৩
গ্রহান্তর থেকে	আহমদ কবীর	ডিসেম্বর ১৯৬৩
একটি অস্ত্রোপচার	মজহারুল ইসলাম	ডিসেম্বর ১৯৬৩
চলমান ভূভাগ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ডিসেম্বর ১৯৬৩
বিজ্ঞান গবেষণায় পাকিস্তান	ইফতিখার গনি চৌধুরী	ডিসেম্বর ১৯৬৩
সারকারামা: একটা অভিনবতা	শহীদুল হোসেন	ডিসেম্বর ১৯৬৩
পারমাণবিক শক্তির প্রকৃতি	ফজলুর রহমান	জানুয়ারী ১৯৬৪
আলোক রশ্মি ও বর্ণালী	মাহফুজা খানম	জানুয়ারী ১৯৬৪
গ্রহান্তর থেকে	আহমদ কবীর	জানুয়ারী ১৯৬৪
জীবাণু ধ্বংসে মানুষ	জিয়াউদ্দিন আহমদ	জানুয়ারী ১৯৬৪
মহাশূন্য থেকে দেখা পৃথিবী	আরভিং এডলার	জানুয়ারী ১৯৬৪
পরিভাষা ও বিজ্ঞান	অশোক কুমার দত্ত	জানুয়ারী ১৯৬৫
গ্রহান্তর থেকে	আহমদ কবির	জানুয়ারী ১৯৬৫
গণিত সহজ না কঠিন	আজিজুর রহমান খলিফা	জানুয়ারী ১৯৬৫
বাংলা শিশু সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু	আবদুল্লাহ আল-মুতী	জানুয়ারী ১৯৬৫
রহস্যময় দ্বীপ	জুলভার্ণ	জানুয়ারী ১৯৬৫
রেডিয়ামের আবিষ্কার	মারিকুরী	জানুয়ারী ১৯৬৫
একটি আধুনিক গল্প	সুব্রত বড়ুয়া	ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫
অঙ্কের জাদুকর রামানুজম	ইফতেখার গণি চৌধুরী	ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫
টেকো মাথার টুকিটাকি	মঈনুল আনাম	ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫
পাখির আত্মকথা	মোহাম্মদ শহিদ হোসেন	ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫
সাগরের নীচে আরেক জগৎ	মীর আবু সালেক	ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫
জুলভার্ণ	মোহাম্মদ আলী ইমাম (হেলাল)	ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫
রহস্যময় দ্বীপ	জুলভার্ণ	মার্চ ১৯৬৫
লীনা মাহমুদের কথা	আহমদ কবির	মার্চ ১৯৬৫
প্যাঁচা সমাচার	মোহাম্মদ সোলায়মান	মার্চ ১৯৬৫

পানির ইতি কথা	আহম্মেদ জহির	মার্চ ১৯৬৫
সাত রঙে রাঙা	ভূঁইয়া ইকবাল	মে-জুন '৬৫
পৃথিবীর পরিধি	ধুমকেতু	মে-জুন '৬৫
খাদ্যের উপাদান পরীক্ষা	আ. কা. মো. রফিক উদ্দীন	মে-জুন '৬৫
তৃতীয় পূর্ব পাকিস্তান বিজ্ঞান মেলা: একটি মনোরম শিক্ষা প্রদর্শনী	মোস্তফা শহিদ	মে-জুন '৬৫
তৃতীয় বিজ্ঞান মেলা প্রসঙ্গে	মুহাম্মদ সালামত উল্লাহ্	মে-জুন '৬৫
সাবমেরিন আবিষ্কারের ইতিহাস	শহীদুল ইসলাম খান (মিন্টু)	মে-জুন '৬৫
খাদ্যের উপাদান পরীক্ষা	আ.কা.মো. রফিকউদ্দিন	মে-জুন '৬৫
আবহাওয়ার কথা	এস. ডি. গুপ্ত	জুলাই ১৯৬৫
ন্যাটা তত্ত্ব	অমল দাশগুপ্ত	জুলাই ১৯৬৫
বিচিত্র মানুষ	এল.সি দুন/টি দোভজানস্কি	জুলাই ১৯৬৫
চাঁদের আলো	সুবোধ দাশগুপ্ত	জুলাই ১৯৬৫
মহাকর্ষ তত্ত্ব	ড. জে ভি নারলিকার	আগষ্ট ১৯৬৫
প্রকৃতি পরিবেশ	এল.সি দুন/টি দোভজানস্কি	আগষ্ট ১৯৬৫
চাঁদের গতি	সুবোধ দাশগুপ্ত	আগষ্ট ১৯৬৫
যে শব্দ শোনা যায় না	মো. আলী ইমাম (হেলাল)	আগষ্ট ১৯৬৫
পরিভাষা	ড. কাজী মোতাহার হোসেন	নভেম্বর ১৯৬৫
অথ গ্রহ বিচিত্র	বার্ট্রান্ড রাসেল	নভেম্বর ১৯৬৫
মাইক্রোস্কোপের হিসাব	সুবোধ দাশগুপ্ত	নভেম্বর ১৯৬৫
বিনা টিকেটের যাত্রী	স্বাতী	নভেম্বর ১৯৬৫
বিজ্ঞান মুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে	সৈয়দ আলী আহসান	নভেম্বর ১৯৬৫
সসার নগরী	জন সল্যাক	নভেম্বর ১৯৬৫
অস্ত্র চিকিৎসায় মুসলমান	মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী	নভেম্বর ১৯৬৫
মানুষের ঠিকানা	হাবিবুর রহমান	নভেম্বর ১৯৬৫
অন্ধদের জন্য সহজতর পঠন ব্যবস্থা	জন হাওয়ার্ড	নভেম্বর ১৯৬৫
চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা	ড. কুদরত-এ খুদা	জানুয়ারী ১৯৬৬
বিজ্ঞানের ভাষা	প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ	জানুয়ারী ১৯৬৬
ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ	সুবোধ দাসগুপ্ত	জানুয়ারী ১৯৬৬
আপনার গ্রহ জ্ঞান	মুসলেহউদ্দিন	জানুয়ারী ১৯৬৬
বিবর্তনের সৃষ্টি মানুষ	এল.সি.দুন ও টি দোভাজানস্কি	জানুয়ারী ১৯৬৬
পাকিস্তানের কারিগরী উন্নয়ন	প্রফেসর আবদুস সালাম	জানুয়ারী ১৯৬৬
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি	মোহাম্মদ নাসির আলী	জানুয়ারী ১৯৬৬
বুড়ো বয়সের কথা	স্বাতী	জুন-জুলাই '৬৬
বংশ গতি নিয়ন্ত্রন	এল.সি.দুন ও টি. দোভজানস্কি	জুন-জুলাই '৬৬
কম্পিউটার বিভ্রাট	মঈনুল আনাম	জুন-জুলাই '৬৬
মাছের ঘুম	আলী ইনাম	জুন-জুলাই '৬৬
মধ্যাকর্ষণ শক্তি	সালেহ আহম্মদ	জুন-জুলাই '৬৬
ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ	আ. দনে প্রভ	মার্চ ১৯৬৭
গাইগার কাউন্টার	সুবোধ দাসগুপ্ত	মার্চ ১৯৬৭
আরো বেগে আরো উঁচে	স্বাতী	মার্চ ১৯৬৭
জাতি তত্ত্ব	দুন ও দোভাজনস্কি	এপ্রিল ১৯৬৭
আপেক্ষিক তত্ত্বের এক অধ্যায়	মুসলেহ উদ্দীন	এপ্রিল ১৯৬৭
ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ	আ. দনে প্রভ	এপ্রিল ১৯৬৭
বিজ্ঞান ও সমাজ	ড. আলী আসগর	জানুয়ারী ১৯৭১
মনুযন্ত্র বিজ্ঞানের কথা	মো. আব্দুল বাকী	জানুয়ারী ১৯৭১
এ কেবল ফুটা পাত্রে	দ্বিজেন শর্মা	জানুয়ারী ১৯৭১
লেনিন ও বিজ্ঞান	জে.জি.ক্রাউথার	জানুয়ারী ১৯৭১
বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	শাহরিয়ার খান	জানুয়ারী ১৯৭১
বৈদ্যুতিক কোষ ও বৈদ্যুতিক চুম্বক	বদরুল আলম	জানুয়ারী ১৯৭১
অবৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান শিক্ষা	আহমেদ হুমায়ুন	আগস্ট ১৯৭২
নিক্তির নিরিখে আপনি	খায়রুল আলম	আগস্ট ১৯৭২

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা	ডক্টর আবদুল্লাহ আল-মুতী	আগস্ট ১৯৭২
সত্যেন বসুর বিজ্ঞান ভাবনা	সমরজিৎ কর	আগস্ট ১৯৭২
বাংলাদেশ ও গণমুখী বিজ্ঞান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগস্ট ১৯৭২
নেশা যার নাম	হামিদ রেজা	আগস্ট ১৯৭২
পদার্থবিদ্যার মূল কথা	আলবার্ট আইনষ্টাইন	অক্টোবর ১৯৭২
রক্তের ঋণ	খায়রুল আলম	অক্টোবর ১৯৭২
দূষিত পরিবেশ	হামিদ রেজা	অক্টোবর ১৯৭২
বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম ও বাংলা ভাষা	ড. আলী আসগর	অক্টোবর ১৯৭২
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নীতি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৭২
লোহা তবু লোহা নয়	হামিদ রেজা	নভেম্বর ১৯৭২
ল্যাথিরিজম	খায়রুল আলম	নভেম্বর ১৯৭২
জীবন ও বিজ্ঞান- ভূমিকা	ডক্টর জহুরুল হক	নভেম্বর ১৯৭২
চোখের তারায় চশমা পরা	এইচ এম শাহ	নভেম্বর ১৯৭২
এ বছরের পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ডিসেম্বর ১৯৭২
তোমাদের জন্যে, ভালবাসা	হুমায়ুন আহমেদ	ডিসেম্বর ১৯৭২
স্কুল পালানো কী শিশুদের এক ধরনের রোগ	সমরজিৎ কর	ডিসেম্বর ১৯৭২
অপার্থিব প্রাণ	ভি. লিভভ	ডিসেম্বর ১৯৭২
কণিকাবিদ্যার সপক্ষে গেলমানের সাথে সাক্ষাৎকার	রবার্ট ওয়ালগেট	ডিসেম্বর ১৯৭২
দর্শনের বৈজ্ঞানিক পটভূমি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৭৩
মহাজাগতিক রশ্মির ছায়াপথীয় উৎস এবং প্রবাহের নতুন ধারনা	আনিস সাবেত	জানুয়ারী ১৯৭৩
কারিগরী উপাদানের উন্নয়নে পদার্থ বিজ্ঞানের ভূমিকা	ড. আলী আসগর	জানুয়ারী ১৯৭৩
মোমের আলো	সুবোধ দাশগুপ্ত	জানুয়ারী ১৯৭৩
সার্টনের বিজ্ঞানের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ	সুব্রত বড়ুয়া	মার্চ ১৯৭৩
বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ	দ্বিজেন শর্মা	মার্চ ১৯৭৩
বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	ড. জহুরুল হক	মার্চ ১৯৭৩
বিশ্ব ও মানুষ	মোহাম্মদ আতাউল করিম	মার্চ ১৯৭৩
গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা	ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মার্চ ১৯৭৩
মহাজগতিক রশ্মির ছায়াপথীয় উৎস এবং প্রবাহের নতুন ধারনা	আনিস সাবেত	মার্চ ১৯৭৩
বহির্বিশ্বে জীবন	মোহাম্মদ আতাউল করিম	মে ১৯৭৩
আবহাওয়া: প্রশ্ন ও উত্তর	বশীর আহম্মদ খোন্দকার	মে ১৯৭৩
বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা প্রসঙ্গে একটি সাম্প্রতিক সেমিনার	চাকলাদার নওশাদ জামাল	মে ১৯৭৩
পরমাণুর রাজ্যে	আইজাক এ্যাসিমভ	মে ১৯৭৩
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ১৯৭৩
চীনের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি	সমরজিৎ কর	মে ১৯৭৩
বাংলাদেশে পেট্রো রসায়নের ভূমিকা	ডক্টর সৈয়দ সফিউল্লাহ	সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
ভারতে বিজ্ঞানের ষাট বছর	এস, ভগবন্তম	সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
সুমারীয়দের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান	মো. আতাউল করিম	সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
ডি.এন.এ ও বংশধারা	ইফতেখারুল ইসলাম	সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
সাম্প্রতিক/পরমাণু শক্তিচালিত হৃদপিন্ড, পানির নীচে বাই সাইকেল, ফোটনের প্রয়োগ, ৪৫০০ বছরের পুরোনো বীজের অঙ্কুরোদগম, স্কাইল্যাব সমাচার	আতাউল করিম	সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
বাংলাদেশের বিজ্ঞান নীতি	ড. মফিজ উদ্দীন আহমেদ	অক্টোবর ১৯৭৩
সম্পদ, বিজ্ঞান ও উন্নয়ন	ড. মফিজ চৌধুরী	অক্টোবর ১৯৭৩
ব্রাউনীয় গতি	মোহাম্মদ আতাউল করিম	অক্টোবর ১৯৭৩
চিনি	মোহাম্মদ হাবিব-উদ-দৌলা	অক্টোবর ১৯৭৩
সূর্য-রহস্য	জাহিদ হাসান কুমার	অক্টোবর ১৯৭৩
সাম্প্রতিক/দৃষ্টিহীনতা, সূর্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, ভ্যাম্পায়ার ও ডিফেনাডাইওন	আতাউল করিম	অক্টোবর ১৯৭৩
সত্যেন বোসের চিঠি	সত্যেন বোস	জুন ১৯৭৪
বিজ্ঞানের সংকট	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	জুন ১৯৭৪
আচার্যের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ	আনোয়ারুর রহমান খান	জুন ১৯৭৪

ঠিক এইখানে	সরদার ফজলুল করিম	জুন ১৯৭৪
বাংলাদেশের পদার্থবিদ্যা চর্চা	অজয় রায়	জুন ১৯৭৪
সাম্প্রতিক/বসু সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বছর	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন ১৯৭৪
পথ হারানো গ্রহ	সৈয়দ মুহিউদ্দিন ইয়ামিন	জুন ১৯৭৪
বিজ্ঞান ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি	দ্বিজেন শর্মা	জুলাই ১৯৭৪
বিবর্তন কাহিনী	মোহাম্মদ আতাউল করিম	জুলাই ১৯৭৪
কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক যুদ্ধ	কিশলয় গোস্বামী	জুলাই ১৯৭৪
তোমার আমার পূর্ব পুরুষ	ইফতেখারুল ইসলাম	জুলাই ১৯৭৪
সাক্ষাৎকার: ড. মফিজ উদ্দিন আহমেদ	ড. আলী আজগর	আগ-সেপ্টে '৭৪
তৈল সংকট ও আগামী দিনের পৃথিবী	সৈয়দ রিয়াজ উদ্দীন আহম্মদ	আগ-সেপ্টে '৭৪
চাউল: আতপ ও সিদ্ধ	হাবিবুদ্দৌল্লা	আগ-সেপ্টে '৭৪
সংশয় উনবিংশতি	স্বাতী	আগ-সেপ্টে '৭৪
প্রোটিনের অভাবে অপুষ্টি	মাসুদ সিদ্দিকী	আগ-সেপ্টে '৭৪
বিবর্তন কাহিনী	মোহাম্মদ আতাউল করিম	আগ-সেপ্টে '৭৪
লুই পাস্তুর আর তাঁর আবিস্কার	মিটুল সরকার	আগ-সেপ্টে '৭৪
সত্যেন্দ্রনাথ বসু: কোয়ান্টাম	উইলিয়াম এ ব্ল্যানপিয়েড	অক্টোবর ১৯৭৪
সংখ্যায়নের সহ-প্রবর্তন	অজয় রায়	অক্টোবর ১৯৭৪
ডেভীর প্রদীপ	আবদুল হালিম	অক্টোবর ১৯৭৪
বিচিত্র মাছ	গোলাম মোস্তফা	অক্টোবর ১৯৭৪
জীবনের উৎপত্তি	মাহমুদুল হাসান	অক্টোবর ১৯৭৪
পৌন:পুনিক বন্যা ও তার প্রতিকার	সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন আহম্মদ	নভে-ডিসে '৭৪
গাছের খনিজ পুষ্টি	মনোয়ার হোসেন	নভে-ডিসে '৭৪
সাগর কেন নোনা	শহীদুল আমিন আশ্র্ব	নভে-ডিসে '৭৪
বর্ণালী/হৃদয়ের কাছাকাছি, জবা গাছের ভেষজ গুণ, মৌমাছির খাবার	আবুল হুস্সাম	নভে-ডিসে '৭৪
ঢাকায় আর্ন্তজাতিক পদার্থবিদ্যা সম্মেলন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৭৫
পদার্থবিদ্যা প্রদর্শনী	ইফতেখারুল ইসলাম	জানুয়ারী ১৯৭৫
এবার যাঁরা নোবেল পেলেন	তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী	জানুয়ারী ১৯৭৫
পল ডিরাক: আত্মভোলা প্রফেসর	নাদিরা মজুমদার	জানুয়ারী ১৯৭৫
ক্যান্সার ও রাসায়নিক পদার্থ	আবুল হুস্সাম	জানুয়ারী ১৯৭৫
বিবর্তন কাহিনী	মোহাম্মদ আতাউল করিম	জানুয়ারী ১৯৭৫
পাথরের লেখা কাহিনী	মাহমুদুল হাসান	জানুয়ারী ১৯৭৫
কৃষি উন্নয়নে তেজস্ক্রিয় পরমাণু	মোহাম্মদ হাবিব উদ্দৌলা	এপ্রিল -মে '৭৫
মাটির জন্মকথা	মনোয়ার হোসেন	এপ্রিল -মে '৭৫
ধোঁয়ার নগরী	ইফতেখারুল ইসলাম	এপ্রিল -মে '৭৫
লিমুলাস	মিঁয়া মুহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস	এপ্রিল -মে '৭৫
তবু বেঁচে থাকি	মাহাবুবুর রহমান	এপ্রিল -মে '৭৫
বই: বিজ্ঞান ও মানুষ	দ্বিজেন শর্মা	এপ্রিল -মে '৭৫
বিজ্ঞান ক্লাব	ড. আলী আসগর	জুলাই ১৯৭৫
রাডার	ভার্গব বন্দ্যোপাধ্যায়	জুলাই ১৯৭৫
গণিত শাস্ত্রের একটি দিক	গোলাম কবির বেগ	জুলাই ১৯৭৫
ঘুম সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি	গ্রেটা পালমের	জুলাই ১৯৭৫
দুটা চোখ কেন	মনিরা বেগম	জুলাই ১৯৭৫
সাগরের গভীরে	মাহমুদুল করিম	জুলাই ১৯৭৫
এলোমেলো	আতাউল করিম	জুলাই ১৯৭৫
লিপ-ইয়ার রহস্য	শে. মো. মহিউদ্দীন ইসলাম	মে-জুন '৭৬
বিশালতার কেন্দ্রভূমে	স্যার বার্নাড লোভেল	মে-জুন '৭৬
সাক্ষাৎকার: প্রফেসর আবদুস সালাম	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে-জুন '৭৬
আবহাওয়ার পূর্বাভাস	আর.সি.এলিস	মে-জুন '৭৬
মহুয়া	দেবী চট্টোপাধ্যায়	মে-জুন '৭৬
নিজেই করো	আলী আসগর	মে-জুন '৭৬
বড় মানুষ বড় কাজ	মুস্তাফা হাছিন	মে-জুন '৭৬

গণচীনে বিজ্ঞান সাধনা	ড. সৈয়দ সফিউল্লা	নভেম্বর ১৯৭৬
পারমানবিক যুগের কথা	স্বপন কুমার গায়েন	নভেম্বর ১৯৭৬
পাখ-পাখালীর নীড়ে	দীপক কুমার দাঁ	নভেম্বর ১৯৭৬
নতুন বই	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৭৬
আমি অমর	মহিউদ্দিন ইসলাম	নভেম্বর ১৯৭৬
বড় মানুষ বড় কাজ	শরীফ মাহবুবুল আলম	নভেম্বর ১৯৭৬
উদ্ভিদ বৈচিত্রে রক্ষণশীলতা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৭৬
ভিনদেশী এক স্কুলে	জিয়াউল হক	নভেম্বর ১৯৭৬
আফিম থেকে ঔষুধ	লিয়াকত আলী	নভেম্বর ১৯৭৬
জয়পুরহাট চুনাপাথর	আবদুল্লা হেল বাকী	জানুয়ারী ১৯৭৭
জীববিদ পেল্লেন গাট্টা	দ্বিজেন শর্মা	জানুয়ারী ১৯৭৭
পরমানবিক যুগের জন্ম কথা	স্বপন কুমার গায়েন	জানুয়ারী ১৯৭৭
গোল মরিচের আবাদ	সত্যজিৎ কুমার ভদ্র	জানুয়ারী ১৯৭৭
নতুন বই	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৭৭
কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পঞ্চাশ বছর	হারুন অর- রশীদ	ফেব্রু -মার্চ '৭৭
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মনস্কতা ও বিজ্ঞান আন্দোলন	আবদুল্লাহ আল মুতী	ফেব্রু -মার্চ '৭৭
আকাশ দেখা	মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	ফেব্রু -মার্চ '৭৭
তাপ আর আয়তন	মনজুরুল ইসলাম	ফেব্রু -মার্চ '৭৭
একটি অনন্য খাদ্য দুধ	আনিছুর রহমান খান কামাল	ফেব্রু -মার্চ '৭৭
নিজেই করো	স্বপন কুমার গায়েন	ফেব্রু -মার্চ '৭৭
মেঘনাদ সাহা	রবার্ট এণ্ডারসন	আগস্ট '৭৭
ইথনো বোটানী: গবেষণার নতুন দিগন্ত	আজিম উদ্দিন মল্লিক	আগস্ট '৭৭
আকাশ দেখা	মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	আগস্ট '৭৭
মানুষের শক্তি	জহুরুল হক	আগস্ট '৭৭
চিকিৎসা প্রণালীর আদিকথা	মোহাম্মদ কবিরুল হাসান	আগস্ট '৭৭
শুকতারা	মহিউদ্দিন ইসলাম	আগস্ট '৭৭
মেঘনাদ সাহা	রবার্ট এণ্ডারসন	সেপ্টেম্বর '৭৭
বিসর্পিল	হুসেন আহমদ নূরী	সেপ্টেম্বর '৭৭
মানুষের শরীরে এসিড-ক্ষারক সমতা রক্ষা	এনায়েত রহিম	সেপ্টেম্বর '৭৭
শনির বলয় কি	হুসাইন আহমদ	সেপ্টেম্বর '৭৭
সময় প্রসঙ্গে	আলী আসগর	মার্চ ১৯৭৮
বার্ধক্যের রহস্য	মুহাম্মদ হাবীব উদদৌলা	মার্চ ১৯৭৮
টবে ডালিয়া ফুল	দেবী চট্টোপাধ্যায়	মার্চ ১৯৭৮
জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ: একটি পর্যালোচনা	আলী আসগর	এপ্রিল ১৯৭৮
ইলিশ	মিঁয়া মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস	এপ্রিল ১৯৭৮
সময় প্রসঙ্গে	আলী আসগর	এপ্রিল ১৯৭৮
বেতারের কথা	এ.ই.এম. আব্দুল্লাহ	এপ্রিল ১৯৭৮
বড় মানুষ বড় কাজ	স্বপন কুমার গায়েন	এপ্রিল ১৯৭৮
আমার ছোট যাদুর ঘড়ি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ১৯৭৮
স্নেহ জাতীয় খাবারের ভূমিকা	বাদল চন্দ্র সাহা	মে ১৯৭৮
মস্তিষ্কে তরঙ্গের খেলা	নিখিল রঞ্জন সাহা	মে ১৯৭৮
এক প্রাকৃতিক পারমানবিক চুল্লীর কথা	স্বপন কুমার গায়েন	জুন -জুলাই '৭৮
গবেষণা প্রকাশনা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন -জুলাই '৭৮
আইনষ্টাইন	ড. স্মিলগা	জুন -জুলাই '৭৮
হাইড্রার আত্মকথা	মাহিউদ্দিন ইসলাম	জুন -জুলাই '৭৮
বড় মানুষ বড় কাজ	স্বপন কুমার গায়েন	জুন -জুলাই '৭৮
বাদ্যযন্ত্রের বিজ্ঞান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগস্ট ১৯৭৮
বিপদগামী ক্রোমোজোম	হুসেন আহাম্মদ নূরী	আগস্ট ১৯৭৮
জন্ডিস	মোহাম্মদ খায়রুল আশরাফ	আগস্ট ১৯৭৮
পৃথিবীর সৃষ্টি ঃ কয়েকটি মতবাদ	হাসান মুরশেদ	আগস্ট ১৯৭৮
জীবনের প্রয়োজনে বিজ্ঞান	আজিম উদ্দীন মল্লিক	সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

সয়াবিন একটি অর্থকরী ফসল	তপন বিকাশ দত্ত	সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের উপর পরিবেশের প্রভাব	তারিকুল ইসলাম	সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
মুক্তা	কাজী মশহুরুল হুদা	সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
আবর্জনা মূল্যহীন নয়	আবু জাফর সাবু	সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
এলবার্ট আইনষ্টাইন ও তাঁর আপেক্ষিক-তত্ত্ব	এ.এম.হারুন অর রশীদ	মে ১৯৭৯
যে জীবন আলোর অধিক	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ১৯৭৯
বোস-আইনষ্টাইন ঘনীভবন	অজয় রায়	মে ১৯৭৯
আইনষ্টাইন ও পদার্থবিদ্যায় বিশুদ্ধ ভাবনা	আলী আসগর	মে ১৯৭৯
গল্পের নায়ক আইনষ্টাইন	নাদিরা মজুমদার	মে ১৯৭৯
আপেক্ষিকতার অন্তরালে আইনষ্টাইন	আহাম্মেদ শফী	মে ১৯৭৯
নোনা পানির চিংড়ি	জেড. এম. গোলাম সারওয়ার জাহাঙ্গীর	জুলাই ১৯৭৯
আকাশ ছোয়া বৃক্ষ	মো. সা. আলী	জুলাই ১৯৭৯
টেষ্টটিউব বেবী	স্বপন কুমার দে	জুলাই ১৯৭৯
ডারউইনের অরিজিন অব স্পেসিস	জর্জ গেইলর্ড সিম্পসন	জুলাই ১৯৭৯
পানির দাম	রনজিৎ কুমার বিশ্বাস	জুলাই ১৯৭৯
রাতভর সূর্য	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৭৯
গুহাচিত্র	আলেক্স আলীম	জুলাই ১৯৭৯
'বিজ্ঞান ক্লাব' একটি ব্যতিক্রমী বই	আবদুল হালিম	জুলাই ১৯৭৯
বিজ্ঞান ক্লাবে মেয়েদের ভূমিকা	রেখা দাঁ	অক্টোবর ১৯৭৯
মৎস্য পচনের কারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ	ভূইয়া এস. এইচ. এম. কাসেম	অক্টোবর ১৯৭৯
অবশেষে বিশ্ব বসন্তমুক্ত	ডোনাল্ড হেণ্ডারসন	অক্টোবর ১৯৭৯
প্লাজমা: পদার্থের চতুর্থ অবস্থা	অজিত কুমার সাহা	অক্টোবর ১৯৭৯
প্রফেসর আবদুস সালামের নোবেল পুরস্কার লাভ	এ.এম. হারুন অর রশীদ	নভেম্বর ১৯৭৯
শিশু ও বিজ্ঞান	আলী আসগর	নভেম্বর ১৯৭৯
ইরি সংকট অতিক্রমের একটি নাম	ক্রীষ্টফার লুকাস	নভেম্বর ১৯৭৯
সূর্য থেকে শক্তি	মইনুল হাসান	নভেম্বর ১৯৭৯
হাওর-বাওর বিলের মাৎস্য সম্পদ	আহমদ মুর্তজা খান	এপ্রিল-মে '৮০
মিশরের মমি	ফারজানা নাজনীন	এপ্রিল-মে '৮০
সিমেন্ট: ইমারতের রহস্য	স্বপন বিশ্বাস	এপ্রিল-মে '৮০
বঙ্গোপসাগরের ট্রলারে	বিষ্ণু দাশ	এপ্রিল-মে '৮০
ওড়ার এমন চমৎকার কল	শামসুন্নেসা বেগম	এপ্রিল-মে '৮০
ব্যাঙের ছাতা	ওসমান গনি	এপ্রিল-মে '৮০
পরিবেশ ও দূষণ	সত্যব্রত দত্ত	এপ্রিল-মে '৮০
বায়ুমন্ডল মায়ের আঁচল	কে. বি. আল-মামুন	জুন ১৯৮০
বিজলীর বিজ্ঞান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন ১৯৮০
রহস্যের আবরণে বৃহস্পতি	পান্নালাল চৌধুরী	জুন ১৯৮০
দুই বন্ধুর উপাখ্যান	জেবা জয়নাব	জুন ১৯৮০
গন্ডাররা বাঁচতে চায়	কামরুল আমিন পাপ্পু	জুন ১৯৮০
একালের হাড়িকুড়ি	আফতাব জাহান	জুন ১৯৮০
অন্ধত্ব কি করে দূর করা যায়	ডা. অমল মিত্র	জুলাই ১৯৮০
এক অনন্য পাহারাদারী	ফারজানা নাজনীন	জুলাই ১৯৮০
জ্বালানী বিহনে আজি	আইজাক আসিমভ	জুলাই ১৯৮০
ডিম কাহিনী	নাদিরা মজুমদার	জুলাই ১৯৮০
উনিশ শ' বছর পর একদিন পম্পেইতে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগ-সেপ্ট '৮০
মাটির রস মগডালে	ওসমান গনি	আগ-সেপ্ট '৮০
মহাশূন্য আমাদেরকে কি দিল	জন নোবল উইলফোর্ড	আগ-সেপ্ট '৮০
সূর্যের নাম শক্তি	জহুরুল হক	আগ-সেপ্ট '৮০
প্রতিপদার্থ ও মহাবিশ্ব	আলী আসগর	ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
রসুন বুনেছি	জেবা জয়নাব	ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
মিষ্টি মুখ অনেক দুখ	আসিফ কামাল	ফেব্রুয়ারী ১৯৮১

সংশয়	স্বাতী	ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
সবার জন্য বিজ্ঞান	আলফ্রেড স্মিথ	ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
যেদিন তুমি মহাকাশে যাবে	সাব্বির আনোয়ার	ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
সূর্যের নাম শক্তি/ নষ্টের বিশ ভাগ	জহুরুল হক	ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
সাম্প্রতিক/বাংলাদেশে আবদুস সালাম, বঙ্গোপসাগরে অনুসন্ধান এবং ছাত্র-বিজ্ঞানী সমাবেশ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
পৃথিবীটা চুম্বক	ই.ম. ফয়সল	এপ্রিল-মে '৮১
মাটি ইতিহাস জানে	রবীন চৌধুরী	এপ্রিল-মে '৮১
গরিলার সাথে আলাপ	ফ্রান্সিস প্যাটারসন	এপ্রিল-মে '৮১
চা স্পৃহা চঞ্চল	ফারজানা নাজনীন	এপ্রিল-মে '৮১
মানুষের ধাতব পদক্ষেপ	কামরুল আমিন পাপ্পু	এপ্রিল-মে '৮১
চমকপ্রদ/যাও এবং বংশবৃদ্ধি কর, মেয়েরা বেশী শব্দকাতর, এবার বায়ুচালিত গাড়ি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল-মে '৮১
মৌমাছির বংশ পরিচয়	নিয়াজ চৌধুরী	জুন-জুলাই '৮১
কলে কারখানার রোবট শ্রমিক	সাব্বির আনোয়ার	জুন-জুলাই '৮১
কলেজের দিনগুলোতে এটম বোমার নীলনক্শা	জন এরিষ্টল ফিলিপস	জুন-জুলাই '৮১
টাইটানিকের মহাপ্রস্থান	মুজিবর রহমান	জুন-জুলাই '৮১
শক্তি ভর কাজ ক্ষমতা	মিচেল উইলসন	জুন-জুলাই '৮১
চমকপ্রদ/বায়োটেকনোলজীর ভবিষ্যৎ, উলকার আঘাতে মৃত্যু	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন-জুলাই '৮১
আপনার ব্যাটারীকে চিনে নিন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগস্ট ১৯৮১
মুসাফির পাখীদের কথা	জেবা জয়নাব	আগস্ট ১৯৮১
শতবর্ষ আগে	স্বাতী	আগস্ট ১৯৮১
টুকরো ছবি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগস্ট ১৯৮১
ভিটামিন সি	আব্দুস সবুর	আগস্ট ১৯৮১
নারকেলের নাড়ু	সাইফুল ইসলাম	আগস্ট ১৯৮১
সাম্প্রতিক/ইউরেনাসের দ্বিশতবার্ষিকী, রক্ত দিয়ে উদ্ঘাটন, ইন্টারফেরণ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগস্ট ১৯৮১
অন্যরকম একটি স্কুল	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগস্ট ১৯৮১
কেমন করে এলো/পেন্সিল	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগস্ট ১৯৮১
বাঁশ: সেই অবাক সামগ্রী	স্বাতী	অক্টো-নভে '৮১
হান্টসভিল আলবামা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৮১
রক্তের জমাট বাঁধা	শ্যামল কুমার রায়	অক্টো-নভে '৮১
গ্রামোফোনের রেকর্ড	ক্যাডেট মহিবুর	অক্টো-নভে '৮১
আমার ছেলেবেলার ল্যাবরেটোরি	হোমার স্মিথ	অক্টো-নভে '৮১
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাণী তিমি	আবু সাঈদ সালেহ ফারুকী	অক্টো-নভে '৮১
বই আলোচনা: আধুনিক উদ্ভিদ বিদ্যা প্রবেশিকা	দ্বিজেন শর্মা	অক্টো-নভে '৮১
জাতিসংঘ:উন্নয়ন-সহযোগিতার অ-আ-ক-খ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৮২
টুকরো ছবি/ পস্তয়নার গুহা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৮২
লোহা আসে কোথা থেকে	সাখাওয়াৎ ওসমান	জানু-ফেব্রু '৮২
পৃথিবীর ওজন যিনি নিয়েছিলেন	স্বাতী	জানু-ফেব্রু '৮২
উপগ্রহের সৌজন্যে	জহুরুল হক	জানু-ফেব্রু '৮২
বাংলাদেশে সয়াবিন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৮২
চমকপ্রদ/পুলিশ বনাম অপরাধীর ইলেকট্রনিকস যুদ্ধ, কোন হাসি হাসি নয়	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৮২
ফুল ফোটাতে আলোর খেলা	ই.ম. ফয়সল	মার্চ-এপ্রিল '৮২
আধুনিক বিজ্ঞান জাদুঘর	শামসুন্নেসা বেগম	মার্চ-এপ্রিল '৮২
সোনামণিদের খাবার	ফারজানা নাজনীন	মার্চ-এপ্রিল '৮২
তোমার হর্স পাওয়ার কত	সাব্বির আনোয়ার	মার্চ-এপ্রিল '৮২
পাখি কেন গান গায়	আবুল আব্বাস	জুন-জুলাই '৮২
ক্ষুদে ক্ষমতাবানের দিন আসছে	ক্রিস্টোফার ইভানস	জুন-জুলাই '৮২
টুকরো ছবি/ আয়া সোফিয়া	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন-জুলাই '৮২

সাম্প্রতিক/কলেজ এখন বাজারে, নিরাপদ কাকে বলে, প্রোগ্রাম অবসানে প্রোগ্রাম	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন-জুলাই '৮২
চমকপ্রদ/জনমের আগে অস্ত্রোপচার, কম্পিউটার শিশুমেলা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন-জুলাই '৮২
ওদের মাঝে হারিয়ে গিয়ে	ফারজানা নাজনীন	জুন-জুলাই '৮২
এই সেই লজ্জাবতী	সাব্বির আনোয়ার	আগ-সেপ্ট '৮২
এমন কেন হয়/শব্দ	স্বাতী	আগ-সেপ্ট '৮২
গরমের ছুটিতে এস্কিমোদের দেশে	মার্টিন সিম্পসন	আগ-সেপ্ট '৮২
বই আলোচনা: সায়েন্স ফর সারভাইভাল/বাঁচার জন্য বিজ্ঞান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগ-সেপ্ট '৮২
যথাযথ শিক্ষা ও বিজ্ঞান ক্লাব	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভে-ডিসে '৮২
মধুতে কি আছে	মো. জিল্লুল বারী মিন্টু	নভে-ডিসে '৮২
'এনিমেশন' অর্থাৎ কার্টুন ছবি কিভাবে তৈরী হয়	জেবা জয়নাব	নভে-ডিসে '৮২
ইতিহাসের প্রথম চিকিৎসক	আসিফ সালাম	নভে-ডিসে '৮২
কেমন করে এলো/লিফট	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভে-ডিসে '৮২
গ্রামবাংলায়/বাংলাদেশে মৌমাছি চাষের সম্ভাবনা সমূহ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভে-ডিসে '৮২
মৌমাছি পরিবারের সদস্যরা	আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী	ফেব্রু -মার্চ '৮৩
চিপ	এলেন. এ. বোরেকো	ফেব্রু -মার্চ '৮৩
অতীতের রাজ্যে	মারুফ-বিন- সাঈদ	ফেব্রু -মার্চ '৮৩
উদ্ভাবক	তানজিনা আনোয়ার	ফেব্রু -মার্চ '৮৩
চমকপ্রদ/মিনি-ফ্যাক্স: টেলিফোনে ছবি, দৌড়বিদের পেশী, শব্দ অনুবীক্ষণ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ফেব্রু -মার্চ '৮৩
সাম্প্রতিক/অষ্টম জাতীয় বিজ্ঞান সম্মেলন, বল কখন সুইং করে, ফিল্মি জগতে কম্পিউটার	স্বাতী	ফেব্রু -মার্চ '৮৩
কি দিয়ে গড়িনু	কুশলী	জুন ১৯৮৩
বিস্ফোরণের পরে	তানজিনা আনোয়ার	জুন ১৯৮৩
শক্তির জন্যে সংগ্রাম	জহিরুল হক	জুন ১৯৮৩
হাসপাতাল	মার্গারেট ও হাইড	জুন ১৯৮৩
এমন কেন হয়/দুধের রং, রং জলা কাপড়, পোলারয়ড চশমা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন ১৯৮৩
সাম্প্রতিক/যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা: ফলাফলের গরমিল, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে গাছরূপী ফিল্টার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন ১৯৮৩
চেয়ারের আত্মকথা	কুশলী	জুলাই ১৯৮৩
মহাজাগতিক রশ্মি	আ. খ. ম. শামছুদ্দোহা	জুলাই ১৯৮৩
ঝিঁ ঝিঁ পোকা	বাসু দেব	জুলাই ১৯৮৩
শক্তির জন্য সংগ্রাম	জহুরুল হক	জুলাই ১৯৮৩
মাড়ি	জেবা জয়নাব	জুলাই ১৯৮৩
কেমন করে এলো/স্যাকারিন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৮৩
গ্রামবাংলায়/সংরক্ষণ কৌশল: ডিম, শস্য	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৮৩
সাম্প্রতিক/চাউলের সুগন্ধ: উপাদানের আবিষ্কার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৮৩
শক্তিধর অনুজীব: ছত্রাক	নূরুর রহমান জাহাঙ্গীর	সেপ্ট-অক্টো '৮৩
প্লাষ্টিক	আহমেদ রাহিদ ডন	সেপ্ট-অক্টো '৮৩
আলেক্সান্ডার গ্রাহাম বেল	হামিম আহমেদ	সেপ্ট-অক্টো '৮৩
বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের প্রকল্প: পরীক্ষামূলক গ্রামীণ কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্ট-অক্টো '৮৩
বিজ্ঞান লেখকের বক্তব্য	আবদুল্লাহ্ আল-মুতী	জানু-ফেব্রু '৮৪
ধনুষ্টংকার	তপন মজুমদার	জানু-ফেব্রু '৮৪
গ্রামীণ কারিগরি বিদ্যালয়ে সৌর চুল্লী নিয়ে পরীক্ষা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৮৪
বর্ণালী/আজকের মুদ্রণ: সীসাকে বিদায়	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৮৪
সাম্প্রতিক/ইউনেস্কো কলিঙ্গ পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে আবদুল্লাহ আল-মুতীর গ্রন্থ আলোচনা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৮৪
সেতু বন্ধ	কুশলী	মে - জুন '৮৪
বায়োম্যাস থেকে জ্বালানী	নাদিরা মজুমদার	মে - জুন '৮৪
ব্যাকটেরিয়ার মন	জয় শংকর আচার্য্য	মে - জুন '৮৪

গভীর সাগরে	মো. ফজলুল আউয়াল মোল্লা	মে - জুন '৮৪
কেমন করে এলো/মিটার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে - জুন '৮৪
টুকরো ছবি/জয়পুর মানমন্দির	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে - জুন '৮৪
উন্নত কূপী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা	সৈয়দ মুশীর হোসেন বোখারী	মে - জুন '৮৪
ষ্টেরিও	আ.খ.ম শামসুদ্দোহা	সেপ্ট-অক্টো '৮৪
কেরালার গণ বিজ্ঞান আন্দোলন	ভি.কে. দামোদরণ	সেপ্ট-অক্টো '৮৪
কারখানায় রক্ত তৈরী	হুমায়ুন কবির খান	সেপ্ট-অক্টো '৮৪
উদ্ভিদের বিচিত্র পরাগায়ন	জয়শংকর আচার্য্য	সেপ্ট-অক্টো '৮৪
কেম করে এলো/ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্ট-অক্টো '৮৪
উল্কা পাত	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্ট-অক্টো '৮৪
সুস্বাদু আনারস	সিতাংশু শেখর রায় (বকুল)	সেপ্ট-অক্টো '৮৪
বর্ণালী/বাংলাভাষায় প্রথম কম্পিউটার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্ট-অক্টো '৮৪
সাম্প্রতিক/পরমাণু কি দেখা যাবে?	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্ট-অক্টো '৮৪
চমকপ্রদ/তিমি মাছ হাঁটতে পারত	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্ট-অক্টো '৮৪
তুষের চুলা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা	সৈয়দ মুশীর হোসেন বোখারী	সেপ্ট-অক্টো '৮৪
ঘড়ির ঐক্য	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫
তেল-চর্বির কথা	নাদিরা মজুমদার	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫
গ্রামীণ অর্থনীতিতে রেশম চাষ	এম.এ.ওয়াহাব	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫
কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আবিষ্কার কাহিনী	পি.এ.এম. ডিরাক	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫
এক্সরে নক্ষত্র	মোহাম্মদ শাহরিয়ার শিবলী	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫
পাখি দেখা	স্বাতী	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫
কাক- তাড়ুয়া কাহিনী	স্বাতী	মার্চ ১৯৮৫
ব্যাটারীর নয়া যুগ	কুশলী	মার্চ ১৯৮৫
বাতাসের ঘুর্ণি ও বিমান দুর্ঘটনা	লতিফুর রহমান	মার্চ ১৯৮৫
উই পোকা: সাবধান	সাব্বির আনোয়ার	মার্চ ১৯৮৫
অদৃশ্য লিপি	জেবা জয়নাব	মার্চ ১৯৮৫
চমকপ্রদ/টেলিভিশন ট্রান্সমিটারের অভিনব ব্যবহার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মার্চ ১৯৮৫
চশমা	কুশলী	এপ্রিল ১৯৮৫
দিবা স্বপ্ন আপনার জন্য ভালো কি?	মো: আবদুল কাইয়ুম দিলাল	এপ্রিল ১৯৮৫
পারমাণবিক বিষ্ফোরণের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার	হেলাল উদ্দিন আহ্‌মেদ	এপ্রিল ১৯৮৫
পতঙ্গ-জগত	মনসুর রহমান	এপ্রিল ১৯৮৫
বায়োগ্যাস প্লান্ট: ভারতীয় অভিজ্ঞতা	এম.এ. ওয়াহাব	এপ্রিল ১৯৮৫
অ্যামিবার আত্মকথা	দীপক লাল বণিক	এপ্রিল ১৯৮৫
দেশে দেশে বিজ্ঞানের গণ সংযোগ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ১৯৮৫
বাংলাদেশের একজন পল্লী বিজ্ঞানী	রনতোষ চক্রবর্ত্তী	মে ১৯৮৫
লেসার রশ্মি	এখলাস উদ্দীন আহমদ	মে ১৯৮৫
প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও আনুসঙ্গিক সমস্যা	আলী আসগর	মে ১৯৮৫
পশু-পাখির আচরণ: যে বিজ্ঞান এখনো শৈশবে	স্বাতী	মে ১৯৮৫
হীরার পদার্থবিদ্যা	শাহিদা রফিক	জুলাই ১৯৮৫
ষ্টেইনলেস ষ্টীল	সাব্বির আনোয়ার	জুলাই ১৯৮৫
বাক্সে মৌমাছির চাষ	এম.এ.ওয়াহাব	জুলাই ১৯৮৫
রং ধনু	মনসুর আহমেদ	জুলাই ১৯৮৫
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে যেমন দেখেছি	ড. কাজী মোতাহার হোসেন	আগস্ট ১৯৮৫
কিশোর বিজ্ঞান শিক্ষার সামগ্রিক পরিমন্ডল	আলী আসগর	আগস্ট ১৯৮৫
মরুভূমিতে বেঁচে থাকার কৌশল	নাদিরা মজুমদার	আগস্ট ১৯৮৫
জিপসাম	মোহাম্মদ ফয়যুল মোমেন	আগস্ট ১৯৮৫
টিউব লাইট	কাজী সারওয়ার আমিন	আগস্ট ১৯৮৫
আত্মীয়তার টান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টোবর ১৯৮৫
লবণ	আলডাস হাক্সলী	অক্টোবর ১৯৮৫
নীলাভ সবুজ শ্যাওলা	অশোক কুমার পাল	অক্টোবর ১৯৮৫
গাছের রোগ ও লক্ষণসমূহ	দেব কুমার হালদার	অক্টোবর ১৯৮৫

তরল পদার্থের প্রবতা	সামী আউয়াল	অক্টোবর ১৯৮৫
রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞান	আলী আসগর	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬
জাপান জার্নাল	শাহিদা রফিক	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬
লবণ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ	এম.এ. ওয়াহাব	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬
পানি	এলিজাবেথ জেইনওয়ে	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬
সাম্প্রতিক/কৃত্রিম সালোকসংশ্লেষণ, চিনি ও পিত্তপাথর	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬
বাতি	ডন মোরেস	মার্চ ১৯৮৬
বর্ণ মনস্তত্ত্ব	মনসুর রহমান	মার্চ ১৯৮৬
কস্তুরী মৃগসম	রাখি আনোয়ার	মার্চ ১৯৮৬
সৌর শক্তি ও তার ব্যবহার	শাহিদা রফিক	মে-জুন '৮৬
বিজ্ঞানে নোবেল: ১৯৮৫	শম্ভুনাথ পাইন	মে-জুন '৮৬
পরিবেশ সমস্যা	এম. এ. ওয়াহাব	মে-জুন '৮৬
ব্যাক্টেরিয়ার গুণাগুণ	এম.এ. ওয়াহাব	মে-জুন '৮৬
মোম	লাভলী ইয়াসমিন	মে-জুন '৮৬
দাঁত	মনসুর রহমান	মে-জুন '৮৬
পেঁয়াজ রসুনের বিজ্ঞান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলা-আগ '৮৬
প্রতিরোধের নতুন দিগন্ত	নাজমা ইয়াসমীন	জুলা-আগ '৮৬
পুরুষের দিন শেষ?	স্বাতী	জুলা-আগ '৮৬
অনুসন্ধানী/শেরপুর অনুসন্ধানী	স্বাতী	জুলা-আগ '৮৬
সাম্প্রতিক/পলিয়েস্টার কটনের বিপদ, বরফের মাধ্যমে সুপেয় পানি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলা-আগ '৮৬
চমকপ্রদ/সিরামিকের ভবিষ্যত, বাজারের থলের ভাল-মন্দ, চোখ-কানের শিক্ষা এবং প্যাঁচা সমাচার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলা-আগ '৮৬
বর্ণালী/ সব উদ্ভিদ কেন বাতাসের নাইট্রোজেন পায়না	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলা-আগ '৮৬
কম্পিউটারকে কৌশল যোগায় কে?	শাহিদা রফিক	জুলা-আগ '৮৬
ক্যান্সার	নিত্যগোপাল বসু	ফেব্রুয়ারী '৮৭
জীবাশ্ম	এম.এ. ওয়াহাব	ফেব্রুয়ারী '৮৭
ধাতুর স্মৃতি	এ.এস.এম.এ. হাছিব	ফেব্রুয়ারী '৮৭
কৃত্রিম রত্ন	শ্রাবন্তী	নভে-ডিসে '৮৭
রঙীন ফটোগ্রাফী	স্বাতী	নভে-ডিসে '৮৭
বাঁহাতি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভে-ডিসে '৮৭
নিউটন কিভাবে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন	জেমস ই. মিলার	নভে-ডিসে '৮৭
জীন প্যান্ট তৈরীর কারখানা	ফারজানা নাজনীন	নভে-ডিসে '৮৭
চমকপ্রদ/ তোতা কাহিনী, ভাত তরকারীর গতিবিধি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভে-ডিসে '৮৭
অণুবীক্ষণ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৮৮
প্রোটিন	এম.এ. ওয়াহাব	জানু-ফেব্রু '৮৮
বহু যুগের ওপার থেকে	জহর রাম বন্দ্যোপাধ্যায়	জানু-ফেব্রু '৮৮
সন্দেহ, আবিষ্কার এবং একটি বই	জেবা জয়নাব	জানু-ফেব্রু '৮৮
ডাবল হেলিক্স	জেমস ডি ওয়াটসন	সেপ্ট-নভে '৮৮
কম্পিউটারের সাথে মিতালী	শাহিদা রফিক	সেপ্ট-নভে '৮৮
গলদা চিংড়ির চাষ	ভূইয়া এস.এইচ.এম. কাসেম	সেপ্ট-নভে '৮৮
মাছ ধরার কাহিনী	জেবা জয়নাব	সেপ্ট-নভে '৮৮
সাম্প্রতিক/কীট নাশনে নূতন কৌশল,	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্ট-নভে '৮৮
দুধের বিজ্ঞান	ফারজানা নাজনীন	ডি '৮৮-ফে '৮৯
খনিজ তেলের কূপ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ডি '৮৮-ফে '৮৯
দেশে প্রচলিত কিছু বিদেশী মাছ	ভূইয়া এস.এইচ.এম কাসেম	ডি '৮৮-ফে '৮৯
হার্টজিয় তরঙ্গের শতবর্ষপূর্তি স্মরণে	নুরুল রহমান জাহাঙ্গীর	ডি '৮৮-ফে '৮৯
চমকপ্রদ/সামাজিক নির্বাচনের পরিণামে, কোলাহলের ব্যবহার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ডি '৮৮-ফে '৮৯
সুনামি	রোকনউদ্দিন জাহেদ	মার্চ-জুন '৮৯
কীট পতঙ্গের অনুভূতি	নাজিয়াৎ ইয়াশফি	মার্চ-জুন '৮৯
চমকপ্রদ/দূর দর্শকের উক্তি, প্রথম উক্তি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মার্চ-জুন '৮৯

বর্ণালী/সফ্‌ট ওয়্যার সংবাদ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মার্চ-জুন '৮৯
আলো, আরো আলো	শ্রাবন্তী	মার্চ-জুন '৮৯
পঞ্চম প্রজন্ম	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৮৯
হাওয়ার তালে দুলকি চালে	বীথিকা চৌধুরী	জুলাই ১৯৮৯
সাম্প্রতিক/পিঠের পেশী দিয়ে সহায়ক হার্ট	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৮৯
চমকপ্রদ/কম্পিউটারের ফল-যাত্রা, ডিস্ক এখন তন্দুরে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৮৯
ডাবল হেলিক্স	জেমস ডি ওয়াটসন	জানুয়ারী ১৯৯০
আক্রান্ত কম্পিউটার: কীট, ভাইরাস, বোমা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৯০
মাইক্রোওয়েভ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৯০
চমকপ্রদ/রাজকীয় হেডফোন, পুরানো টায়ারের রসায়ন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৯০
সাম্প্রতিক /পানি সেচ, নদী শাসনের নূতন পদ্ধতি, প্রিয় গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৯০
বর্ণালী /মাটির ঘর	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৯০
ডাবল হেলিক্স	জেমস ডি ওয়াটসন	ফেব্রু-এপ্রিল '৯০
কোয়ান্টাম: পদার্থবিদ্যার জগতে নানা আপাত বৈপরীত্য	বেলাল বাকী	ফেব্রু-এপ্রিল '৯০
এণ্ডি শিল্প	বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন	ফেব্রু-এপ্রিল '৯০
ছোটদের পাতা/ পনির	স্বাতী	ফেব্রু-এপ্রিল '৯০
চলো যাই বিমান বন্দর	নাজিয়াৎ ইয়াশফি	ফেব্রু-এপ্রিল '৯০
সাম্প্রতিক/ মৌমাছি দর্শন, পেঁয়াজের এত গুণের উৎস কোথায়, জীবনের শীতল পরশ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ফেব্রু-এপ্রিল '৯০
চমকপ্রদ/নূতন শীত বস্ত্র: এক যাত্রায় বহু ফল, বাস যখন চলৎশক্তি জমা রাখে,	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ফেব্রু-এপ্রিল '৯০
কেমন করে এলো/ এন্টিসেপটিক	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ফেব্রু-এপ্রিল '৯০
ডাবল হেলিক্স	জেমস ডি ওয়াটসন	মে-জুলাই '৯০
জিন ব্যাংক: বৈচিত্রের নিরাপত্তা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে-জুলাই '৯০
সাম্প্রতিক/ধোঁয়া কালি থেকে হীরা, সমদ্রতল বৃদ্ধির প্রতিকারের এখনই সময়, যে প্লাষ্টিক বিলীন হবে, মাছের ঝাঁকে একতা কেন বল,	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে-জুলাই '৯০
চমকপ্রদ/ বয়স্ক বিজ্ঞানী, বাতিল হবার আগে,	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে-জুলাই '৯০
কেমন করে এলো/শীততাপ নিয়ন্ত্রণ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে-জুলাই '৯০
চলো যাই বিমান বন্দর	নাহিয়াৎ ইয়াসমিন	মে-জুলাই '৯০
পুরানো নিদর্শন থেকে ইতিহাস	স্বাতী	মে-জুলাই '৯০
ফিরিয়ে দাও আসল প্রাণিবিদ্যা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে-জুলাই '৯০
বয়স্ক বিজ্ঞানী	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে-জুলাই '৯০
বর্ণালী/স্কুলে কলেজে পদার্থ বিদ্যা, পাঠক্রম কতখানি যথাযথ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে-জুলাই '৯০
অন্য মৌলিক বিদ্যালয়: জীবন যেখানে যেমন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে-জুলাই '৯০
ওষুধ সম্বন্ধে জেনে রাখা ভাল	স্বাস্থ্য সুহৃদ	সেপ্টেম্বর ১৯৯০
অন্য রকম কিছু যাদুঘর	স্বাতী	সেপ্টেম্বর ১৯৯০
বর্ণালী/সফ্‌টওয়্যার সংবাদ, শিশুদের স্কুলে ক্যালকুলেটরের ব্যবহার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ১৯৯০
সাম্প্রতিক/ পশুপালকের জন্য ভ্রূণ কারিগরি, সৌর কোষের নূতন দক্ষতা	"	সেপ্টেম্বর ১৯৯০
চমকপ্রদ/নৃতত্ত্বের বইয়ে মেয়েদের ছবি নেই কেন, বাদ্য যন্ত্রের ভবিষ্যৎ	"	সেপ্টেম্বর ১৯৯০
মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা: একটি অনানুষ্ঠানিক জীবনাশ্রয়ী শিক্ষা উদ্যোগের পরিচিতি	"	সেপ্টেম্বর ১৯৯০
ডাবল হেলিক্স সম্বন্ধে মন্তব্য	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯০
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯০
ঘুম ঘোরে গরজে	নাজমা ইয়াসমীন	অক্টো-নভে '৯০
জামদানী	শ্রাবন্তী	অক্টো-নভে '৯০
খাবারে যা মেশানো	স্বাতী	অক্টো-নভে '৯০
বর্ণালী/কম্পিউটার: অতি-যত্নের বিড়ম্বনা,	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯০

সাম্প্রতিক/জীবকোষে রক্তিম "সংবাদ দাতা', ধ্রুব তারা আরো ধ্রুব হচ্ছে, প্রথম যুগের কলম্বাসরা, ইলেকট্রিক গাড়ীর নূতন দিগন্ত, বাঁশের ফুল: হর্মোন আশ্বাস	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯০
মাছের আঁইশ থেকে সৌখিন দ্রব্যাদি	ইনামুল হক	জানুয়ারী ১৯৯১
রান্না ঘরের বিজ্ঞান	গৃহস্থ	জানুয়ারী ১৯৯১
সাম্প্রতিক/মুদ্রণে নুতন প্রযুক্তি: চালু প্রেসে পৃষ্ঠা বদল	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৯১
বর্ণালী/বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বনাম মানুষের চাহিদা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৯১
চমকপ্রদ/মরুতে বৃষ্টি নামাতে প্লাষ্টিক বনায়ন, শতাব্দীর শেষ কোন দিন?	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৯১
প্রযুক্তি কেন্দ্র ও মৌলিক বিদ্যালয়ে রেশম চাষ অভিজ্ঞতা	এম.এ. ওয়াহাব এবং মনির হোসেন	জানুয়ারী ১৯৯১
ঝিনুকের জীবন	নাজিয়া তাসফী	জানুয়ারী ১৯৯১
জীবনের নীল নক্শায় কারিগরি হস্তক্ষেপ	স্বাতী	এপ্রিল-মে '৯১
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল-মে '৯১
সাম্প্রতিক/সিডিটিভি: এবার মালটিমিডিয়া, নূতন যুগের ইঞ্জিন, মহাশূন্যে বাণিজ্যিক পদক্ষেপ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল-মে '৯১
চমকপ্রদ/ছোট উইয়ের বড় অবদান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল-মে '৯১
কেমন করে এলো/ব্যাটারী	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল-মে '৯১
জীবনের নীল নকশায় কারিগরী হস্তক্ষেপ	স্বাতী	জুন-জুলাই '৯১
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন-জুলাই '৯১
গণবিজ্ঞান উদ্যোগ: গ্রাম বাংলায় চারণ দলের অভিযান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন-জুলাই '৯১
বর্ণালী /হিউরেকা: অনন্য এক বিজ্ঞান যাদুঘর	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন-জুলাই '৯১
সাম্প্রতিক/ কম বিদ্যুৎ খরচে অধিক আলো, খাদ্য সংরক্ষণের নূতন পদ্ধতি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন-জুলাই '৯১
চমকপ্রদ/বাতাসের ঠেলায় চালিত ইঞ্জিন ট্রেন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন-জুলাই '৯১
জনগণের বিজ্ঞান: ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগের দৃষ্টি ভঙ্গীতে	ভিটল রাজন	আগ-সেপ্ট '৯১
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগ-সেপ্ট '৯১
গণবিজ্ঞান উদ্যোগ সম্মেলন	নিজস্ব প্রতিবেদক	আগ-সেপ্ট '৯১
গণবিজ্ঞান উদ্যোগ: গ্রাম বাংলায় চারণ দলের অভিযান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগ-সেপ্ট '৯১
ব্যাঙ চাষ: গবেষণালব্ধ ফলাফল	প্রবীর রায়	আগ-সেপ্ট '৯১
সাম্প্রতিক/টেলিভিশন পর্দায় পলিমার আলো, দূর অনুধাবন এখন মানুষের অনেক কাছে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগ-সেপ্ট '৯১
সাধারণ জিনিস নিয়ে অসাধারণ ভাবনা	রবার্ট ফুলঘুম	অক্টো-নভে '৯১
শুঁয়া পোকা কাহিনী	স্বাতী	অক্টো-নভে '৯১
স্থাপত্য বিজ্ঞানের কথা	জেবা জয়নাব	অক্টো-নভে '৯১
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯১
চমকপ্রদ/ পরীক্ষায় নকল উদ্ঘাটনে কম্পিউটার, আহত গাছের জন্য নিজস্ব 'হাসপাতাল',আণবিক তারের 'জয়েন বাক্স',	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯১
সাম্প্রতিক/ সংরক্ষণের জন্য আরো তথ্য-ঘন মাধ্যম, আলু বাঁচাতে জিন কারিগরি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯১
বর্ণালী/গণিতের আর কি প্রয়োজন?, নারী চিত্র: বিশ্ব জোড়া	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯১
প্রসাধন, রসায়ন, বিজ্ঞাপন	আপন কেমিষ্ট	ডিসেম্বর ১৯৯১
সাধারন নিয়ে অসাধারন ভাবনা	রবার্ট ফুলঘুম	ডিসেম্বর ১৯৯১
বিচিত্র বিজ্ঞান	সাব্বির আনোয়ার	ডিসেম্বর ১৯৯১
সাম্প্রতিক/লিবিয়ার ফসিল পানি ও নলাকৃতি নদী, জাপানের চিন্তাশীল কম্পিউটার এখন প্রদর্শনীতে, ক্যান্সার প্রতিরোধে রসুন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ডিসেম্বর ১৯৯১
চমকপ্রদ/ মশা নিধনে অব্যর্থ পাখা, একটি সোফার দাম	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ডিসেম্বর ১৯৯১
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ডিসেম্বর ১৯৯১
পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন	প্রাণবন্ধু বিশ্বাস	জানুয়ারী ১৯৯২
খাবারে মেশাল: ভাল মন্দ	আপন কেমিষ্ট	জানুয়ারী ১৯৯২
ঘূর্নি বিধ্বস্ত মৌলিক বিদ্যালয় এলাকার গৃহনির্মাণ কর্মসূচি	এম এ ওয়াহাব	জানুয়ারী ১৯৯২

সাধারণ নিয়ে অসাধারণ ভাবনা	রবার্ট ফুলঘুম	এপ্রিল ১৯৯২
পৃথিবীর জন্য শীর্ষ বৈঠক: প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে	স্বাতী	এপ্রিল ১৯৯২
সাম্প্রতিক/যোগাযোগের জন্য বিশ্ব জোড়া কম্পিউটার জাল, ডি,এন,এ বিশ্লেষণে আদি মাতার সন্ধান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল ১৯৯২
চমকপ্রদ/ঔষুধের চার পেয়ে কারখানা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল ১৯৯২
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল ১৯৯২
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ১৯৯২
কি করে নোবেল পুরস্কার পাওয়া যায়	আমির আমিরানী	মে ১৯৯২
রং তুলি শিল্প	শাহীন সুলতানা	মে ১৯৯২
গ্রামীন পরিবেশে মুরগীর বাচ্চা পালনে তুষের চুলায় ব্রুডার	মো: মাহেদুর রহমান	মে ১৯৯২
নিম্ন উত্তাপের কথা	স্বাতী	আগস্ট ১৯৯২
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগস্ট ১৯৯২
শিশুর বিজ্ঞান মনস্কতা ও শিশু শিক্ষা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগস্ট ১৯৯২
একটি অঞ্চলে সার্বজনীন ভাবে উন্নতচুলা প্রবর্তন কার্যক্রম	শাহীন সুলতানা	আগস্ট ১৯৯২
সাম্প্রতিক/আদি মানুষের ফসিল: শূন্যস্থান পূরণ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগস্ট ১৯৯২
চমকপ্রদ/গোবরের শুদ্ধি, আদিম ছুতার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগস্ট ১৯৯২
ভাষা বিদ্যা ও কম্পিউটার	আলী আসগর	অক্টোবর ১৯৯২
প্রাকৃতিক গ্যাস	স্বাতী	অক্টোবর ১৯৯২
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টোবর ১৯৯২
রাতে আকাশ অন্ধকার দেখায় কেন	অঞ্জন মাহফুজ	অক্টোবর ১৯৯২
সাম্প্রতিক/রান্নার গুনে খাবারের স্বাদ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টোবর ১৯৯২
বর্ণালী/কম্পিউটার প্রোগ্রামে গণিত ও ভীতির অবসান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টোবর ১৯৯২
মৌলিক বিদ্যালয ব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতি	মো. ঈদউদ্দিন	অক্টোবর ১৯৯২
কিশোরী সমাবেশ-সুরুজ, টাংগাইল	শাহীন সুলতানা	অক্টোবর ১৯৯২
রোবট	আলী আসগর	নভে-ডিসে '৯২
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভে-ডিসে '৯২
টেলিভিশন প্রযুক্তির পালা বদল	স্বাতী	নভে-ডিসে '৯২
ধরিত্রী সম্মেলন ও তারপর: আমাদের করনীয়	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভে-ডিসে '৯২
স্থানান্তরযোগ্য করে গাছ বড় করার পরীক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভে-ডিসে '৯২
বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রে স্লাইড শো ও আলোচনা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভে-ডিসে '৯২
পদ্মা যমুনার উৎস সন্ধানে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৯৩
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৯৩
অপটিক্যাল ফাইবার	স্বাতী	জানু-ফেব্রু '৯৩
বর্ণালী/সৌর স্নাত নারকেল	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৯৩
সাম্প্রতিক/কীটমুক্ত শস্য সংরক্ষণের জন্য সৌর শক্তি, ভাইরাসের সহায়তায় আণবিক অস্ত্রোপচার	সাইখুলুজ্জামান মিনার	জানু-ফেব্রু '৯৩
চমকপ্রদ/তাপে চাপে গোল কাঠ থেকে চৌকা কাঠ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৯৩
সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পে - বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানু-ফেব্রু '৯৩
কিশোরী সমাবেশ	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	জানু-ফেব্রু '৯৩
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ১৯৯৩
ইবনে সীনা	ড. আলী আসগর	মে ১৯৯৩
ইতিহাসের ঢাকা নগরী: প্রযুক্তি ও জনজীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ১৯৯৩
চমকপ্রদ/ হিল নেই তবু হাই হিল	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ১৯৯৩
বর্ণালী/ শিক্ষা বনাম প্রশিক্ষণ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ১৯৯৩
সাম্প্রতিক/ রক্তের অন্য রকম বাইপাস	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ১৯৯৩
সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র	মোহাম্মদ মাহেদুর রহমান	মে ১৯৯৩
কিশোরী সমাবেশ: দেউতি রংপুর	মো. আশরাফুল ইসলাম (আজাদ)	মে ১৯৯৩
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলা-আগ '৯৩
চোখ আর চশমা	স্বাতী	জুলা-আগ '৯৩
ইতিহাসে ঢাকা নগরীঃ প্রযুক্তি ও জনজীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলা-আগ '৯৩
মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কয়লা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলা-আগ '৯৩

চমকপ্রদ/হেরমানের সন্তান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলা-আগ '৯৩
সাম্প্রতিক/বিজ্ঞানে জ্বালানী বাঁচাতে প্লাষ্টিক	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলা-আগ '৯৩
পেট্রোল ট্যাংক ও ইঞ্জিনের মাঝ পথে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলা-আগ '৯৩
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
দ্রুত কোলেস্টোরল কমাতে এনজাইম	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
সাম্প্রতিক/ টেলিভিশনকে কি গুটিয়ে রোল করা যাবে?	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
তাম্র যুগের এক নিঃসঙ্গ পথিক: আইসম্যান	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ	কাজী জহিরুল ইসলাম	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
মাদাগাস্কারে মরুকরণ বিজ্ঞানীদের উদ্বেগ	সঞ্জয় ভৌমিক	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
সিঙ্গুলারিটি কি?	অঞ্জন মাহফুজ	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
চমকপ্রদ/পিপড়ার সরল যাত্রা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র কার্যক্রম	এম.এ.ওয়াহাব এবং দাউদ মোল্লা	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯৩
এভারেষ্ট শৃঙ্গে: মহাবিজয়ের ৪০ বছর	স্বাতী	অক্টো-নভে '৯৩
শ্রোয়ডিংগারের 'বিড়াল'	অঞ্জন মাহফুজ	অক্টো-নভে '৯৩
সাম্প্রতিক/ চূড়ান্ত তত্ত্বের সন্ধানে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯৩
বায়োটেক্সটাইল: জীবানু প্রতিরোধী কাপড়	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯৩
টার্কী মুরগীর মধ্যে সন্তান আকাঙ্ক্ষার অবসানে জিন কারিগরি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯৩
উদ্ভিদ শারীরবৃত্তে রাসায়নিক দূত	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯৩
চুইংগাম চিবিয়ে দাঁত পরিস্কার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯৩
ঘ্রাণং- অর্ধ..	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯৩
ধ্রুব তারা আরো ধ্রুব হচ্ছে এবং আরো রহস্যময়	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টো-নভে '৯৩
মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থায় নতুন সংযোজন	কুন্তল কান্তি পাল	অক্টো-নভে '৯৩
সাম্প্রতিক/বিকল্প জ্বালানী বাস, ফ্যাক্সে গোপনীয়তা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ডি '৯৩-জা '৯৪
চমকপ্রদ/ কম্পিউটার কী বোর্ড অলীক হতে চলছে, বন উন্নয়নে গৃহপালিত পশু	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ডি '৯৩-জা '৯৪
পরিবেশ ও নগরজীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মার্চ-এপ্রিল '৯৪
বায়োটেকনোলজী শিল্প কোন পথে?	"	মার্চ-এপ্রিল '৯৪
স্কাউট জাম্বুরী '৯৪	মো. মহসীন আলী	মার্চ-এপ্রিল '৯৪
গ্রামীণ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	আ.ক.ম সিরাজুল ইসলাম	মার্চ-এপ্রিল '৯৪
মিনি বায়োগ্যাস প্লান্ট	এম. এম. সাইখুলুজ্জামান	মার্চ-এপ্রিল '৯৪
এ যুগের রোবট শ্রমিক	স্বাতী	মার্চ-এপ্রিল '৯৫
সবুজ আচছাদন ও পরিবেশ. বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মার্চ-এপ্রিল '৯৫
মেথক্যাথিনোন: পরবর্তী হুমকি	জিয়াউল আহসান	মার্চ-এপ্রিল '৯৫
বিশ্ব-তত্ত্বের নূতন বিকল্প: বিগ-ব্যাং না মিনি ব্যাং	জয়ন্ত নারলিকার	মার্চ-এপ্রিল '৯৫
ফসলের বৈচিত্র: কৃষির নতুন দিগন্ত	হাসান বানু	মার্চ-এপ্রিল '৯৫
সাম্প্রতিক/ম্যামোগ্রাফী ঝুঁকিও মাপতে পারে, কম্পিউটারের আপন ডাক্তারী,	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মার্চ-এপ্রিল '৯৫
চমকপ্রদ/দুর্গত উদ্ভিদের আর্ত সংকেত	"	মার্চ-এপ্রিল '৯৫
পদার্থ বিদ্যায় স্নাতক	স্বাতী	জুন-জুলাই '৯৫
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন-জুলাই '৯৫
কোয়ান্টাম তত্ত্ব কিভাবে হতভম্ব করে: চিঠি না ফ্যাক্স? শক্তি - ব্যয়ের হিসাবে কোনটি দক্ষ	জন পোলকিং হোর্ন	জুন-জুলাই '৯৫
পোলিও দিবস পালন ও আমাদের কার্যক্রম	মির্জা মো. রফিকুল ইসলাম	জুন-জুলাই '৯৫
কেঁচো কম্পোস্ট	শাহীনুর কবীর	জুন-জুলাই '৯৫
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ	হাসান বানু	জুন-জুলাই '৯৫
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ফেব্রু-মার্চ '৯৬
চমকপ্রদ/জীব বিবর্তন ও প্রেমের চাহিদা, জলহস্তী - জোক সমাচার	"	ফেব্রু-মার্চ '৯৬
সাম্প্রতিক/উদ্ভিদ-বৈচিত্রে রক্ষণশীলতা, কোলেষ্টেরোল নিয়ন্ত্রণে মারাত্মক ছত্রাক, জড় বুদ্ধির কারণ সন্ধানে, মস্তিষ্ক রোগে ফুলেল চিকিৎসা, জোয়ার ভাটা থেকে শক্তি: নূতন পদ্ধতি,	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ফেব্রু-মার্চ '৯৬

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র কার্যক্রম: মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন	তসলিমা আনোয়ার ও মহিবুল্লাহ শেখ	ফেব্রু-মার্চ '৯৬
২য় এপি কমডেকো: তামাতু বরগুনা	এনামুল হক	ফেব্রু-মার্চ '৯৬
পরিবেশ ও নগর জীবন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল-মে '৯৭
কম্পিউটারের কাজ	"	এপ্রিল-মে '৯৭
ই-মেইল	"	এপ্রিল-মে '৯৭
সাগর সিঞ্চনে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৯৭
সাম্প্রতিক/ভোল পাল্টানো শ্যাওলা না, গা বাঁচানো প্রবন্ধ, ভয়ঙ্কর স্মৃতি - পীড়িত ইঁদুর, অতি ভাল ভাল নয়	"	জুলাই ১৯৯৭
চমকপ্রদ/ শূন্য পাওয়ার প্রতিযোগিতা, ৩৫ জন সঙ অনেক শিশু এবং কয়েকজন ডাক্তার	"	জুলাই ১৯৯৭
স্টিফেন হকিং: এই শতাব্দীর অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী	ওবায়দুল গণি চন্দন	জুলাই ১৯৯৭
ভার্চুয়াল রিয়ালিটি	আসরার মাসুদ	জুলাই ১৯৯৭
সমুদ্রের নীচে বাড়ীঘর	আনজির লিটন	জুলাই ১৯৯৭
দুই নদীর মাঝে সভ্যতার পথযাত্রা	মিথুন	জুলাই ১৯৯৭
দেশে বিজ্ঞান গবেষণার কিছু চিত্র	ফরহাদ আহাম্মেদ	জুলাই ১৯৯৭
সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে ব্যাপক প্রশিক্ষণ	বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিবেদক	জুলাই ১৯৯৭
বিজ্ঞান চর্চার গ্রামীণ আনন্দকেন্দ্র	ঐ	জুলাই ১৯৯৭
বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প	জারহাদ হোসেন সিদ্দিকি	জুলাই ১৯৯৭
উন্নয়ন সহায়ক হিসেবে টেলিভিশন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৯৭
সাবধান ! ওজোন স্তর ক্ষয় হচ্ছে!!	বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিবেদন	নভেম্বর ১৯৯৭
সাম্প্রতিক/ ব্লাকহোল কি আদৌ উদ্বায়ী?	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৯৭
আগামী দিনের খাদ্য: স্পিরুলিনা	বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিবেদন	নভেম্বর ১৯৯৭
স্মরণশক্তির রহস্য	ফরহাদ আহাম্মেদ	নভেম্বর ১৯৯৭
কম্পিউটার কথিকা	আরিফ বাদশা খান	নভেম্বর ১৯৯৭
কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশ	বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিবেদন	নভেম্বর ১৯৯৭
দেশ ও বিজ্ঞান	ফরহাদ আহম্মেদ	নভেম্বর ১৯৯৭
ইন্টারনেট ফোন	মো. মোসলেম আলী	নভেম্বর ১৯৯৭
একুশ শতকে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা	মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	নভেম্বর ১৯৯৭
এক নজরে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রম	বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিবেদন	নভেম্বর ১৯৯৭
প্রযুক্তি ও নগর সভ্যতা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন ১৯৯৮
বিহারের গ্রামে এস.আর. আই এর সঙ্গে অভিজ্ঞতা	হাসান বানু	জুন ১৯৯৮
বিজ্ঞান-কল্প কাহিনী/পূণর্মিলন	আরিফ বাদশা খান	জুন ১৯৯৮
সাম্প্রতিক /পানি থেকে পেট্রল, মহাকাশে নতুন গ্যালাক্সি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুন ১৯৯৮
বায়োনিক্স প্রযুক্তি	মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	জুন ১৯৯৮
গ্রামীণ গৃহনির্মাণ সামগ্রী টেকসইকরণ প্রযুক্তি	নীলরতন সরকার	জুন ১৯৯৮
মরুজ উদ্ভিদ ক্যাকটাস	ফরহাদ আহাম্মেদ	জুন ১৯৯৮
গবেষণা রিপোর্ট/ বাংলাদেশের পানি সংকট উত্তরণে ভূগর্ভস্থ পানি	মো.জায়েদুল আলম ফুয়াদ	জুন ১৯৯৮
বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রম : সুরুজে বিশেষ বাড়ি বাড়ি কাজ	মো.জারহাদ হোসেন সিদ্দিকী	জুন ১৯৯৮
বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের সৌরশক্তি কার্যক্রম	সালমা খাতুন	জুন ১৯৯৮
আধুনিক ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	আগস্ট ১৯৯৮
রোবট সয়ম্ভু	আরিফ বাদশা খান	আগস্ট ১৯৯৮
শব্দের গতিসীমা পেরিয়ে	আহসান রেজা চৌধুরী	আগস্ট ১৯৯৮
বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা কার্যক্রম	নিজস্ব প্রতিবেদক	আগস্ট ১৯৯৮
শান্তিময় বিশ্বের জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ	ড. এম.এ.সাত্তার	আগস্ট ১৯৯৮
শিশুর মানসিক বিকাশে আপনি কি করবেন	ডা. শাহীদা হোসাইন	আগস্ট ১৯৯৮
সৌরশক্তি প্রযুক্তির জাতীয় প্রদশনী '৯৮	ফরহাদ আহাম্মেদ	আগস্ট ১৯৯৮
গ্যাসের গাড়ী	ফরহাদ আহাম্মেদ	সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
ইন্টারনেট ব্যবসা	আরিফ বাদশা খান	সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
সাম্প্রতিক/ কম্পিউটারের শতাব্দী সংকট, বিশ্বের ক্ষুদ্রতম কম্পিউটার, বিশেষ সাইকেল, সমুদ্রের নীচে শহর।	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

জনগণের নতুন আতঙ্ক: আর্সেনিক দূষণ	ডা.শাহীদা হোসাইন	সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
বিজ্ঞানের জনা অজানা/রেল লাইনে ফাঁক থাকে কেন, স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে কিভাবে অবস্থান করছে, তারকা মিটমিট করে জ্বলে কেন, মরুসাগরে মানুষ ভেসে থাকে কেন, বিস্ময়কর যন্ত্র রাডারের কথা,	বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিবেদন	সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
দরিদ্রতা ও পরিবেশ	ড.এম এ সাত্তার	সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের কিশোরী কর্মসূচি	শার্মিন ফরহাত	সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
বাংলাদেশের জার্নাল ও বিজ্ঞান সাময়িকী	ফরহাদ আহাম্মেদ	সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
তাপের বদলে চাপ প্রয়োগে খাদ্য সংরক্ষণ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৯৮
গ্যাসিফায়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন দিগন্ত	ফরহাদ আহাম্মেদ ও সিরাজুল ইসলাম	নভেম্বর ১৯৯৮
মাইণ্ড রিডিং এবার কম্পিউটারে	আরিফ বাদশা খান	নভেম্বর ১৯৯৮
ক্যালসিয়াম গ্রহণ কতটুকু জরুরী	ডা.শাহীদা হোসাইন	নভেম্বর ১৯৯৮
সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা থেকে শক্তি	অজিত চৌধুরী	নভেম্বর ১৯৯৮
অপুষ্টি দূরীকরণে শাক-সব্জি	বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিবেদন	নভেম্বর ১৯৯৮
সাম্প্রতিক/শূন্যে বেলুন প্রতিযোগিতা, শস্য ও বৃক্ষ লালনের ইলেকট্রনিক্স, জৈব বর্জ হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃত্রিম চোখ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পোষাক, হাতের তালুতে জেনারেটর	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৯৮
বিজ্ঞানের জানা অজানা/২৮ বছর বয়সের পর মানুষ বড় হয় না কেন, নদীর চেয়ে সমুদ্রে সাঁতার কাটা সহজ কেন, যমুনাসেতু বাঁকা কেন, হাই আসে কেন।	বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিবেদন	নভেম্বর ১৯৯৮
ভারতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	নভেম্বর ১৯৯৮
জীবাণু সার	ফরহাদ আহাম্মেদ	নভেম্বর ১৯৯৮
বিজ্ঞান চর্চার আনন্দ কেন্দ্র ভ্রমণে একদিন	হাসান বানু	নভেম্বর ১৯৯৮
বিদেশী পত্রিকায় বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র: তারা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আয় করছে , গ্রামীণ বাংলাদেশে শিশু কিশোরদের ক্ষমতায়ন	রশীদা ভগত	নভেম্বর ১৯৯৮
যৌথ গবেষণার : কোল্যাবোরেটরী	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৯৯
এশিয়ায় অটো বিস্ফোরণ	আরিফ বাদশা খান	জানুয়ারী ১৯৯৯
বায়োটেকনোলজি	মো.জায়েদুল আলম ফুয়াদ	জানুয়ারী ১৯৯৯
ধান গবেষণায় বাংলাদেশ	ফরহাদ আহাম্মেদ	জানুয়ারী ১৯৯৯
শরীরে পানির প্রয়োজন কতটুকু	ডা. শাহীদা হোসাইন	জানুয়ারী ১৯৯৯
বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের বিদ্যালয় - নার্সারী সমূহ: একটি সমীক্ষা	বিজ্ঞান গণশিক্ষা প্রতিবেদন	জানুয়ারী ১৯৯৯
কিশোরীদের গল্প	রীতা ভৌমিক	জানুয়ারী ১৯৯৯
চমকপ্রদ/বিদ্যুৎ লাইনের মাধ্যমে ইন্টারনেটের তথ্য, মাটি খাওয়া মানুষ, গাড়ীর নীরব যাত্রা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৯৯
সাম্প্রতিক/কম্পিউটার নেটওয়ার্কের নতুন যুগে বাংলাদেশ, সৌরশক্তি চালিত রেসিং কার, স্মৃতি বর্ধক ঘড়ি, মগজের জাদুঘর, ঘরে বসে রক্ত পরীক্ষা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ১৯৯৯
প্রযুক্তির পিঠে সওয়ার হবো নাকি প্রযুক্তি তলানী কুড়াবো	প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস	এপ্রিল ১৯৯৯
বাংলাদেশে অর্কিডের গুরুত্ব ও তার বাণিজ্যিক ব্যবহার	ড.সত্যজিত কুমার ভদ্র	এপ্রিল ১৯৯৯
সাম্প্রতিক/আমরা কেমন আছি, পরিবর্তিত জিন না ছড়াবার উপায়, প্লাষ্টিক বালতির পেছনে রাসায়নিক অনুঘটক,মানবদেহের বিস্ময়কর তথ্য	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল ১৯৯৯
১৯৯৮ সালের নোবেল বিজয়ী	ফরহাদ আহামেদ	এপ্রিল ১৯৯৯
উত্তর পত্র পরীক্ষায় যন্ত্র কিভাবে পাঠ করে	ড. এটি এম জিয়াউদ্দিন ও জায়েদুল আলম ফুয়াদ	এপ্রিল ১৯৯৯
অতিরিক্ত ভিটামিন দেহের জন্য ক্ষতিকর	ডা. শাহীদা হোসাইন	এপ্রিল ১৯৯৯
মশলার রহস্য কথা	আবুল কাশেম (আকাশ)	এপ্রিল ১৯৯৯
হার্বেরিয়াম	নিয়াজ উদ্দীন পাশা	এপ্রিল ১৯৯৯
কিশোরীদের ক্ষমতায়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।	ফরহাদ আহাম্মেদ	এপ্রিল ১৯৯৯
চমকপ্রদ/ পুরোনো কম্পিউটার দিয়ে সুপার কম্পিউটার: পাথরের স্যপ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল ১৯৯৯
বর্ণালী/ দামি গ্যাস, নানা গ্যাস	"	এপ্রিল ১৯৯৯

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ: উপমহাদেশের ভূমিকা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৯৯
কম্পিউটারের বারকোডিং	মোহাম্মদ জায়েদুল আলম ফুয়াদ	জুলাই ১৯৯৯
মাইক্রোওয়েভ চুলা: এখন রসায়নের রান্নায়	নাতাশা	জুলাই ১৯৯৯
চাঁদেও মানুষের বসতি হবে!	সুজন হায়দার	জুলাই ১৯৯৯
কোয়াসাররা কেন উজ্জ্বল হয়	শৈবাল কুমার গুহ	জুলাই ১৯৯৯
মহাদেশীয় অপসারণ তত্ত্ব	আবদুল কাদের পলাশ	জুলাই ১৯৯৯
এই নদী, এই পানি	স্বাতী	জুলাই ১৯৯৯
জীবনের জন্য পরিবেশ	ফরহাদ আহাম্মেদ	জুলাই ১৯৯৯
চমকপ্রদ/মুরগীর পালকের নতুন ব্যবহার, রাতের কর্ষণ আগাছার ঝামেলা কমায়	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৯৯
বই পড়ার নতুন প্রযুক্তি: অডিবলের শোনার বই	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৯৯
সাম্প্রতিক/বহন যোগ্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, আগামী দিনের নেট: রাস্তার আলোয় বিপত্তি, অফুরন্ত পানি থেকে হাইড্রোজেন জ্বালানি তৈরীর নতুন সম্ভাবনা, জাপানী হ্রদের কাদার ভাষায় অতীত দিনের কাল-পঞ্জিকা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৯৯
বাংলাদেশে কৃষি জমিতে প্রয়োজনীয় বর্জ পদার্থের ব্যবহার	মো.নিয়াজ উদ্দিন পাশা	জুলাই ১৯৯৯
লেখার কালি এলো কিভাবে	মোতাহার উদ্দিন মাজেদ	জুলাই ১৯৯৯
ভিটামিন কেন প্রয়োজন	ডা.শাহীদা হোসাইন	জুলাই ১৯৯৯
বিজ্ঞানের জানা-অজানা: ক্যামেরা ছবি তৈরী করে কিভাবে, সেলুলার ফোন বা মোবাইল ফোন কিভাবে কাজ করে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ১৯৯৯
কম্পিউটার শব্দ পরিচিতি	মো.ফয়সাল আনোয়ার প্রতীক	জুলাই ১৯৯৯
হাসতে মানা	বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিবেদন	জুলাই ১৯৯৯
বর্ণালী/কোয়ান্টাম থিয়োরি কাকে বলে, জন্তুদের লেজ থাকে কেন, মোম কোথা থেকে পাই	হাসান বানু	জুলাই ১৯৯৯
পশু সম্পদ গবেষণায় বাংলাদেশ ,	বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিবেদন	জুলাই ১৯৯৯
বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রম: প্রত্যন্ত গ্রামে আত্মকর্ম-সংস্থানের জন্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ	"	জুলাই ১৯৯৯
ইঞ্জিনের ইতিহাস	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
আমেরিকা মহাদেশের বিলুপ্ত প্রায়- কিছু প্রাণীর কথা	শৈবাল কুমার গুহ	সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
কুসংস্কার: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ	মো. ফয়সাল আনোয়ার প্রতীক	সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র কার্যক্রম কেঁচো কম্পোস্ট	এস.এম মোতাব্বিরুল হক	সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
সাম্প্রতিক/ পুত্র ও কন্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন জিন আবিস্কার, ভিন্ন গ্রহের মহাকাশ যানে চড়ার আশায় ৬০ ব্যক্তি অন্তর্ধান, চীন মহাশুন্যে মানুষ পাঠাবে, চন্দ্র বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী, চন্দ্র টেলিস্কোপকে মহাশূন্যে স্থাপন, ক্ষুদ্র গ্রহানুতে পানির প্রাচুর্য	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
কোষ্ঠ-কাঠিন্য	ডা. শাহিদা হোসাইন	সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
ক্যান্সার নিয়ে কথা	হাসান বানু	সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
কম্পিউটার শব্দ পরিচিতি	ফয়সাল আনোয়ার প্রতীক	সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
চমকপ্রদ/ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবী, ডিম হাটের চিকিৎসায়, ভূতত্ত্ব থেকে শেখা, কাল্পনিক ব্যায়াম শারীরিক শক্তি দিতে পারে।	হাসান বানু	সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
ব্রেইন জিম	মো. মফিজুল হক	অক্টোবর ১৯৯৯
মাশরুম নিয়ে কথা	হাবিবুর রহমান	অক্টোবর ১৯৯৯
শিশুর ঘাম হলে করণীয়	ড. শাহীদা হোসাইন	অক্টোবর ১৯৯৯
রান্নাঘরের প্যাথোলজী	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টোবর ১৯৯৯
হাট গড়ার কাজে হাত পায়ের পেশী	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টোবর ১৯৯৯
তারা জন্ম কথা	মুহাম্মদ ইব্রহীম	ডিসেম্বর ১৯৯৯
২০০০ সাল এবং Y2K সমস্যা	মহিবুল হক সেতু	ডিসেম্বর ১৯৯৯
বিজ্ঞানের যাদুকর : টমাস আলভা এডিসন	শৈবাল কুমারগুহ	ডিসেম্বর ১৯৯৯
কাগজের জয়যাত্রা	এম এইচ এম আবেদ	ডিসেম্বর ১৯৯৯
বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রম: উপার্জনমূলক শিক্ষা	হাসান বানু	ডিসেম্বর ১৯৯৯
পৃথিবীর ধ্বংস কী আসন্ন	ফরহাদ আহমেদ	ডিসেম্বর ১৯৯৯
অবহেলিত রোগ পাইল্‌স	ডা. শাহীদা হোসাইন	ডিসেম্বর ১৯৯৯

আর্সেনিক দূষণ	মো. নাহিদুল কবির বুলবুল	ডিসেম্বর ১৯৯৯
কৃষি উন্নয়নে বায়োটেকনোলজি	লিটন চৌধুরী	ডিসেম্বর ১৯৯৯
তথ্যকণিকা/ কম্পিউটারে Melissa ভাইরাস, ড্রাইভিং শিখানোর সফ্টওয়্যার	বুশরা জেবিন	ডিসেম্বর ১৯৯৯
চমকপ্রদ/ নিজের দেহের স্পেয়ার পার্ট তৈরী	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ডিসেম্বর ১৯৯৯
সৌরজগতের সৃষ্টি ও অবস্থান	নাঈম উল ইসলাম অপু	ডিসেম্বর ১৯৯৯
ধারাবাহিক: স্পিউটার শব্দ পরিচিতি	ফয়সাল আনোয়ার প্রতিক	ডিসেম্বর ১৯৯৯
সাম্প্রতিক/ ফাঁপা হাড়ের সাহায্য, ভিডিওতে দ্রুত অনুসন্ধান, কীটনাশক পোকা ও লেডী বার্ডের ডানায় বেড়ী,	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ডিসেম্বর ১৯৯৯
বস্তুর পুনব্যবহার	স্থপতি মো. মোশাররফ হোছাইন	ডিসেম্বর ১৯৯৯
কলিং বেলের ইলেকট্রনিক্স ডায়াগ্রাম	নূরুল ইসলাম	ডিসেম্বর ১৯৯৯
বিংশ শতাব্দীতে পদার্থ বিদ্যা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ২০০০
পৃথিবীর অরণ্য	শৈবাল কুমার গুহ	জানুয়ারী ২০০০
১৯৯৯ এর নোবেল বিজয়ী	সংগৃহিত	জানুয়ারী ২০০০
নিদ্রাহীনতা যখন সমস্যা	ডা. শাহীদা হোসাইন	জানুয়ারী ২০০০
উন্নত চুলা	মোছা. রহিমা খাতুন	জানুয়ারী ২০০০
ফ্রাঙ্কলয়েড রাইট: জীবন ও স্থাপত্য	স্থপতি মোশাররফ হোছাইন অমি	জানুয়ারী ২০০০
কম্পিউটার শব্দ পরিচিতি	ফয়সাল আনোয়ার প্রতীক	জানুয়ারী ২০০০
ম্যাগলেভের নতুন পদ্ধতি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ২০০০
ফটোগ্রাফি: অতীত এবং বর্তমান	আইরীন নিয়াজী মান্না	জানুয়ারী ২০০০
২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস ৩০ দিনে?	ফরহাদ আহাম্মেদ	জানুয়ারী ২০০০
কম্পিউটার প্রিন্টার	ফয়সাল আনোয়ার প্রতীক	জানুয়ারী ২০০০
মানমন্দির মন্দির নয়	কাজী বাবিন	জানুয়ারী ২০০০
মানবদেহের বিস্ময়কর তথ্য	ফরহাদ আহাম্মেদ	জানুয়ারী ২০০০
ক্ষুধা ও পরিবেশ দূষণ	ড. এম. এ. সাত্তার	জানুয়ারী ২০০০
সবচেয়ে হাল্কা ও ভারী ধাতুর কথা	এ.জেড. এম. আহসান হাবিব	জানুয়ারী ২০০০
ডিম্বাণুর উদার নীতি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জানুয়ারী ২০০০
মিথ্যা ধরার যন্ত্র	কাজী বাবিন	জানুয়ারী ২০০০
আপনার মতামত	শাহীন আকতার	জানুয়ারী ২০০০
বিজ্ঞান সাময়িকীতে সংযোজনের আবেদন	মো. স. আহমদ	জানুয়ারী ২০০০
তোতা কাহিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মার্চ ২০০০
বিজ্ঞান চর্চায় অধিক মানুষের অংশগ্রহণ: একুশ শতক একটি সম্ভাবনা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মার্চ ২০০০
বিজ্ঞান সাহিত্যে বিশ শতকের অর্জন	নূরুল হুদা	মার্চ ২০০০
সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ	ফরহাদ আহাম্মেদ	মার্চ ২০০০
সূর্যের কথা	শফি ইসলাম	মার্চ ২০০০
বর্জ্য পদার্থের পুনচক্রায়ন	শেখ ওহিদুজ্জামান	মার্চ ২০০০
কম্পিউটার শব্দ পরিচিতি	ফয়সাল আনোয়ার প্রতীক	মার্চ ২০০০
সংক্রামক রোগ টাইফয়েড	ডা. শাহীদা হোসাইন	মার্চ ২০০০
তথ্য কণিকা	জাকিয়া সুলতানা সুমি	মার্চ ২০০০
সুদর্শন পাখি হুদ্‌ হুদ্‌	আইরীন নিয়াজী মান্না	মার্চ ২০০০
মৌমাছির বিচিত্র জীবন	কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	মার্চ ২০০০
নতুন কম্পিউটার ভাইরাস	ফরহাদ আহাম্মেদ	মার্চ ২০০০
মাছের শরীর বিদ্যুৎ, মাংস খেকো গাছ, মহাকাশে খাবার ঠান্ডা গরম	ফরহাদ আহাম্মেদ	মার্চ ২০০০
পুস্তক সমালোচনা	কে এম নুরুল হুদা	মার্চ ২০০০
চোখের ছানির উৎস	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মার্চ ২০০০
টমেটোর গুণাগুণ	হাসান বানু	মার্চ ২০০০
ব্লাক হোল: মহাবিশ্বে মায়াবী তারকা	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল ২০০০
তিনটি যথাযথ কেঁচো জাত ও বিভিন্ন কম্পোস্ট উপাদানের ব্যবহারে কেঁচোর মাধ্যমে কম্পোস্টিং এর তুলনামূলক পরীক্ষা	শারমিন ফরহাত ওবায়েদ মুতাকাব্বিরুল হক ও মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল ২০০০
মানব ক্লোনিং এর উজ্জ্বল দিক	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল ২০০০

আত্মদহনে শক্তি সৃষ্টি করবে উপগ্রহ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল ২০০০
ডাক্তারের কাছে জেনেটিক প্রফাইল	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল ২০০০
সাইকেল এলো যেভাবে	সোয়াইব হক	এপ্রিল ২০০০
চমকপ্রদ· বিদ্যুৎ বিহীন কম্পিউটার	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	এপ্রিল ২০০০
অন্যরকম বিমান	মহিবুল হক	এপ্রিল ২০০০
অদ্ভুত বড় ঘড়ি	মো. সাইদুর রহমান মোল্লা	এপ্রিল ২০০০
কম্পিউটারের মৌলিক কথা	একে এম সহিদুল ইসলাম	এপ্রিল ২০০০
সৌরশক্তি প্রযুক্তির জাতীয় প্রদর্শনী-২০০০	তোফায়েল আহমেদ	এপ্রিল ২০০০
পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজ	কে এম নূরুল হুদা	এপ্রিল ২০০০
আশ্চর্য প্রাণী	সুলতানা ফেরদাউস স্বপ্ন	এপ্রিল ২০০০
অদ্ভুদ প্রাণী: হনর্ড টোড	আইরিন নিয়াজী মান্না	এপ্রিল ২০০০
বিশ শতকের বিজ্ঞান বনাম একুশ শতকের বিজ্ঞান	ফরহাদ আহাম্মেদ	এপ্রিল ২০০০
কম্পিউটার শব্দ পরিচিতি	ফয়সাল আনোয়ার প্রতীক	এপ্রিল ২০০০
গাছের অনুভূতি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ২০০০
পরিবেশ অবক্ষয়ের আশংকা	ফরহাদ আহাম্মেদ	মে ২০০০
রেটিনা যখন কম্পিউটার স্ক্রীন	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ২০০০
মঙ্গল গ্রহে বিমানের প্রথম যাত্রা	ফরহাদ আহাম্মেদ	মে ২০০০
ভূমিকম্প মোকাবেলায় প্রকৌশল গবেষণা	রিটা ট্রাশেল	মে ২০০০
ভূমিকম্প	মো. ফয়সাল আনোয়ার প্রতীক	মে ২০০০
বিশ্ব সৃষ্টির কথা	শফি ইসলাম	মে ২০০০
দেশের আতংক "আর্সেনিক"	জহিরুল ইসলাম রুবেল	মে ২০০০
দেশে বায়ু থেকে বিদুৎ উৎপাদন সম্ভাবনা	তোফায়েল আহমেদ	মে ২০০০
খাবারের আধুনিকায়নে চাপ	মো. খোরশেদ আলম	মে ২০০০
স্বাদের সূত্র, জিহ্বায় আর মস্তিস্কে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ২০০০
পৃথিবী দ্রুত হেলে গিয়েছিল	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ২০০০
পাকস্থলীর সবল জীবাণুরও দুর্বলতা আছে	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ২০০০
বাতাসের স্বরূপ আবিস্কারক: হেনরি ক্যাভেলিশ	সফি ইসলাম	মে ২০০০
সবচেয়ে ক্ষুদ্র কী বোর্ড, সাপের দেহ ঠান্ডা কেন?	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	মে ২০০০
নিউটনের মাধ্যাকর্ষন সূত্রে ভুল	ফরহাদ আহাম্মেদ	মে ২০০০
পুস্তক সমালোচনা: ফুলের জন্য ভালবাসা	কে. এম. নুরুল ইসলাম	মে ২০০০
জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় জৈব নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুমোদন	মাহতাব ওসমানী	মে ২০০০
আমাদের জাতীয় পাখী দোয়েল	আইরীন নিয়াজী মান্না	মে ২০০০
তথ্য প্রযুক্তি: বাংলাদেশের সমৃদ্ধি অর্জনের মহাসড়ক	মুহাম্মদ ইউনূস	জুলাই ২০০০
ইলেকট্রনিক টাকা: ই-ক্যাশ	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ২০০০
দেহে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা	ডা. সাহীদা হোসাইন	জুলাই ২০০০
কেমন করে হয় চলচ্চিত্র চিত্রায়িত ও প্রদর্শিত	মোতাহের উদ্দিন মাজেদ	জুলাই ২০০০
পাটের মোজাইক রোগ: একটি পর্যালোচনা	সুকল্প দাস	জুলাই ২০০০
একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ২০০০
গরিব দেশ গরিব কেন?	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ২০০০
জলাতংক ও করণীয়	মো. নজরুল ইসলাম	জুলাই ২০০০
জীব ও অভিব্যাক্তি	এ.আর. এম. শাহানুজ্জামান তালুকদার	জুলাই ২০০০
নীরোগ শতায়ু	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ২০০০
কৃষিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং একটি বিতর্কিত প্রযুক্তি	কৃষিবিদ ফরহাদ আহাম্মেদ	জুলাই ২০০০
ভারচুয়াল ব্যাংক	স্বাতী	জুলাই ২০০০
আপনার শরীর-স্বাস্থ্যের উপর নজরদারি	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	জুলাই ২০০০
ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ ব্যবস্থা: ফুয়েল সেল	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সেপ্টেম্বর ২০০০
ড. সলি[illegible]লি	কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	সেপ্টেম্বর ২০০০
বাদুড় থেকে রাডার	সোয়াইব হক	সেপ্টেম্বর ২০০০
বিট্ল: প্রকৃতি অবাক বিস্ময়	ইসতিয়াক জাহাঙ্গীর	সেপ্টেম্বর ২০০০
টেলিভিশন প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে ভি-চিপ	আরিফ বাদশা খান	সেপ্টেম্বর ২০০০

পরিবেশে বনায়নের প্রভাব	মোহাম্মদ একরামুল ইসলাম	সেপ্টেম্বর ২০০০
বিস্ময়কর প্রাণী ডলফিন	মোনতাসির আহম্মদ রাতুল	সেপ্টেম্বর ২০০০
জানা-অজানা	শফি ইসলাম	সেপ্টেম্বর ২০০০
বাংলাদেশ ও বন্যা	মুসতবা ইশতিয়াক মামুন	সেপ্টেম্বর ২০০০
CNG: সম্ভাবনাময় দ্বার	মো. মঈনউদ্দিন আহমদ	সেপ্টেম্বর ২০০০
গোল্ডেন রাইস না সুইসাইড টেকনোলজি	আমিনুল ইসলাম জুয়েল	সেপ্টেম্বর ২০০০
শব্দ - দূষণ	এম. এইচ. রাশেদ চৌধুরী	সেপ্টেম্বর ২০০০
একই অধিক	স্বাতী	সেপ্টেম্বর ২০০০
পরিবেশ ও বৃক্ষ	মো. মঈনউদ্দিন আহমদ শাহজাদা	সেপ্টেম্বর ২০০০
চমকপ্রদ/একটু আরামের জন্য.	মুহাম্মদ ইব্রাহীম,	সেপ্টেম্বর ২০০০
মাথায় কত প্রশ্ন	মো. তৌফিক হোসেন	
স্বাস্থ্য পরিবেশ কার্যক্রম	ফরহাদ আহাম্মেদ	সেপ্টেম্বর ২০০০
প্লাস্টিক আলো	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টোবর ২০০০
মানুষ বনাম রোবট	অনিরুদ্ধ আলম	অক্টোবর ২০০০
নিলস বোরের পরিপূরকতার নীতি ও সভ্যতার সঙ্কট	ড. আলী আসগর	অক্টোবর ২০০০
তুঁত গাছের লাইকেন প্রতিরোধ: কিছু কথা	মো. আব্দুল রশীদ	অক্টোবর ২০০০
বৃক্ষের জন্যে	শামছুর রহমান	অক্টোবর ২০০০
পরিবেশ দূষণে কার্যকর জৈব প্রযুক্তি ফাইটোরিমেডিয়েশন	আব্দুল্লাহ শাহরিয়ার	অক্টোবর ২০০০
সাম্প্রতিক/টেস্টটিউবের নতুন টেস্ট, কোষ থেকেই পাওয়া যাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ	আবীর হাসান	অক্টোবর ২০০০
সাইফাই-ছবি	এ.এফ.এম. ফখরুদ্দীন	অক্টোবর ২০০০
আগামী দিনের টেলিফোন	এনামুল হক	অক্টোবর ২০০০
আর্সেনিক বিপর্যয় ও উত্তরণের পদক্ষেপ	আরশাদ সিদ্দিকী	অক্টোবর ২০০০
চমকপ্রদ/স্পর্শ-অনুভূতি নিয়ে নতুন মাউস	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	অক্টোবর ২০০০
ভয়ঙ্কর পিপীলিকা	মো. মঈনউদ্দিন আহমদ শাহজাদা	অক্টোবর ২০০০

এই উভয় বৈচিত্র্যকেই আমরা সংকলনে ধারণ করার চেষ্টা করেছি। অতি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ থেকে হালকা মেজাজের রূপক লেখা, বড়দের থেকে ছোটদের মনোগ্রাহী বিষয়বস্তু সব কিছুরই কিছু প্রতিনিধিত্বমূলক লেখা এখানে আনা হয়েছে। তাছাড়া যে সব সক্রিয় কর্মদ্যোগ *বিজ্ঞান সাময়িকী* বিভিন্ন সময় গ্রহণ করেছে তারও কিছুটা প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।

এই সংকলনটি চল্লিশ বছর ধরে ব্যাপ্ত একটি প্রচেষ্টার, একটি আকাঙ্ক্ষার, একটি আন্দোলনের আলেখ্য হিসাবে আদৃত হবে, এই আশা আমাদের থাকবে।

সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন **ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম**, মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর শুরু থেকে আজ অবধি এই পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক; বিজ্ঞান লেখক ও রেডিও-টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের (সিএমইএস) তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক। এদেশে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে তাঁর অবদানের জন্য ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম সুপরিচিত।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ